প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৫৯

। প্রকাশক ।

শ্রীস্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এস. সি., বি. টি.
বনমালী বিশ্বনাথ প্রকাশন
২২, পঞ্চাননতলা রোড,
কলিকাতা-৪১

ছেপেছেন ঃ
শ্রীমতী অলোকা চট্টোপাধ্যায় এম. এ.
সারদা প্রিন্টিং এণ্ড বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
২২, পঞ্চাননতলা রোড, কলিকাতা-৪১

॥ উৎসর্গ ॥

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক এম. এ., পি-এইচ. ডি., ডি. লিট
ভক্তিভাজনেষু

সূচীপত্র

আধুনিক পৃথিবীতে গবেষণার ধারা অনেকটাই পাল্টে গেছে। কোন বিষয়কেই তার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে গবেষকগণ বিষয়টিকে খাটো করে ফেলেন না। তাঁদের লক্ষ্য, ওই বিষয়টির সমধর্মী অন্যান্য বিষয়কেও প্রাসঙ্গিক ভাবে এনে ফেলা, এবং তার ফলে বিষয়টিকে একটি পরিপূর্ণতা দান করা। এমন কি, কলা ও বিজ্ঞান—যা দুই বিরুদ্ধ ডিসিপ্লিন, তাদের মধ্যেও একটি সমন্বয় সাধনের প্রয়াস দেখা যায়। বলা হয়, কলা ও বিজ্ঞান এক পাখির দুটি ডানা, ওড়বার জন্যে দুটোরই প্রয়োজন। ইতিহাস, তর্কশাস্ত্র, ফোকলোর—সবই আজ 'বিজ্ঞান'-এর অন্তর্ভুক্ত বলে চিহ্নিত, আপন মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই।

শ্রীযুক্ত রণজিৎকুমার সমাদ্দার মূলত ইতিহাসের ছাত্র, আমার অধীনে গবেষণা করতে এলেন সাহিত্য-বিষয়ে। প্রথম দিনই আমি তাঁকে আলোচনার দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে সচেতন করেছিলাম। তাঁর দৃষ্টিকোণ হবে 'সিন্থেটিক', সমন্বয়মূলক। অর্থাৎ ইতিহাসের তথ্য নয়, ইতিহাসের 'বোধ' দিয়ে সাহিত্যিক বিষয়কে ব্যাখ্যা বিচার করা। এক হিসেবে একেই বলা যায় **Metanalysis**, বাঙলা করে বলতে পারি—'সহ-বিশ্লেষণ'। এক ডিসিপ্লিনকে আর এক ডিসিপ্লিন দিয়ে দেখা। এক প্রসঙ্গ দিয়ে ভিন্ন এক প্রসঙ্গের বিচার।

কেবল ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যকেই নয়, সাহিত্যের সঙ্গেও আবার সংস্কৃতিকেও নিতে হবে। 'সংস্কৃতি' শব্দটিকেও অতি আধুনিক নৃতাত্ত্বিকগণ এক বিশাল ক্যানভাসের মধ্যে ফেলে দেখছেন। একটি জাতির সর্বাঙ্গীণ জীবন হল সেই ক্যানভাস। এই জন্যে কেবল **Culture** নয়, **'Culture-complex'** (বাঙলা করলে বলা যায়—'সংস্কৃতি-মণ্ডল') কেই একটি জাতির সাংস্কৃতিক বিকাশের পূর্ণতা বলে ধরে নিতে হবে।

শ্রীমান রণজিৎ তাঁর গবেষণা-পত্র রচনাকালে এই সব দিক সম্পর্কে পূর্ণ মাত্রায় সচেতন ছিলেন॥ যে শ্রম ও নিষ্ঠার পরিচয় তিনি দিয়েছেন, পাঠক মাত্রই তাতে খুশি হবেন। এই জাতীয় গ্রন্থের যেটি সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দিক, তা হল বিন্যাসের দিক॥ ভাগে-ভাগে, পর্বে-পর্বে এক-একটি প্রসঙ্গকে পরিপূর্ণতার পটভূমিকায় সাজিয়ে তোলা॥ আধুনিক গবেষণার একটি বড়ো দিক হল **Taxonomy** অর্থাৎ **Scientific classification**। [illegible]ক কতোখানি সূক্ষ্মস্তরে নিয়ে যাওয়া যায়, এই বই থেকে পাঠকগণ তার খানিকটা পরিচয় পাবেন। ইতিহাস-পর্ব

সাহিত্য-পর্ব রূপে প্রতিটি বিদ্রোহের পূর্ণচিত্র নানা উপবিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে।

নানা ঐতিহাসিক ঘটনা, তা সে যত ছোটই হোক না, একটি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে কিছু না কিছু, রেখাপাত করে যাবেই। অনেক ক্ষেত্রে কৌতুকের ব্যাপার এই ঘটে, ঐতিহাসিক ঘটনাটি কালের অতলে হারিয়ে গেছে, কিন্তু তার সাহিত্যিক বা সাংস্কৃতিক প্রতিফলনটি সঞ্জীবিত আছে। এখানে গবেষকের কাজ দুটি: ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে ঘটনাটির স্বরূপ উদঘাটন; এবং তার পর সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার মূল্যায়ন। আবার, যেখানে ইতিহাসের ঘটনা স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ, সেখানে কি কেবলি ইতিহাসের ধারা অন্বেষণ? এখানেই দেখতে হবে, প্রতিটি বিদ্রোহের যে জাতীয় প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে, একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো মনস্তত্ত্বগত সাদৃশ্য আছে কি না; যদি থাকে, তবে সেটাকেই বলতে হবে Culture-complex, অর্থাৎ বিদ্রোহের কারণ যাই হোক না, একটি জাতি তার নিজস্ব সংস্কৃতি দিয়ে কিভাবে তা গ্রহণ করেছে বা প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে।

শ্রীমান রণজিৎ এইখানে একটি বড়ো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। তিনি ছোট-বড়ো সব বিদ্রোহের পরিচায়নের শেষে একটি মূল্যায়ন করেছেন। তাতেই বাঙালী জাতির সংস্কৃতি-মণ্ডলটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এইজন্যে একদিকে অবিভক্ত বাঙলাকে যেমন তিনি ক্যানভাস করেছেন, অপরদিকে নিতান্ত সাম্প্রতিক কালের গল্প-উপন্যাসের রাজ্যেও ঢুকে পড়েছেন।

শ্রীমান রণজিতের ভাষা যুক্তিপূর্ণ, বিশ্লেষণাত্মক,—তথাপি সুখপাঠ্য। তবু তাঁর ভাষা নিয়ে কারো-কারো ঈষৎ আপত্তি থাকতে পারে, বিশেষত কিছু বিশেষণ প্রয়োগে ও অভিধা প্রদানে। সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিই, গ্রন্থের ভবিষ্যৎ সংস্করণে তা সংশোধন করে দেওয়া যাবে।

বাঙলা সাহিত্যের গবেষণার ক্ষেত্র দিনে-দিনে ক্রমেই প্রশস্ত হচ্ছে; বিষয়বস্তুও জটিল এবং অভিনব হচ্ছে। বর্তমান গবেষণা-গ্রন্থটি সেই নতুনত্বের আর এক প্রমাণ। অধুনা আমরা কেউ আর নিতান্ত 'বিবৃতিধর্মী' গবেষণা-পত্র চাই না,—সকলেই 'বিশ্লেষণাত্মক' গবেষণা-গ্রন্থ পছন্দ করি। আলোচ্য গ্রন্থটি আধুনিক পাঠকের মানসিক খোরাক হয়ে উঠেছে। ইতি

নিবেদন

একটি ক্ষণ, মাহেন্দ্র ক্ষণ-ও বলতে পারি। আমি পরিচিত হয়েছিলাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান সুনামী অধ্যাপক ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই সুযোগ এনে দিয়েছিলেন সদ্যপ্রয়াত গবেষক ডঃ কামিনী কুমার রায়। কথা প্রসঙ্গে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে স্থানীয় বিদ্রোহের প্রভাব ঃ সন্ন্যাসী থেকে সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত' বিষয়কে ঘিরে একটি ভালো কাজ হতে পারে ; ভেবে দেখো।

কৃতজ্ঞচিত্তে সেই কথাটি এখন ও ভাবি, কেমন করে তাঁর কথাটি সুমুখে রেখে, এগিয়েছি, পাঠ নিয়েছি। কর্মসূত্র আমি তখন বর্ধমানে ছিলাম। তাই বর্ধমান-বিশ্ববিদ্যালয়ে চেষ্টা করেছিলাম কাজটি করার। ইতিহাসের ছাত্র বলে বাংলা বিভাগে কাজটি সম্ভব হয়নি, নীতিগত কারণেই! তবে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ডঃ জীবেন্দ্র সিংহ রায় ও অধ্যাপক ডঃ শক্তিব্রত ঘোষ মহাশয় সুযোগ এনেদিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিকের তত্ত্বাবধানে কাজটি করার। কাজ এগুতে থাকে শ্রদ্ধেয় গুরুমশাইয়ের উৎসাহ ও নির্দেশে। এতক্ষণ যাঁদের নাম করলাম, তাঁদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি ও অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি॥

একটি কথা সবিনয়ে বলি। বাংলার বিদ্রোহ বাঙালী-মানস ও বাংলা সাহিত্য নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা হয় নি, এই আলোচনার ব্যাপক প্রয়োজন তথ্য ও তত্ত্বের গভীরে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থের সুরু। বলাবহুল্য, এটি একের কর্মনয় এবং আমি-ও তা পারিনি। ভবিষ্যৎ বর্তমানের উত্তর সূরি, একথা নিশ্চিত মানি। বিদ্রোহ ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত আলোচনা বাদদিলে শ্রীসুপ্রকাশ রায় মহাশয়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। তিনি বিদ্রোহ আলোচনার ঐতিহাসিক পট ও পরিবেশ সম্পর্কে গভীর আলোচনা করেছেন। তিনি আমার অগ্রজ-লেখক তাঁকে আমার প্রণাম জানাই।

তাছাড়া বিশেষ বিশেষ বিদ্রোহের ওপর যে সব ঐতিহাসিকগণ কাজ করেছেন, তাঁদের প্রতি আমার ঋণের অন্ত নেই ; স্বীকার করি। প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে যাঁদের সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী। এই প্রসংগে সুকুমার মিত্র মহাশয়ের নাম-ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমার সাফল্যের পেছনে তাঁর শুভকামনা কথঞ্চিৎ প্রকাশ করা গেল। এই তালিকায় বগুলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীসুশান্ত হালদার মহাশয়ের নাম-ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলি। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে কিছু বই ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। অনুজ বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ডল অনুক্রমণী তৈরীতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই। এবং প্রণাম জানাই আমার অগ্রজ শ্রীঅজিত কুমার সমাদ্দারকে। তিনি আমার অগ্রগতি ও সাফল্যের প্রতি সাগ্রহ-লক্ষ রেখেছেন।

বিভিন্ন গ্রন্থাগার ঢুঁড়ে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করেছি। কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, এশিয়াটিক সোসাইটি, পশ্চিমবঙ্গের স্টেট আর্কাইভস্ প্রভৃতি গ্রন্থাগারের কর্মীদের তৎপরতা ও সহৃদয়তার কথা ভেবে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। মহাকরণ গ্রন্থাগারের দায়িত্বশীল কর্মী শ্রীখগেন সাহাকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তিনি কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ দেখার সুযোগ করে দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। আমার পূজ্য-অধ্যাপক ড. ভৌমিক স্নেহবশতঃ এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। তাঁকে আবার প্রণাম জানাই।

আর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি অগ্রজ প্রতিম শুভৈষী শ্রীস্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়কে— তিনি ঝুঁকি নিয়েছেন সাফল্য-বৈফল্য না ভেবেই। তিনি থিসিস ছাপিয়ে জমা দেবার আগ্রহ দেখিয়েছেন। করলাম-ও তাই। এই প্রিয় বন্ধুটির বলিষ্ঠ প্রাণময় ব্যক্তিত্বের স্পর্শে আমি মুগ্ধ।

স্বীকার করি, প্রতিকূলতা ছিল অনেক। তাড়াহুড়ো-ও করেছি। এতে মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গেল অনেক অনেক। আমি ভালো প্রুফ দেখতে জানি না সেটা-ও কারণ বটে। শুদ্ধি-পত্র দিয়েছি। তবুও ভরসা করি সুধী পাঠকের সহৃদয়তার উপর। পরবর্তী সংস্করণে সকলরকম ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে পারবো, আশা রাখি।

পরিশেষে, এই ঋণাত্মক তালিকা থেকে যাঁকে বাদ দিচ্ছি তিনি হলেন আমার সহ-ধর্মিণী শ্রীমতী সুনীতি সমাদ্দার। যাঁর সাগ্রহ ও অনুপ্রাণনা আমাকে সদাচঞ্চল রেখেছে একমুখিন প্রতীতিতে। তাই সাফল্য ও আনন্দঘন মুহূর্তের আমরা দুজনে সমান অংশীদার; সে কথাটাই বড়ো মনে হয়॥

বিনীত

শ্রীরণজিৎ কুমার সমাদ্দার

প্রকাশকের নিবেদন

লেখক ইতিহাসের ছাত্র, সাহিত্যের নন। তবুও এই গ্রন্থে ইতিহাস আছে যতখানি, সাহিত্য তার থেকে কম নয়; আবেগ প্রচণ্ড কিন্তু তা চিন্তাবিযুক্ত নয়। কিংবা তত্ত্বগত উপলব্ধি থেকেও তিনি দূরে সরে থাকেন নি।

তিনি এই গ্রন্থে জানিয়েছেন ব্রিটিশ-পুঁজির উদ্যোগ-প্রসার। সাম্রাজ্যবাদনীতির তির্যক প্রক্রিয়া। সাহেব রাজার শাসন শোষণ। সামন্ত প্রভুদের পীড়ন তাড়ন। কৃষক প্রজার ইংরেজ ও জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম;—জীবন যুদ্ধের সংগ্রাম। এতে তিনি প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন;

১. ইংরেজ শাসনারম্ভ বাংলা তথা সারা ভারতের বুকে সহজভাবে হয়নি।
২. ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বিদ্রোহগুলি ছিল স্থানিক কিন্তু গণভিত্তিক।
৩ বিদেশী শাসনের উচ্ছেদই ছিল বিভিন্ন বিদ্রোহের লক্ষ্য।
৪. ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে হিন্দু মুসলমান ঐকমত্য হয়েছেন।
৫ ধর্মীয় বিশিষ্টতা নিয়ে ব্রিটিশবিরোধী অভ্যুত্থান অনেক ক্ষেত্রেই সুরু হলে-ও অত্যল্পকালের মধ্যে তার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে।
৬. জমিদারগণ অনেকক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থে কৃষক জনতাকে উত্তেজিত করেছেন।
৭. পর্বত-অরণ্যচারী উপজাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে যে সংগ্রামী চেতনা লক্ষ করা গেছে; তার বিশিষ্টতা কিছুমাত্র কম নয়।
৮. ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসংগ্রামের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল দুর্বার॥

লেখকের সিদ্ধান্ত, সেই প্রাক্-রাজনৈতিক যুগে স্থানিক বিদ্রোহের উদ্যোক্তরা যে চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন; তা আজকের রাজনৈতিক চেতনা থেকে দূরান্তিক নয়। লেখক এসব কথা বলেছেন পরম আবেগে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, গ্রন্থটি পাঠ করলে আপনিও এমনটি করেই হয়তো বা বলবেন।

বিদ্রোহী বাঙলার ইতিহাসকে লেখক দুটি ভাগে ভাগ করেছেন; আঠারো শতক ও উনিশ শতকে। আবার ইতিহাস পর্ব ও সাহিত্য পর্বে ভাগ করে ইতিহাস ও সাহিত্যের বিশ্লেষণ করেছেন; সংস্কৃতির পরিমণ্ডলটিকে নিপুণ তুলিতে এঁকেন

করেছেন শতেক বর্ষের পরিধিতে (১৭৫৭-১৮৫৭)। এতে ইতিহাস ও সাহিত্যের রসিক পাঠক মাত্রেই আনন্দ পাবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। বিদ্রোহ ভিত্তিক জাগরণের এমন ব্যাপক বিশ্লেষণ ইতিহাস ও সাহিত্যের আঙ্গিকে আগে হয়নি। ইতিহাসের ক্ষেত্রে সংগৃহীত পূর্ব-তথ্যাদির বাচাই ও বিশ্লেষণ যেমন এই গ্রন্থে করা হয়েছে তেমনি সাহিত্যের ক্ষেত্রে গল্প-উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছড়া ও গাথা প্রভৃতির মূল্যায়ন করা হয়েছে এতে। ফলত, বাঙলার বিদ্রোহ বাঙালীমানস ও বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক চিন্তাধারার আলোচনা করা হয়েছে তথ্য ও তত্ত্বের গভীরে। আমাদের এই বিদ্রোহী বাংলায়, অবশ্যই অবিভক্ত বাংলার নিরিখে লেখক চিত্রিত করেছেন সন্ন্যাসী, সমসের গাজী, গণ নায়েক, পাগলপন্থী, তিতুমীর, ফরাজী, সাঁওতাল ও সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির ইতিহাস ও সাহিত্যের পর্বান্তর।

এমন একটি গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ করতে পেরে আনন্দ বোধ করছি। গ্রন্থটি গুণীজনের কাছে সমাদৃত হলে পরিশ্রম সার্থক হবে এবং ধন্য হবো ॥

ইতি

শ্রীস্বপন কুমার চট্টোপাধ্যায়

॥ প্রথম ভাগ ॥

আঠারোশতকের বিদ্রোহচিত্র

"To pour redress on India's injured realm
The oppressor to dethrone, the proud to whelm ;
To chase destruction from her plunder'd shore
With arts and arms that triumph'd once before.
The tenth Avatar comes ! at heaven's command..."

Thomas Campbell, The Pleasures of Hope.

কথামুখ

বাঙলার প্রবাদপ্রতিম সিরাজের পতন এবং পলাশীযুদ্ধে ইংরেজের জয়, এ দুটি ঘটনা বাঙলার প্রাণপ্রবাহকে বেদনাজনিত আঘাতে মথিত করল ;— যে আঘাত বাঙলার 'মহিমাচ্যুতির' আঘাত। আর, ব্রিটিশ বণিক-শক্তির রাজ-দণ্ডের অধিকার ও জয়-যাত্রা ; সেই হলো সুরু। ইতিহাসের গতি বাঁক নিল ভিন্ন পথে। বাঙালীর জীবন-সংস্কৃতির নব রূপায়ণ-ও সুরু হয়ে যায়। কারণ, "পলাশীর যুদ্ধ মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যে অবস্থান করিয়া বাঙালীর জীবন, সংস্কৃতি ও অধিমানসকে অননুভূতপূর্ব বৈচিত্র্যে মণ্ডিত করিয়া প্রাণচেতনাকে এমনভাবে আঘাত হানিয়াছিল যে, বাঙালী এক মুহূর্তেই ছায়াধূসর মধ্যযুগীয় জীবনবোধ ত্যাগ করিয়া রণরঙ্গমুখর আধুনিক জীবনের রাজপথ অবলম্বন করিল।"১

ভারতীয়দের জীবন প্রবাহে যুদ্ধ নোতুন নয়। স্মরণাতীত কাল হতে ভারতের ধন-ঐশ্বর্যের* লোভে কত বিদেশী শক্তির আবির্ভাব হয়েছে এখানে। তাদের মধ্যে কেউ-বা ধন-ঐশ্বর্য নিয়ে ফিরে গিয়েছে। আসার ও ফেরার পালায় তারা লুণ্ঠন-অত্যাচার, নগর জনপদ ধ্বংস করেছে। আবার কেউ-বা ভারতের শৌর্যের কাছে, বুদ্ধি ও চিন্তাধারা এমনকি, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাব-দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়ে ভারতের মাটিতেই আপন সত্তার ভাববিনিময় করেছে। শাসকের ভূমিকায়-ও অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমান ভারতে এসেছে আক্রমণকারীর বেশে, "বাণিজ্যের পথ ধরিয়া বিনীত আচরণের অন্তরালে আততায়ীর ভূমিকা"২ নিয়ে আসেনি। যারাই ভারতে এসেছে, রাজত্ব করেছে, ভারতের সমাজ জীবনের গতি প্রবাহকে তারা অস্বীকার করেনি। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার কাঠামো ভাঙার-ও প্রয়োজন হয়নি তাদের। ফলত এদের সংগে ভারতীয়দের জীবন-চর্যার মেল বন্ধন হয়েছিল সহজভাবেই।৩

কিন্তু কথা হলো, ইংরেজরা এদেশকে আপন করে নিতে পারেনি। নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধিতে, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের-ব্যূহ রচনা করেছে। যুদ্ধ করেছে রাজ্য-পাটের কলুষ-কামনায়। পলাশীর যুদ্ধ তারই অগ্নিস্বাক্ষর বহন করে। অবশ্য পলাশীর যুদ্ধে বাঙালীর অসহযোগ ও অসম্ভব নিষ্ক্রিয়তার প্রশ্নটি বড়ই বিচিত্র ও জটিল। ইতিহাস অন্যকথা বলতে পারত, যদি সেদিন বাঙালীর জনচিত্ত স্পন্দিত হয়ে উঠত ; তবে বাঙালীর উপপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে ভেসে যেত

বণিকদের রাজ্যলালসা। কিন্তু তা হয়নি। একথা স্বীকার করেছেন ক্লাইভ, মুর্শিদাবাদের অলস-কৌতুক দর্শক দেখে। তাই পার্লামেন্টে তাঁর সখাস্য-উক্তিটি বড়ই করুণ মনে হয়: "That the inhabitants, who were spectators, upon that occasion, must have amounted to some thousands ; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it with sticks and stones."৪

যাই হোক, ঘটনার পরিপ্রেক্ষিকায় ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩-শে জুন, পলাশী-প্রহসন বিদেশী শাসনের অঙ্কুর রোপিত হলো। বাঙালী তূষ্ণীভূত হয়ে এক কলঙ্ক অধ্যায়ের প্রান্তমুখে দাঁড়াল ; এবং সেদিনই বাঙালী "...entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal."৫

এক

পলাশী পতনের পর জালিয়াতি ও শঠতার প্রতীক মীরজাফর নবাব হলেন। এ পদে অধিষ্ঠিত থাকলেন ও তিন বৎসর (১৭৫৭ ৬০)। কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান অর্থগৃধ্নুতা মিটিয়ে মসনদে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো না। মীর কাশিম নবাব হলেন (১৭৬০-৬৪)। তিনি নবাব পদে বৃত হয়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের অবাধ শোষণ-অত্যাচার বন্ধ করতে চাইলেন। ফলে তাঁর কঠিন চিত্ত ধাতুর সঙ্গে ইংরেজের বিরোধ অনিবার্য হয়। এতেই মীরকাশিম মসনদ হারালেন। মীরজাফর আবার নবাবী পেলেন। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মারা যান। তখন কোম্পানী কালহরণ না করে মীরজাফরের পুত্র নাজিম-উদ্-দৌলাকে নবাব করলেন। স্বভাবী হাতে নবাব নবাব খেলা সুরু হয়েছে। ব্যাপারটাই এমন,—নোতুন নোতুন নবাবের মসনদে উপস্থাপনের প্রতিটি উপলক্ষ্যই প্রাচ্যের রূপকথার কল্পতরু ধরে ঝাঁকুনি দেবার পক্ষে এক উপযুক্ত সময় বলে বিবেচিত হলো।৬

নবাব হলেন সাক্ষিগোপাল। তাঁকে ছুঁয়ে কোম্পানীর দৌরাত্ম্য সুরু হয়েছে। কর্মচারীরা অবাধ লুণ্ঠনের তাণ্ডব লীলায় মত্ত হলো। এ সম্পর্কে নির্লজ্জ ক্লাইভ-ও স্বীকার করলেন একটি পত্রে। ৩০.৯.১৭৬৫ তারিখে কোর্ট অব

ডিরেকটস'-এর কাছে লেখা পত্রটিতে তিনি বললেন : "The sources of tyranny and oppression, which have been opened by the European agents acting under the authority of the Company's servants, and the numberless black agents and subagents acting also under them, will, I fear, be a lasting reproach to the English name in this country."৭

অথচ বিস্ময়ের অবধি থাকেনা, যখন এই ক্লাইভ দ্বৈত শাসনের ভির্যক প্রক্রিয়ায় দেশে অত্যাচার, অনাচার সৃষ্টি করলেন। ১২.৮.১৭৬৫ তারিখে সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভই হলো শোষণোৎসবের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত।

কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হলো দানবোপম নাজিমদের ওপর। বাংলার রাজস্ব আদায়ের জন্য নিযুক্ত হলেন মহম্মদ রেজাখাঁ। আর, বিহারে নিযুক্তি পেলেন সীতাব রায় ও দেবীসিংহ। এই নিষ্ঠুর নাজিমেরা জমিদার ও কৃষকের কাছ থেকে যত বেশি পেরেছেন আদায় করেছেন। জমিদারদের-ও লুণ্ঠনের অধিকার দিয়েছেন।

কিন্তু জমিদার ও কৃষকের ওপর অবাধ লুণ্ঠনের রাজকীয় অধিকারটিকে কেবলমাত্র নিজেদেরই হাতে রেখে প্রভূত ধন ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন। রাজস্বের নামে যে শাসন সুরু হয়েছে, এর সবটুকু চাপ সাধারণ প্রজার ওপরই পড়ল। নবাবী আমলেও জমিদারদের ওপর চাপানো দাবি রায়তের ওপর-ও বর্তাতো। অবশ্য, সে সময় ছিল উন্নত-কৃষিকাল। অথচ কোম্পানীর লক্ষ্য ছিলনা কৃষি-জমির উন্নতির দিকে। এমনকি, তাদের দৃষ্টি বিমুখ ছিল বাঙলার শিল্প—তাঁত শিল্পের দিকে-ও। এতদিন যে তন্তুবায়গণ শিল্পের প্রাণরস যোগাতেন; আর যা ছিল প্রাচীন বনিয়াদ, সেই শিল্পকে ইংরেজ শাসকগণ ভেঙে চুরমার করে দিলেন। কোম্পানীর মুৎসুদ্দিদের অনুসৃত নির্দয়নীতির ফলে দেশীয় শিল্পীরা রেশম ও সুতোর জিনিস তৈরি করতে পারতেন না। —এমন কত নজির আছে, জোর করে রেশম উৎপাদন থেকে বিরত করার জন্য তাদের বুড়ো আঙুল কেটে দেওয়া হয়েছে।৮ এই প্রসঙ্গে লার্পেণ্ট সাহেবের স্বীকারোক্তি "We have destroyed the manufac-

tures of India''৯ মনে রাখার মতো। সবচেয়ে বড়ো কথা, এদেশ থেকে শিল্পের কাঁচামাল ইংলণ্ডে যেতে লাগল। আর সেখান থেকে আনীত তৈরি জিনিসের সঙ্গে দেশীয় শিল্পের অসম-প্রতিযোগিতায়; দেশী শিল্পের পরাজয় হতে লাগল প্রতিক্ষেত্রেই। ফলে বাংলার শিল্প-বাণিজ্যের মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর রেসিডেণ্ট বেকার সাহেবকে-ও তাই স্বীকার করতে হলো—"It must give pain to an Englishman to have Reason to think that since the accession of the company to the Dewanee the condition of the people of this country has been worse than it was before; and yet I am afraid the Fact is undoubted."১০

দুই.

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিকগণ বাংলাকে গ্রাস করার যে নক্সা রচনা করলেন, তা বাঙালীদের নিঃস্ব হবার নোতুন ক্ষেত্র-পথ। মীরজাফরকে মসনদে বসিয়ে নজরানা চাইলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। অর্থগৃধ্নু কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান দাবি মেটাতে অক্ষম মীরজাফরকে সরতে হলো। ইংরেজের দাক্ষিণ্যে, মীরকাশিম পালা বদলের নায়ক হলেন। মীরকাশিম তাঁর সর্বশক্তি দিয়ে কোম্পানীর চাহিদা পূরণ করতে সমর্থ হলেন বটে। কিন্তু বিরোধ অন্যত্র। কোম্পানীর সদিচ্ছার অভাবে, মিত্রতার বাতাবরণ সৃষ্টি হলো না।

কোম্পানীর অবৈধ-বাণিজ্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কোম্পানীর কর্মচারিগণ বিনাশুল্কে মাল চালান দিতে লাগল। অথচ দেশীয় বণিকদের শুল্ক দিতে হতো। এতে নবাবের রাজস্ব হ্রাস পেতে থাকে। কোম্পানীর কর্মচারীরা স্থল বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে দৌরাত্ম্য দেখাতে লাগল। ক্লাইভের স্বভাবিবিক্ত ভ্যানসিটার্ট (১৭৬০) কোম্পানীর দুষ্কৃতি লক্ষ করে এই মন্তব্য করলেন: এদেশে আমাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই, কোম্পানীর কতিপয় কর্মচারী ও তাদের অধীনে নিযুক্ত কিছু লোক; অনেক কিছুরই নোতুন উদ্যোগ শুরু করেছে, নিষিদ্ধ দ্রব্যের ব্যবসা এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করেছে।১১ প্রায় সমোচ্চারণ করলেন পরবর্তী

গভর্ণর ভেরেলস্ট—"A trade was carried on without payment of duties, in the prosecution of which infinite oppressions were committed. English agents or Gomasthas, not contented with injuring the people, trampled on the authority of government, binding and punishing the Nabob's officers whenever they presumed to interfere. This was the immediate cause of the war with Meer Cossim."১২

কোম্পানীর কর্মচারীদের অবৈধ উপায় ও চলাচলের বিরুদ্ধে মীরকাশিম গভর্ণরের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এই বলে : কলকাতার কুঠি থেকে কাশিমবাজার, পাটনা এবং ঢাকা পর্যন্ত সমস্ত ইংরেজ কর্তাব্যক্তিরা, তাদের গোমস্তা, কর্মচারী ও দালালরা প্রত্যেক জেলাতেই রাজস্ব আদায়কারী সমাহর্তা, খাজনা বিলিকার, জমিদার ও তালুকদারের মত কাজ করছে। কোম্পানীর 'দস্তক' হাতে তুলে আমার কর্মচারীদের কোন ক্ষমতাই প্রয়োগ করতে দিচ্ছে না। গোমস্তা এবং অন্যান্য কর্মচারীরা প্রত্যেক জেলা, গঞ্জ, পরগণা এবং গ্রামে তেল, মাছ, খড়, বাঁশ, চাল, ধান, সুপুরি ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা চালাচ্ছে। প্রত্যেকেই কোম্পানীর একটা দস্তক হাতে নিয়ে নিজেকে কোম্পানীর সমকক্ষ মনে করে।১৩ বলাবাহুল্য, প্রতিবাদ শুধু নিষ্ফলই হলো।

যে ব্যক্তিসত্তা মীরকাশিমকে নবাবী পাইয়ে দিয়েছিল, সেইসত্তা, আত্মবোধ মীরকাশিমকে যুদ্ধে নামিয়েছিল। একদিকে মীরকাশিমের সার্বভৌম কর্তৃত্ব-প্রবণতা ও দেশহিতৈষণা১৪ অপর দিকে ইংরেজ শাসকদের অসংগত সুযোগ লাভের কৌশল এবং প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টা ;—এই দুইয়ের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হলো। এক্ষেত্রে একটি সমার্থক মন্তব্য উদ্ধার করি : "the dominating fact of the situation was that the interest of the English and of the Nawab were irreconcilable. There could be no stability in affairs so long as the Nawab fancied himself an independent governor and the English claimed privileges wholly inconsistent with that independence."১৫

আরো আছে। বিনা শুল্কে কোম্পানী কর্মচারীদের অন্তর্বাণিজ্য, জোর করে উপঢৌকনের নামে অর্থ আদায়, রাজস্ব-আদায়ের নামে নিষ্ঠুর অত্যাচার; বাংলাদেশকে রিক্ত করে তোলে। এর ওপর ইংরেজরা একরকম মজুদনীতি গ্রহণ করল। সময়ের সুযোগ বুঝে যৎসামান্য মূল্যে খাদ্য-ফসল কিনে গুদামজাত করতে লাগল। ইংরেজের একচেটিয়া ব্যবসা সুরু হলো।১৬ ঐ ফসলই কৃষককে চড়া দামে কিনতে হতো নিতান্তই অসময়ে। মুদ্রার মাধ্যমে খাজনা দেওয়ার বিধি প্রবর্তিত হয়েছে। ফলত, মুদ্রা সংগ্রহের জন্য কৃষককে ফসল বিক্রি করতেই হতো। এতে কৃষক মূল্য পেত সামান্য, আর বণিক-রাজার লাভ হতো প্রভূত। এরই বিষময় ফল দেখা দিল ১৭৬৯-এ। কপর্দক শূন্য কৃষকের ঘরে অন্নাভাবঃ আর্তনাদ সুরু হলো।

১৭৭০-তে বাংলা ও বিহারের বুকে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া নেমে এল। ক্ষুধিত-বাংলার হাহাকার ধ্বনি দুর্ভিক্ষের বায়ুতরঙ্গে মূর্ত হলো। ভারতবর্ষের দুর্ভিক্ষের প্রত্যক্ষ কারণ বাৎসরিক বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা। এরকম দুর্ভিক্ষের প্রচণ্ডতা ও তার জন্য জীবনহানির মূলে "The chronic poverty of the people".১৭ কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের মূলে কেবলমাত্র অনাবৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলা ঠিক হবে না। প্রত্যক্ষদর্শী লেখক ইয়ং হাসব্যাণ্ড অন্ততঃ একথা স্বীকার করেননি যে, এই মন্বন্তর কোনো অনাবৃষ্টি কিংবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়-প্রসূত ছিল।১৮ কোম্পানীর ক্রূর ব্যবসায়িক নীতিকেই এক্ষেত্রে দায়ী করা যায়। তাদের লোলুপ দৃষ্টিজনিত মজুদনীতির 'কালাগ্নি' কৃষদের নিঃস্ব করল। আর্থিক লাভালাভের হীনমনোবৃত্তি প্রসূত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, মানবিক দুর্দশার মর্মন্তুদ কাহিনী।

মন্বন্তরের শোচনীয় রূপটি চিত্রিত হয়ে আছে প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতিচারণায়;— মর্মস্পর্শী কবিতায়। তা হলো এই:১৯ঃ

"Still fresh in memory's eye the scene I view,
The shrivelled limbs, sunk eyes, and lifeless hue;
Still hear the mothers' shrieks and infants' moans,
Cries of despair and agonizing moans,
In wild confusion dead and dying lie;—

Hark to the Jackals' yell and vultures' cry,
The dogs' fell howl, as midst the glare of day
They riot uumolested on their prey !
Dire scenes of horror, which no pen can trace,
Nor rolling years from memory's page efface."

এই দুর্ভিক্ষের শোচনীয়তাকে স্বীকার করে কলকাতা পরিষদ কোর্ট অব ডিরেকটর্স-এর কাছে কয়েকটি চিঠি ২০ লিখেছিলেন। তার দুই একটির স্থূল মর্ম্ম এখানে বিবরণিত হতে পারে। ৯.৫.১৭৭০ তারিখের চিঠিতে লেখা হয়েছে: যে দুর্ভিক্ষ চলছে, তার ফলে মৃত্যু, ভিক্ষাবৃত্তি, সমস্ত বর্ণনার বাইরে। একদা প্রাচুর্যময় প্রদেশ পূর্ণিয়াতেই মোট অধিবাসীর এক তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়েছে। অন্যান্য স্থানের দুর্দশাও সমানে চলেছে!

১১,৯.১৭৭০-এ আরেকটি চিঠি। এতে বলা হলো,—জনগণের দুর্দশা বর্ণনাতীত। আমরা এ মন্তব্য করতে আনন্দবোধ করছি যে, তারা আমাদের রাজস্ব-দাবি মেটাতে পারছে না বটে; কিন্তু আদায় যতটা খারাপ আশা করা হয়েছিল, আদায় ততটা খারাপ নয়।

আরো একটি চিঠি। তারিখ ১২.২ ১৭৭১। এতে বলা হয়, দুর্ভিক্ষের শোচনীয়তার অবধি নেই। জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। তবু-ও এ বৎসর, বাংলা ও বিহারের আদায়ের কিছুটা উন্নতি হয়েছে।

১০.১.১৭৭২ তারিখে পরিষদের একটি নির্লজ্জ উক্তি—"The collections in each department of revenue are as successfully carried on for the present year as we could have wished".

এমনকি, হেস্টিংস ৩.১১.১৭৭২ তারিখে জানালেন:—যদিও দেশের এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছে, চাষের সর্বনাশা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে; তবু-ও ১৭৭১-তেই রাজস্ব আদায় ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে-ও বেশি।২১

এই মন্বন্তরের সংগে বসন্তরোগ মহামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করল; ফলত সর্বনাশা মন্বন্তরে প্রাণ আহুতি দিলেন বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বা প্রায় এককোটি মানুষ। মৃত্যুর বিষাদ ছায়ায় বাঙালীর যে মানস বিবর্তন

হচ্ছিল ; তাতেই এক ভিন্নতর বিদ্রোহী বাংলার জন্ম হলো। সে বাংলার মুখে ছিল আকুতি ও কঠিন শপথ, — হে আল্লা ! তোমার নির্যাতিত সন্তানের পাশে এসে দাঁড়াও। অত্যাচারের হাত থেকে তাদের মুক্তি দাও।২২

তিন

আমরা লক্ষ করেছি, অন্তর্বাণিজ্যে এবং বহির্বাণিজ্যের সকল ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অনৈতিক সুবিধালাভ, তাদের একচেটিয়া ব্যবসা ও মুনাফা লোভ, অর্থগৃধ্নুতা, উদ্ধত শাসন এবং অত্যাচার, ক্লাইভের দ্বৈত-শাসনের ব্যাভিচার ; হেস্টিংসের নির্লজ্জনীতি বাংলার জনচিত্তে বিভীষিকার সৃষ্টি করল।

তার ওপর বাংলাকে স্থায়ী শোষণের ব্যবস্থা হিসাবে, রাজস্বের ক্রমবৃদ্ধির জন্য কোম্পানী জমিদারদের সঙ্গে প্রথমে 'পাঁচশালা' ও পরে 'দশশালা' বন্দোবস্ত করলেন বটে ; কিন্তু এ ব্যবস্থা সুপ্রযুক্ত হলো না। তাই, শোষণের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের শেষ নিদান দিলেন (১৭৯৩)। এ ব্যবস্থার ফলে জমিদারকে জমির চিরস্থায়ী মালিকরূপে মেনে নেওয়া হলো। "বন্দোবস্ত জমির মালিকদের সংগে করা হয়েছিল। বড় জমিদার বা ছোট জমিদার বা তালুকদার বা চৌধুরী বা কৃষক জমিদার— যাঁকে জমির মালিক বলে গণ্য করা হয়েছিল, তাঁকেই বন্দোবস্তের প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।"২৩ প্রমথ চৌধুরী 'রায়তের কথা'য় লিখেছেন,— "শোর সাহেবের কথাই প্রমাণ যে, এদেশে জমিদারের সঙ্গে রায়তের সম্বন্ধ তাঁর কাছে বড়ই গোলমেলে ঠেকেছিল। কাজেই যা গোল, তাকে তিনি চৌকোশ করার প্রস্তাব করেছিলেন। তিনি অবশ্য এ পরিবর্তন রয়ে-বসে করতে চেয়েছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের কিন্তু আর তর সইল না। তিনি আইনের ঠুকঠাকের বদলে একঘায়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসলেন। ফলে বাংলার প্রজা বাংলার জমির উপর তার চিরকেলে স্বত্বসামিত্ব সব হারালে, আর রাতা-রাতি বাংলার জমির নিব্যূঢ় স্বত্বাধিকারী জমিদার নামক আর এক শ্রেণীর লোক জন্মলাভ করলে।"২৪

তিনি আরো বলেছেন : "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপর কারণ রাজনৈতিক। ইংরেজ রাজ যখন বিদেশীরাজ, তখন দেশে এমন একটি দলের সৃষ্টি করা

আবশ্যক, যাদের স্বার্থ ইংরেজ রাজের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। যেহেতু আপদে বিপদে এই দল ইংরেজ রাজের পক্ষ অবলম্বন করবে।''২৫ ফলকথা, জমিদারগণ এই বন্দোবস্তের সুযোগ ব্যবহারে পেছু-পা হলেন না। তাঁরা যেমন করে পারুন না কেন, মায় প্রজার গৃহ জমি-জমা বন্ধক নিয়ে কিংবা উচ্ছেদ করে খাজনা আদায়ের তৎপর হলেন: আর ভীরু প্রজার ক্ষীণ প্রতিবাদ উদ্বায়ী হলো। জমিদার কৃষকের সংগে উঠবন্দীতে যেতে রাজি না হওয়ায় সাধারণ কৃষক প্রজার দুঃখের দিন সেই হলো সুরু।

শুধু কি তাই, এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু জমিদারদের অনেক পরিবারই রাজস্বের অনাদায়ে বিপর্যয়ের মুখে পড়ল।২৬ যাইহোক, বাংলার যুগসংকটক্ষণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, প্রাচীন বনিয়াদেরই জয়ডংকা বাজাল। সে সময় ইউরোপে ঘটল বিপ্লব,—ফরাসী বিপ্লব। আর, "আমাদের দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হল প্রাচীন বনিয়াদ। প্রাচীন বনানীর ভিতর বাইরের আলো ঠিকরানো সহজ সাধ্য নয়।" ২৭

কোম্পানীর কর্মচারী, জমিদার নায়েব দেওয়ানদের শোষণোৎসবে এসে যোগ দিলেন আর এক শ্রেণী;—এঁরা মহাজন। আপাতদৃষ্টিতে এঁদেরকে মনে হয়েছে প্রজাকুলের বন্ধু বলেই। এঁরা প্রজাদের ঋণ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন। কিন্তু বন্ধু প্রীতির আড়ালে যে তমসুক হাতে রাখতেন, তার বলে বলীয়ান হয়ে একদিন প্রজাকেই গৃহ জমি ছাড়া করতেন। এই সূত্র পথেই আবার অনেক মহাজন জমিদার হয়েছেন।

ইংরেজ শাসক, জমিদার ও মহাজন এই ত্রয়ী নিষ্ঠুর প্রতিম শোষকের নির্মম অভিঘাতে বাঙালী প্রজার যে আত্ম-প্রত্যয় জাগল:—সেই চেতনা শুধু বাঙালীর মনোলোককেই আন্দোলিত করেনি; বহির্জীবনে-ও এই চেতনার আভাস ইংগিত দুর্নিরীক্ষ্য ছিল না। তাই দ্রুত পরিবর্তনশীল রাজশক্তির কামনার বাষ্পে, ক্লিষ্ট পিষ্ট বাঙালী প্রজাদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও প্রত্যাঘাত করার চেষ্টা করেছেন; বিদ্রোহ বিপ্লবের প্রলয়-কল্লোলে। রক্তক্ষয়ী বাঙলার সেই ইতিহাস, বিদ্রোহী বাঙলার জীবন যুদ্ধের ইতিহাস।

পাদটীকা

১. ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলাসাহিত্য,

ভারতের ধনসম্পদ সম্পর্কে বিদেশীদের ধারণা লক্ষণীয় :

সপ্তদশ শতকের ভারত-সমৃদ্ধি সম্পর্কে টাভার্নিয়ের মনে হয়েছে—"even in the smallest villages rice, flour, butter, milk, beans and other vegetables, sugar and other sweetmeats, dry and liquid, can be procured in abundance."

(Tavernier, "*Travels in India,*" Oxford University Press edition, 1925, Vol. I, P. 238) প্রসংগ—R. P. Dutt, India Today,

আওরংগজেবের ভেনেসীয় চিকিৎসক মানুচির ধারণায়—

"Bengal is of all the kingdoms of the Mogul best known in France. The prodigious riches transported thence into Europe are proofs of its great fertility. We may venture to say that it is not inferior in anything to Egypt, and that it even exceeds that kingdom in its products of silks, cottons, sugar and indigo. All things are great plenty here, fruits, pulse, grain, muslins, cloths of gold and silk.

(F. F. Catrou, "*The General History of the Mogul Empire ;* extracted from the Memoirs of M. Manouchi, a Venetian and Chief Physician to Aurangzeb for about 40 years," published by John Bowyer, London, 1709) প্রসংগ—Dutt, Ibid, P. 23

কিংবা শোনা যাক ফরাসী পর্যটক বার্ণিয়েরর কথা। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে তিনি বাংলায় দু'বার এসেছিলেন। তাঁর উচ্ছ্বাস এরকম : "The knowledge I have acquired of B:ngal in two visits inclines me to believe that it is reacher than Egypt. It exports in abundance cottons and silks, rice, sugar and butter. It produces amply for its own consumption of wheat, vegetables, grains, fowls, ducks and geese. It has immense herds of pigs and flocks of sheep and goats. Fish of every kind it has in profusion. From Rajmahal to the sea is an endless number of canals, cut in bygone ages from the Ganges by immense Labour for navigation and irrigation."

(Bernier, quoted by Sir William Willcocks, "*Lectures on the Ancient System of Irrigation in Bengal*", University of Calcutta, 1930 PP. 18-19) প্রসংগ—Dutt, Ibid, PP. 23-24.

এমনকি, ক্লাইভ ১৭৫৭-তে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে সভয়কম্পিতবক্ষে প্রবেশ করে যা অনুধাবন করলেন, তা এরূপ :—"This city is as extensive, populous and rich as the City of London, with this difference that there

were individuals in the first possessing infinitely greater property than in the last City."
(Quoted in the Indian Industrial Commission Report; P, 249)
প্রসংগ—Dutt, Ibid, PP 21-22.

২. নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য,
(১৮৮০ শকাব্দ) পৃ. ১

৩. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম

৪. B. D. Bose—*Rise of the Christian Power in India* P. 36
প্রসংগ—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, পৃ: ১২

৫, Jadunath Sarkar edi., *The History of Bengal*, Vol. II Dacca, 1948, P. 499 এই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "On June 23, 1757 the middle ages of India ended and her modern age began." P. 497

৬. "Every occasion for setting up a new Nawab was considered a suitable opportunity for shaking the proverbial Pagoda tree of the East."
—Romesh Dutt, *The Economic History of India* (Indian Edition, Vol. I, P. 22

৭. Dutt, Ibid, P, 24

৮. Dutt, Ibid, P, 18
তুলনীয়, "Various and innumerable are the methods of oppressing the Poor weavers, which are daily practiced by the company's agents, floggings, forcing, bonds from them, & C. by which the number of weavers in the Country has been greatly decreased."
William Bolts, *Considerations on Indian Affairs*, 2nd. edition, 1772 London P. 74

৯. Romesh Dutt—*The Economic History of India*, Vol. II, P. 78

১০. Edward Tomson and G. T. Garratt, *Rise and fulfilment of British Rule in Indta*, 2nd Edition 1958, Allahabad P. 99

১১. Dutt, Ibid, (Vol. I), P. 13

১২. Ibid, P. 13

১৩. Mirkasim's letter, dated 26th March, 1762
প্রসংগ—*The Economic History of India*, Vol. I P. 13

১৪. "Mirqasim was a genuine patriot an able ruler, who quickly retrenched expenditure and Suppressed disorders".—মীরকাশিম সম্পর্কে এই প্রশংসা করেছেন দু'জন ঐতিহাসিক Edward Thomson and G. T. Garratt. দ্র, *Rise and fulfilment of British Rule in India*, P. 91.

১৫. H. H. Dodwell, *Dupleix and Clive*,

তুলনীয়, "There is no doubt that the Nawab had, from the beginning, aimed at establishing his complete independence of the English, and that he patiently strove to break the supremacy which they had obtained after the revolution of 1757. His object was to establish an independent and unfettered 'Subahdari' in Bengal by reducing the extraordinary power and influence of the European Traders."

দ্র, Nandalal Chatterjee, *Mirqasim*, (1935), P, 219

১৬. Younghusbad, *Transactions in India*, PP. 123-24

প্রসংগ—ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ ১১-১২

১৭. Dutt, Ibid, P. 34

১৮. *Transactions in India*

প্রসংগ—তদেব, পৃ. ১২

১৯. কবিতাটি জন শোরের। দ্র, উদ্ধৃতি, W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, P. 22

২০. Extracts from India office Records, quoted in Hunter's *The Annals of Rural Bengal* (London, 1868) PP. 339-404

২১. Extracts from India office Records, Hunter, Ibid, P. 381

২২. Siyar Mutakharin, Vol. II, P. 101

Dutt, Ibid, P, 15.

২৩. শচীন সেন, বাংলার রায়ত ও জমিদার (পুনর্মুদ্রণ, ১৩৭৬), পৃ. ৭

২৪. প্রমথ চৌধুরী, রায়তের কথা, (পুনর্মুদ্রণ, ১৩৭৪) পৃ. ৫২.

২৫. তদেব, পৃ. ৩৪

লর্ড কর্ণওয়ালিস মেয়াদি বন্দোবস্তের দোষ কারণ বর্ণনা করেছেন। জনশোরের বক্তব্যের উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"I may safely assert, that one-third of company's territory in Hindustan is now a jungle inhabited only by wild beasts. Will a ten years' lease induce any proprietor to clear away that jungle, and encourage the raiyats to come and cultivate the lands, when, at the end of that lease, he must either submit to be taxed *ad libitum* for their newly-cultivated lands, or lose all hopes of deriving any benefit from his Labour....."

—Governor-General's Minute of 18th September, 1789

প্রসংগ—W. W. Hunter : *Bengal Ms. Records*, Volume I 1782-1793, London, 1894 P. 78.

২৬. "The wave of the Permanent Settlement had, in truth, submerged the ancient houses of Bengal."

Hunter's, *Bengal Ms. Records*, Vol. I, P. 101.

২৭. শচীন সেন, তদেব, পৃ. ৭

।। সংযোজন ।।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলাদেশের চিরায়ত সামাজিক ব্যবস্থাও অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে চুরমার হলো। বাঙলার চাষী অনন্তর দুঃখে দিন কাটাতে থাকে। এর দাহ থেকে তাদের নিষ্কৃতি ছিল না। অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় 'জমির মালিক' গ্রন্থে (পৃ. ৬) লিখেছেন: "বাংলার চাষীর যত দুঃখ তার মূলে জমিদারি। জমির সংগে এদের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক শুধুমাত্র খাজনার সংগে, অথচ এরাই জমির মালিক। সেই মালিকত্বের জোরে রায়তের খাজনা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছে, জমি যেন ইণ্ডিয়া রবার। রায়ত ইচ্ছামত তাঁর জমি বিক্রি করতে পারেনা। জমিদারকে দিতে হবে উঁচু নজরানা। নইলে জমি থেকে উচ্ছেদ। নিজের জমির গাছ রায়ত নিজে কেটে নিতে পারবে না। ঝড়ে পড়ে গেলেও না। কারণ তারও মালিক জমিদার। নিজের জমিতে রায়ত ইচ্ছামত পাকা বাড়ি করতে পারবে না। পুকুর কাটতে পারবে না। এরকম আইনী অত্যাচার তো আছেই, তার ওপর বেআইনী অত্যাচারের শেষ নেই।"১ এমনি ছিল বাঙলাদেশের জমিদারদের আসল চেহারা।

বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে এই বন্দোবস্তের দুরান্তিক প্রতিক্রিয়াসম্পর্কে বলেছেন: "বঙ্গদেশের কৃষিজাত আয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে এ পর্যন্ত তিন চারিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না এই বেশী টাকাটা কার ঘরে যায়? কে লইতেছে?

এখন কৃষিজাত—কৃষকেরই প্রাপ্য—পাঠকেরা হঠাৎ মনে করিবেন, কৃষকেরাই পায় বাস্তবিক তাহারা পায়না...।"২

বঙ্কিম চন্দ্র আর-ও বলেছেন: "ব্রিটিশ্ রাজ্যকালে ভূমিসংক্রান্ত যে সকল আইন হইয়াছে, তাহাতে পদে পদে প্রজার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রতিবারে দুর্বল প্রজার বল হরণ করিয়া আইন কারক বলবান্ জমীদারের বলবৃদ্ধি করিয়াছেন। তবে জমীদার প্রজাপীড়ন না করিবেন কেন?"৩

'হাসিম শেখ বা রামধন পোদেরা' এরই শিকার, এমন কথা বললেন বটে।

তবু-ও বিক্ষুব্ধ মানুষটি ইংরেজের ি বরুদ্ধে রণনীতি পরিহার করলেন; বোধকরি মধ্যবিত্ত মানসিকতার সংকীর্ণ নীতিরফলে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া আরো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস চেয়েছিলেন ইংলণ্ডের অনুকরণে এদেশে একদল ভূস্বামী গঠন করতে। যারা জমির সর্বপ্রকার উন্নতি করবে। কৃষির প্রয়োজনে খালবিল সংরক্ষণ এবং জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ রাজার দায়িত্ব জমিদারের ঘাড়ে চাপিয়ে পরম নিশ্চিন্তে তিনি থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা গেল যা ছিল তা-ও ধ্বংস হয়েগেল। **"Public works have been almost entirely neglected through out India... The motto hitherto has been: 'Do nothing, have nothing done, let nobody do anything."**[১]

১. **Sir Arthur Cotton, *Public works in India*, 1854, P, 272**
প্রসংগ —***India To day*, P, 213.**

প্রথম অধ্যায়

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

(১৭৬০-১৮০০)

ক. ইতিহাস পর্ব

পটভূমিকা

১. যুগসংকট

২. বিদ্রোহীদের পরিচয়

৩. বিদ্রোহের প্রকৃতি

খ সাহিত্য পর্ব

১. গাথা সাহিত্য

২. সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও আনন্দমঠ

৩. উত্তরবংগের প্রজা বিদ্রোহ ও বাংলা সাহিত্য

৪. দিনাজপুরের কবিতা

১ ॥ অধ্যায় ঃ সন্ন্যাসীবিদ্রোহ

ক. ইতিহাস পর্ব

...পটভূমিকা...

ইংরেজদের পলাশীলাভ, বাংলার রাষ্ট্রজীবনে বিপর্যয়ের সংকেত। শ্বেত-বণিকদের রাজ্য লালসা ও শোষণের অভিঘাতে বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও মনোজীবন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো। অন্যদিকে, পলাশী-যুদ্ধে জয়লাভ করেও ইংরেজ শক্তি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। এর-ও কারণ ছিল। তাঁরা নবজীবনের দ্বার প্রান্তে এসে বাংলাদেশের অন্তর্গূঢ় মর্মবেদনা অনুধাবন করতে পারলেন না। বণিক-রাজা জয়োল্লাসে এতই মত্ত ছিলেন যে, বাঙালী মানসের অন্তর্নিহিত প্রতিবাদী সুরটিকে বুঝে ওঠার সময় পেলেন না। বাঙালী প্রজা যে বিদ্রোহী চেতনার বিদ্যুৎ স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠছিলেন ; সে চেতনা দুর্লক্ষ্য ছিলনা। দৃষ্টি প্রসারিত করলেই এর আদ্যন্ত-রূপটি আভাসিত হয়ে উঠত : কিন্তু তাঁদের কলুষ-দৃষ্টি তখন বাংলার সম্পদ-বৈভবে।

অধিগত সাফল্য, বৃহৎ ঝুঁকিও বটে। কেননা আরো একটি শক্তি পরীক্ষায় নামতে হলো ইংরেজদের ; সে হলো বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪)। এখন ইংরেজরা জয়ী—তবে নিষ্কণ্টক নয়। "এ কথা ভাবা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে বকসারের সাফল্যের পরে বাংলা সুবায় ব্রিটিশদের আধিপত্য বিস্তার খুব অনায়াসে হয়েছিল। ব্রিটিশদের শক্তি পরীক্ষা তখনও বাকি ছিল এবং তাদেরকে সেই শক্তি পরীক্ষা করতে হয়েছিল বাংলার জনসাধারণের সংগে দীর্ঘকালব্যাপী বহু অর্থক্ষয়ী, বহু লোকক্ষয়ী সংগ্রামে।"১ বলাবাহুল্য, দীর্ঘকালব্যাপী এই আঘাত-সংঘাত, সন্ন্যাসী ও ইংরেজদের মধ্যে দুই বিপক্ষ শিবিরের কাহিনী।

বণিকের রাজতন্ত্রে পুরনো গ্রাম সমাজের কাঠামো ধ্বংস হলো। বাঙলার জনসাধারণ ধ্বংস-ক্রিয়ার সরল প্রতিঘাতে দিশেহারা হলেন। এতদিন তাঁরা যে উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন; তা পুরনো গ্রাম সমাজের সংগে ছিল সম্পৃক্ত। কিন্তু উপের পথটি বিলুপ্ত হতে লাগল।

অভ্যস্ত জীবনের এই হঠাৎ পরিবর্তন অসংগত ও অসংহত জীবন পথের সন্ধান দিল। অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে প্রত্যবায় করল অনেকেই। ইংরেজ বণিকদের কুঠি কাছারি, জমিদার, মহাজনদের ওপর আক্রমণ সুরু হলো: উদ্দেশ্য, লুণ্ঠন। কারণ, "এই ইংরেজ বণিকদের গুদামে মজুদ শস্য এবং জমিদার-জায়গিরদার-মহাজনদের ঘরের ধন সম্পদ কাড়িয়া লইতে না পারিলে বাঁচিবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু তাহা কাড়িয়া লইবার জন্য দলবদ্ধ হওয়া চাই, আর চাই অস্ত্র। কৃষক ও কারিগরগণের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এই শাসকদের অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে না লইলে বাঁচিবার কোন উপায় নাই।"২ প্রাণে বাঁচার তাগিদই বড়ো কথা। তাই, বাংলার এই জনজাগরণ জীবনবৃত্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তির গভীরেই নিহিত। আর এই জন-জাগরণের দিব্যদাহে শ্বেত-শাসকগণ সংকটানুভব করলেন।

এতদুভয়ের চিত্ত বিরোধ ও বি-সম ভাবধারার মিলন সম্ভব হলোনা। ফলে যুগ সংকট দেখা দিল।

১. যুগসংকট...

পলাশী বিপর্যয়ের অব্যবহিত পরে বাংলাদেশে যে সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছিল; তাকে হেস্টিংস যতই সুলভ তাৎপর্যে ব্যাখ্যা করুন না কেন, মোটের ওপর এই সংগ্রাম দমনে ব্রিটিশ শক্তি বিপুল বাহিনী ব্যবহার করলেও অসীম বীরত্ব দেখাতে পারেননি। পলাশী প্রান্তরে যে জয় সহজ হলো ক্ষুদ্র এক বাহিনী নিয়ে, অথচ সে রকম কিছু যুদ্ধ করতে না হয়েও বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত সন্ন্যাসী-ফকিরদের শমনে-দমনে সময় লেগেছে অনেক; প্রায় চল্লিশ বৎসর। স্বাভাবিকভাবে এই বিদ্রোহ অভ্যুত্থানের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। এর উত্তর, অবশ্যই অর্থনৈতিকতার গভীরে।

মোঘল যুগের অন্ত্যপর্বে জমিদার ও জায়গিরদারগণ খাজনা আদায়ের নামে যে শোষণ অত্যাচার সুরু করেছিলেন; তার হাত থেকে নিস্তার ছিলনা

কৃষক প্রজার। ইংরেজদের পলাশীলাভ, বাংলা ও বিহারের জনজীবনে বিষময় দিক। এখানে জনজীবন বলতে কৃষক, কারিগর, শিল্পী—সকল শ্রমজীবী মানুষকেই বুঝতে হবে। তাদের জীবন-চর্যা ও বাদ নয়। সাহেব রাজা মূলতঃ বণিক। তাই বিকিকিনির হাটে নেমে, ব্যবসায়ের নামে যে লুণ্ঠন, অত্যাচার-উৎপীড়ন সুরু করলেন, তাতে বাংলা ও বিহারের জনজীবন শুধুমাত্র বিপর্যস্ত হলোনা; ধ্বংসের মুখে পড়ল। বস্ত্রবয়নে উন্নীত বাংলাকে সংকটে ফেলায় জন্ম শাসকগণ দেশীয় শিল্পীদের নানান চুক্তির নিগড়ে ফেলতেন। এর জন্ম চলত অকথ্য নির্যাতন। এই নির্যাতনের ফলে ঢাকার জগদ্বিখ্যাত মস্‌লিন কারিগরদের এক তৃতীয়াংশ বিজন বনে পর্যন্ত আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে শিল্প ধ্বংস হতে দেরি হলো না। গ্রাম্য অর্থনীতি ভেঙে পড়ে অচিরেই। প্রসংগত রেশমবস্ত্র শিল্প সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাঙলাদেশের সূতীবস্ত্রের মত রেশমবস্ত্র ছিল উৎকৃষ্ট। এদেশের রেশম সম্পর্কে ইংলণ্ড ও য়ুরোপের বিভিন্ন স্থানে যথেষ্ট সুনাম ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয় কোম্পানীর কর্মচারিগণ প্রথমে রেশম ও রেশমী-বস্ত্র য়ুরোপের বাজারে চালান দিতেন। এই ব্যবসায়ে কোম্পানীর প্রভূত মুনাফা হলো বটে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল অন্যত্র। ইংলণ্ডের তাঁত শিল্পী ও বস্ত্র ব্যবসায়িগণ বাংলাদেশের উন্নত মানের রেশমবস্ত্রের অসম প্রতি-যোগিতায় স্থান করে নিতে পারলেন না।৩ কিন্তু কোনোক্রমে অক্ষমতা স্বীকার না করে আন্দোলনে নামলেন।৪ এরই ফলে পরবর্তী কালে ইংলণ্ডের ডিরেক-টরবর্গ বাঙলাদেশের প্রতিনিধিদের ব্যবস্থা নিতে ১৭-৩-১৭৬৯ তারিখে এক পত্র লিখলেন। এতে বলা হলো: এমন ব্যবস্থা নিতে হবে, যেন বাঙলাদেশের শিল্পীরা আর রেশমবস্ত্র তৈরী করতে না পারে। কেবলমাত্র কাঁচা রেশম উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিতে বললেন।৫

নির্দেশিত ব্যবস্থা পত্রে-ও নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না ডিরেক্টরগণ। তাই যথাবিহিত ব্যবস্থা ও তৎপরতার জন্ম কঠোর পথ অবলম্বনের গুহ্য পন্থা জানিয়ে আরেক বিধান দিলেন। তাতে বলা হলো: দেখতে হবে যে, রেশমগুটি থেকে যে সকল ব্যক্তি সুতো বের করে আর যারা সুতো থেকে বস্ত্র তৈরী করে; এই উভয়বিধ ব্যক্তিগণ যেন গৃহে বসে স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারে। এদেরকে কোম্পানীর কারখানায় কাজ করার জন্ম বাধ্য করতে

হবে। প্রয়োজনে 'রাজনৈতিক' ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। বলাবাহুল্য, এর অন্তর্নিহিততত্ত্ব হলো, সামরিক শক্তির প্রয়োগ ও জুলুম-অত্যাচার। আর এটি সহজেই অনুমেয়, শ্বেত প্রশাসন নির্দেশিত কর্মটি সুনিপুণভাবেই পালন করেছিলেন। "ইহার ফলে রেশমীবস্ত্রের তাঁতীদের একাংশ বেকার হইয়া জীবন ধারণের জন্য কেবলমাত্র কৃষির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হয়, এবং অপর অংশ 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহে' যোগদান করিয়া বিদ্রোহীদের দল পুষ্ট করে।"৬

এর ওপর ইংরেজদের খাদ্যনীতি ছিল সর্বাত্মক। পর্বত প্রমাণ লাভের আশায় দেশের খাদ্য ফসল তাঁরা গুদামজাত করলেন। ইংরেজের মজুদনীতি সর্বনাশা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকে ত্বরান্বিত করল। অথচ মন্বন্তর কবলিত বাঙলায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো শিথিল মনোভাব দেখাননি। দুর্দিনের দিনগুলিতে সুপারভাইজারগণ খাজনা আদায়ে কীরূপ বাহাদুরি দেখিয়েছেন, এবং পূর্ববর্তী বৎসরগুলি তুলনায় এর বর্ধিত পরিমাণ কোন্ কেরামতিতে সম্ভব হয়েছে; তা দুর্বোধ্য নয়। আর এর জন্য বাঙলাদেশের মানুষ যে বিভীষিকা ও মর্মযন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন; তার কোনো নজির মেলেনা।

কোম্পানীর নির্দয়নীতিতেই শ্রমিক-শিল্পীর রুজি বন্ধ হলো। কৃষক চাষ করলেন, ফসল পেলেন না। ফসল মজুদ হলো কোম্পানীর ভাণ্ডারে। অন্নাভাবে দিন কাটালেন কৃষক-মজুর। কোম্পানী শোষণের যে অভিনব কৌশল অবলম্বন করলেন, তাতে এদেশীয়দের হাতে ও পাতে মারার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। ফলত, গ্রাম্য-অর্থনীতির বিপর্যয় গ্রাম-সমাজের সীমায়িত প্রাংগণে নেমে এল।

একদিকে বাঙালীর আশাআকাঙ্ক্ষা যেমন দিনে দিনে উত্তুঙ্গ হয়েছে, আরেকদিকে ভদ্রেতর ইংরেজদের মানবনীতি বিবর্জিত কর্মকাণ্ড তেমনি গ্রাম-সমাজের ওপর রূঢ় আঘাত করেছে। আর বাঙালীর একান্ত ভাব-ভাবনা, সবমিলিয়ে জীবনচেতনাকে করেছে অন্তরিত। বাঙলার গ্রামজীবনের অরক্ষিত প্রাংগণে ব্রিটিশ শক্তির এই হঠাৎ-প্রবেশে অর্থনীতি, সমাজনীতি ভেঙে গেল। ফলে, বাঙলার লোকসাধারনের পক্ষে ইংরেজ-কুগ্রহকে সহ্য করা সম্ভব হলো না। তাঁরা মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন সংঘর্ষ-সংঘাতে।

২. বিদ্রোহীদের পরিচয়...

বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের পরিচয় প্রসংগে এডওয়ার্ড টমসন ও জি. টি. গ্যারাট তাঁদের রচিত গ্রন্থে বলেছেন : সন্ন্যাসীদের অভ্যুত্থান হেস্টিংসের সময় সবচেয়ে "mysterious episode". । যদিও হেস্টিংস সন্ন্যাসীদের 'হিন্দুস্থানের যাযাবর' বলেছেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদের অভ্যুত্থান আজও রহস্যাবৃত। এর প্রকৃত ইতিহাস উদ্ভাবনের চেষ্টা ভারতবাসীর দিক হতেই হওয়া উচিত। ঐতিহাসিকদ্বয়ের মন্তব্যে, ঐতিহাসিক সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় মেলে।৭

'দবিস্তান' গ্রন্থে সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, "perpetually confounded Hindu Yogis, Sannyasis and Vairagis with Muhammedan Durvishes."৮ রিচার্ডসন তাঁর ডিক্সনারি-তে বলেছেন : 'ফকির' হলেন—"A poor man, a religious order of mendicants thus named by the Arabians ; by the Persians Dervish or Sorf and the Indians Senassey......"৯ উইলসন সাহেবের বক্তব্যের স্থূল মর্ম এখানে উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছেন,—'সন্ন্যাসী' একটি শ্রেণীগত অর্থে ইংগিতবহ। হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভ্রমণকারী ভিক্ষুক দলই এই সন্ন্যাসীরা। বস্তুত যে ব্যক্তি পৃথিবীর পার্থিব আকর্ষণ থেকে মুক্ত হয়েছেন, অথবা যিনি ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধাচারী এমন ভ্রমণরত ধর্মীয় মানুষকেই সন্ন্যাসী বলা যায়। অনুরূপভাবে 'ফকির' শব্দটি সাধারণত মুসলমান ধর্মাশ্রিত একজন পবিত্র ভিক্ষুকের প্রতিই আরোপ করা যায়।১০ 'সন্ন্যাসী' এবং 'ফকির' শব্দ দুটি দিয়ে ভিন্ন দুটি ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়কে বোঝান হয়। কিন্তু আসলে উভয়-সম্প্রদায় দেশীয়, দরিদ্রতম ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মপ্রবণ মানুষ।১১

সন্ন্যাসীদের শ্রেণীবিভক্তিকরণের দিক থেকে আমরা দুটি শ্রেণীর উল্লেখ দেখি। একদল সন্ন্যাসী যাঁরা মঠ-মন্দিরে উপাসনা করতেন সাধুসন্ত ও মহান্তদের অধীনে। এই প্রসংগে 'গিরি' সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসীদের নাম করা যায়। হিমালয় অঞ্চলে 'যোশীমঠ', মহীশূরের তুঙ্গভদ্রানদী সমীপবর্তী 'জ্যোতির্মঠ', দ্বারকায় 'সারদামঠ' (বোম্বে), উড়িষ্যার পুরীতে 'গোবর্দ্ধন মঠ' এবং কেদারনাথের 'ঊখীমঠ' ছিল সন্ন্যাসীদের ধর্মসাধনার পীঠভূমি। এখানে উল্লেখ্য, শংকরাচার্যের দশজন শিষ্য : পুরী, গিরি, পর্বত, সাগর, বাণ, অরণ্য তীর্থ, আশ্রম, সরস্বতী এবং ভারতী নামে পরিচিত ছিলেন। এই দশনামী

শিষ্যগণ 'দশনামা' সংঘ দ্বারা পরিচালিত হতেন। এই দশজন শিষ্যের অধীনে থাকত প্রাগুক্ত মঠগুলি।১২ সম্ভবত আরেকদল দীক্ষান্তে পথপরিক্রমায় বেরুতেন ক্ষুন্নিবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তির প্রয়োজনে। এঁরা ভিন্ন ভিন্ন দল ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে আপন গুরুর নামে নিজেদের পরিচয় দিতেন যেমন, গিরি ও পুরী।

এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে প্রায় অনৈক্যজনিত বিবাদ লেগেই থাকত। সম্রাট আকবর স্বচক্ষে পুরী ও গিরি—এই দুইদলের সশস্ত্র যুদ্ধ* দেখেছিলেন। ১৬৪০ খ্রীস্টাব্দে সন্ন্যাসী ও মুণ্ডি বা বৈরাগীদের মধ্যে এরূপ একটি যুদ্ধ হয়েছিল। এমনকি, নাগাসন্ন্যাসীদের দুইদল—মাদারী ও জালালী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুরূপ লড়াই হয়েছিল। সে কারণেই দবিস্তানের লেখক১৩ মন্তব্য করেছেন : "the sanyasis being frequently engaged in war." যামিনীমোহন ঘোষ মহাশয় 'গিরি' শব্দ দিয়ে পার্বত্যভূমির বাসিন্দাদের বুঝিয়েছেন। 'The Sannyasis......belong generally to the "Giri" sect—literally he who lives in a "giri" or "hill."১৪ বক্তব্যটি যথার্থ হয় তখনই, যখন হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মঠবাসী কিংবা মঠপ্রধান নামানুসারী একটি সম্প্রদায় বলে মনে করা যায়।

এক

ঘোষ মহাশয় সন্ন্যাসীদের আক্রমণ প্রসংগে ময়মনসিংহের কথা উল্লেখ করেছেন। এটা অবশ্য জানা যায়নি যে, কেমন করে সন্ন্যাসীরা ময়মনসিংহের পরগণাগুলিতে এলেন এবং কবে থেকে এখানে বসবাস সুরু করেছেন। এক্ষেত্রে ময়মনসিংহের কতিপয় জমিদারের লেখা দুটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইংরেজ শাসকদের নিকট লেখা জমিদারদের একটি চিঠি থেকে সময় সীমার কিছু হদিস মেলে। একটি চিঠি লেখা হয়েছিল ৬.৩.১৭৮৩ তারিখে। এতে জানানো হয়েছে, বিহারের বিশৃঙ্খলাকারী সন্ন্যাসীরাই এখানে (ময়মনসিংহের বিভিন্ন পরগণায়) এসে বসবাস সুরু করেছে। এই মাত্র নয়, আরো বলা হলো,—সন্ন্যাসীরা মহাজনীকারবার (টাকাকড়ির লেনদেন) ফেঁদে বসেছে। শুধু মহাজনী কারবারই নয়, ধান ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যবসাবাণিজ্য আরম্ভ করেছে। এরজন্য মৃগীনদীর ওপর 'নালাগঞ্জে' একটি

হাট স্থাপন-ও করেছে।১৫ অপরচিঠিতে১৬ সন্ন্যাসীদের প্রশংসা করে জমিদারগণ জানালেন,—পূর্বেতো একটি প্রথা ছিল, জমিদারগণ স্থানীয় অধিবাসীদের জীবন সুরক্ষার প্রয়োজনে তাঁদের পরগণাতে সন্ন্যাসীদের আবাসিত করাতেন।

তারিখসম্বলিত চিঠি থেকে বেশ কিছু পূর্বে তাকাতে হবে আমাদের। কারণ, কোনো একটি দলের পক্ষে মহাজনী কারবার কিংবা ব্যবসাবাণিজ্যের সুরু ও হাটস্থাপন নিদেন পক্ষে বসবাসের নিশ্চয়তার পরই আরম্ভ হয়েছিল, এমন ধারণা সংগত। আর দলবিশেষের কোনো স্থানে নোতুন আগমন ও বসতি বিস্তার বা মৌল-তাগিদ মেটাতে অন্তত একটি যুগের অতিক্রান্তি অসম্ভব নয়। সেদিক থেকে ময়মনসিংহে সন্ন্যাসীদের অবস্থান প্রসংগে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা না গেলে-ও আঠারোশতকের সত্তরের দশককে চিহ্নিত করা যায়।

কিন্তু পশ্চিমবাংলায় সন্ন্যাসীদের সংবাদ পাওয়া যায় আরও কয়েক বৎসর পূর্বে। কোম্পানীর 'প্রসিডিংস' এক্ষেত্রে সাক্ষ্য। কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিদের বৈঠকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২১ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারির আলোচনায় এবং ওয়াট ও হাউয়িতের রিপোর্টে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরে নাগাসন্ন্যাসীও মারাঠাদের লুণ্ঠন-ক্রিয়াকর্মের সংবাদ মেলে। এতে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাবে স্থির হয়, তাঁদের রাজস্ব আদায়ের কাজ অব্যাহত রাখার জন্য উপদ্রুত অঞ্চলে সামরিক বাহিনী প্রেরণ করা হবে।১৭

কিন্তু দুর্মর একটি জিজ্ঞাসা থেকেই যায়, সন্ন্যাসীদের আগমন হয়েছিল, না অভ্যুত্থান? বাংলা ও বিহারের জনজাগরণের মূলে সন্ন্যাসীদের অভ্যুত্থান হয়েছিল বলেই মনে হয়। আর এই অভ্যুত্থানের শক্তি ছিল স্থানীয় শ্রমজীবী মানুষ। যদি তাই না হবে, তবে ইংরেজ শাসনে করায়ত্ত বাংলা ও বিহারে দুর্দিনের দিনগুলিতে বিদ্রোহীদের চিত্তধাতুর দুর্মদ বলিষ্ঠ প্রকাশ লক্ষিত হতো না। আসলে স্থানীয় জনসমাজ ইংরেজ শাসন ও শোষণে, পীড়ন ও তাড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন বলেই তাঁদের বিদ্রোহী. মানস দুর্বার হয়ে উঠলো। অবশ্য, এসব শ্রমজীবী মানুষের সংগে হাত মিলিয়েছিলেন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কিছু নোতুন মানুষ। এঁরা বাংলা ও বিহারে প্রবেশ করেছিলেন কাজের আশায়। ফলে, কেউ লাগলেন কৃষিকর্মে,

কেউ-বা শিল্পায়নে। অনেকেই আবার স্থানীয় জমিদারদের পাইক-বরকন্দাজ ও সীমান্তরক্ষী হিসাবে নিয়োজিত হলেন। কর্মজগতের বৃহৎ আবেদনে, রুজি-রোজগারের নিবিড়টানে একদিন ওঁরা এদেশীয় সত্তায় মিলেমিশে একাকার হলেন। সুতরাং একদিন বাংলায় যে জনজাগরণ হয়েছিল সাহেব রাজার বিরুদ্ধে—শোষণ, মহাবিনষ্টির বিরুদ্ধে : সে জনচিত্তের উন্মাদনার কোনো-টাই বাইরের ছিল না ; অন্তরগরজ থেকেই উদ্ভূত ও প্রধূমিত হয়েছিল বলেই মনে হয়।

দুই

কোম্পানীর নথিপত্র থেকে এটা প্রতীয়মান যে, সন্ন্যাসীদের গিরি ও নাগা সম্প্রদায় বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় জমিদার ও রাজপুরুষদের সহযোগিতা করেছেন। জমিদারগণ সন্ন্যাসীদের প্রথমে ভয় পেলে-ও তাদের কর্মে-আন্তর নিবিষ্টতা লক্ষ করেই আশ্রয় দিয়েছিলেন বা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। জমিদারগণ বিভিন্নকর্মে যেমন অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রয়োজনে সন্ন্যাসীদের পাইক, বরকন্দাজ এবং সীমান্ত প্রহরী হিসাবে নিযুক্তি দিতেন। ফলত, এই সন্ন্যাসীরা জমিদারদের শক্তি বৃদ্ধিতেই শুধুমাত্র সহযোগিতা করেননি, এঁরা কখন-ও স্থানীয় জমিদারদের সাহায্য করেছেন অপর জমিদারদের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসায়। কিংবা লড়াইয়ে। মসনদচ্যুত নবাব মীরকাশিম মসনদ ফিরে পেতে সন্ন্যাসীদের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছিলেন। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌল্লা, রাজা বেণীবাহাদুর (পাটনার শাসনকর্তা) এঁরা দুজনেই সন্ন্যাসী নেতা হিম্মতগিরির* সহযোগিতা সম্বল করে পাটনার নিকটবর্তী মেজর কারনাকের ঘাঁটির ওপর আক্রমণের উদ্যোগী হয়েছিলেন ; অবশ্য সে অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল।১৮

সন্ন্যাসীরা বেতনার্থী সৈন্য হিসাবে কাজ করেছেন, রাজরাজড়ার হয়ে যুদ্ধ করেছেন : এমন নজির আছে। গাড়োয়ালের রাজা বিতাড়ন করলেন কুমায়ুন স্টেটের রাজা মোহন সিংহকে। রাজ্যচ্যুত মোহন সিংহ পথে-প্রবাসে বেরিয়ে পড়লেন। পথ পরিক্রমায় এলাহাবাদে এসে তিনি যুদ্ধাজীব নাগা সন্ন্যাসীদের সাক্ষাৎ পেলেন। বিতাড়িত রাজা কুমায়ুন ফিরে পেতে সন্ন্যাসীদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। রাজা প্রতিশ্রুতি দিলেন, কুমায়ুন

ফিরে পেলে, তিনি-ও সন্ন্যাসীদের সহযোগিতা দেবেন আলমোড়া লুণ্ঠনে। ফলকথা, সন্ন্যাসীবাহিনী কুমায়ুনে প্রবেশ করল তীর্থ-অছিলায়। মোহনসিংহ সময়ের সুযোগ বুঝে সন্ন্যাসীদের শক্তি নিয়ে কুমায়ুন আক্রমণ করলেন। এই মিলিত বাহিনীর নিকট পরাজিত হলেন প্রধানচাঁদ। রাজা মোহনসিংহ আবার কুমায়ুন দখলে আনলেন।১৯

তিন

ওয়ারেণ হেস্টিংস বিঘোষণ করেছিলেন,—এই সন্ন্যাসী-ফকিরগণ হলো 'হিন্দুস্থানের যাযাবর', 'পেশাদারী ডাকাত' এবং তীর্থ যাত্রার নামে 'ভিক্ষাবৃত্তি, চুরি ও লুণ্ঠনে অভ্যস্ত দস্যু'। এমনকি, সন্ন্যাসী ফকিরদের পরিচয়-প্রসংগে কলকাতা পরিষদ এক পত্রে লিখলেন এরূপ: "A set of lawless banditti, known under the name of Sanyasis or Faquirs, have long infested these countries; and, under pretence of religious pilgrimage, have been accustomed to traverse the chief part of Bengal, begging stealing, and plundering wherever they go, and as it best suits their convenience to practise."২০. আরেকটি চিঠিতে উল্লেখ করা হলো,—দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বৎসর বাংলায়: "...their (সন্ন্যাসী-ফকির) ranks were swollen by a crowd of starving peasants who had neither seed nor implements to recommence cultivation with, and the cold weather of 1772 brought them down upon the harvest fields of Lower Bengal, burning, plundering ravaging, 'in bodies of fifty thousand men'."২১

সন্ন্যাসী-ফকিরদের প্রকৃতি নিরূপণে কোম্পানী যা নথিভুক্ত করেছেন তা শুদ্ধ-সভ্য নৈতিকতার অভাব। তারা অমার্জিত। অযথা রূঢ়তার পরিস্ফীতি। উদাহরণ নেওয়া যাক। সন্ন্যাসী-ফকির প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, "The dacoits of Bengal, are not, like the robbers in England, individuals driven to such desperate courses by sudden want. They are robbers by profession, and even by birth. They are formed into regular communities, and their families subsist by the spoils which they bring home to them."২২

কোম্পানীর নথিপত্রে বিদ্রোহীদের প্রতি যেরূপ উৎকট-ভাবাভঙ্গি আরোপিত হয়েছে তার বিশ্লেষণে দেখি :

১. সন্ন্যাসীরা ছিল : দস্যু-ডাকাত ;
২. হিন্দুস্থানের যাযাবর ;
৩. পেশায় — ভিক্ষাবৃত্তি ;
৪. অবলম্বন : চুরি-ডাকাতি ;
৫. সংখ্যায় — হাজার পঞ্চাশ।

সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে কোম্পানীর স্বীকৃত অভিমত হলো :

১. সন্ন্যাসীদের অবস্থা : সহায় সম্বলহীন,
২. অন্নাভাবে উপবাসী।
৩. তাদের চাষের সুযোগ ছিল না। চাষের জমি ও কর্ষণের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ছিল না।
৪. দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বৎসরেই এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

এক্ষেত্রে হান্টার সাহেবের উক্তিটি অর্থবহ। তিনি লিখেছেন ;— গৃহহীন সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হতো। সৈনিকের দল গড়ে দেশময় ঘুরে বেড়াত। এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছিল পঞ্চাশ হাজারের মতো।২৩ হান্টার সাহেবের বক্তব্যে স্পষ্ট আভাসিত যে, সন্ন্যাসীরা ছিলেন গৃহহীন। এখন প্রশ্ন, কেমন করে এই সন্ন্যাসীরা গৃহহারা হয়েছিলেন ? এর কারণটি অবশ্যই ইংরেজদের শাসন-শোষণ ও পীড়ন-তাড়ন। ইংরেজদের অতিমাত্রিক শোষণ-নিষ্পিষ্টে বাংলা ও বিহারের জনসমাজ থেকে একটি বিরাট অংশের উৎসাদন হয়। স্ব-স্থান থেকে প্রজাসাধারণ উৎসাদিত হওয়ার কারণেই তাঁরা গৃহহীন হয়েছিলেন। এই প্রজাদের মধ্যে খাজনার ভারে ক্লিষ্ট কৃষক ও সুতী-রেশমবস্ত্রের কর্মচ্যুত কারিগর প্রভৃতি ছিলেন।

একটু তলিয়ে ভাবলে আমরা দেখবো বাংলার জনসাধারণ কর দিতে অভ্যস্ত। মোঘল রাজত্বের প্রয়োজনেই উদ্ভব হয়েছিল জমিদার শ্রেণীর। কর আদায়ের জন্য এদের সৃষ্টি। মোট কথা, "কর আদায়ের কন্‌ট্রাক্টর"।২৪ এ সময় থেকেই চলছে প্রজাপীড়ন। এরই আরো বিচিত্র জটিল ও ভয়াবহ রূপটি প্রকটিত হলো যখন ইংরেজরা খাজনা আদায়ের কাজে নামলেন।

বাঙালী-প্রজা বণিক রাজার ধরন-ধারণ, রীতিনীতির সংগে হাত মেলাতে পারছিলেন না। সুতরাং শোষকের কবল থেকে বাঁচার সংগ্রামে নেমেছিলেন সেদিনের গৃহহারার দল। এর সংগে যুক্ত হলেন ভগ্নদশাগ্রস্ত মোঘল সাম্রাজ্যের বেকার বুভুক্ষ সৈন্য সামন্ত। সামরিকজ্ঞান ও সমর কৌশল এঁদের অধিগত। ফলে বাঙালীর শক্তি বৃদ্ধি পেল। বঞ্চিত জনমানসের দীপ্ত-সম্মিলনে বাঙালীর অন্তরতম, স্পষ্টতম, স্থিরতম, দৃঢ়তম বিদ্রোহের অনুভূতি প্রতপ্ত হলো।

জনৈক লেখক তাঁর গ্রন্থে২৫, এই ঐতিহাসিক বিদ্রোহের তিনটি ধারার সুসংবদ্ধ আলোচনা করেছেন।

১. বাঙলা ও বিহারের কৃষক-জনসমাজ ইংরেজ শোষণ, উৎপীড়ন হতে আত্মরক্ষার জন্যই বিদ্রোহী হতে বাধ্য হয়। তারাই বিদ্রোহের মূল ও প্রধান শক্তি।

২. ধ্বংস প্রাপ্ত মোঘল সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীর ছত্রভঙ্গ, বেকার ও বুভুক্ষ সৈন্যগণের একাংশ আত্মরক্ষার তাগিদেই বিহার ও বাংলার বিদ্রোহীদের সংগে মিলিত হয়ে সামরিক সাফল্যের চেষ্টা করেছে।

৩. সন্ন্যাসী ও ফকিরদের যে সব সম্প্রদায় বাংলা ও বিহারে স্থায়িভাবে বসবাস সুরু করেছিল চাষ আবাদের মাধ্যমে; সেই চাষী সন্ন্যাসী ও চাষী ফকিরগণ শোষণ থেকে মুক্তি পেতে এবং অপরদিকে যে সব সন্ন্যাসী-ফকিরগণ ধর্মানুষ্ঠান করত, তারা বিদেশী শাসকদের হস্তক্ষেপ হতে অব্যাহতির জন্য বিদ্রোহের অভিমুখী হয়ে ওঠে।

এই স্পষ্ট ও সুবোধ্য বক্তব্যের সংগে আমরা একমত। এই প্রসংগে বিদ্রোহের স্থানটি-ও আমরা 'লোকেট' করে নিতে পারি। সন্ন্যাসীদের বিরোধী তৎপরতা কেন্দ্রীভূত হয় উত্তর বাংলায়ঃ বিশেষ করে রঙপুরে। মন্বন্তর ছিয়াত্তরে আশ্চর্য প্রভাব যতটা পড়ল পূর্ণিয়া, মুর্শিদাবাদ ও দিনাজপুরে—ঠিক ততটাতো নয়ই, বেশ কম প্রভাব ছিল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল রঙপুরে। ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থেকে অব্যাহতির জন্য উপক্রুত এলাকার গ্রামবাসী এখানে সমবেত হয়েছে। এর মধ্যে সর্বরিক্ত গৃহস্থ যেমন ছিল, তেমনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-ও। আবার, যেহেতু ভেক নিলে ভিখ মেলে, তাই গৃহস্থের অনেকেই

ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য ভিক্ষাকে জীবিকা করে সন্ন্যাসী-ফকিরদের ভেক গ্রহণ করেছিল। মনে রাখা ভালো যে, চলতি বাঙলায় সন্ন্যাসী ফকির বলতে শুধুমাত্র ভেকধারীকেই বোঝায় না, গৃহহীন নিঃসম্বল ব্যক্তিকেও বোঝায়।২৬

চার

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের যিনি ছিলেন বিতর্কিত নায়ক, যাঁকে ঘিরে ইংরেজ শক্তির উৎকণ্ঠার অবধি ছিলনা। যে ধুরন্ধর এই বিশাল ব্যক্তির পরাক্রম ও অনুরুদ্ধ আক্রমণে ইংরেজ সে দিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন; সে বক্তি সত্তার নাম মজনু শাহ—সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মন্ত্রগুরু। কালজয়ী ব্যক্তিক-সত্তা। যিনি স্বীয় পরিমণ্ডলে টেনে আনতে পেরেছিলেন কয়েক সহস্র মানুষকে। দীক্ষা দিলেন একটি, তা হলো—বিদ্রোহ। জীবন সত্তার গভীরে যা অনুভব করতে হয়, দৃঢ়তা ও কঠিন শপথের বাতাবরণে যার উন্মোচন সম্ভব হয়। মজনু-প্রশংসায় জনৈক লেখকের বক্তব্যটি লক্ষণীয় তিনি বলেছেন,—"The role of Majnushah is particularly significant. He was an organiser of great ability, a great commander-in-chief who fought in the midst of a very trying situation against the superior armed forces of the British."২৭ সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সর্বশ্রেষ্ঠ এই নায়কের জীবন বৃত্তান্ত নিয়ে মতান্তর আছে। ইনি ছিলেন বুরহান বংশীয় ফকির। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে তিনি বসতিস্থাপন করেছিলেন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে মাখনপুরে যুগসঙ্কটের এই অধিনায়কের কর্মাবসান হলো লোকচক্ষুর অন্তরালে। এঁর সম্পর্কে আমরা স্থানান্তরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়াস নেবো॥

৩. বিদ্রোহচিত্র···

ইংরেজ বণিকতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের পেষণে বাঙালীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। বাঙালী এর থেকে মুক্তি চাইলেন। ফলত, প্রত্যাঘাত সুরু হয় বিদ্রোহ-বিপ্লবে। ইংরেজ বণিক তন্ত্রের ভাঙা-গড়া ক্রিয়ার অন্তরালে বিদ্রোহীরা সংগঠিত হচ্ছিল একটা ঐক্য সূত্রে। যে একতা তাদের জীবনের ক্ষেত্রে যে কোনোভাবে, যে কোন পরিস্থিতে প্রেরণা ও শক্তি যুগিয়েছিল

জমিদার মহাজন গোষ্ঠী ও ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে : যে লড়াই জীবনে যন্ত্রণামুক্তির লড়াই।

আলোচ্য পর্বে আমরা দেখবো, সে লড়াইয়ের কৌশল যেমন ছিল অদ্ভূত তেমনই বিরুদ্ধাচরণের ক্রিয়া-কৌশল ও ছিল বিভিন্ন বিচিত্র। ইংরেজ শক্তির কাছে এইটেই ছিল সমস্যা। কারণ, সন্ন্যাসী ফকিরদের অস্বরাস অগ্রগতি সম্পর্কে সামগ্রিক অধ্যয়ন ও সন্ধানী পটভূমি রচনা করা তাদের পক্ষে সম্ভব হতো না। বিদ্রোহীদের দেখা গেছে, কখনো সম্মুখ থেকে কখনো বা আড়াল আবডাল থেকে যুদ্ধ করতে, 'গেরিলা-কৌশলে'। শুধু যুদ্ধ নয়, লুণ্ঠন করেছে ইংরেজকুঠি কিংবা প্রজাশোষণে স্ফীত জমিদারদের রাজস্বভাণ্ডার। এতে শাসকদেরই ক্ষতি হয়, কারণ মূল ভাণ্ডারেই টান পড়ে। ফলে গোপন বৈঠকে স্থির হলো প্রতিরোধ ব্যবস্থার। আমরা আগেই জেনেছি, ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান ও কৃষ্ণনগরে সন্ন্যাসী-ফকিরদের লুণ্ঠন জনিত কারণে ইংরেজ কর্তাব্যক্তিদের দুটি আলোচনা সভায় স্থির হয়; সামরিক শক্তি দিয়ে ঐ দুটি স্থানে প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা এমনভাবে করা হবে, যাতে টাকা আদায়ের কাজ অব্যাহত থাকে।২৮

১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে সন্ন্যাসী ফকিরদের আঘাত পড়লো ঢাকার ইংরেজকুঠির ওপর। এই আক্রমণে ঢাকার-কুঠি বিদ্রোহীদের দখলে এল। র‍্যালফ-লিস্টার ছিলেন কুঠি প্রধান। কুঠির সম্পদ রক্ষার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু সিপাহী-সান্ত্রীরা যে যেদিক পারলো পালিয়ে গেল। সুতরাং কুঠি তাঁর রক্ষা হয় না। সংবাদ পেয়ে ক্যাপটেন গ্রান্ট ২৯ তাঁর বাহিনী নিয়ে হাজির হলেন। যুদ্ধ হলো প্রচণ্ড। এই যুদ্ধে ফকিরদের পরাজয় হলো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়টি হলো এই : বন্দী-ফকীরদেরই কুলির কাজে ব্যবহার করে কুঠি পুনর্নির্মিত হলো।৩০

বিদ্রোহীদের পরবর্তী আক্রমণ সুরু হয় রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়ার ইংরেজ কুঠির ওপরে। বিদ্রোহীরা ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কুঠি-সম্পদ লুণ্ঠন করে। কুঠি প্রধান বেনেট সাহেব বন্দী হলেন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। আরো একবার ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে, বিদ্রোহী বাহিনী রামপুর বোয়ালিয়া আক্রমণ করে ইংরেজ বণিক ও স্থানীয় ধনিক মহাজনদের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করে নেয়। ৩১

কুচবিহার সিংহাসনের আভ্যন্তর বিরোধ নিয়ে সন্ন্যাসীও ইংরেজের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয় ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে। কুচবিহারের নাবালক মহারাজ ছিলেন ভুটানের প্রতিনিধি। এই মহারাজা ছিলেন ভুটিয়াদের রক্ষণাবেক্ষণে। কিন্তু ষড়যন্ত্র রাজ-অন্তঃপুরে। রামানন্দ গোসাঁই-এর চক্রান্তে মহারাজ নিহত হন। তখন সিংহাসনের দখলদারী নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলো। 'নাজির দেও' রুদ্রনারায়ণ (যিনি উত্তরাধিকার সূত্রে ছিলেন সৈনাধ্যক্ষ) ও ভুটিয়াদের মধ্যে। ভুটিয়ারা রুদ্রনারায়ণকে দেশ ছাড়া করলেন। রুদ্রনারায়ণ ইংরেজ শক্তির সাহায্য চাইলেন।৩২ লেঃ মরিসন এলেন, রুদ্রনারায়ণের পাশে দাঁড়ালেন। অপর পক্ষ ভুটিয়ারা সন্ন্যাসীদের আহ্বান করলেন। যুদ্ধ সুরু হলো। রেনেল* তাঁর বিবরণীতে মরিসনের বীরত্ব ও যুদ্ধ কাহিনীর তথ্য বিবৃতি দিয়েছেন। সন্ন্যাসীরা সম্মুখ-সমরে জয় অসম্ভব বুঝে ছোট ছোট দলে, বিশেষ-কৌশলে ইংরেজ বাহিনীর ওপর আক্রমণ সুরু করে। এবং চতুর্মুখী একটানা আক্রমণে মরিসনের বাহিনী বিপর্যয়ের মুখে পড়ে পরাস্ত হলো (আগষ্ট, ১৭৬৬)।

রেনেল লিখলেন ৩৩ ;—সন্ন্যাসী-ফকিরের দল তাঁদের (রেনেল ও মরিসনের বাহিনী) শিবির আক্রমণ করেছে। মরিসন অনাহত অবস্থায় পালাতে পেরেছেন বটে। রিচার্ড-ও (রেনেলের ভাই) সরে যেতে পেরেছেন। কিন্তু তিনি নিজে প্রাণে বাঁচলে-ও দেহে সর্বত্র ক্ষতের জালা অনুভব করছেন। সন্ন্যাসীদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল পাটনা কুঠি। টমাস র‍্যামবোল্ড ২০.৪.১৭৬৭ তারিখের পত্রে লিখলেন ;— একটি বিরাট সন্ন্যাসীদের দল : সংখ্যায় পাঁচহাজার, বিহারের সারেজিতে (সারণ) প্রবেশ করেছে। সন্ন্যাসীরা বিহারে সর্বত্র সন্ত্রাস সৃষ্টি করে ইংরেজ-কুঠি আক্রমণ করেছে। এরফলে, তাঁদের রাজস্ব-আদায়ের কাজ ব্যাহত হয়েছে। সন্ন্যাসীদের আক্রমণে ইংরেজপক্ষে প্রায় আশিজনের মত হতাহত হয়েছে। দুটি বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ের পর ক্যাপটেন উইল্ডিং-এর নেতৃত্বে সুসজ্জিত বাহিনী প্রেরিত হয়েছে "to rid the country of them, as their stay strikes terror into the country people and greatly hurts the collections in that part." তার ফলে সন্ন্যাসীরা পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়েছে।৩৪

উত্তর বংগের জঙ্গলাকীর্ণ স্থানগুলিতে ছিল বিদ্রোহীদের গুপ্ত ঘাঁটি। শত্রু

বাহিনীর ওপর অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ দিয়েছে এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। অরণ্যের পটভূমিতে তারা রচনা করেছে দুর্ভেদ্য দুর্গ।৩৫ সন্ন্যাসীরা মার্টেল সাহেবকে হত্যা করে ছিল প্রতিশোধ পরায়ণতাপূর্বক। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জিকে পাঠালেন সন্ন্যাসীদের দমনে। তিনি রঙপুরে এসে জানলেন, বিদ্রোহীরা সন্ন্যাসীকাটা পরিত্যাগ করে নেপাল সীমান্তে এগিয়ে চলেছে। সংবাদ প্রেরিত হলো, সংগে নির্দেশ: ভার্ট লেঃ কিথ্ বিদ্রোহীদের অনুসরণ করলেন। এ সময়ে সন্ন্যাসীরা গা-ঢাকা দেয়। তারপর, ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে নেপাল সীমান্তের মুগহারায় বিদ্রোহী-দের অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজ সেনাবাহিনী পরাস্ত হলো। সেনানী কিথ্ নিহত হলেন এ-যুদ্ধে।

সন্ন্যাসীদের কয়েকটি যুদ্ধে জয় যেমন সাহস অন্যদিকে ইংরেজ শক্তির ক্ষেত্রে তেমনই ত্রাসের সঞ্চার করল। ফলত, সন্ন্যাসীদের মধ্যে দেখা গেল নব নব উদ্যম ও পরিকল্পনা আর ইংরেজদের মধ্যে চেষ্টা চলল নবনব উপায় উদ্ভাবনও প্রতিরোধের পরিকল্পনা। এ সময় মন্বন্তরের দিবাদাহ সুরু হয়। ফলত বাঙলার জনমানসের অন্তর্জ্বালা এই বিচিত্র পরিপ্রেক্ষিকায় অবারিত হলো বিদ্রোহদমে। যাইহোক, ১৭৭০-৭১ সময় সীমায় বিদ্রো-হীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও এসময় ইংরেজশক্তি বিদ্রোহীদের কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত করতে পেরেছে। পূর্ণিয়ার কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে ৫০০ জন সন্ন্যাসী ফকির বন্দী হয়। এর ফলে বিদ্রোহীদের অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ পায়। এতেই জানাযায়, বিদ্রোহীরা প্রকৃত পক্ষে শান্তিপ্রিয় স্থানীয় জনগোষ্ঠী তাদের পরিচালক-ও একজন স্থানীয় ও সকলের পরিচিত ও প্রিয় মানুষ। ৩৬

এক

পূর্ণিয়ার পরাজয়ে বিদ্রোহীরা কিছুটা দমে গেলেও অল্প দিনের মধ্যেই পুনোদ্যমে বিদ্রোহীদের কর্মকাণ্ড সুরু হয়। দিনাজপুর, বগুড়া ও জলপাই গুড়ি প্রভৃতি স্থানে দুর্গ নির্মাণ ও সৈন্য সংগ্রহে উদ্যম নেওয়া হয়। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ফকির-নেতা মজনুশাহেব তৎপরতা বিশেষ লক্ষনীয়। এই শক্তিমান নেতার সাহচর্য, বুদ্ধিও পরিকল্পনা এবং সবিশেষ দক্ষ পরিচালনা বিদ্রোহ-বিপ্লবকে দুর্বার করে তোলে। ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারি

মাসে লে: টেলরও লে: কেন্টহাম পরিচালিত দুটি বাহিনীর সংগে মজনুশাহকে যুদ্ধে নামতে হলো বটে, কিন্তু সুবিধে করতে না পেরে তিনি পিছু-সরলেন। এ সময় তিনি মহাস্থান গড়ের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই আবার তাঁর তৎপরতা সুরু হয় উত্তরবংগে। সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় আশ্বস্ত মজনুশাহের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল স্থানীয় জমিদার ও ধনিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা আদায়ের। সম্ভবত একারনেই তিনি বাংলার বৃহত্তম জমিদার নাটোরের রাণী ভবানীর নিকট একটি বিনীত পত্র লিখেছিলেন :

We have for a longtime begged and been entertained in Bengal and we have long continued to worship God at the several shrines and altars without ever once sbusing or oppressing anyone. Nevertheless last year 150 Fakirs were without cause put to death. They had begged in different countries and the cloaths and victuals which they had with them were lost. The merit which is derived and the reputation which is procured from the murder of the helpless and indigent need not be declared. Formerly the Fakirs begged in separate and detached parties but now we are all collected and beg together. Displeased at this method they (The English) obstruct us in visiting the shrines and other places — this is unreasonable. You are the ruler of the country. We are Fakirs who pray always for your welfare. We are all full of hopes."

এতে তিনটি জিনিস স্পষ্ট :

১। বিদ্রোহীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ;

২। বিদ্রোহীরা ইংরেজ শক্তিকে শাসক হিসাবে মানতে চায়নি ;

৩। বিদ্রোহের পেছনে একটি ধর্মীয়ভাব অব্যক্ত ছিল। —মনে হয় রাণীর কাছ থেকে মজনু শাহ কোনোরকম সহযোগিতা লাভ করেন নি। যদি তা করতেন, তা হলে নাটোরের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহীদের পিছু

আচরণ প্রকাশ পেত না।৩৮ সে যাইহোক, মজনুশাহের অবারণীয় বিদ্রোহ-দমে শাসক বর্গ শংকিত হয়ে উঠলেন।

সন্ন্যাসী ফকিরদের অগ্রগমনে শাসকগণ এতটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠছিলেন কেন, এর আংকিক দিক হলো,—

১। ইংরেজ শাসকদের রাজস্ব আদায়ের কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। আবার যেটুকু-বা আদায় হচ্ছিল, তার অনেকাংশই বিদ্রোহীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে।

২। শাসকগণ ভীত হয়ে উঠছিলেন, তার একটি বড়ো কারণ তাঁদের অনুগৃহীত জমিদারগণ বিদ্রোহীদের দমনে অক্ষম ছিলেন। ইংরেজদের শংকা ছিল বিদ্রোহীদের ঔদ্ধত্যের কারণ হয়তো জমিদার গণের দুর্বলতা না হয় গোপন সহায়তা।

৩। বিদ্রোহীদের আক্রমণ পদ্ধতি ও ক্রমান্বিত প্রয়াসে শাসক বর্গ নিজেদের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব সম্পর্কে ভীত ছিলেন।

ইংরেজরা অবশ্য পাল্টা প্রচার করেছিলেন, বিদ্রোহীরা জনসাধারণের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে, অত্যাচার-উৎপীড়ন করে। এদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। কিন্তু ইচ্ছা পূরণের এই সাহসিক প্রচার সমভাবীদের কাছ থেকে বাহবাস্ফোট পেলে ও এমন প্রচারে উচ্চকিত হলো না লোক-মানস। আসলে, সাধারণ মানুষ বিদ্রোহীদের সংগ্রামী মানসের সংগে তারা ঐকাত্ম্য অনুভব করেছে। বিদ্রোহীদের মূল 'টার্গেট' ছিল ইংরেজ শোষক-পীড়ক ও অত্যাচারী জমিদার মহাজন। দেশীয় জমিদারগণ অবশ্য অনেক চেষ্টাকরেছেন বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার। কিন্তু তাঁদের শক্তি-সামর্থ্য বিদ্রোহীদের নির্জিত করতে পারেনি। বিদ্রোহে গণসমর্থনের কথা ভেবেই শাসকবর্গ রাজশাহী জেলায় শাসন-নীতির রূঢ় বচনটি সংযত গম্ভীর ভাষায় প্রচার করলেন ;—সন্ন্যাসী ফকিরদের উৎপাত জনিত কারণে রাজস্বের যে ক্ষতি হয়েছে, সে ক্ষতি পূরণের ঝুঁকি নিতে হবে সাধারণ প্রজাকেই। রাজ-শাহী জেলার প্রত্যেক কৃষককেই বহন করতে হবে রাজস্ব-ক্ষতি। এরজন্ত সরকার দায়ী হতে পারে না।৩৯।

১৭৭২-৭৩ খ্রীস্টাব্দে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ দুর্বার হয়ে ওঠে। শাসকগণ

বিচক্ষণ। এ সময়ে বিদ্রোহীদের তৎপরতা যেমন ছিল প্রচণ্ড তেমনি শাসক শ্রেণীও প্রতিরোধ প্রতিবিধানে উত্তাল হলেন। এ এক সংকটঘন মুহূর্ত। উত্তর বংগে বিদ্রোহীদের সমাবেশ ও হেস্টিংসের সৈন্য প্রেরণ ;—দু' পক্ষের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। রংপুরের বিদ্রোহ দমনে এলেন ক্যাপটেন টমাস। সংগে তাঁর বিরাট সেনাবাহিনী। ৩০-১২-১৭৭২ তারিখের প্রত্যুষে স্বরূপপুর পরগণার শ্যামগঞ্জে রণদামামা বেজে ওঠে। বিদ্রোহীরা গা-ঢাকা দেয় গভীর জংগলে। ইংরেজ সেনানী যুদ্ধে-মত্ত, তাই মহানন্দে গোলাগুলি ছুড়ে বিশ্রাম নিলেন। ভাবলেন, প্রতিপক্ষ পশ্চাদপসরণ করেছে এতে। প্রকৃতপক্ষে তারা পাল্টা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

সুযোগ-ও এল। বিদ্রোহীবাহিনী দেশীয় অস্ত্র, তীর ধনুক, লাঠি—বল্লম নিয়ে ইংরেজদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এতে সহায়তা করল স্থানীয় জনসাধারণ। ক্যাপটেন টমাস দেশীয় সিপাহীদের প্রতি-আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সিপাহীরা স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চাইল না, তারা অনড়। ফলকথা, ইংরেজ পক্ষে পরাজয় ঘোষিত হলো। ক্যাপটেন টমাস বিদ্রোহীদের তরবারির আঘাতে নিহত হলেন। এ সম্পর্কে পার্লিং সাহেবের খেদোক্তিটি লক্ষণীয়—

"the ryots gave no assistance but joined the Sannyasis with lathies and showed the Sinassies those whom they saw had concealed themselves in long grass and jungle and if any of the sepoys attempted to go into their villages they made a noise to bring the Sinnasies and they plundered the sepoy's firelocks."৪০

দুই

উত্তরবংগ পরাজয়ের আঘাত শাসকদের বড়ই লেগেছিল। হেস্টিংস আহত হলেন এতে।৪১ এ সম্পর্কে ইংলণ্ড থেকে কঠোর নির্দেশ এল, বিদ্রোহ দমনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে হবে। ইংলণ্ড থেকে নোতুন সৈন্য আনালেন হেস্টিংস। ক্যাপটেন জোন্স নবগঠিত সৈন্যবাহিনী নিয়ে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন ২৮. ১. ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে। সন্ন্যাসী-ফকিরদের পক্ষে

যুদ্ধ পরিচালনায় ছিলেন দর্পদেব। জোন্সের সৈনাপত্যে দর্পদেবের বাহিনী সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হলো। এর ফলে জলপাইগুড়ির দুর্গ দর্পদেবের হাতছাড়া হলো। ৪২ এর কয়েকদিন পর ৩. ২. ১৭৭৩ তারিখে সেনাপতি স্টুয়ার্ট দিনাজপুর জেলার সন্তোষপুরের দুর্গ বিদ্রোহীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলেন

ইংরেজ সেনাবাহিনীর নবসংগঠনের কথা সন্ন্যাসীরা বেশ ভালোভাবেই টের পেল। তারা-ও সুসংগঠিত হবার চেষ্টা করে। বগুড়ার বাহিনী এমন-ভাবে সংগঠিত হলো যে, কর্তৃপক্ষ এখানে আক্রমণের ভরসা পেলেন না। এ সময় বিদ্রোহীরা স্থানীয় ইংরেজ কর্মচারী ও জমিদারদের কাছ থেকে কর আদায় করে। আপসের জন্যই হোক আর বিদ্রোহীদের হাত থেকে বাঁচার তাগিদেই হোক; বিদ্রোহীদের হাতে টাকা তুলে দিয়ে কিন্তু এইসব ইংরেজ কর্মচারী ও জমিদারগণ বিদ্রোহীদের শক্তির প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। এর ফলে রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে। তাই যখন জমিদারগণ নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে অক্ষমতার কারণ দর্শিয়ে 'রেভিনিউ বোর্ড'-এর অনুগ্রহ চেয়েছিলেন। বোর্ড কোনো রকম সুবিধে দিতে অস্বীকার করলেন। বোর্ডের অনুমান, বগুড়ায় সন্ন্যাসীদের উদ্ধত আচরণ, লুণ্ঠন ক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে জমিদার, তালুকদার ও সাধারণ অধিবাসীদের সহযোগিতা ও প্রশ্রয়ে। তাই রাজস্বক্ষতির কোনো বিবেচনা বোর্ডের পক্ষে সম্ভব নয়। ৪৩

শুধু মাত্র বগুড়ায় নয়, সন্ন্যাসীরা এসময়ে উগ্র উচ্ছ্বাসে তৎপর হয়েছে ঢাকা ও ময়মনসিংহে। ময়মনসিংহে সন্ন্যাসীদের ব্যাপক সমাবেশ সংবাদ পেয়ে ক্যাপটেন এডওয়ার্ডস এলেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ, বিদ্রোহীদের অতর্কিত আক্রমণের টাল সামলাতে পারলেন না ক্যাপটেন। বিদ্রোহীদের প্রাণপ্রবাহের কাছে দিঙ্‌মূঢ় হলেন তিনি। ফলে তাঁর মৃত্যুর মধ্যেই তখনকার যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।৪৪

পূর্ববংগে সন্ন্যাসীদের অভিযান সংক্রান্ত চিঠি পত্র লক্ষ করলে এটা ধারণা হয়: সন্ন্যাসীদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল কোম্পানীর কর্মচারী ও জমিদার শ্রেণী। ময়মনসিংহ পরগণার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় কোম্পানীকে জানিয়েছিলেন যে, পাঁচ হাজার সন্ন্যাসী-ফকিরের দল জাফরশাহী পরগণায় প্রবেশ করে পরগণার নায়েবকে আটক রেখে ষোলশত টাকা জুলুম-আদায় করে। আলাপ সিংহের চার আনা অংশের জমিদারের কাছ থেকে

খবর মেলে, তিন হাজার পাঁচশত সন্ন্যাসীর একটি দল তাঁর গোমস্তার বাড়ি লুঠ করেছে। জমিদারের নায়েব ও লোক মারফৎ সাড়ে তিন হাজার টাকা সন্ন্যাসীদের পাঠিয়ে তবেই তিনি বেঁচেছেন। সেরপুরের সংবাদ থেকে জানা যায়, সন্ন্যাসীদের ভয়ে জমিদার ও তাঁর পরিবারবর্গ জংগলে অবস্থান করেছেন। সন্ন্যাসীরা ব্যবসায়ীদের-ও টাকাকড়ি লুঠ করেছে। এরা দিনাজপুরের কোনো এক ভদ্র লোকের গোমস্তা রামলোচন বোসকে আটক রেখে চার হাজার দুশত টাকা আদায় করেছে। ৪৫

এখানে উল্লেখ অনাবশ্যক হবে না যে, হেস্টিংস বিদ্রোহ দমনে এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্যে এক নোটিস জারী করলেন। এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো :

"Notice is hereby given to all Bairagis and Sannyasis who are travellers, strangers and passengers in this country, exceptinng such of the caste of Ramanandi and Gauria who have for a longtime been settled and receive a maintenance in land money or gundi from the Government or the zamindars of the province, likewise, such Sannyasis as are allowed charity ground for executing of religious offices, etc. to leave the town of Calcutta, its precintics, or any other place of residence in it within sevendays from the publication of this advertisement, and depart from the Subahs of Bengal and Bihar in two months."

"It is further declared that if any of thc above mentioned sects shall be found in Bengal or Bihar at the expiration of two months they are to be seized and put on the roads for life made to work at the public buildings and have their property confiscated to the Government. If any one with a view of evading the intent of this publication shall claim donations of land and his claim be falsified, he will be punished as above directed." ৪৬

আভাসে ইংগিতে বলা হয়েছে, হেস্টিংস কঠিন হয়ে উঠছিলেন সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে ; এখানে আমরা সেই কঠিন চিত্তধাতুর প্রত্যক্ষ পরিচয় পেলাম। কিন্তু স্বভাবতই প্রশ্ন দেখা দেয়, হেস্টিংস সন্ন্যাসীদের যখন বহিরাগত-ই ভাবলেন ; তখন তাদের সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত-করণ, কিংবা জমি জায়গার ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটি দেখা দিল কেন। প্রকৃত পক্ষে 'বহিরাগত' শব্দটিতে আমাদের আপত্তি আছে। আপত্তির কারণ বিদ্রোহীদের পরিচয় প্রসংগে বলে এসেছি।

যাইহোক, দু'মাস পরে সকল কালেকটরদের বলা হলো যে, বিভিন্ন জমিদার ও কৃষকদের প্রতি আদেশ জারী করে জানতে চাওয়া হোক ; সন্ন্যাসীদের গতিবিধিও লুণ্ঠনের সংবাদ। এই সংবাদ দিতে যাঁরা অস্বীকার করবেন, তাঁরা "to be attended with the displeasure of the Board in case of zamindars ; and in case of farmers, they will be seriously punished for neglect of it," ৫৭

এরপর হেস্টিংস আরো কয়েকটি ব্যবস্থা নিলেন।

১। সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করলেন। তা থেকে দেশীয় বাহিনীকে * সম্পূর্ণ বাদ দিলেন। কারণ, দেশীয় বাহিনী স্বদেশের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধ করে না। দেশীয় সিপাহীদের বরকন্দাজ ও রক্ষী হিসাবে নিয়োগ করলেন।

২। অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো। বারাণসী রাজ চৈত সিংহের কাছ থেকে এর জন্য দাবি করা হয়েছিল পাঁচশত অশ্বারোহী সৈন্য ও তার সংকুলান ব্যয়।

৩। বিদ্রোহীদের মিলন ক্ষেত্র তীর্থস্থান। তাই নানা রকম কর আরোপ করে বিদ্রোহীদের তীর্থস্থানগুলিতে অবাধ যাতায়াতের বাধা দেওয়া হলো।

৪। বিদ্রোহীরা পলায়ন উদ্দেশ্যে ভুটানে প্রবেশ করত। হেস্টিংস ভুটান-রাজ দেবরাজের সংগে চুক্তিবদ্ধ হলেন। শর্ত,—বিদ্রোহীদের ভুটানে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে ইংরেজ সৈন্য ভুটানে প্রবেশ করতে পারবে।

৫। বিভিন্ন স্থানে এক শ্রেণীর পাহারাদার নিযুক্ত করা হলো সন্ন্যাসীদের বাধাদান ও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে।

এতকিছু করতে পেরে হেস্টিংস মহানন্দে পল্লবিত বাগ্‌বিস্তার করলেন এই বলে যে, বিদ্রোহের অবসান হয়েছে। ইংলণ্ডের কর্তাব্যক্তিদের জানালেন তাঁর বলিষ্ঠ পদক্ষেপেই বিদ্রোহ অবসিত, অপসৃত। প্রকৃত পক্ষে হেস্টিংসের এই সাড়ম্বর ঘোষণা ছিল অমূলক, ভাবাবেগ প্রসূত। ১৭৭৪-৭৫ খ্রীস্টাব্দের সময় সীমায় বিদ্রোহীদের তৎপরতা তেমন না থাকলে-ও ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে সন্ন্যাসী ফকিরদের আবার বিদ্রোহ অভিযান সুরু হয় নব উদ্যমে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য হেস্টিংসের জয়গানে মুখর হয়ে তাঁর গ্রন্থে লিখলেন,—'He (হেংস্টিস) was thus able to save the country from the depredations of the Sannyasis, and secure the public revenue which had formerly suffered very much from their ravages, particularly in the northern districts. The suppression of the Sannyasis was an achievement of which the great statesman might well be proud, though it has been scarcely noticed by the historians." ৪৮ ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার এক্ষেত্রে ঠিক হয়নি। তিনি এক পেশে বিচারে নেমে ছিলেন। ইংরেজি নথিপত্র উদ্ধার করেও তিনি এমন লঘু মন্তব্য করলেন। তাঁর কাছে ইংরেজ শাসন 'নব্য ভারতের প্রভাত' বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে হেস্টিংসের উদ্ধত শাসনে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ দমন সম্ভব হয়নি। হেস্টিংসের আবেগ দীপ্ত ঘোষণা নিছক আত্মতৃপ্তি স্বরূপ তার প্রমাণ বিদ্রোহের স্থায়িত্ব। বিদ্রোহের অস্তিত্ব কিঞ্চিদধিক দু'যুগ টিকে ছিল।

এই পর্বে মজনুশাহ ছিলেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বাতাবরণে দীপ্ত। তিনি এগিয়ে নিয়েছেন বিদ্রোহের গতি প্রবাহকে। এ সময়ে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করেছেন, বিভিন্ন স্থানের সংগে যোগ রক্ষা করে চলেছেন। ময়মনসিংহে মজনুর বিস্তৃত কর্মকাণ্ড, শাসক বর্গের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। সেইজন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ পত্র প্রেরণ করে তাঁর অভিপ্রায় জানতে চেয়েছেন; কখন ও বা চরম পত্র পাঠিয়ে দেশত্যাগ করার নির্দেশ ও দিয়েছেন। যখন

কিছুতেই মজনুকে বিরত করা গেলনা, তখন প্রশাসকগণ মজনুকে হাতে নাতে ধরার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলেন। ফলত, মজনু মালদহে সরে গেলেন। সেখানে-ও তাঁর সংগঠন কার্য ব্যাহত হয়। তিনি গা-ঢাকা দিলেন। ইংরেজ প্রশাসন বিভ্রান্ত হলো। গুডল্যাড সাহেব তাই দুঃখ করে এক পত্রে মালদহের রেসিডেন্ট চার্লস গ্রান্ট সাহেবকে জানালেন যে, মজনুকে ধরবার জন্য এনসাইন কোলবিকে পাঠানো হলো বিরাট সৈন্য বাহিনী দিয়ে। মেজর বুকানিনতো আগেই নিয়োজিত হয়েছেন। কিন্তু উভয়েই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন।৪৯

মজনুকে ধরতে না পারার জন্য ইংরেজ সেনাপতি ও কালেকটরগণের ব্যর্থতা ঢাকা দেবার প্রচেষ্টাও আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তিটি এরূপ: ইতিপূর্বে মজনুর অগ্রগতিকে প্রতিহত করা গেছে। অবশ্য তাঁর উৎপাতের জন্য তাঁকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি বটে; তার কারণ জমিদারগণ মজনুর গতিবিধি সম্পর্কে সংবাদ দিতে ভয় পান। মজনুর অনুচরেরা এমন কৌশল আয়ত্ত করেছে যে ইংরেজপক্ষের উপস্থিতি টের পেলেই অদৃশ্য হয়ে যায়। আবার অন্যত্র একটি নির্দিষ্ট স্থানে তারা মিলিত হয়। যার ফলে তাদের পশ্চাদ্ধাবন সম্ভব হয় না।৫০

তবু-ও ইংরেজপক্ষে, মজনুকে প্রতিহত করার চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। ইংরেজ সেনাপতিগণ আরো সতর্ক হয়ে, আরো উন্নত অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছোটো ছোটো দলে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও উত্তর বংগে বিদ্রোহীদের সন্ধানে অগ্রসর হলেন। কিন্তু নির্ভীক পুরুষ মজনুশাহ তাঁর অভিযান বীরদর্পে চালাতে লাগলেন। লুণ্ঠন করলেন ইংরেজ কুঠি, সরকারের রাজস্ব ভাণ্ডার ও জমিদারদের ধনসম্পত্তি। এ সময় মজনুকে বেশ কিছুটা বেগপেতে হয়েছে অভ্যন্তরীণ গোলযোগে। হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিরোধ সৃষ্টি হয়। সম্ভবত ভুলবোঝাবুঝির মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল এই বিরোধ।৫১

১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বরে মজনুর বগুড়ায় অবস্থান ও কার্যাবলীর কিছু কিছু সংবাদ জে. এলিয়ট সাহেবের চিঠি পত্রে মেলে। এতেই জানা যায়, লেঃ ব্রেনান সাহেব মজনুর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন। এমন একটি চিঠিতে বগুড়ার অস্থায়ী কালেকটর জে. এলিয়ট দিনাজপুরের

কালেকটর জর্জ হ্যাচ সাহেবকে লিখলেন,—লেঃ ব্রেনান আজ (৬.১১.১৭৮৬) খবর পাঠিয়েছেন যে তিনি আজই সন্ধ্যায় মজনুর বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযানে তৎপর হবেন। এলিয়ট সাহেবের আশা ছিল, "by which means, I hope, we shall expel him" (মজনু)।৫২ দুই বাহিনীর প্রবল যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে মজনু আহত হলেন। আর এই আহত যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পেলেন না। এতেই তাঁর জীবনাবসান হলো বিহারের মাখনপুর নামে এক পল্লীর গোপন ডেরাতে। এখানে একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক, মজনুশাহের মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে। সুপ্রকাশ রায়ের গ্রন্থে৫৩ মজনুশাহের মৃত্যু তারিখ ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরের শেষদিক বলে নির্দেশ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি যামিনীমোহন ঘোষ মহাশয়ের বিখ্যাত গ্রন্থ "সন্ন্যাসী ফকির রেইডার্স ইন বেঙ্গল"-এর ওপর নির্ভর করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। এর জন্য আমরা দিনাজপুরের কালেকটরের চিঠিটির ওপর নির্ভর করতে পারি। তিনি লিখেছিলেন,— "It is certain that Mujenoo died at Muccunpore......on the 15th of March last." এই চিঠিটি লেখা হয়েছিল ১৯.১২.১৭৮৭ তারিখে।৫৪ এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া চলে যে, ঐ বৎসরের ১৫ই মার্চে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

তিন

যে বৃহৎ কর্মকাণ্ডের নায়ক ছিলেন মজনু শাহ, সে কর্মকাণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটলো মজনুর মৃত্যুর সংগে সংগেই। ফলত, সন্ন্যাসী ফকির বিদ্রোহের শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষিত হতে আর দেরি হলোনা। কারণ, মজনুর সাংগঠনিক শক্তি, দৃঢ়তা, বলিষ্ঠ-অনমনীয় ভাব-প্রকৃতি বিদ্রোহকে প্রদীপন করলে-ও তার দীপ্ত আভায় যোগ্য শিষ্য তৈরি হয়নি; বা হওয়ার সুযোগ ছিলনা। মজনু এমন একজন পুরুষ ছিলেন এবং তাঁর ব্যক্তি প্রভা এতখানি ছড়িয়ে ছিল যে তার পাশে আরেকটি ব্যক্তিক-মানসের প্রকাশ সহজ সাধ্য ছিল না মজনুর প্রভাবে বিদ্রোহের নবলব্ধ প্রত্যয়কে যাঁরা কাজে লাগিয়েছিলেন, তাঁরা হলেন মুশা শাহ, চেরাগআলি, মদরবক্স, রমজানিশাহ, জহুরশাহ, মতিউল্লা, করিমশাহ, নেয়াজুশাহ ও ইমামবক্সশাহ। আবার এ-ও পরিলক্ষিত হয়েছে ভবানীপাঠক ও দেবীচৌধুরাণীর সংগে মজনুশাহের যোগসূত্র ছিল অভিন্ন, অনন্ত।

মজনুর মৃত্যুরপর থেকে সন্ন্যাসী ফকিরদের তৎপরতা দিনাজপুরেই বেশি ছিল। যদি-ও এর দীপ্ত প্রবাহের ঘাটতি ছিলনা রঙপুর, কোচবিহার, আসাম, মালদহ ও পূর্ণিয়াতে। দিনাজপুরের কালেকটর একজন ইংরেজ সৈনাধ্যক্ষকে লিখলেন : মদরবক্স নামে মজনুর এক শিষ্যের উদ্ধত-অভি-যানে সম্প্রতি পাড়ুয়ার জংগল তাঁদের হাতছাড়া হয়েছে। আবার আরেকটি পত্রে তিনি জানালেন,—বিদ্রোহীদের সংখ্যা প্রায় তিন চার শত হবে। তারা দিনাজপুর থেকে পঞ্চাশমাইল দূরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে শিকারপুর অভিমুখে ধাবিত হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করা হোক।৫৫

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, বিদ্রোহীদের শক্তি ও প্রেরণা ছিল স্থানীয় জনসাধারণ। স্থানীয় জনসাধারণ বিদ্রোহীদের সহযোগিতা করেছেন বিভিন্ন অভিযানে। ইংরেজ কালেকটরদের চিঠিপত্রে এসব প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। এমন একটি চিঠিতে৫৬ লেখা হয়েছিল :

> রাণী ভবানীর বরকন্দাজ বাহিনীর সংগে মুশাশাহের অনুচর-দের একটি যুদ্ধ হলো। গ্রামবাসী বিদ্রোহী মুশা-বাহিনীকে সাহায্য করেছে। এতে রাণীর বরকন্দাজ বাহিনী পরাজিত হয়েছে। গ্রামবাসী বিদ্রোহীদের পালিয়ে যেতে-ও সাহায্য করেছে।

অন্য আরেকটিতে,

> জংগীপুর পরগণার জগদীশপুর ও চিমপুরে মুশাশাহকে আক্রমণ করতে বেশ বেগ পেয়েছেন লেঃ ক্রিস্টি। এর কারণ, জনগণ ইংরেজকে কোনোরকম সাহায্য করেনি। তাছাড়া সন্দেহ ও ভয়ের যথেষ্ঠ কারণ আছে যে, জনসাধারণ বিদ্রোহীদের জিনিসপত্র নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়।৫৭

অন্যত্র,

> পত্রটি হেস্টিংসের। তিনি লিখেছিলেন লরেন্স সুলিভানকে। বক্তব্য : এটি আমার ইচ্ছা, –সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালানোর। এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতেকরে বঙ্গদেশ থেকে তাদের উৎখাত সম্ভব হয়। উত্তর-পূর্বে যে

স্থায়ী আবাস তারা গড়ে তুলেছে; সেখান থেকে-ও বিতাড়ন করতে হবে। আর যে সব জমিদারগণ সন্ন্যাসীদের আশ্রয় ও সহযোগিতা করেছে; তাদের প্রতি-ও কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে।৫৮

১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের জুনমাস থেকে বাঙলার বিদ্রোহচিত্রের নায়ক ও নায়িকা হিসাবে ভবানীপাঠক ও দেবীচৌধুরাণীর ৫৯ নাম শোনা যায়। ইংরেজদের নথিপত্রে এদেরকে ডাকাত বলা হয়েছে। আবার কোথায়-ও বা ভবানী পাঠককে দুঃসাহসী ব্যক্তি বলা হয়েছে। কতিপয় ব্যবসায়ী ঢাকার কাস্টমস্ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট উইলিয়ম সাহেবের কাছে ভবানীপাঠকের অত্যাচার ও লুণ্ঠন সম্পর্কে নালিশ করলেন। এই অভিযোগ সূত্রে উইলিয়ম সাহেব একটি গ্রেপ্তারী-পরওয়ানা বের করলেন। ভবানীপাঠক ও দেবীচৌধুরাণী এই পরওয়ানার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন। এবং আরো বেশী উন্মত্ত হয়ে উঠলেন শাসকদের ওপর। লুণ্ঠন করলেন ইংরেজদের পণ্যসম্ভার।৬০ তাঁরা ইংরেজদের শাসকবলে মানেন না, স্বীকার-ও করেন না। ফলত, যুদ্ধ সংঘটিত হয় দু'পক্ষে। লে: ব্রেনান এলেন সমর বাহিনী নিয়ে। জলযুদ্ধ সুরু হলো। এতে পাঠকের বাহিনী বিপর্যস্ত হলো। পাঠক নিহত হলেন। অনেকেই আহত অবস্থায় বন্দী হলো। সম্ভবত এই জল যুদ্ধে দেবীচৌধুরাণী ছিলেন না, বা থাকলে-ও পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন। অবশ্য এর-পরেও কোম্পানীর নথি পত্রে দেবীচৌধুরাণীর আক্রমণের কথা উল্লেখ আছে।

মোটকথা, শাসক বর্গের শোষণ-পীড়নের প্রতি প্রত্যাঘাত করাই হলো বিদ্রোহ। আর লুণ্ঠন ছিল বিদ্রোহীমানসের ক্রিয়া-প্রক্রিয়া! অথবা বলা যেতে পারে সমকালীন বাঙলার প্রকাশ ভঙ্গি।

এর পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। এ সময়ে ময়মনসিংহের বিভিন্ন পরগণায় বিদ্রোহীদের আক্রমণে ইংরেজ শাসক ও জমিদারগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। আবার এ সময় নেতৃত্ব নিয়ে-ও বিদ্রোহীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এমন একটি দ্বন্দ্বে ফেরাগুলের হাতে মজনুর যোগ্যতম শিষ্য মুশাশাহ নিহত হলেন (১৭৯২, মার্চ)।৬১ মজনুর মৃত্যুর পর যেটুকু শক্তি দিয়ে বিদ্রোহকে অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছিলেন, মুশাশাহ;—সে শক্তির

ও নিতান্তই অভাব হলো তাঁর মৃত্যুতে। এ সময়ে বিহারে শোভানআলি ও বাংলাদেশে চেরাগ আলি বিদ্রোহের আদর্শকে ধরে রাখার যথার্থ চেষ্টা করলেন বটে; তবে যে অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁরা বিক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন, তা থেকে তাঁরা নিস্তার পেলেন না। মতিগীর নামে এক আততায়ীর ছুরির আঘাতে চেরাগ আলি প্রাণ হারালেন। তখন নেতা রইলেন বাকি এক,—শোভান আলি। এ সময় কয়েকজন বিদ্রোহী নেতা বন্দী হলেন ইংরেজের হাতে। তার ফলে বিদ্রোহীদের অনেক গোপন তথ্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।

১৭৯৭ থেকে ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে শোভান আলি ও আমুদি শাহের নেতৃত্বে কয়েকটি ছোটোখাটো আক্রমণ চালানো হয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। অবশ্য সে সব আক্রমণের তীব্রতা ও ব্যাপকতা কোনোটাই ছিল না। ইংরেজশাসকগণ শোভান আলিকে ধরার জন্য জালপাতলেন: পুরস্কার ঘোষণা করলেন. বিদ্রোহী নেতার সংবাদ দিলে চার সহস্র মুদ্রা দেওয়া হবে।৬২

এর পর আরো একবৎসর ছাইচাপা আগুনের মত বিদ্রোহের আভা-প্রভা ছিল বটে নেয়াজুশাহ, বুদ্ধ্ শাহ ও ইমামবাড়িশাহের নেতৃত্বে।৬৩ কিন্তু তা ছিল নিভান্তই নিভন্ত আগুন!

খ. সাহিত্যপর্ব

১ গাথা সাহিত্য...

বাংলার এক যুগসন্ধিক্ষণে আলোচ্য গাথাকাব্য ধারার সূচনা হয়েছিল। নবাবী আমলের পতন ও কোম্পানী-শাসনের আরম্ভকাল হচ্ছে এর পটভূমি। কোম্পানী-আমলে সেই সর্বব্যাপী ভাঙনের যুগে নিশ্চয়তার অভাবে মানুষ যখন পীড়িত, —তখন সেই বিকার ভাবের আবেগে পরিব্যাপ্ত হলো। হয়তো মুক্তিসাধনার উপায় হিসাবেই। এর-ও অবশ্য কারণ ছিল : তত্ত্বগত। কেননা, ভাবের ভিতর ও বাহিরে বাঙালী দুরন্ত দুর্বার। সে ভাব অনুভূতির গভীরতায়, হৃদয়াকৃতির তীব্রতায় প্রকাশের অনায়াস সারল্যে স্বতোৎসারিত। এটা সম্ভব হয়েছে প্রাণের নিবিড় টান ও গভীরমমতায়। ফলে বাঙালীর জীবন বোধ, জীবন দৃষ্টি সজীব প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে আপন মহিমায়। তাই মানুষ আপন প্রয়োজনে ভাবের আবেগে রচনা করেছে কাব্য-গীত, ছড়া ও গাথা। মনের ভাবকে সে ফুটিয়ে তুলেছে কথা আর গান মাধুর্যে। এইসব তাগিদের মূলে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মনেতিক ও অর্থনৈতিকতার কারণ-ও বটে। এখানে আমরা রাজনৈতিক কারণটুকু জেনে নেবার চেষ্টা করবো মাত্র। আর সে কারণ থেকে বাঙালী ভাব চেতনা সমন্বিত যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তার মূল্যায়নে আমরা তৎপর হবো।

সমাজ জীবনের নানা আন্দোলন, প্রভাব, ভাব জগতের উত্থানপতন গাথারূপ পেয়েছে। আবার স্থানীয় কোনো ঘটনা অনেক সময়ই গাথা রূপ লাভ করেছে। আঠারো শতকের গ্রাম্য কবিগণ বিভিন্ন সময়ে ঐতি-

হাসিক ছোটো বড়ো ঘটনা, কাহিনী নিয়ে গাথা রচনা করে ছিলেন। সেইসব গাথা অবশ্য ধারাবাহিক ইতিহাস নয় কিংবা ঐতিহাসিক সততা ও সত্যতা তাতে রক্ষিত হয়নি; কিন্তু এতে ঘটনার যে সমাবেশ ও বিস্তৃত বিবরণ থাকে তার সবটুকু মিথ্যা বা কবিকল্পনায় রঞ্জিত নয়। গভীর তত্ত্বকথায় পৌঁছুলেই ইতিহাসের মূল সুর খুঁজে পাওয়া যায় না, কিংবা ইতিহাসের ব্যক্তি ও দৃশ্যপট একেবারেই চেনা যায় না; তা-ও নয়। গ্রামের কবি অতি সহজ সরল আন্তরিকতায়, প্রাণের নিবিড়টানে সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনাকে যে চোখে যেমনভাবে দেখেছেন; বা যে ছবি তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, তাকেই পদ্য-বন্ধ করেছেন। কারণ কবি জানতেন, গ্রামের মানুষের কাছে ছন্দোবদ্ধ কবিতা, কাহিনীকাব্য, পাঁচালি ও ছড়ার আবেদন অনেক বেশী। নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ পাঠ করে রসাস্বাদন করতে পারবেন না এবং তার সুযোগ-ও কম। ফলত, কবিতাব পাঠকের চেয়ে তাঁর শ্রোতার সংখ্যাই ছিল প্রচুর। তাই হয়তো কবি নিজেই কিংবা গ্রামের কোনো কবিয়াল গায়েন গাথায় সুর দিতেন, সৃষ্টি হতো গাথা-গান।

এখানে গাথাকাব্যের মূল সূত্র বের করবার অবকাশ কম। তবু-ও গাথা কবিতা সম্পর্কে একটু প্রাসংগিক আলোচনা করবো। কারণ, আমাদের অনুমান, গাথা সাহিত্যের মধ্যে অষ্টাদশ শতকের মধ্য-পর্বের রাজনৈতিক ইতিহাসের চিত্র-বিচিত্র ধরা পড়েছে।

তাহলে, গাথার স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য কি? ইভ্লিন কেন ভ্রিকওয়েলস্ তাঁর 'দি ব্যালাড্ ট্রি' নামক গ্রন্থে ৬৪ বলেছেন: গাথা কবিতার স্থিতি বিষয়বস্তু এবং ভংগির ওপর নির্ভর করে না, কিন্তু সুরের ওপর নির্ভরশীল। গাথা কবিতা মৌখিক-প্রচার নির্ভর। পাশ্চাত্য সমালোচক রবার্ট গ্রেভ্স বলেছেন; ৬৫—

১। গাথা-কবিতা-রচয়িতার সঠিক নাম জানা যায় না।

২। গাথা-কবিতার যথার্থ কোনো বই থাকেনা।

৩। সংগীত ভিন্ন গাথা কাব্য অসম্পূর্ণ, এর সংগীতে থাকে পুনরাবৃত্তির গঠন-বৈশিষ্ট্য।

৪। গাথা-কবিতা স্থানিক, কৃষ্টিসম্পন্ন নয়, মৌখিক কিন্তু সাহিত্যিক বিষয়ক-ও নয়।

৫। এই সব গাথা কাব্যগুণেও উন্নত নয়।

এম. জে. সি হোজার্ট জানিয়েছেন ৬৬— গাথা কবিতাগুলি যত সহজে চেনা যায়, তত সহজে এদের সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায় না। গাথা কবিতাগুলি যেমন রচয়িতার পরিচায়ক নয়, তেমনি এইসব কোনো ব্যক্তি বিশেষের-ও নয়। অধিকাংশ গাথারই কোনো নির্ভর যোগ্য উৎস নেই। আরেকজন পাশ্চাত্য সমালোচক টি. এফ হাণ্ডারসনের মতামত এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তিনি বলেছেন : লেখার চলন হওয়ার সংগে সংগে গাথা কবিতাগুলি ব্যক্তি বিশেষের পাঠ ও জন সাধারণের শুনবার আগ্রহে এর গঠন-শৈলীর রূপ পরিবর্তিত হয়েছে।৬৭ প্রাগুক্ত মতামতের ভিত্তিতে একজন গবেষক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তার কয়েকটি হলো এই : "মৌখিক কাহিনীমূলক গীতি কাব্যকে গাথাকাব্য নামে অভিহিত করা যায়।" "কবিতা ও গান গাথাকাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ হইলেও কাহিনী অংশই প্রধান।" এবং "গাথা কাব্য গ্রাম্য-জনসাধারণের সাহিত্য, ইহা আমাদের সম্মুখে গ্রামের চিত্র তুলিয়া ধরে" ; ইত্যাদি।৬৮

গাথা সম্পর্কে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকাতে বলা হয়েছে : The ballad is a short narrative folk song..." ৬৯ এর মৌখিক রূপ সম্পর্কে এতে বলা হয়েছে "Since ballads thrive among unlettered people and are freshly created from memory at each performance, they are subject to constant variation in both text and tune."৭০ আবার যেমন অন্যত্র ;— "The ballad tells a dramatic story, focusing on a single situation. The story is compact and presented mainly by dialogue ; it omits exposition, description, transitions, and editing. Its structure has been described as "Leaping and Lingering"...৭১

সুতরাং গাথার স্বরূপ বুঝতে যে সহায়ক দিকগুলির প্রতি লক্ষ রাখতে হবে ; তা হলো এই :

১। গাথার মৌখিক রূপ,

২। গীতিরূপ—সুরের ব্যঞ্জনা।

৩। আখ্যান অংশ কাহিনীমূলক। সামাজিক, ধর্মনৈতিক কিংবা উদ্বেলিত যুগ সমস্যার আধারে রচিত হতে পারে।

৪। গাথা স্থানগত। স্থানীয় চিন্তা প্রসূত রচনা।

৫। যেহেতু রচয়িতা গ্রামের কোনো নিরক্ষর ব্যক্তি-ও হতে পারেন, তাই সাহিত্যের দুর্লভগুণ এতে সর্বদা থাকেনা বটে ; তবু-ও অনেক সময়ই গাথা রসপুষ্ট হয়ে ওঠে।

৬। গাথায় থাকে উপভাষা। মিশ্রভাষারীতি এবং অসম পয়ার ছন্দ।

এক

উপরি উক্ত সূত্র ধরে আমরা আলোচনায় অগ্রসর হবো, কেমন করে দেশের বহু ঘটনা নিয়ে সাহিত্য ;—গাথা সাহিত্য রচিত হয়েছে। তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। অবশ্য, আলোচ্য গাথা-কবিতা সবই আঠারোশতকের বাঙলা দেশের সমাজ বিবর্তনের ধারা বুঝবার সহায়ক হবে। এতে যুগোচিত প্রাণ স্পন্দন না থাকলে-ও এমন উপকরণ পাওয়া যাবে, তাতে সমকালীন সংকটের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হতে পারে অনায়াসেই।

যেমন ঃ

শুন শুন সর্ব্বজন একমন হঞা।
রুক্কিণী যখন আইল জাঙ্গার বাহিআ।
চণ্ডালগড় হৈতে, চণ্ডালগড় হৈতে,
যেন মতে হিষ্টিনী হারিল।
চৈতন্য সিংহ মহারাজ জানে সর্ব্বজন,
চলিলা তার সনেতে, চলিলা তার সনেতে,
রণ করিতে হিষ্টিনী হারিল।

দেখ রঙ্গ দিল ভঙ্গ দেখ সব লুটিল॥

পালাল প্রাণ লইআ, পালাল প্রাণ লইআ,
সব ছাড়িআ কলিকাতা পঁহুছিল।
আট্‌কোচনের সাহেব মেলি, আট্‌কোচনের সাহেব মেলি
রুক্কিণী কহিল।

যুক্তিসার করিআ, যুক্তিসার করিআ,
হুকুম পেয়ে নিল টাকা কড়ি।
সিফাই সঙ্গে কত রঙ্গে গেল তড়াবড়ি ॥

ফের চণ্ডালগড়ে থানা, ফের চণ্ডালগড়ে থানা
কথো জনা ধরিতে বেগারি।
পোহিল্যা মকসুদ্ করি, পোহিল্যা মক্সুদ করি,
রশি ধরি কৈল মহাজারি ॥
শঙ্কা সর্ব্বলোকে, শঙ্কাসর্ব্বলোকে
পূর্ব্বমুখে বান্ধিআ চলিল।
যেন সীতা হেতু সাগর শ্রীরাম বান্ধিল ॥
লঙ্কা জয় করিতে, লঙ্কা জয় করিতে,
জয়ঢাকেতে বাদ্য বাজে ভাল।
সিফাই সঙ্গে কত রঙ্গে মূর্ত্তি লালে লাল ॥

শেষে,

আইল কোতুল পুরে, আইল কোতুল পুরে,
ডঙ্কামেরে শঙ্কা বড় হৈল।
সেখানে ছেড়্যা তড়াবড়ি[১] খাটুল পঁহুছিল।
ছামুতে[২] যাহা পড়ে, ছামুতে যাহা পড়ে,
কাটে ছিঁড়ে গাছ পাথর আদি।
দেবতা পেলে ছুঁড়ে ফেলে পঞ্চানন আদি ॥
গায়ে তার হাথ দিআ গায়ে তার হাথ দিআ,
উপাড়িয়া শিবকে পেলিল।
কত গ্রাম নিব নাম পশ্চাৎ করিল ॥

হরিপাল বামে থুআ, হরিপাল বামে থুআ,
পাছু হুআ ভুরশুট্ পরগণা।

১. তড়াবড়ি=তাড়াতাড়ি
২. ছামুতে =সম্মুখে

শ্রীব্রগেল কাটুরাজুলা ধারে দিল তার থানা ॥
সেখানে বান্ধিল বড়, সেখানে বান্ধিল বড়,
কোরে দড় সাঁথারি খাটাঞা।
মাঠে মাঠে শালিখাঘাটে উত্তরিল গিঞা ॥

আড়পার কলিকাতাতে আড়পার কলিকাতাতে,
নৌকা পথে গঙ্গা পার হল্য।
সহর গিঞা হুজুর হঞা কুর্ণিশ করিল ॥
শুনি সাহেব হর্ষ হল, শুনি সাহেব হর্ষ হল,
পাঠাইল বহু সেনাগণ।
শ্রীগুরু ভাবিঞা কহে মদন মোহন ॥
মেদিনীপুরে স্থিতি, মেদিনীপুরে স্থিতি
হল্য ইতি রাস্তার কবিতা।
হরি হরি বল সভে ঘুচিবে ভব চিন্তা ॥৭২

এটি একটি ঐতিহাসিক গাথা। মেদিনীপুর নিবাসী কবি মদনমোহন রচিত 'রাস্তার কবিতা'। কবি মেদিনীপুরের লৌকিক দেবী রঙ্কিণীর" নাম নিয়ে তাঁর গান সুরু করেছেন। হেস্টিংসের সময় কোম্পানী চণ্ডালগড় হতে শালিখা পর্যন্ত যে দাঁড়া রাস্তা তৈরি করেছিলেন ; এ গাথা গানটিতে তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু কবি একথা বলেননি, হেস্টিংসের সংগে মহারাজ চৈতন্ত সিংহের যুদ্ধের হেতু কি! আমাদের অনুমান, বিষ্ণুপুরের মহারাজা কোম্পানীর আনুগত্য স্বীকার করতে চাননি। এর ফলে হেস্টিংস যুদ্ধ-উদ্দেশ্যে সৈন্তসামন্ত নিয়ে এলেন, পরাজিত-ও হলেন। পরাজয়ের একমাত্র কারণ হলো সুপথের অভাব—একথা হেস্টিংস ভাবলেন বটে। তাই আত্মগ্লানি সূচক অনুভবের জন্তই হেস্টিংস কোম্পানীকে হুকুম দিলেন পথ তৈরির। যে পথে তিনি আবার সৈন্ত নিয়ে অগ্রসর হতে পারবেন সহজ ভাবে।

মদনমোহনের রচিত গাথাটি নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত "ঐতিহাসিক চিত্র গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড"—তে প্রকাশিত। গাথাটি [illegible] চীন বাংলা পুথি থেকে সংগৃহীত হয়েছে।
[illegible]

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে এটি প্রকাশিত হয়। তখন পুথিটিকে শতাধিক বর্ষের পুরনো বলা হয়েছে। তাই, আঠারো শতকের শেষার্ধে এটি রচিত বলে অনুমান করা যায়।৭৩ দীনেশচন্দ্র সেন এই গাথাটির রচনাকাল নির্দেশ করেছেন ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ।৭৪ এই কাহিনী নিয়ে আরো একটি পুথি পাওয়া গেছে। এটির রচয়িতা আবদুলপুর নিবাসী দ্বিজ রাধামোহন। এর লিপিকাল ১২৭০ সাল।৭৫

অন্যত্র,

রাস্তাতৈরির কাহিনী নিয়ে "অথ গোরার কবিতা" নামে একটি কাহিনী কাব্য রচিত হয়েছে। এর রচয়িতা দ্বিজদ্বারকানাথ।৭৬ গাথাটি রচিত হয় ১২৮০ সালে। কবিতাটির পটভূমি ছদ্ম-ঐতিহাসিক। ১১৭৬ সালের মন্বন্তর, দানবীয় বীভৎসতায় বাংলার ওপর নির্মম অভিঘাত হানল; আর তার ফলেই বাংলার ঘনবসতি পূর্ণ বীরভূম, মেদিনীপুর ও বিষ্ণুপুর প্রভৃতির অনেক স্থানই শ্মশানে পরিণত হয়েছিল। এসব অঞ্চল ঘনজংগলে পরিণত হলো। বন্যজন্তুর উপদ্রব বাড়লো।

"বীরভূমের ঐতিহাসিক রাজপথও তার আশে পাশের গ্রাম তখনও অধিকাংশ জংগলাকীর্ণ ছিল। বিধ্বস্ত গ্রাম্য-সমাজ ও তখন আবার নতুন করে গড়ে ওঠেনি, কারণ তার বনিয়াদটাই ইংরেজরা চূর্ণ করে দিয়েছিলেন।" রাজপথের এই অবস্থা হওয়ায় ইংরেজ ফৌজেরই অসুবিধা হলো বেশি। অনতিক্রমণীয় পথকে সুগম করার কাজে লাগলো গোরা সৈন্যরা। এতে গ্রামবাসীদের-ও ডাক পড়ে বেগার খাটবার জন্য, কারণ "রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে হবে জঙ্গল হাসিল করতে হবে, খাবার দাবার যোগাতে হবে। এককথায় গোরাফৌজের যাত্রাপথ সুগমতো করতেই হবে, তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের যাবতীয় উপকরণ ও অভুক্ত ও অর্ধভুক্ত গ্রামবাসীদের সরবরাহ করতে হবে।" ৭৭ এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে কবি গান বেঁধেছেন। কবি রঙ্গ-রসে শোনাতে চাইলেন;—

শুন সবে একভাবে বিপত্তের কাজ
জেনমতে লড়াইদিতে সাজিল ইংরাজ।
থাকে সব বরমপুর ফোদ১ জুড়ে কি দিব তুলনা
একএক গোরার পেছু সেপাই তিনজনা।

১ বহরমপুরের ফোর্ট

হঠাৎ একদিন,

জাবে সব পছিমেতে আচম্বিতে আইল পরয়ানা।
জমিদার লোক সুনে করিছে ভাবনা।
তারিখ সন ১২২১ সালে অর্দ্ধেক পৌষমাস
আচম্বিতে সুনে লোকের লাগিল তরাস।
সাহেব ডেকে বলে রেয়ত লোকে সাবধান তোমরা
এই রাস্তা দিয়ে জাবে সব বাদসাই গোরা।

তখন ভীতসন্ত্রস্তগ্রামবাসী—

বলে ভাই পড়ল দায়, হায় হায়, রৈইতে নারি ঘরে
গরু জরু সকল লয়ে পালাও দেশান্তরে।
পালায় সব কলু মালি তিলি তামলী মনে পেয়ে ভয়
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য কপাট দিয়ে রয়।

সাবধানতা সত্ত্বে-ও

জমিদার গ্রামে গ্রামে পেয়াদালয়ে আনে মণ্ডল ধরি
খাবার ঘোরদানা দাও বেট১ আর বেগারি।...
বলদের ঘোরদানা চাই আনা আউর পোয়ালা লাডা২
জিনিষ দিতে কুন কাজে ওজর না করিহ তোমরা।

সৈন্যদের বিবিধ প্রয়োজন মেটাতে গ্রামবাসী অস্থির। আপত্তি করার সামর্থ্য নেই। কারনটি জটিল।

ইজারাদার কৈছে তারে মাছের তরে ঘনলাড়ি মাথা
কেওট৩ বলে এত জাড়েও৪ মাছ পাব কোথা ?

১· ভেট>বেট

২. ধান পেটানোর পর খড়ের যে আটি হয় তা আউড়।
ধান গাছের অগ্রভাগ কেটে গরু দিয়ে ধান-মারার পর যে খড় বেরোয় তা পোয়াল বা পোয়ালা।
ধান গাছের অগ্রভাগ কেটে নেওয়ার পর যে অংশটি থাকে তাকে নাড়া বা লাড়া বলে।

৩. কেওট=জেলে

৪. জাড়ে =শীতে

শুনে উঠলো রেগে, যাছের লেগে রাখ বেটাকে ধরে
দেখে দাপ্১ বলে বাপ, জালে লাগল গিয়ে।

কবির কৌতুক :

বৈরাগী কৈছে দেখ নবদ্বীপে হয়েছিল যে গোরা
নিস্তার করিল জীব শচীর কিশোরা।
দিয়ে হরিনাম কৈল ত্রাণ গৌরচন্দ্র রায়
এবে বিলাতী গোরার হাতে পাছে প্রাণ যায়।

গোরা ফৌজের উদ্ধত যাত্রা ও নিষ্ঠুর আচরণ সুরু হয়েছে বহরমপুর থেকেই। এই ভাবে তারা এগিয়ে এসেছে বীরভূমের দিকে। সিউড়িতে এসে যখন তারা তাঁবু ফেল্‌লো, তখন গ্রামবাসীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

বিষম ফোজের লেঠা
দুয়ারে দুয়ারে দিল সেঁয়াকুলের কাঁটা
তখন ফৌজ সিউড়ী গ্রামে সর্বজনে পড়িল ঘোষণা
নফর চাকর বেট বেগারি পড়িল তাম্বুখানা।
আগাড়ীর ফৌজ সকল রয় শ্রীকৃষ্ণনগরে
বীণা বাঁশী যন্ত্ররাশি আসিয়েছে ভারে ভারে।

বাজিছে জগঝম্প মহিকম্প বাদ্যের বাখান২
দুইভিতে দুইছড়ি হাতে ফিরিছে কাপ্তান।
যতসব ফোজের গুলি কহেশুনি কিছু-মাত্র সীমা
ফোজ দেখিতে শোক পেয়েছে কুখুটার নিমা।
কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে কুখুটাতে যাহার নিবাস
ফোজের কবিতা কৈল হইয়া উল্লাস ॥ ৭৮

আরেকটি ঘটনা,—ঘটেছিল রঙপুরে। ১১৯০ সাল। এসময়ে রঙপুরের কালেকটর ছিলেন গুডল্যাড সাহেব। তাঁর অন্যায় ও অবিচারে যে জনশক্তির জাগরণ হয়েছিল;—তা রাজনৈতিক কারনেই ঐতিহাসিক। রঙপুরের

১. দর্প>দপ্প>দাপ্

২. বাখান—ব্যাখ্যান্। বাঁকুড়া জেলায় গালি অর্থেও ব্যবহৃত হয়

রাজা, বর্ধনকুটিরের ন' আনা অংশের জমিদার সীতারাম রায়কে দেওয়ান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সঙ্গে কোম্পানীর অনুমোদনের জন্য একটি চিঠি পাঠালেন কলকাতায়। কিন্তু গুডল্যাড সাহেব অন্যকথা বলেন। তিনি তাঁর প্রিয়পাত্র রামবল্লভকে ঐ পদে বহাল করতে চাইলেন। রাজা সাহেবকে রুষ্ট করলেন না, আবার নিজে-ও সন্তুষ্ট হলেন না। রামবল্লভ দেওয়ান হলেন বটে। কিন্তু চতুরও দুষ্ট রামবল্লভের চক্রান্ত সুরু হলো। রাজার মহল কিনে নিতে তাঁর গুহাশ্রিত কামনা সত্যতর হয়ে ওঠে। বিষয়টি রাজা-ও টের পেলেন। তখন বিমূঢ় রাজা ঘটনাটি প্রজাদের গোচরে আনলেন। প্রজারা উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা গুডল্যাড সাহেবের নিকট রামবল্লভের পদচ্যুতি দাবি করলেন। বিক্ষুব্ধ গণচিত্তের বেদনা, জনমানসের হৃদয় জ্বালা ও বিদ্রোহ, কবি অনুভব করেন। তাই 'গণশক্তির দাবি' প্রতিষ্ঠিত হলো। কবির উপলব্ধি : প্রজার চাপে সাহেবের মৃদু-বিষণ্ণতা—

শুন শুন রামবল্লভ রায়
রায়তে না ছাড়ে পিছু কি করি উপায়।

রামবল্লভের মোহ ভঙ্গ হয়েছে। তাই মিত ভাষণটি সহজ ও সুন্দর।

দেওয়ান বলে রায়ত সব করতে পারে
কাকে ও স্বর্গে তোলে কাকে আছাড় মারে।
রায়ত লইয়া সবার ঠাকুরালী
যত দেখ সোনার বালা রায়তের কড়ি।

অসহ্য চিত্ত-দাহ থেকে মুক্তি পেতে—

সাহেব বলে আজ হতে দেওয়ান খারিজ হইল
শুনিয়া সকল প্রজা স্বর্গ হাতে পাইল।

প্রজাগণ স্বভাবতই আনন্দিত হলেন। তাই,

মহাশব্দ করি সবে ঝাকি দিয়া কয়
জীয়া থাক সাহেব তোমার বিবির হউক জয়!

কবির ভণিতা—

নয় আনার কবি কহে পাঁচালি মধুর
কৃষ্ণ হরিদাস ভণে বাস মহীপুর।
কৃষ্ণ হরিদাস ভণে ভাহের মামুদ লেখে
সবে মিলি জয় জয় দিয়া আল্লাবল মুখে।৭৯

শেষ পংক্তি হতে আমরা জানলাম যে, গাথাটি রচনা করেছিলেন কৃষ্ণ হরি দাস, আর লিপিকার ছিলেন তাহের মামুদ। এই গাথাটিতে যে ইতিহাস উপস্থাপিত, তাতে আঠারোশতকের বাঙলার বিদ্রোহী জনমানসের পরিচয় মেলে। আমরা ইতিহাস পর্বে জেনেছি, আঠারো শতকের উত্তর বাঙলা কত বিক্ষুব্ধ ছিল; আর সে বিক্ষুব্ধতার ভাবতরঙ্গ কোন্ খাদে কতটা বয়ে চলেছিল। অবশ্য উত্তর বাংলার সামগ্রিক অধ্যয়ন সম্ভব হবে,—উত্তর বাঙলার প্রজা বিদ্রোহ ও বাঙালী মানস; এই সূত্রে। যাই-হোক আঠারোশতকের সামাজিক, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও বিশৃঙ্খলার দিনে গ্রাম্য কবি গাথা রচনা করেছেন। সমকালীন ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় রসপুষ্ট তাঁর কবিতা। এতে গীতি প্রাণতা নেই সত্য। কিন্তু তাঁর কবিতা তথ্যমূলক, সমকাল কৌতূহলী, সামাজিক বিষয় প্রধান-ও হয়ে উঠেছে।

পুনশ্চ,

গুডল্যাড সাহেবের অনুগ্রহ ও প্রশ্রয়ে কোম্পানীর ইজারাদার রাজা দেবী সিংহ নির্মম অত্যাচার করেছিলেন রঙপুরে। তাঁর অত্যাচারে অসংখ্য প্রজা গৃহহারা হয়েছেন। কোম্পানী-আমলের সূচনায় দেবীসিংহের অত্যাচার-ও যে, ছিয়াত্তর মন্বন্তরের পথ প্রশস্ত করেছিল; তা ইতিহাস স্মরণ করবে নিরবধি। শোষক দেবীসিংহের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন রতিরাম দাস,—তা অনবদ্য। রতিরাম দাস জাগের গানে সমকালীন ঘটনাকে সংবদ্ধ করেছেন।

রঙপুর, ধুবড়ী, কুচবিহার এবং জলপাইগুড়ি প্রভৃতি অঞ্চলে চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে কামদেবের পূজা উপলক্ষে 'জাগ-গান' শোনা যেত। এই সব গান এতই কুরুচি পূর্ণ যে ভদ্রসমাজে গাওয়া হতো না। রতি-রামদাস এরকম একটি জাগ-গানের 'রাস' অংশের মধ্যে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের সম্মিলিত বিদ্রোহ বর্ণনা করেছেন।৮০ এতে বোঝা যায়, "আদিরস অবলম্বনে ধামালী রচনা করিলেও সমসাময়িক রাজনৈতিক এবং সামাজিক দুরবস্থা রাজবংশীর কবির মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল বলিয়াই এই নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর কবি সমসাময়িক এক ঐতিহাসিক ঘটনা জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুণে বীর এবং

রৌদ্র রস সহকারে বর্ণনা করিয়াছেন।"৮১ রতিরাম দাসের জাগগান* থেকে আমরা দেবী সিংহের নিষ্ঠুর কর্ম-নিপুন জীবন ভাষ্যের হদিশ পাই। দীনেশ চন্দ্র সেন কবির পরিচয় প্রসংগে লেখেন "এই কবিতা-রচক রতিরাম রঙ্গপুর জেলায় প্রাচীন ইটা কুমারী গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি 'রাজবংশীয়' ছিলেন" ৮২

রতিরাম দাস আত্ম পরিচয়ে বলেন ;—

পূরব দিকেতে ব্রহ্ম পুত্রের মেশানি।
পশ্চিমে কুশাই গঙ্গা আছয়ে ছড়ানি॥
উত্তরেতে গিরিরাজ দক্ষিণে বাঙ্গালা।
যে দেশে কিরিপাকরে কামাখ্যা মঙ্গলা।
করতোয়া শিবের বিভার হস্ত-জল।
মধ্যদিয়া বয়া যায় করি টল টল॥
করতোয়ার তীরে আছে শীলা দেবীর ঘাট।
পরশুরামেরআছে সেখানেতে পাঠ॥
পৌষমাসে হয় যদি নারায়নী যোগ।
শতেক যোজন হৈতে আইসে কত লোক॥

এই সীমার মাঝে দেশ পোণ-দুয়ার খিতি১।
এদেশে আমাদের জাতির বসতি॥
হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম।
পরশু রামের ভয় এবড় সরম॥
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এদেশে আইসাছি।
ভঙ্গ-ক্ষত্রী রাজবংশী এইনামে আছি॥

আবার রঙপুরের ঘোড়া ঘাটের মাহাত্ম্য প্রসংগে কবি বলেন ঃ

এই দেশে ঘোড়াঘাট রঙ্গপুর জেলা।
যে জেলা করিছে বঙ্গ দেশের উজলা॥

১. পোণ-দুয়ার—পুণ্যতোয়ার। খিতি—ক্ষিতি

কবির অভিযোগ,—

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বারচিং ॥
যেমন যে দেবতার মূরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন ॥
রাজার পাপেতে হৈল মুলুকে আকাল।
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী মারা গেল ॥

দেবী সিংহ খাজনা আদায়ের জন্য যে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিলেন; তা কবির দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি বলেছেন:

কত যে খাজনা পাইবে তার লেখা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই ॥
দেও দেও যাইযাই একমাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥

নিদ'য় দেবীসিংহের নিকট—

মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার ॥
সোয়ারিত চড়িয়া যায় পাইকে মারে জুতা।
দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোঁতা ॥

দেবীসিংহের অত্যাচারে—

পারে না যাটায় চলতে ঝিউরী বউরী।
দেবীসিংহের লোক নেয় তাকে জোড় করি ॥
পূর্ণ কলি-অবতার দেবীসিংহ রাজা।
দেবীসিং-এর উপদ্রবে প্রজা ভাজাভাজা ॥

দেবীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানুষটি হলেন,—

রাজা রায়ের পুত্র হয় শিবচন্দ্র রায়।
শিবের সমান বলি সর্ব্বলোকে গায় ॥
টটাকুমারীতে তার আছে রাজবাটী।
দেখিতেপ্রকাণ্ড বড় অতি পরিপাটী ॥

কত ঘর কত দুয়ার কত যে আঙ্গিনা।
তার সনে কোন বাড়ীর তুলনা লাগেনা॥
বড়ঘর চণ্ডীমণ্ডপ টুই[১] অতি উঁচা।
দুইচালে ঘরখানি কোণাগুলি নীচা॥
পশ্চিম-দুয়ারী মণ্ডপ আর কোন খানে নাই।
এ ঘর হোতে যে ঘর হইচে সেটেও দেখবার পাই॥
কত পাইক পেয়াদা আছে আছে কত দারোয়ান।
কত যে আমলা আছে কত দেওয়ান॥
মন্ত্রণার কর্ত্রী জয়দুর্গা ঠাকুরাণী।
বড়বুদ্ধি বড়তেজ সকলে বাখানি॥
শিবচন্দ্রের কার্য-কর্ম তাঁর বুদ্ধি নিয়া।
তার বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করে সকল দুনিয়া॥
আকালে দুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা।
মারিধরি লুট করে বদমাংস পাকা॥
শিবচন্দ্রের হৃদে এইসব দুখ্খ বাজে।
জয়দুর্গার আজ্ঞায় শিবচন্দ্র সাজে॥
দেবীসিংহের দরবারে শিবচন্দ্র গেল।
প্রজার দুখ্খের কথা কহিতে লাগিল॥

দেবীসিংহ ফুঁসে উঠলেন। কবির কটাক্ষ :—

রজপুত কালাভূত দেবীসিং হয়।
চেহারায় মৈষাসুর হইল পরাজয়॥
গুনিচক্ষু কট্‌মট লাল হৈল রাগে।
কোন্ হায় কোন্ হায় বলি দেবী হাঁকে॥
শিবচন্দ্রকে কয়েদ করে দিয়া পায়ে বেড়ি।
শিবচন্দ্র রাজা থাকে কয়েদ খানাত পড়ি॥
দেওয়ান শুনিয়া তবে অনেক টাকা দিয়া।
ইটাকুমারীতে আনে শিবে উদ্ধারিয়া॥

---
১. টুই=চালের উপরিভাগ

বৈদ্য-বংশ-চন্দ্র শিবচন্দ্র মহাশয়।
দেবীসিংহের অত্যাচার আর নাহি সয়।।

রাজার মনে যে প্রতিবিধানের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে তা দমিত হবার নয়। রাজার মনের আন্তরিক সহানুভূতি, বাস্তবদৃষ্টি, বলিষ্ঠ চিত্ত-ধাতু এসবই কবির নিপুণ তুলিকায় স্পষ্ট আভাসিত।

রঙ্গপুরে আছিল যতেক জমিদার।
সবারে লিখল পত্র সেঠ্‌টে১ আসিবার।।
নিজ এলাকার আর ভিন্ন এলাকার।
সকল প্রজাক ডাকে রোকা২ দিয়া তার।।
হাতী ঘোড়া বরকন্দাজে ইটাকুমারী ভরে।
সব জমিদার আইসে শিবচন্দ্রের ঘরে।।
পীরগাছার কর্ত্রী আইল জয়দুর্গা দেবী।
রূপমোহনেতে বৈসে একে একে সবি।।
রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া।
হাতঘুড়ি চক্ষু-জলে বক্ষভাসাইয়া।।
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস।।

রাজার সহৃদয়-নিবেদন হলো এই:

শিবচন্দ্র খাড়া হইয়া কয় হাত যোড়ে।
রাগেতে কহিতে কথা চক্ষে জল পড়ে।।
প্রজাদের দেখাইয়া জমিদারগণে।
এ দেয় দুক্ষ না ভাবিয়া অন্নখান কেনে।।
উত্তর হতে জল আসিয়া বড় লাগে বাণ।
সেই বাণে খায়া ফেলায় যত কিছু ধান।।
কতদিন কতকষ্টে কতটাকা দিয়া।
ক্যায়োয়ার মুখে আমি দিয়াছি বান্ধিয়া।।

১. সেঠ্‌টে=সেখানে
২. রোকা: আরবী 'রুক্ক' শব্দজাত; 'চিঠি' অর্থে ব্যবহৃত।

রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ায়১ নাই জল।
মাঠে ধান জলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল ॥
বচ্ছরে বচ্ছরে এলা২ হইতেছে আকাল।
চালে নাই খেড় কারো ঘরে নাই চাল ॥
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া।
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাই কারো মায়া ॥

এখানে 'রাজার পাপে' বলতে কবি দেবীসিংহকে আক্রমণ করেছেন। কারণ, দেবীসিংহের নীতিবোধ নেই, ধর্ম বিশ্বাস-ও কিছু ছিল না। আচার-আচরণে-ও ব্যতিক্রম। মানবতার সদ্‌গুণের অভাব তাঁর মধ্যে। অর্থ পিশাচ, নীতিহীন এই মানুষটির পাপেই দেশ দুর্ভিক্ষে পীড়িত।

শিবচন্দ্রের বেদনা ও হতাশা,

দুষ্টরাজা দেবীসিংহে বুঝাইতে গেলাম।
আমার পায়ে বেড়ীদিল দেওয়ানের গোলাম ॥
প্রজার অবস্থা দেখি যা করিতে হয়।
কর জমিদারগণ তোমরা মহাশয় ॥
কারোমুখে নাই কথা হেঠমুণ্ডে রয়।
রাগিয়া শিবচন্দ্র রায় পুনরায় কয় ॥
যেমন হারামজাদা বজ্‌পুর ডাকাইত।
খেদাও সর্ব্বায় তাক ঘাড়ে দিয়া হাত ॥
জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই ॥
মাইয়া হয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ্‌৩ তলোয়ারে ॥
করিতে হৈবে না আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলা করিবে সব হইব না নীচু।

১. দেওয়ায়=মেঘে
২. এলা=এখন
৩. পারোঙ=পারা

রাগি কয় শিবচন্দ্র থর থর কাঁপে।
ক্যাণা ধরি উঠে যেমন রাগি গোঁমা সাপে১ ॥

শিবচন্দ্রের পরামর্শ—

শিবচন্দ্র নন্দীকয় শুন প্রজাগণ।
রাজার তোমরা অন্ন তোমরাই ধন॥
রঙ্গপুরে যাও সবে হাজার হাজার।
দেবীসিংহের বাড়ীলুট বাড়ী ভাঙ্গ তার॥
পারিষদ্ বর্গ-সহ তারে ধরি আন।
আপন হস্তেতে তার কাটিয়া দিমো কান।

সে তো পরামর্শ নয়,—আদেশ। প্রজা-ধ্যান-সন্দীপ্ত রাজার তাগিদ। যেখানে হৃদয়বান রাজার আদেশ, সেখানেই প্রজার প্রশান্তি। তাই কর্মের আহ্বানে, আবেগ-দীপ্তিতে ভরে ওঠে সরল প্রজা। এর ফলে জনহিতব্রতী রাজার বেদনাপিষ্ট জিজ্ঞাসার উত্তরে, কবি বলেন ঃ

শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সব প্রজা ক্যাপে২।
হাজার হাজার প্রজাধায় এক ক্যাপে৩॥
লাঠি নিল খন্তি নিল নিল কাচি দাও।
আপত্য করিতে আর না থাকিল কাঁও॥
ঘাড়েতে বাঁকুয়া নিল হালের যোয়াল।
জাঙ্গাল৪ বলিয়া সব চলিল কাঙ্গাল॥

এই বিদ্রোহ অভিযানে ভদ্রলোকদের অসহযোগিতায় কবি অসহিষ্ণু। তাই, কটাক্ষ করতে তিনি কুণ্ঠিত হলেন না। কবি নিজে রাজবংশীয় ছিলেন, তাই এক পক্ষের নীরব থাকাটা তাঁর চোখে স্পষ্ট। যেন জীবন প্রবাহের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করলেন সেই নীরবতা। কবির সখেদ ;—

চারিভিতি হইতে আইল রঙ্গপুরের প্রজা।
ভদ্রগুলা আইল কেবল দেখিবারে মজা॥

১. গোঁমাসাপে—গোখরো সাপে
২, ক্যাপে—উত্তেজিত হয়
৩. এক ক্যাপে—একেবারে, একসময়ে
৪. জাঙ্গাল—বাঁধ, উঁচু পথ

ইটা দিয়া পাইট্‌কা দিয়া পাটকিলায় খুব।
চারিভিতি হতে পড়ে করিয়া ঝুপঝুপ॥
ইটার ঢেলের চোটে ভাঙ্গিল কারো হাড়।
দেবীসিং এর বাড়ী হইল ইটার পাহাড়॥
খিড়কির দুয়ার দিয়া পালাইল দেবীসিং।
সাথে সাথে পালেয়ে গেল সেই বার ঢিং॥
দেবীসিং পলাইল গিয়া গাও ঢাকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা॥৮৩

অথচ কবি তাঁর শেষ দানটি ইংরেজদের হাতেই তুলে দিলেন :

ইংরাজের হাতে রাজ্য দিলেন চক্রপাণি।
সুবিচার করি গেল আপনি কোম্পানি॥
ইংরাজ বিচার করি এজলাস করি।
একে একে ফাটকেতে রাখে ঢিং এ করি॥৮৪

এই গাথাটিতে রঙপুরের প্রজা সাধারণের সারল্য ও কঠিন মানসের পরিচয় মেলে। বঞ্চিত, প্রতারিত প্রজাদের আর্তনাদে রাজা শিবচন্দ্রের চিত্ত যেমন বিচলিত; তেমনি হৃদয়বান রাজার আন্তরিক স্পর্শে-ও অনুগত প্রজার অনুপম আর্দ্রতা লক্ষণীয়। দেবীসিংহের শোষণ-নিপীড়নের মর্মস্পর্শী কাহিনী কবির চিত্রায়ণে ধরা পড়েছে। আবার সাধারণ মানুষের ন্যায় কবি-ও অল্পে সন্তুষ্ট। তিনি-ও আনন্দিত হন, যখন শোনেন ইংরেজ শাসক দেবীসিংহের বিচারে বসেছেন; তা শাস্তি যত কমই নির্দ্ধারণ হোক না কেন!

দুই

···মজনুর কবিতা···

১২২০ সালের ১৪ই কার্ত্তিক পঞ্চানন দাস কর্তৃক রচিত "মজনুর কবিতা"* নামে একটি ঐতিহাসিক গাথার সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি ১৩১৭ সালে রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।৮৫ এর পটভূমিকা ঐতিহাসিক সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ;—যে বিদ্রোহে উত্তরবঙ্গের সাধারণ প্রজা-মাত্রেই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদী হয়েছিলেন। আঠারো শতকের মধ্যপাদে ইংরেজদের প্রবল দুর্নৈতিকতার শিকার হয়ে বাঙালী যে অন্তর্জ্বালায় ছিলেন পীড়িত ;— সে তো অন্তর্জ্বালা নয়, বলা যায় অগ্নিজ্বালা—যা একসময় প্রত্যক্ষ বিপ্লবের পটভূমি রচনা করেছিল। অবশ্য সে বৈপ্লবিক উত্তাপ নিয়ে কাব্য, গাথার কথা খুব বেশি আমাদের জানা নেই। এবং এই কবিতায় মজনুর যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তার সংগে ইতিহাসের প্রাণ আবেগ স্পন্দিত, আত্মসচেতন, স্বতন্ত্র ব্যক্তি নিষ্ঠ প্রখর সেই বাধাবন্ধহারা মজনুশাহের কতটা মিল আছে তা নিয়ে মতান্তর অনেক। আলোচনার ধারাসূত্রে সেই পার্থক্য স্পষ্ট হবে।

কবির অনুযোগ,—

শুনসভে একভাবে নৌতুন রচনা।
বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু বারনা॥
কালান্তক যমবেটাক্ কে বলে ফকির।
যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥

কবি মজনুর ভীষণরূপকে বর্ণনা করেছেন। আমরা কবির সংগে একমত যে, মজনুশাহ ভীষণ প্রকৃতির ছিলেন। তাঁর দুর্মদ বলিষ্ঠ মননের জন্যই তিনি অনন্য ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের বাতাবরণে ভাস্বর। তাই ইংরেজশাসকগণ অস্থির-চঞ্চল হয়ে উঠেছেন, মজনুর সক্রিয় ব্যক্তি-চিত্তকে অবদমিত করার উদ্দেশ্যে। অবশ্য কবি এখানে মজনুকে দস্যুতার ভীষণতর মূর্তি হিসাবে চিত্রিত করেছেন।

কবির সরস কৌতুক :

সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম।
আগে চলে ঝাণ্ডাবাণ ঝাউল নিশান॥
উঠ্ গাধা ঘোড়া হাতী কত বোগদা১ সঙ্গতি।
জোগান তেলেঙ্গা সাজ দেখিতে ভয় অতি॥
চৌদিকে ঘোড়ারসাজ তীর বরকন্দাজি।
মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি॥

১. বোগদা = বলদ

কবি এখানে মজনুর চালচলন ও পরিপার্শ্ব বর্ণনা করেছেন সরসে। দেশীয় সৈন্যসহযতে চলেছেন মজনুশাহ। তাঁকে ও তাঁর তেলেঙ্গাসাজে সজ্জিত সৈন্যদের দেখলে চারিদিকে যে ভীতির সঞ্চার হয়; কবি তার প্রতি ইংগিত করেছেন। আসলে মজনুশাহকে যুদ্ধ করতে হয়েছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। তার জন্য সর্বত্র, সর্বদা, সর্বাবস্থাতেই তৈরী থাকতে হয়েছে ঘোড়া, তীর ও বরকন্দাজ বাহিনী নিয়ে; প্রতি-আক্রমণের অনুকূল সুযোগ সন্ধানে। তাই,—

দলবল দেখিয়া সব আক্কেল হৈল গুম।
থাকিতে এক রোজের পথ পড়্যা গেল ধুম॥
বড়ই দুখ্‌খিত হৈল পলাইব কোথা।
মনদিয়া শুনসভে লোকের অবস্থা॥

কবি শোনাতে চেয়েছেন মজনুশাহের আক্রমণ পদ্ধতিটি। তা হলো এই;—

যেদিন যেখানে যা'য়া করেন আখড়া।
একেবারে শতাধিক বন্দুকের দেহড়া১॥
সহজে বাঙ্গালীলোক অবশ্য ভাগুয়া।
আসামী ধরিতে ফকির যায় পাড়া পাড়া॥

তখন গ্রামের অবস্থা:

ফকির আইল বলি গ্রামে পৈল হুড়।
পাছুয়া বেপারী পলায় গাছে ছাড়্যা গুর॥
নারীলোক না বান্দে চুল না পরে কাপড়।
সর্ব্বস্ব ঘরে থুয়্যা পাথারে দেয় নড়২॥
হালুয়া ছাড়িয়া পলায় লাঙ্গল জোয়াল।
পোয়াতি পলায় ছাড়ি কোলের ছাওাল॥
বড মনুষ্যের নারী পলায় সঙ্গে লয়্যা দাসী।
জটার মধ্যে ধন লয়্যা পলায় সন্ন্যাসী॥

কবির গুরুতর অভিযোগ,—

থাল, লোটা লইল না পাইল উদ্দিশ।
টাকার মালচে চিরে শিওরের বালিশ॥

১. দেহড়া=সম্মিলন
২. পাথারে দেয় নড়—পথে দৌড় দেয়

আলদা১ মাটী দেখি ফকির করে পোচপেচ।
টাকার লাগি যে মারে বাক্সের খোট ॥
মহাজনের সিন্দুক কাড়ি টাকা লইল ঝাড়া।
আগে লুটে বাড়ীঘর পাছে আড়াপাড়া ॥

এতে মজনুশাহকে লুটেরা হিসাবে চিত্রণ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, মজনু অর্থ-অলঙ্কারের লোভে গ্রামে গ্রামে অত্যাচার সুরু করেছে। গ্রামবাসী ভীত-সন্ত্রস্ত। শুধু কি তাই,—তা-ও নয়। এদের মধ্যে কামাতুর ফকির আছে, তাদের ভয়ে :

ভাল মানুষের কুলবধূ জঙ্গলে পলায়।
লুট্‌রা ফকির যত পাছে পাছে ধায় ॥
যদি আসি লাগপাস জঙ্গলের ভিতর।
বাজে আসি ধরে যেন লোটন কৈতর ॥
বসন কাড়িয়া লয় চাহে আলিঙ্গন।
যুবতি কাকুতি করি কি বলে বচন ॥
দন্তে কুটা করি বাপু ধরি হাত পাও।
অতিথ ফকির তোমরা দুনিয়ার বাপ মাও ॥

কবির সাবধান বাণী,—

ফকির হইয়া কর ছাগলের কাজ।
পরিণামে দুঃখ পাবা ঈশ্বর সমাঝ ॥
সুজন ফকির হয়ে শুনি হস্ত দেয় কাণে।
অধম ফকির হাতবাড়ায় যৌবনে ॥
পরিণাম নাহি শুনে করয়ে শিঙ্গার।
দৌড়িয়া যাইতে কাড়ি লয় বস্ত্র অলঙ্কার ॥
লাজে নাহি কথা রাখে গুপ্তভাবে।
ধর্ম্মসাক্ষী করি তারা মজনুকে শাপে ॥
তারা বলে ঈশ্বর এহি করুক।
মজনু গোলামের বেটা শীঘ্র মরুক ॥

১. আলদা=আলগা, শিথিল

কবির বিস্ময়,—

কোন্ দেশ হৈতে আইল অধম।
ইহাকে ভারথে থ্ুয়া পাশরিছে যম॥

এখানে মজনুশাহ সম্পর্কে দুটি প্রশ্নের আলোকে আলোচনা করলে বিষয়টি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে।

১. মজনুশাহের পরিচয় কি ?

২. প্রকৃত পক্ষে মজনুশাহ অত্যাচারী ছিলেন কিনা। কিংবা ইতিহাসের নিরিখে মজনুশাহের সংগে গাথাকাব্যের চিত্রিত মজনুর মিল কতখানি ?

প্রথম প্রশ্নটি জনৈক লেখকের৮৬ সিদ্ধান্ত থেকে বিষয়টি উপস্থাপন করা যায়। 'মজনু' শব্দটির অর্থ পাগল আর 'শাহ' শব্দটির অর্থ রাজা, তাহলে শব্দ দুটির মিলিত অর্থ দাঁড়ায় পাগলরাজা। আসলে এটি এক ছদ্মনাম। মজনুশাহ তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন বহুকাল। এই সংগ্রামী নায়কের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপকে অবদমিত করতে না পারাটাই শাসকবর্গের প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও নিবুদ্ধিতার প্রমাণ। তাই পরবর্তীকালে ইংরেজরা মজনুশাহের আসল পরিচয় জানবার পরে-ও তা গোপন রেখে সেই প্রমাণকেই আবরণিত করেছেন। এরপর লেখক, খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদের 'কোচবিহারের ইতিহাস' অবলম্বনে জানিয়েছেন, মজনুশাহের আসল নাম বাকের মহম্মদ বা বাকের আলি। ইনি রঙপুরের একজন ভূস্বামী ছিলেন। মজনুশাহ ছদ্মনামে ব্রিটিশ বিরোধী গণশক্তিকে পরিচালনা করতেন; অথচ প্রকাশ্যেই তিনি চলাফেরা করতেন। বাকের ছিলেন মুঘল বংশোদ্ভূত। সেদিন মুঘল পরিচয় ছিল উত্তর ভারতীয় ঐক্যের প্রতীক। তাই মজনুর পরিচয় প্রকাশিত হলে বাংলার জনযুদ্ধ সমগ্র উত্তরভারতে কেন্দ্রীভূত হতে পারে, এই আশংকায় মজনুশাহের প্রকৃত পরিচয় ইংরেজ শাসকগণ গোপন করেছিলেন বলেই মনে হয়।৮৭

২ আমরা ইতিহাস পর্বে মজনুশাহের কর্মকাণ্ডের সংগে পরিচিত হয়েছি। রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়কালে সমাজ জীবনের ভাঙন আবর্তনে বহুবিচিত্র ও জটিল কর্মব্যাপ্তির মধ্যে মজনুশাহের যে পরিচয়; তা আমরা জেনেছি। আর আমরা এ-ও দেখেছি, ইংরেজচিত্ত সান্নিধ্যে এসে, নবলব্ধ প্রেরণাতে এক

বিশেষ শ্রেণী কেমন করে আরো শোষক হয়ে উঠেছেন ;—আর এই শ্রেণীকে বিদেশী শক্তি কাজে লাগিয়ে কিভাবে মহাশোষক হয়ে উঠেছিলেন। ফলকথা, শোষিত, বঞ্চিত, সহায়-সম্বলহীন প্রজাসাধারণ বিক্ষুব্ধ হয়েছেন এতে। শোষণের দুঃসহ যন্ত্রণা হতে মুক্তি পেতেই তাঁদের বিদ্রোহীমানস সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

মুক্তির অভিমুখী বিদ্রোহীমানসের নায়ক ছিলেন মজনুশাহ। সাংগঠনিক প্রয়াসে তাঁকে ছুটে বেড়াতে হয়েছে দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, রংপুর ও ময়মনসিংহের বিভিন্ন পরগণায় ; কখন-ও বা বিহারের বিভিন্ন স্থানে। নিরলস চেষ্টায় তিনি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় সকল বাঙালীকে একতা-সূত্রে বেঁধেছেন ; অন্তত সে চেষ্টার ত্রুটি তিনি করেন নি। সংঘবদ্ধ প্রয়াস নিয়ে যে আঘাত তিনি ইংরেজ শক্তির ওপর এনেছিলেন, তা ছিল দুর্বার। সেই প্রচণ্ড, প্রমত্ত বিদ্রোহানলকে কিছুতেই অবদমিত করতে পারছিলেন না শাসক-শক্তি। তাঁদের পক্ষে যেহেতু মজনুর বিদ্রোহ উদ্যমকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হচ্ছিল না ; সেজন্য মজনুর নামে অপপ্রচার করতে লাগলেন, এবং মজনুকে উৎপীড়ক হিসেবে চিত্রিত করলেন ; নিতান্তই রাজনৈতিক অন্তঃস্বভাবে। অথচ বাঙালীর জীবনভূমিতে রাজনৈতিক বিপ্লবতাড়না যখন স্বভাব-নিবদ্ধ হতে পারে নি, তখন দেশপ্রেরণালব্ধ উদ্দেশ্যের একাভিমুখিতা, সংগ্রামীমানসের দৃঢ়তা ও মুক্তি-সিদ্ধির অনন্ত আকাঙ্ক্ষায় যে ব্যক্তিটি ভাস্বর ; তাঁর এরূপ-চরিত্র চিত্রণের কারণ কি ? এতে ইংরেজের ক্ষেত্রে যে মনস্তত্ত্ব কাজ করছে ; তা বোধকরি এই :

এক. অনুগ্রহ পুষ্ট ধনিক সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষের সহানুভূতি আদায়—যাতে তাদের সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে দুর্ধর্ষ এই মানুষটিকে ধরা যায়।

দুই. ত্রাসের সঞ্চার করা। এতে লাভ হলো, ইংরেজ কর্তাব্যক্তিদের দোষ-স্খালনের সুযোগ থাকে। তাতে তাঁদের চেষ্টা ও অক্ষমতা জনিত ত্রুটি প্রকাশ পায় না। আবার মজনু-ভীতি প্রচারের অপর কারণ হলো মজনুকে একক, একপেশে ও কোণঠাসা করে তোলা। এতে মজনুকে ধরার সুযোগ হতে পারে, কারণ লোক সাধারণ ভয়ে মজনু থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে।

এখানে বলা দরকার যে, বিদেশীশাসকদের বিরুদ্ধে মজনুশাহ দেশের ধনী ও জমিদার সম্প্রদায়কে নিয়ে যে ঐকমত্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ; তাতে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই ব্যর্থতার প্রতিশোধ নিতে তিনি ভোলেননি। ফলে তিনি অত্যাচারী হয়ে উঠেছিলেন। সে অত্যাচার, উৎপীড়ন সাধারণ কোনো মানুষের ওপরই ছিল না। আশ্চর্যের কথা, ইংরেজশাসনের প্রথম-লগ্নে যদি এদেশীয় কোনো মানুষ দেশ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবি ও সচেতনতা ক্রমে সুপরিবদ্ধ হয়ে শোষকের হাত থেকে বাঁচার জন্য সশস্ত্র বিদ্রোহ-বিপ্লবের পথে এগিয়ে যান ; তাঁকে আর যাই-ই বলিনা কেন, অত্যাচারী বলতে পারিনা। বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলার জন্য একটি উদাহরণ দিই :

আগেই বলেছি, মজনুশাহ নাটোরের জমিদার রাণী ভবানীর সহযোগিতা কামনা করে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিতে ছিল বেদনামথিত আবেদন। ইংরেজের শোষণ পীড়ন হতে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তিনি তাঁর সাহায্যের প্রত্যাশী। কিন্তু রাণী তাঁর দীপ্ত-আহ্বানে সাড়া দিলেন না। এর ফল সূচিত হলো। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি থেকে মজনুশাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা নাটোর অঞ্চলের অত্যাচারী ধনী ও জমিদার এবং ইংরেজ কুঠিয়ালদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করলেন এবং এদেরকে বেঁধে নিয়ে কৃষক অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে লাগলেন।৮৮

এখানে উল্লেখ্য, ইংরেজেরা মজনুকে সকল অপকর্মের নায়ক বলে উল্লেখ করলে ও তাঁদের চিঠিপত্র হতে এটা-ও প্রমাণ হয়, মজনুশাহ সাধারণ মানুষের ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠন করেননি। সাধারণ মানুষের ওপর কোনোরকম অত্যাচার না করার জন্য বিদ্রোহীদের তিনি কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই তিনি সাধারণ মানুষের সাহায্য-ও পেয়েছিলেন। এমন দৃষ্টান্তের দুই একটি :

নাটোরের সুপারভাইজর ২৫. ১. ১৭৭২ তারিখের এক পত্রে রেভিনিউ কাউন্সিলকে জানালেন ;—৮৯ আমার হরকরা সংবাদ এনেছে যে, গতকাল ফকিরদের একটি প্রকাণ্ড দল সিলসবেরির একটা গ্রামে জমায়েত হয়েছে। তাদের নায়ক মজনুশাহ তাঁর অনুচরদের কঠিন নির্দেশ দিয়েছেন ; যাতে তারা জনসাধারণের ওপর অত্যাচার ও বল প্রয়োগ না করে এবং সাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান ব্যতীত কিছুই যেন গ্রহণ না করে। কিন্তু

আমি এক সংবাদে অবগত হলাম যে তারা দয়ারাম রায়ের নূরগ্রাম কাছারি থেকে পাঁচশত টাকা ও জয়সিন্ পরগণার কাছারি থেকে ষোলশত নব্বই টাকা লুণ্ঠন করেছে। অথচ একই ব্যক্তি ২৯শে জানুয়ারির চিঠিতে জানালেন: বিদ্রোহীরা গ্রামবাসীদের ওপর কোনো অত্যাচার করেনি। এবং গ্রামবাসীরা বিদ্রোহীদের আহারের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এতে আরো জানানো হলো, বিদ্রোহীদের দলে কৃষকেরা যোগদান করেছে। তারা ইংরেজ শাসককে কর দেওয়া বন্ধ তো করেছেই, পরন্তু সেই কর বিদ্রোহীদের হাতে তুলে দিয়েছে।

আরেকটি চিঠি, পালিংসাহেবের। তিনিও রেভিনিউ কাউন্সিলকে ১৭৭২-এর ডিসেম্বরে জানালেন:
কৃষকেরা আমাদের সাহায্য করেনি, বরং বিদ্রোহীদের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করেছে। ইংরেজেরা যখন আত্মরক্ষার জন্য জংগলে লুকিয়েছে তখন তারা পলাতক ইংরেজদের খুঁজে বের করে হত্যা করিয়েছে। এমনকি, কোনো ইংরেজ গ্রামে প্রবেশ করলে কৃষকগণ তাকে হত্যা করে বন্দুক কেড়ে নিত।

প্রথম চিঠিতে দয়ারাম হলেন নাটোরের প্রধান নায়েব। পরে তিনি দীঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর দ্বিতীয় চিঠির গ্রাম-বাসীরা হলেন সিলস্‌বেরির (বগুড়া) প্রজাবৃন্দ। এবং তৃতীয় চিঠিতে পালিং সাহেবের খেদোক্তিটি রঙপুরে বিদ্রোহীদের সংগে ক্যাপটেন টমাসের যুদ্ধের পটভূমি। এতেই ক্যাপটেন টমাস নিহত হয়েছিলেন। এর থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়:

১. বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ইংরেজ শাসকশ্রেণী ও ইংরেজ আশ্রিত জমিদার ও ধনী সম্প্রদায়—যাঁরা বিদ্রোহীদের কাছে শোষক বলেই পরিগণিত হতেন।

২. বিদ্রোহীদের শক্তির উৎস ছিলেন সাধারণ কৃষক-প্রজা, যাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও সহানুভূতিতে বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩. বিদ্রোহীরা অত্যাচার করেছে, এতে দ্বি-মত হবার নয়। কিন্তু তারা অত্যাচার করেছে ইংরেজশাসক ও অসহযোগী জমিদারের ক্ষেত্রে। অথচ তারা শ্রমজীবী সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বাঙলার জনমানসের

প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই মজনুর বিদ্রোহী সত্তা রসস্থ হয়েছিল। তাই তাঁর অভিযান ছিল দুর্বার সৈনিকের মতই। এই স্পৃহা আত্মসুখের তাগিদে নয়, স্বদেশচেতনা ও স্বদেশ ধর্ম থেকেই জেগেছিল। সুতরাং দেশচিন্তক মজনুকে অত্যাচারী না বলে দেশ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত সশস্ত্র বিপ্লবী বল্‌লে অত্যুক্তি হয় না। "প্রকৃত পক্ষে সন্ন্যাসী ফকিরদের বিদ্রোহ ছিল বৃটিশ বিরুদ্ধে ভারতীয় গণশক্তির প্রথম গৌরবময় সশস্ত্র অভ্যুত্থান।"১০

তাহলে স্পষ্টই দেখ্‌ছি, আলোচ্য গাথাটিতে কবি মজনুশাহের ক্ষেত্রে নির্দয়। সত্যকথন এতে নেই; কেননা কবির চিত্রিত মজনুর সংগে ইতি-হাসের ব্যক্তি মানসের মিল নেই। অথচ প্রায় সমকালীন কবির চোখে মজনুর এই ছবি কেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে বলতে হয়, কবি পঞ্চানন দাস সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। তিনি কোনো শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতেন কিনা তা-ও জানা নেই। সম্ভবত ধনিক কোনো সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন তিনি। তাই হয়তো শ্রেণীস্বার্থের বিবেচনায় মজনুকে উৎপীড়ক হিসাবে চিত্রিত করলেন। এখানে একটি বিশেষ 'মোটিভ' কাজ করছে বলেই মনে হয়। আর উৎপীড়ন, অত্যাচার, লুণ্ঠনচিত্র আঁকতে গেলে অতিমাত্রিক এবং অপ্রাকৃত কিছু এসেই পড়ে। সুতরাং ইতিহাসের বিচারে তা যেমন ধর্তব্য নয়; তেমনি সাহিত্যের ভাব-পর্যায়ে-ও তার গুরুত্ব নেই। আঠারোশতকে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণ-উৎপীড়ন জানতে হলে ইতিহাসের গভীরে পৌছুতে হয় এবং প্রতিবাদী মজনুর মনোধর্ম বিশ্লেষণ করতে হয়। সে ক্ষেত্রে এই গাথাটি তথ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের তোরণদ্বার খুলে দেয় বটে।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য যে, কবি ঘটনাচাতুর্য ও শব্দচাতুর্যের প্রলোভন থেকে সরে থাকতে পারেননি। কবি এতে যে আলেখ্য দিতে চেয়েছেন তাতে মজনু ও তাঁর দলের লোভ, অর্থ অলঙ্কারে আসক্তি ও অসংযম ইন্দ্রিয়াসক্তির মর্মস্পর্শী চিত্র পরিস্ফুট। কিন্তু বর্ণনার কৌশলে স্থূলতা-ও লক্ষণীয়। বাঙালী জীবনের সামগ্রিক হৃদয়বেদনা অনুধাবন করতে পারলেন না কবি। যদি পারতেন, তবে এটি একমুখিনতার দোষে দুষ্ট না হয়ে সুস্থ জীবন দ্রষ্টার দর্পণ হতে পারত। তবু-ও বলি, সুজন ও অধম ফকিরের

পার্থক্য-অনুধ্যান গাথাটিতে থাকায় কবি অন্তত কিছুটা যুক্তিনিষ্ঠ ও বাস্তববাদী হয়ে উঠতে পেরেছেন।

এখানে আর-ও একটি প্রশ্নের মীমাংসা করা যেতে পারে তাহলো 'মজনুর কবিতা'টিকে আমরা গাথা বলে এসেছি। দেখা যাক্ সেটি আদৌ গাথা কিনা। কবিতাটির আরম্ভ বৈশিষ্ট্য এবং ধুয়ো দেখে মনে হয় এটি গীতিরূপে প্রচলিত ছিল। এর আরম্ভটি লক্ষণীয়ঃ "শুনসভে একভাবে নৌতুন রচনা।" আবার মধ্য পদে-ও সেই রকম ধুয়োঃ "মন দিয়া শুন সভে লোকের অবস্থা।" আগেই উল্লেখ করেছি, একটি গাথার আরম্ভ যেমনঃ "শুন সভে একভাবে বিপত্তের কাজ

জেন মতে লড়াই দিতে সাজিল ইংরাজ।"৯১

প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ দুই একটি পুঁথির পদসূচীর আরম্ভটুকু উদ্ধৃত করা হলো। "শুন বিধ (বুধ) গণ আর এক পরস্তাপ।

জেরূপে মরণকালে হৈব মনস্তাব ॥৯২

অথবা

সুন সভে দিয়্যামন এই পুস্তক সমাপন

হইলেন সেখানে বসি

বাগীলা নামেতে গ্রাম মহেষতলার বাম

পাটসাল বড় সুখ বাসি ॥৯৩

পুনশ্চ,

শুন সবে একভাবে কাব্যরসের কথা,

নবাবে লুটিল কুঠী সহর কলিকাতা।৯৪

অর্থাৎ উপরোক্ত পদসূচীতে আরম্ভের ধুয়ো৯৫ দেখে বলা যায় এসব লোকমুখে প্রচার ও গীত হতো। আমাদের আলোচ্য 'মজনুর কবিতা'টি লক্ষ করলে এটি স্পষ্ট হয় যে, কবি বা গায়েন সকলকে শোনাতে চেয়েছেন অনেকটা হেঁকে ডেকে। সুর সংযোগে বলার প্রবণতা ও উদ্দীপন এক আবেগ ও ঢঙের অনুসরণ দেখি এতে। এর ফলে কৌতুক রসের অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হতো। শ্রোতা মনোযোগী হতেন। আর তখনই কবি ঘটনামান অতীত, বর্তমানকে বহুবিচিত্র বর্ণে সাজিয়ে ভাবের ছায়ামণ্ডপ তৈরি করতেন। সুতরাং পাঠ করার জন্যই যে কবিতাটি নয়, তা বেশ স্পষ্ট।

আরো আছে, যেমন মিশ্রভাষারীতি। দৃষ্টান্ত দিই,—
স্থানীয় ভাষা :

ছাড়্যা ∠ ছেড়ে। পড়্যা ∠ পড়ে
থুয়া ∠ থুইয়ে ∠ থোয়া—রাখা অর্থে
পলায় ∠ পালানো। পাছে ∠ পিছনে
ছাওয়াল ∠ ছেলে,—সন্তান অর্থে
পাবা ∠ পাওয়া, ইত্যাদি।

আবার আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দের বাহুল্য। যেমন,

ফার্সী—নিশান, মরদ, গুম, বাজ

আরবী—ফকির, বরকন্দাজ, গাজি/গাজী
তাজি/তাজী (অশ্ববিশেষ) গোলাম

আবার লোটা—হিন্দীশব্দ

ভাগ্‌ + উয়া 7 ভাগুয়া, কৃ-ৎ প্রত্যয়, তুলনীয় হিন্দী প্রভৃতি।
শব্দ ব্যবহারে-ও প্রাচীন নিদর্শন এই গীতি কবিতাটিতে পাওয়া যায়।

যেমন, ১. দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' স্থলে ক প্রয়োগ যথা, বেটাক

২. হৈল, পৈল, প্রভৃতি ক্রিয়া ব্যবহার।

আমাদের উল্লিখিত গাথাগুলিতে, আজকের বিচারে গীতিপ্রাণতা নেই, তবে গাথাকার বা গায়েন লোকরুচি যেভাবে অধ্যয়ন করতেন ; সেই ভাবেই গাইতেন ফলে যুগোপযুগী সরস রচনা হয়ে উঠত। "গাথা-সাহিত্যের ভাষা পাড়াগেঁয়ে, ছন্দশিশুর আধ আধ বুলির মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা,—পূর্ণতা পায় নাই। কিন্তু বিবেচনাপূর্ব্বক বিচার করিলে দেখিতে পাইবেন, চলিত ভাষায় আজ যাহা সুন্দর ও মার্জিত, পরবর্তীকালে তাহা 'সেকেলে'ও আমার্জিত হইয়া পড়িয়াছে।"৯৬

সুতরাং একথা মনে রাখা দরকার, "প্রাচীন বাংলা গাথাকাব্যগুলি বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা, সুতরাং এই রচনাগুলিকে বাংলার ইতিহাস আখ্যা দেওয়া না গেলে-ও, ইহারা বাঙ্গালীর ইতিহাস হইবার গৌরব দাবী করিতে পারে।"৯৭

তিন

…মহাস্থানগড়ের ছড়া…

সন্ন্যাসীদের উৎপীড়ন অত্যাচারকে ঘিরে একটি ছড়ার কথা জানা যায়। এটি মহাস্থানগড়ের ছড়া।৯৮ বগুড়া জেলার ছয় মাইল উত্তরে মহাস্থানগড়। এখানে করতোয়া নদী উপকূলে শীলাদেবীর ঘাটে বছর কয়েক পর পর বিশেষ তিথিতে পৌষ-নারায়ণী স্নানের রীতি আছে। এই স্নান উপলক্ষে পুণ্যলোভাতুর মানুষের ভীড় হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা-ও আসেন।

কিন্তু এই ছড়াটির মধ্যে যে বিষয়টি উপস্থাপিত, তা হলো, মহাস্থানগড়ে পুণ্য স্নানের যোগ মুহূর্তে অত্যাচারী সন্ন্যাসীদের আগমন সংবাদ। ফলত, স্নান যাত্রীরা শংকিত। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁরা পলায়ন করছেন।

কবির বর্ণনা :—

বৈশাখ মাসেতে কথা উপস্থিত হৈল।
দৈবযোগে হেনকালে পৌষ মাস আইল॥
পৌষ মাসের সোমবার অমাবস্যার ভোগ।
মূলা নক্ষত্রেত পাইল নারায়ণীযোগ॥

মঙ্গল বারের দিন আইল ছয়শত সন্ন্যাসী।
তারা কাশীবাসী, মহাঋষি, উর্দ্ধবাহুর ঘটা॥…
সন্ন্যাসী আইল বল্যা লোকের পড়ে গেল শঙ্কা।
…হাজারে হাজারে, বেটারা লুট করিতে আইসে।
…বেটাকের অস্ত্র আছে, রাখে কাছে, বন্দুক সাঙ্গি তীর।
তমার চিমীঠা, খাপে ঢাল, ঢাকা শির॥

কবির ভণিতা :

কবিতা রচিল দ্বিজ গৌরীকান্ত নাম।
নিবাস তাহার বটে নারুলি গ্রাম॥
বগুড়ার চেলপাড়া গ্রাম।
দ্বিজকুলে উৎপত্তি সেই করে গান॥

ভণিতা অংশে কবির পরিচয় মেলে। কিন্তু বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের পরিচয় এটি নয়। এ হলো দুর্বৃত্তদের নিয়ে ছড়া। এটির রচনাকাল ১২২০ সাল। তাই এর উল্লেখ আবশ্যক হলো। অর্থাৎ সুজন সন্ন্যাসী ফকিরদের সংগে অধমের মৌল পার্থক্য তখন-ও ছিল। তাই বলা যায়, কবি পঞ্চানন দাস কিংবা দ্বিজ গৌরীকান্ত অধমদেরই ছবি এঁকেছেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ সন্ন্যাসী সৈনিকদের ছবি নয়।

এই ছড়াটি হরগোপাল দাসকুণ্ডু সংগ্রহ করেছেন। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩১৪ সালে।

২. সন্ন্যাসীবিদ্রোহ ও আনন্দমঠ...

বাংলাদেশে ইংরেজের রাজনৈতিক জয়যাত্রা সুরু অষ্টাদশ শতকের মধ্যথেকে। আর তখন থেকেই বাংলার প্রাণরস নিঙ্ড়ে নেওয়া সুরু হয়েছিল ধীরে ধীরে, অথচ অব্যাহত গতিতে। ফলত, ইংরেজদের অবিচার, অনাচার ও বিনষ্টি বাঙালীর জীবন-প্রচ্ছদে রূঢ় আঘাত করল। তাই বাঙলা দেশের মানুষ মুক্তি-সিদ্ধির উপায় হিসাবেই বিদ্রোহ করেছিল। এই নিদারুণ ঘটনা বঙ্কিম জেনেছিলেন বাস্তবাভিমুখ দৃষ্টিকোণ থেকে। মন্বন্তর কবলিত বাঙলার যে চিত্র বঙ্কিমের বর্ণালিম্পনে উদ্ভাসিত, তা তাঁর ব্যক্তি-মনের বিষণ্ণ-ছায়ারই প্রতিফলন। 'আনন্দমঠ' সম্পর্কে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন বঙ্কিম জীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তা হলো এই ;—

"বর্ষীয়ান্ খুল্লপিতামহের নিকট আমরা কয় ভ্রাতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা প্রথম শুনি।...কি প্রকারে তিল তিল করিয়া মন্বন্তর ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল তাহা বিবৃত করিলেন।...এই গল্পটি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, কিন্তু আমার অগ্রজের (বঙ্কিমচন্দ্রের) উহা মনে ছিল; কেননা ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময়ে ঐ গল্পটি আবার তাঁহার মুখে শুনিলাম। আমার বোধহয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর অবলম্বনে কোন উপন্যাস লিখিবার তাঁহার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু যৌবনে লেখেন নাই। কিঞ্চিৎ পরিণত বয়সে লিখিলেন।"৭৯

পরিণত বয়সে আনন্দমঠ লিখতে বসে বঙ্কিমচন্দ্র যে ক'টি বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত প্রশ্নের মধ্যে পড়েন নি; তা নিশ্চিত করে বলা যায়না। সুতরাং এক্ষেত্রে বঙ্কিম-মানস বিবর্তনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যেতে বঙ্কিম-সমস্যার আধারে। যেমন, ১. বাংলার ইতিহাস; ২. দেশপ্রীতি ও সাহিত্য চিন্তা; ৩. পরিবেশ। লোকবৃত্তকে জানার ও জানাবার আগ্রহ বঙ্কিম সাহিত্যের স্পষ্টতম দিক। এরজন্য তাঁর অদম্য কৌতূহল ছিল বাংলার অতীতকে জানবার। "এ-কৌতূহল বৈজ্ঞানিকের নিস্পৃহ অনুসন্ধিৎসা থেকেই জাগে নি, এর মূলে ছিল দেশ-প্রেমিকের নিবিড় অনুরাগ।"১০০

বঙ্কিম সাহিত্যে ইতিহাস ধ্যান পুরোপুরি না হলেও ইতিহাস চিন্তার নবউদ্বোধন হয়েছিল; বাংলার অতীত ও সমসাময়িক সমাজ পটভূমিকার আলোকে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই চিন্তা কবে থেকে তাঁর মনে দানা বেঁধেছিল, এটা বলা শক্ত। তবে মনে হয় ঐতিহাসিক চেতনা ও 'বঙ্গদেশ প্রীতির বীজ' অঙ্কুরিত হয়েছিল বাল্যকাল হতেই।১০১ স্টুয়ার্ট ও মার্শম্যানের বাঙলার ইতিহাসে বঙ্কিম তৃপ্ত হননি। বাঙলাদেশের সমগ্র চেহারাকে খুঁজে পাননি বলেই। এরজন্য তাঁর সকরুণ মন্তব্যটি স্মরণীয়: "বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয় তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালার বিদেশী বিধর্মী অসার পরপীড়কদিগের জীবন চরিত মাত্র। বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে।... আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান করি।"১০২ এই অনুসন্ধান তো একের কাজ নয়, সকলের। কিন্তু একথাও ঠিক, বঙ্কিমচন্দ্রের পরিপার্শ্ব এমনই জটিল, বিচিত্র কর্মবহুল ছিল এবং বঙ্কিম-মন সাহিত্য সৃষ্টি ও পুষ্টিতে এত বেশি ভাবিত ছিল যার জন্য এই অনুসন্ধানের নীরস শুষ্ক কাজটির প্রতি সম্ভবত তিনি খুব যত্নবান হতে পারেন নি। অবশ্য কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি অনুসন্ধিৎসার রস ও বাসনার উদ্দীপন সঞ্চারে তথ্য-সূত্র নির্দেশ করলেন মাত্র। আবার এ-ও সত্য শিল্পকর্ম অথবা ইতিহাস বিচারের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন নিরলস। ফলত, অতীত পটভূমি তাঁর চোখে যেমন ভাবে ধরা পড়েছে; তারই আলোকে রচনা করলেন

'আনন্দমঠ'। এই রচনার মূলে ইতিহাস চেতনায় প্রবুদ্ধ বাঙালী বঙ্কিম চন্দ্রের মর্মপীড়াজনিত কারণ ছাড়া বোধকরি আর কিছু নেই।

এক

আমরা আগেই জেনেছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন আনন্দমঠ লিখেছেন তখন তিনি পরিণত ভাবপর্যায়ে পৌঁছুতে পেরেছিলেন। ফলে তাঁর মধ্যে সংযত গম্ভীর-উচ্ছ্বাস ও আবেগ পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে যুক্ত হয়েছে গভীর নীতিবোধ। জ্ঞান ও নীতির সমন্বয়ে দেশপ্রীতির পথ সুন্দর, সুমহান হয়ে উঠতে পারে একথা উচ্চকিত হলো আনন্দমঠে। এরজন্য বঙ্কিমচন্দ্র দেশ মাতৃকার সেবককে ভক্তির পথ স্মরণ করিয়েছেন,—যে ভক্তি জ্ঞানের উত্তরণ দ্বার। "সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন, শত্রু-শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব। মহাপুরুষ। শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা।"১০৩ একথা বলেই মহাপুরুষ সত্যানন্দের হাত ধরে গভীর তত্ত্বকথা শোনালেন যেন মূল সমস্যার মহামন্ত্র: "কে কাহাকে ধরিয়াছে? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে,—ধর্ম্ম আসিয়া কর্ম্মকে ধরিয়াছে...।"১০৪ ইংরেজ মিত্র কারণ, "ইংরেজ ভারতবর্ষের পরোমপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে অনেক নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে···।"১০৫ ইংরেজ মিত্র তার আরও কারণ, "ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।"১০৬ অতএব ইংরেজকেই রাজা করার কথা বঙ্কিমচন্দ্র বললেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনে তিনি একটি বড়ো যুক্তি দিলেন: "ইংরেজ বহির্ব্বিষক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোক শিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।"১০৭

আনন্দমঠ মুক্তি সাধনার বেদ। 'বন্দেমাতরম্' তার সংগীত। দুর্গত দেশের সন্তানদের দৃষ্টি, চিত্ত, প্রীতি ও সেবা আকর্ষণ করে এই বেদ। মুক্তি সাধনায় অখণ্ড একতানতা বজায় রাখার জন্যই সাধন-পথের পাথেয় হবে ভক্তি যা সুসংযত কিন্তু জ্ঞানাত্মক;—এমন ভক্তি যা জ্ঞানকে পরা-

বিদ্যাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে এবং 'বহির্বিষয়ক জ্ঞান'কে উপাদেয় মনে করে। আর এমন ভক্তি ত্যাগের আদর্শে, জ্ঞানাত্মক কর্মে প্রবৃত্ত করবে কিন্তু লুঠেরার হেয়বৃত্তি বিমুখ করবে।১০৮

তাই সত্যানন্দের আক্ষেপ শুনে চিকিৎসক বঙ্কিম উপদেশ দিলেন,—"সত্যানন্দ, কতর হইও না। তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তিরদ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখন পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশের উদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।"১০৯

বঙ্কিমের প্রাগুক্ত চিন্তাধারা আমাদের বিভ্রান্ত করে। অনেকের মতে তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব এখানে সুস্পষ্ট। অথচ যিনি ভারতবর্ষের 'স্বাধীনতা ও পরাধীনতা' প্রবন্ধ লিখেছেন, যিনি 'পলিটিকস' ও 'বাঙ্গালা শাসনের ফল' প্রবন্ধের মধ্যে তীব্র, তীক্ষ্ণ হতে পেরেছেন; যে কমলাকান্ত বঙ্কিম 'লোক রহস্য' রচনা করে বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করেছেন তাঁর এমন 'ইমোশন' আমাদের আশা হত করে। কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যকে সমকালীন ও সমভূমিক দৃষ্টি ভংগিতে দেখলে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সরল প্রকাশ সেখানে অনায়াস। এতে জীবন ভাবনার বিপর্যয় নেই। "আসলে মহাপুরুষের কণ্ঠে বঙ্কিমের যুক্তিবাদী চিন্তা ধ্বনিত, সত্যানন্দের আবেগ কুল প্রার্থনায় প্রকাশ পেয়েছে বঙ্কিমের নিভৃত বাসনা।...বঙ্কিম যখন 'আনন্দমঠ' লিখেছিলেন তখন বিপ্লবের সময় প্রস্তুত হয়নি, সেজন্য মহাপুরুষ বিদ্রোহ থামিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু প্রায় কুড়ি পঁচিশ বছর পরে বাংলার বিপ্লবীরা উপযুক্ত সময় এসে গেছে বলেই আনন্দমঠকে আদর্শ করে বিপ্লব-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।"১১০ এই প্রসংগে স্মরণ করি বঙ্কিম জীবনীকারের বক্তব্যটি। তিনি লিখেছেন: "তিনি (বঙ্কিমচন্দ্র) ইহা বেশ জানিতেন, একদিন না একদিন 'বন্দেমাতরম্' বাঙ্গালীর কণ্ঠে কণ্ঠে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্বনিত হইয়া বাঙ্গালায় নূতন জীবন আনিবে—নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে। কেমন করিয়া জানিতে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহা জানিনা। তবে দুই একজনের নিকট এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছি।"১১১

"বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দেশ প্রেমের মহান সাফল্যে উদ্বুদ্ধ দেশ প্রেমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, এবং সেই স্বপ্নকে তিনি জাতীয় আধারে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।" ১১২ তাঁর এই চাওয়া নিতান্তই সহজ ছিলনা বলেই, অন্তরতম, স্পষ্টতম অভিব্যক্তি কোথায় যেন চাপা পড়ে গেল। বোধ করি, মনের আবর্তেই। ফলে যে 'ইমোশন' অননুভূত, অভাবিত—তার উদ্বোধন সম্ভাবিত হলোনা বলেই "বিষ্ণু মণ্ডপ জনশূন্য হইল। তখন সহসা সেই বিষ্ণু মণ্ডপের দীপ উজ্জলতর হইয়া জলিয়া উঠিল; নিবিল না। সত্যানন্দ যে আগুন জালিয়া গিয়াছিলেন, তাহা সহজে নিবিল না। পারি ত সে কথা পরে বলিব।" ১১৩ কিন্তু পরের কথা বঙ্কিমচন্দ্রের আর বলা হয়ে ওঠেনি। "সম্ভবতঃ দেশ কাল পাত্র বিবেচনা করিয়াই বলিতে আর সাহস করেন নাই।"১১৪ আর এই কারণেই হয়তো প্রথম সংস্করণের ক্ষেত্রভূমিকে বিকৃত করতে হয়েছিল পরবর্তী সংস্করণে। ফলকথা, প্রথম সংস্করণের 'ইংরেজ' শব্দ পরিবর্তিত হয়েছিল 'যবন' শব্দভাবে। তবুও বলা যায়, এই উক্তিটির মধ্যে মৌল প্রেরণা ও জীবন বাণীর সারবত্তা আত্মগোপন করে আছে।

দুই

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'আনন্দমঠ' রচনায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর অন্তর্জগৎ বিক্ষুব্ধ ছিল। এই বিক্ষুব্ধতার কারণ জানতে হলে তাঁর কর্ম জীবনের পটভূমি আলোচনা আবশ্যিক হয়ে ওঠে। হিন্দুধর্ম নিয়ে যে আলোড়ন উঠেছিল সারাদেশে; তার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেন নি। কারণ, ধর্মক্ষেত্রে বিদেশী শাসকদের হস্তক্ষেপে যে আন্দোলন উপস্থিত হলো তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সচেতন ব্যক্তি মাত্রেরই নীরব থাকা সম্ভব ছিলনা রাজনারায়ণ বসু ও কেশবচন্দ্রসেন প্রমুখ ব্যক্তিদের মধ্যে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার নিয়ে যে মতান্তর; এবং উত্তর পশ্চিম ভারতের বিশ্রুত দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্য সমাজ' নিয়ে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে তাতে বঙ্কিম-চন্দ্রকে বিবাদের আসরে নামতেই হলো। একদিকে যুক্তিবাদ, যা তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে রস সংগ্রহ করেছিলেন; অপরদিকে হিন্দুধর্ম: এই দুইয়ের সমন্বয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন হিন্দুধর্মকে। এর জন্য

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে, জেনারেল এ্যাসেম্ব্লিজ ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ হেস্টি সাহেবের সংগে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব নিয়ে তাঁর বাদানুবাদ স্মরণ করা যেতে পারে।১১৫ বলা যায়, এতে বঙ্কিমচন্দ্রের "সমন্বয় ও সংস্কারধর্মী মনোভাবই অভিব্যক্ত" হয়েছে।১১৬

ধর্ম নিয়ে বঙ্কিমের মন যখন ছিল বিচঞ্চল, বিক্ষুব্ধ এমন সময় তিনি কর্ম-জীবনের পরিমণ্ডলের সংগে সমতা রেখে চলতে পারছিলেন না। 'সেন্টিমেণ্ট'-এ আঘাত লাগছিল বলতে হবে। কারণ, আকস্মিক, অহেতুক ও অজানিত ঘটনা প্রবাহ তাঁর কাছে উপেক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারেনি। না পারার-ও কারণ ছিল। যেমন, ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়াতে বদলি হলেন। এখানে আসার কিছু দিনের মধ্যেই কালেক্টকটর সি.ই. বাকল্যাণ্ডের সংগে তাঁর ঝগড়া হয়। আবার ঐ বৎসরে আগস্ট-সেপ্টেম্বরে তিনি বাংলা গভর্ণমেণ্টের অস্থায়ী অ্যাসিস্ট্যাণ্ট পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসেই সে পদটির বিলোপ হয় ও তার পরিবর্তে, 'আণ্ডার সেক্রেটারি' নামে একটি পদের সৃষ্টি হলো বটে কিন্তু তাতে কোনো ভারতীয়কে নিয়োগের সুযোগ দেওয়া হলোনা ; প্রচলিত বিধান অনুযায়ী। ফলে বঙ্কিম-চন্দ্রকে সরে যেতে হলো। ব্লাইথ সাহেব এলেন ও কর্মভার গ্রহণ করলেন। এ নিয়েও ঐ বিভাগের সেক্রেটারি মেকলে সাহেবের সংগে বঙ্কিমচন্দ্রের মনো-মালিন্য ঘটে। সেকালে দৈনিক পত্র-পত্রিকায় বঙ্কিমের অসন্তোষের যৌক্তিকতা স্বীকার করল বটে, তবে তা দিয়ে সুরাহা কিছু হয়নি।

"বঙ্কিমচন্দ্রকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারীর পদ থেকে অপসারিত করার আসল কারণটা ছিল, ঠিক ঐ সময়টা বঙ্গদর্শনে তাঁর ধারাবাহিক উপন্যাস আনন্দমঠ প্রকাশিত হওয়া। তিনি আনন্দমঠে ইংরাজ-বিদ্বেষ প্রকাশ করেন।

ইংরাজ সিভিলিয়ানরা বাঙলা জানতেন। তাঁরা বঙ্গদর্শনে আনন্দমঠ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এরই ফলে তাঁর অপসারণ।"১১৭

আবার ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রকে হাওড়ায় বদলি করা হয়। সেখানে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট ই. ভি. ওয়েস্টমেকট সাহেবের সংগে রেলওয়ে মোকর্দমা বিচারের রায় নিয়ে যে ঝগড়া হয়েছিল ; তা এমন

পর্যায়ে উঠেছিল যে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যদি দু'তিন মাসের মধ্যে স্থানান্তরিত না হতেন; হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রকে সে সময় চাকরি রক্ষা করতে বেশ বেগ পেতে হতো। সুতরাং স্পষ্ট দেখ্‌ছি, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের স্বভাব চিহ্নিত মানুষটির কর্মক্ষেত্রে মলিন-আবর্তন সৃষ্টি হয়েছে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্মম অবিচারে। ফলে বঙ্কিমের চিত্তধাতু বিক্ষুব্ধ ভাব-দৃষ্টিতে আবদ্ধ হওয়াই স্বাভাবিক।

আরো আছে। এ সময়ে ইলবার্ট বিল আন্দোলন, দেশ বিদেশের ঘটনার সংঘাতময় পরিবেশ এবং সমকালীন ইতালির আদর্শে দেশে গুপ্ত সমিতির তৎপরতা; সুরেন্দ্র নাথ, বিপিনচন্দ্র পাল ও সুন্দরীমোহন দাসের বৈপ্লবিক কর্ম সাধনা এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর গৃহাঙ্গনে অগ্নি প্রদক্ষিণ করে দেশ নায়কদের কঠিন শপথ: ইংরেজ দাসত্ব না করার। এ সবেরই প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের হয়েছিল। সুতরাং যুগোচিত পরিবেশের ছায়া-সম্পাৎ তাঁর উপন্যাসে ঘটবে এটাই স্বাভাবিক।

অতএব আনন্দমঠে যেসব ক্রিয়াশীল উপাদান রয়েছে তাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বস্তুত. সমাজ পটভূমির তাগিদে রচিত আনন্দমঠ প্রেরণা দেয় ভাবী যুগকে। যে কথা সহজ আলোকে প্রকাশ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, সে কথা ভাবের আধারে গভীর অর্থে বোঝাতে চেয়েছেন এবং জীবনসত্য করে ঝাঁপিয়ে পড়ার মূলমন্ত্র তিনি আনন্দমঠেই জানিয়েছেন। এটা সত্য, আনন্দমঠ অতীত বাংলার ইতিহাস নয়—সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দিব্য কাহিনী ও তথ্যপঞ্জী-ও নয়। তবে এটা সুস্ফুট, "দেশপ্রেমের যে আবেগ অতীতের ধ্যানে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, আনন্দমঠ সেই আবেগ নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল। শুধু ধ্যানে এবং অনুভূতি-সর্বস্ব-আবেগে নয় অত্যাচারী রাজার পীড়নের প্রতিবাদে অধীর বিদ্রোহে সংগঠনমূলক রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে একটি উচ্চতম নৈতিক আদর্শ নিয়ে দেশপ্রেম এই বইতে ভবিষ্যতের দিগ্‌দর্শনী হয়ে উঠল। বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত-রচনার মধ্যেই এর ইঙ্গিত ছিল।"১১৮
কিংবা,

"সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক কর্ম ও সংঘটনের যে পরিকল্পনা 'আনন্দমঠে' ভাষা পাইয়াছে, তাহার মধ্যে ও সমকালীন আন্দোলনের শক্তি ও দূরদর্শিতার

ছাপ রহিয়াছে। বিচ্ছিন্ন, এককসাধনা ও মনস্কাম, মুষ্টিমেয়ের আকাশ বিদারী চীৎকার ভবিষ্যতের গর্ভ হই তে স্বর্ণ কুড়াইয়া আনিতে পারিবে না, এই বিচ্ছিন্ন মনস্কাম সকলের, সর্বসাধারণের মনস্কামে পরিণত করিয়া তবেই তাকে সার্থক কর্মের রূপ দেওয়া সম্ভব। এখানেও শিল্পি-মানস ভবিষ্যতের দিকে তাঁহার অঙ্গুলি-সঙ্কেত জানাইয়া গিয়াছেন।"১১৯

তিন

আমাদের বক্তব্য, আনন্দমঠে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কোনো প্রভাব আছে কিনা। অর্থাৎ আনন্দমঠ লেখার সময় বঙ্কিম ইতিহাসের প্রতি কতটুকু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে, তা আমাদের বিচার্য। এখানে বলে রাখা ভালো, অনেকের মতেই 'আনন্দমঠ' ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্র-ও তা বলেন নি। তবু-ও বলতে বাধা নেই, অষ্টাদশ শতকের মধ্যপাদে অরাজকতা, রাজ শক্তির অক্ষমতা, অব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল ;—সে বিদ্রোহের প্রাণ ও নবপ্রতীতি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র তাথ্যিক সংকেত ঠাহর করেছিলেন। বাংলার এক যুগ সন্ধিক্ষণে যে দুটি ঘটনা সূচিত হয়েছে ; তা হলো, বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ। এই যুগ যন্ত্রণার প্রেক্ষাপটে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠ রচনা করেছিলেন। তার প্রমাণ, "বঙ্কিমচন্দ্র যে কালটিকে উপন্যাসের জন্য নির্বাচন করেছিলেন সেই কাল ছিল অরাজকতার। এই অরাজকতাই বিদ্রোহের জন্ম দেয়। সন্তান সম্প্রদায়ের উদ্ভবের তাদের বীরত্বের ক্রমবিকাশটি দেখান নি সত্য কথা। কিন্তু তিনি এই বিদ্রোহের কারণটি নিরূপণের চেষ্টা করেছেন।"১২০

দ্বিতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের প্রথম কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিশৃঙ্খলার যে চলচ্চিত্রতা তুলে ধরেছেন আর তাতে "দুর্ভিক্ষ পীড়িত 'শুষ্ক, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, উলঙ্গ' ; দস্যুদলের পরিকল্পনা যতই বীভৎস হউক ইহা দেশের তৎকালীন অবস্থার উপর তীব্র আলোকপাত করে।"১২১

তৃতীয়ত, "আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক—বাংলার এই দ্বিবিধ দুর্যোগের সুযোগ লইয়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সঙ্কটজনক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য।"১২২

চতুর্থত, আনন্দমঠে কালগত সাদৃশ্য যেমন আছে তেমনি স্থানগত-ও। সংগঠনের উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা যেমন অন্তরালে থেকে অর্থাৎ অরণ্যের গভীরে আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহের প্রস্তুতি নিয়েছেন, আক্রমণ পদ্ধতি রচনা করেছেন কিংবা যুদ্ধের পরিচালনা করেছেন তারই মূলগত সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাদের-ও কর্মকাণ্ড জঙ্গলের পরিবেশে বিস্তার লাভ করেছে। বঙ্কিম এটাই দেখিয়েছেন।

পঞ্চমত, আনন্দমঠের যে সংগীত আমাদের আপ্লুত করে তা যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কালীন সংগীত কিংবা ছড়া-গাথা থেকে রসপুষ্ট নয়; তাই-বা কেমন করে বলি! কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে যে 'স্পিরিট' আনতে চাইলেন; তারই উত্তপ্ত প্রবাহ দেখি সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের অন্তর্গূঢ় নিবিড় আকাঙ্ক্ষাতে।

ষষ্ঠত, ঐতিহাসিক বিষয় প্রধান যেমন, ক্যাপটেন টমাসের যুদ্ধ পরিণতি ও এডওয়ার্ডস-এর যুদ্ধ-পরিকল্পনা ও সৈন্য সংগঠনে যে উৎসাহ ব্যয়িত হয়েছিল; তারই প্রতিচ্ছবি মেলে আনন্দমঠে।

জনৈক লেখক বলেছেন, ১২৩—"আনন্দমঠের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ঘটনা ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র ঘটনার স্থান ও সন্ন্যাসীদের উদ্দেশ্য পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যে করুণ চিত্র ইহাতে আঁকা হইয়াছে তাহা অতিরঞ্জিত নহে।" তিনি আরো বলেছেন: "উপন্যাসে তৎকালীন সামাজিক, অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ইতিহাসের পূর্ণ সহযোগিতা বিদ্যমান। অসম্ভব কাহিনীর অবতারণা করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস বিকৃত করেন নাই। উপন্যাসের প্রয়োজনে ইতিহাসের কোন অংশ পরিবর্তন করিয়া লইয়াছেন মাত্র।"

এই প্রসংগে আমরা আচার্য যদুনাথ সরকারের কয়েকটি মন্তব্য লক্ষ করব। আনন্দমঠের ঐতিহাসিক গাম্ভীর্য-গাঢ়তা সম্পর্কে তিনি বলেছেন: "যদিও ইহাতে বর্ণিত লোকগুলি ইতিহাস হইতে তুলিয়া লওয়া নহে, তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই গ্রন্থে সেই যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ঠিক প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং ইহার প্রধান ঘটনাটি নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে আগাগোড়া ধার করা।"১২৪

আবার আচার্যের বপরীত বিচারও আছে। তিনি বলেছেন: "কিছু কিছু বাস্তব সত্য ইতিহাস হইতে লইয়া, তাহাতে তাঁহার অদ্বিতীয় চরিত্র সৃষ্টির কল্পনা যোগ করিয়া, সবটার মধ্যে নিজ ঊর্দ্ধ প্রবাহিণী ভাবধারা ঢালিয়া দিয়া…প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, এক অপূর্ব্ব সামগ্রী বাঙ্গালা সাহিত্যকে দান করিলেন।"১২৫

এখন প্রশ্ন, বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক চরিত্র সৃষ্টিতে কল্পনাযোগ করলেন কেন? এর সংগত উত্তর হলো, উপন্যাসের বিশেষ গতি-ও প্রয়োজনের তাগিদে। কারণ, আচার্যের ভাষায় বলি; "ঐতিহাসিক মসলার অভাবে উপন্যাস লেখক—অনেক স্থলে পেশাদার ঐতিহাসিক ও কল্পনার সাহায্যে ফাঁক পুরাইতে বাধ্য হন।"১২৬ সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে ইতিহাসের নির্ভেজাল চারিত্রিক ধর্ম রক্ষা করা কেন যে সম্ভব হয় নি সেটুকু আমরা জেনে নিতে পারি আচার্যের এই উক্তি থেকে-ও। "…বিদ্রোহী সন্তানগণ নিরক্ষর; তাহারা বা তাহাদের দলের ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্য কেহ সে সময়ে কোন বিবরণ লিখিয়া যায় নাই; তাই আজ আমাদের একমাত্র পুঁজি হেস্টিংস লাটের কয়খানা চিঠি এবং রেকর্ড অফিসে রক্ষিত নিম্ন ইংরেজ কর্ম্মচারীর কয়খানা রিপোর্ট, সুতরাং এখানে একতরফা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ যুগের ঘটনার বিবরণ ও মানবচরিত্র সৃষ্টি করা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই।"১২৭ আবার পর মুহূর্তেই আচার্য বিরোধী মন্তব্য করেছেন যে, আনন্দমঠের সন্তানগণ বাঙালী কায়স্থের ছেলে। কিন্তু প্রকৃত সন্ন্যাসীরা এলাহাবাদ, কাশী, ভোজপুর প্রভৃতি জেলার লোক। এবং "প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্গীতার নাম পর্য্যন্ত জানিত না।"১২৮ আরো আছে। "সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরি পুরীর দল একেবারে লুঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারি-ও করিত মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নের-ও অতীত ছিল, এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র।"১২৯

আমরা বিদ্রোহ পর্বের ইতিহাসে লক্ষ করেছি যে, বাঙলায় বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থান হয়েছিল। স্থানিক এই বিদ্রোহ-বিপ্লবে সামিল হয়েছিলেন বিহারের একাংশ কারিগর ও কৃষক জনগোষ্ঠী যাঁরা ইংরেজশাসন ও শোষণ-উৎপীড়নের শিকার হয়েছিলেন। আর এতে যোগ দিয়েছেন মোঘল সৈন্যবাহিনীর

ছত্রভংগ বেকার ও বুভুক্ষ সৈন্যগণের একাংশ। আত্মরক্ষার জীবন-সম্ভব তাগিদে মিলিত হয়েছেন। আর যেসব সন্ন্যাসী ফকিরগণ বাংলায় স্থায়িভাবে বসবাস সুরু করেছিলেন চাষ-আবাদ ও স্ব-ধর্মাচরণের মাধ্যমে; তাঁরা-ও বাংলার সামাজিক জীবন চেতনার সংগে মিলেমিশে গিয়েছেন। এই গণসম্মিলন থেকে তাঁদেরকে আলাদা করা সম্ভব নয়। এঁদেরকে প্রকৃতই চাষীসন্ন্যাসী ও চাষীফকির নামে অভিহিত করা যায়। তাই, রাজনৈতিক জীবন যন্ত্রণার দিনে এঁরা-ও নীরব ছিলেন না। কারণ, রাষ্ট্রবিশৃঙ্খলার স্রোত তাঁদের জীবনকে-ও রূঢ়ভাবে আঘাত করেছে। ফলে জীবনযুদ্ধে তাঁদের নামতেই হলো।

অতএব আচার্যের উক্তি সন্ন্যাসী ফকিরেরা পশ্চিমের লোক বলে থেমে যাওয়া বিচারের ক্ষেত্রে যুক্তি নিষ্ঠ হলো না। আবার সন্ন্যাসী ফকিরেরা প্রায় সকলেই নিরক্ষর একথা মেনে নিলে-ও গীতা, যোগশাস্ত্রের নাম কেউ জানত না একথা-ও ঠিক নয়। প্রাচীনকালে অক্ষর জ্ঞান না থাকা সত্ত্বে-ও শ্রুতির মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে অনেকেই অবহিত হয়েছেন। আরো একটি কথা: "বিদ্রোহী সন্ন্যাসী বা ফকিরদের হাজার হাজার সমর্থকের মধ্যে বাংলার শত শত নির্যাতিত প্রাচীন ভূস্বামীদের কেউ ছিল না অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ সন্তান ছিল না এমন কথাও হলফ করে বলা কঠিন।"১৩০

দ্বিতীয়ত, মাটি' ও রাষ্ট্রের অন্তরতম যোগ বাংলার লোক সাধারণের নিকট একেবারেই অনবহিত ছিল না। তাই অন্তর গরজ থেকেই ইংরেজদের অত্যাচার উৎপীড়ন থেকে মুক্তি চেয়েছে বাঙালী। এতে ছিল পরাধীনতার যন্ত্রণা ও স্বাধীনতা কামনার উদ্দীপনা।

তৃতীয়ত, আমরা আগেই বলে এসেছি, সন্ন্যাসী ফকিরেরা আক্রমণ-ও লুণ্ঠন পন্থা অবলম্বন করেছে। এবং প্রসঙ্গোপকরণে-ও বলেছি, তারা আক্রমণ করেছে ইংরেজশাসকদের ওপর; লুণ্ঠন করেছে তাদের সঞ্চিত ভাণ্ডার, আর লুণ্ঠন করেছে ইংরেজ আশ্রিত ও সমর্থনপুষ্ট জমিদার ও সামন্তসম্প্রদায়ের ধনসম্পত্তি। এঁরা বিদ্রোহীদের নিকট দেশের শত্রু বলেই পরিগণিত হয়েছেন। আবার ঐ সব সামন্ত প্রভুদের মধ্যে কেউ যে বিদ্রোহীদের সমর্থক ও সহযোগী বন্ধু ছিলেন না, একথা বলা-ও ইতিহাস বিরোধী। যাইহোক,

বিদ্রোহীরা সাধারণ জনসমাজের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। ফলত, অবাধগতিতে ত াঁদের তৎপরতা সম্ভব হয়েছে। ইংরেজ নথিপত্রে বলা হয়েছে; সন্ন্যাসী ফকিরেরা জমিদারগণের সাহায্যে লেগেছে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের মতই ব্যাপারে। কখনো এঁরা পাইক বরকন্দাজ হিসাবে কাজ করেছেন। কখনো বা এক জমিদারের হয়ে অপর জমিদারের সংগে লড়াইয়ে নেমেছেন। সীমান্ত প্রহরী হিসাবেও কাজ করেছেন। সুতরাং সন্ন্যাসী ফকিরেরা লুঠেরা ছিলেন ;—এ কথা বলা হলে, আসল চিত্রের মূল্যায়ন হয় না। ক্ষুদিরামকে ইংরেজরা বলেছেন খুনী, আমরা বলেছি এখনো বলি, নির্ভীক দেশপ্রেমিক। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা ডাকাতি করেছেন। এমনকি শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নায়ক ত্রৈলোক্য মহারাজও এতে অংশ নিয়েছেন। আমরা ত াঁদের বলি দেশসাধক। আসলে এ যাচাই দেশকালের অন্তর্নিহিত তাগিদে। এর মূল সূত্র দেশচেতনা। দেশচেতনার মৌল প্রেরণা সঞ্জাত কর্ম-কৌশল যেমন অনেক সময়ই ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারে না; কারণ মুক্তি সেখানে আসল লক্ষ্য। অর্থাৎ ভুল্‌লে চলবে না "end justifies the means." এমন লক্ষ্যে, ইংরেজশাসনের প্রথম লগ্নে একদল মানুষ অবারণীয় বিদ্রোহ উদ্যমে মেতে উঠেছিলেন ;—অবশ্য সে উদ্যম ছিল কিছু আড়ষ্ট, অসর্তক ও অসংলগ্ন। তবু-ও বলতে হয়, এই মহতী প্রচেষ্টার মধ্যে লুঠেরার দৃশ্য অনুধ্যান নয়, আমাদের অনুধ্যান : তাঁদের দেশভাবনা। এখানে একজন সমালোচকের কটাক্ষ লক্ষণীয় "সন্ন্যাসী ও ফকিরেরা লুটেরা এবং অবাঙালী ছিল এই কথা বলে যাঁরা সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আসল রূপটি চাপা দেবার এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার ভিত্তিকে মিথ্যা প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরই পোষকতা করেছেন।"১৩১

আমাদের অনুমান, বঙ্কিমচন্দ্র কর্মজীবনের নিরজন অবকাশে ইংরেজদের লিখিত নথিপত্র দেখার চেষ্টা করেছিলেন। এছাড়া গ্লাইগের 'Memoirs of warren Hastings' তিনি যত্নসহকারে পাঠ করেছিলেন এবং হাণ্টারের 'Annals of Rural Bengal' বইখানা অবশ্যই দেখে ছিলেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য, বঙ্কিম যদি আরো প্রযত্নে ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্ব অনুধাবন করতেন তবে আনন্দমঠের সংগে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ভাবাদর্শ ছাড়া-ও ঐতিহাসিক রূপপ্রকৃতি অনেক বেশি নির্ভেজাল পরিতন্ময়তার গুণে মনোগ্রাহী হতে পারত।

কারণ শিল্পিভাব ফোটাতে গিয়ে বাস্তবতা হারিয়েছেন। বাস্তবতা আনতে ভাবের খেই হারিয়েছেন। আবার বাস্তব-ভাব রাখতে গিয়ে দেশকাল পরিস্থিতির কথা চিন্তা করেছেন। তাই তিনি চিন্তা করেছেন 'ইংরেজ' রাখা হবে না 'যবন' রাখা হবে; 'বীরভূম' রাখা হবে না 'উত্তরবঙ্গ'। আবার ক্যাপটেন উড্‌কে রাখলে ইতিহাস হয় না, অতএব তিনি এডওয়ার্ডস-কে আনলেন। লিখে-ও ভরসা নেই; আড়াল চাই। অতএব বঙ্কিম বিজ্ঞাপন দিলেন, "ইংরেজরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" অথবা এটি: "উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে।...এ অনৈক্য আমি মারাত্মক বিবেচনা করি না—কেননা, উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।"১৩২ কিন্তু সত্যের অপলাপ হোক এ-ও তিনি চান না। তাই তিনি লিখলেন: "তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপনে যে অনৈক্যের কথা লেখা গিয়াছে, তাহা রাখিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই বিবেচনা করিয়া, এই সংস্করণে আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করা গেল।"১৩৩

অথচ যা দেওয়ার দরকার ছিল, তা দেওয়া হয় নি। যা জানানোর দরকার ছিল, তা জানানো হয় নি, তাই লিখেছেন: "এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালায় সন্ন্যাসীবিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস ইংরেজিগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল।"১৩৪ কিন্তু সেটুকু সব নয়। তিনি হাণ্টার সাহেবের বিখ্যাত গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করলেন না। সেখানে ছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের আসল চিত্র। এখানে বিদ্রোহীদের চিনে নেওয়া-ও সহজ। *

এখানে একটি বিষয় গভীর করে ভাবা দরকার। যদি সন্ন্যাসীবিদ্রোহের আলোকে আনন্দমঠ না হবে, তবে বঙ্কিমচন্দ্র একথা লিখেছিলেন কেন; "যে যুদ্ধগুলি উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বীরভূম প্রদেশে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় হইয়াছিল।" (৩য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন) তাহলে এমন ভাবা-ই সংগত যে, যুদ্ধগুলি ইতিহাসের আলোকে রচিত; শুধু ঘটনা ভূমি পরিবর্ত্তিত। এমন হলো কেন? এর-ও দুটি কারণ আছে মনে হয়:

১. হয়তো আনন্দমঠ লেখার পূর্বে ইতিহাসের গভীর-পাঠ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

২. হয়তো ঘটনাভূমি পরিবর্ত্তন করে রাজ-রোষ থেকে অব্যাহতি পেতে চেয়েছেন। অর্থাৎ আনন্দমঠের আনন্দ সেনানীরা বিদ্রোহ বিপ্লবের মাধ্যমে

কুঠারাঘাত করেছে ইংরেজদের ওপর নয়; বীরভূমের যবন, অর্থাৎ মুসলমান রাজার অপশাসনের বিরুদ্ধে। একথা আপাত লিখে আন্তরভার বোঝাতে চেয়েছেন ছদ্ম-কৌশলে।

কিন্তু এখানে বলার থাকে। বঙ্কিম যদি আত্মপক্ষ সমর্থনে এমন কথা লেখেন কিংবা ভাবপ্রকাশ করেন, তবে তা প্রগতি বিরোধী। "অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বস্তুবাদীরা ধ্যান-ধারণার ক্ষেত্রে·· গোলামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সূত্রপাত করেছিলেন সামন্ত তন্ত্রের উচ্ছেদের সংগ্রাম।"১৩৫

যাইহোক, নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল হোক কিংবা অনবধানবশতঃ ভুল হোক তাকে স্বীকার করলেন 'অনৈক্য' বলে। তাই দেখি, তৃতীয় সংখ্যার অনৈক্য পঞ্চমবারে "আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করা গেল"। অথচ বীরভূমকে আর উত্তরবঙ্গ করা গেল না। কেন যে তা সম্ভব হয় নি, এ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের দেওয়া অভিমত হলো এই: "প্রথম চারি সংস্করণে 'আনন্দমঠে'র ঘটনাস্থল ছিল বীরভূম, অজয়ের তীরবর্ত্তী কোনও আরণ্য ও পার্বত্য প্রদেশ; কিন্তু আসল সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল উত্তরবঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র তৃতীয় সংস্করণে এই ভুলের উল্লেখ করিয়াছেন, পরিবর্তন করেন নাই। পঞ্চম সংস্করণে এই পরির্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে বীরভূমের নদী, অরণ্য ও পর্বত এমন ভাবে মিশিয়া গিয়াছিল যে, সামান্য কয়েকটা নাম তুলিয়া অথবা বদলাইয়া বীরভূমকে বরেন্দ্রভূম করা সম্ভব হয় নাই; বরেন্দ্রভূমিকে ছাপাইয়া বীরভূমিই ফুটিয়া উঠে।"১৩৬

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত 'আনন্দমঠ' সন্ন্যাসীবিদ্রোহের ভাব প্রেরণা সঞ্জাত, ইতিহাসের মৌলচিন্তাপ্রসূত ও সুসমন্বয়াবান্বিত। এবং আনন্দমঠ অনাগত বিদ্রোহ-বিপ্লবী মানসের মননশীল তত্ত্ব জিজ্ঞাসার সাংকেতিক শব্দ চিত্র ও নবোদ্বেধিত বিস্ময়: আর তা থেকেই পরবর্তী বিপ্লবীরা সমিধ্ সংগ্রহ করেছিলেন জীবন-বিপ্লবের উদ্বেগ ও উত্তেজনায়।

আরো বলি, "জাতীয়তা বোধের ভাবাদর্শকে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় আধারে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে দেশের ইতিহাসের দিকেই তাকিয়ে ছিলেন।"১৩৭ কিংবা বক্তব্যের স্বভাবিক প্রয়োজনে এই মন্তব্যটি অযৌক্তিক নয়: "লেখক যথার্থ ইতিহাসের মধ্যে—জনসাধারণের কথায় প্রবেশ করতে চেয়েছেন।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের যারা শিকার সেই সহস্র সহস্র নরনারী, শত শত গ্রাম, সন্ন্যাসীবিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল যারা, সেই বিপুল সংখ্যক সন্তানেরা দলে দলে এই উপন্যাসের মধ্যে ভীড় জমিয়েছে। তাদের যুদ্ধ পলায়ন জয়োল্লাস, তাদের সমবেত সঙ্গীত, শত্রুনির্যাতন লুঠতরাজ প্রভৃতির বিবরণ উপন্যাসের একটা প্রধান স্থান দখল করেছে।"১৩৮

৩. উত্তর বংগের প্রজাবিদ্রোহ ও বাংলা সাহিত্য…

"যদি কেহ অত্যাচারের বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন, যদি কেহ মানব প্রকৃতির মধ্যে সয়তানবৃত্তির পাপ অভিনয় দেখিতে চাহেন, তাহা হইলে একবার দেবীসিংহের বিবরণ অনুশীলন করিবেন। দেখিবেন, সেই ভীষণ অত্যাচারে কত জনপদ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে! কত কত দরিদ্র প্রজা অন্নাভাবে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে! কত কত জমীদার ভিখারীরও অধম হইয়া দিন কাটাইয়াছে! কুলললনার পবিত্রতা হরণ, ব্রাহ্মণের জাতিনাশ, মানীর অপমান, এই সকল পৈশাচিক কাণ্ডের শত শত দৃষ্টান্ত ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাইবেন।...সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে এরূপ পাশব অত্যাচারের দৃষ্টান্ত অধিক নাই বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"১৩৯

ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের মর্মান্তঃসঞ্চারী এই উক্তিটির সারবত্তা ইতিহাসের প্রাসঙ্গিকতায় উজ্জ্বলতর হবে। আঠারো শতকের শেষভাগে উত্তরবংগে যে বিদ্রোহ প্রধূমিত হয়েছিল তার কারণ; ইংরেজ পুরুষদের সহযোগী দেবীসিংহ ও গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের মিলিত শোষণ-অত্যাচার। ন্যায়নীতি বিবর্জিত কর্মকাণ্ডের এই দুই নায়ক কিভাবে দেশকে অরাজকতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন ;—তা নিয়ে সাহিত্য ঃ উপন্যাস সাহিত্য রচিত হয়েছে। যদি-ও একশো বছর পরে এই সাহিত্য কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে, তবু-ও এর তুল্য মূল্য আর কিছু নেই। কেন না, দেশের ইতিহাসের প্রতি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে এটি সমর্থ হয়েছিল। এই উপন্যাসটির নাম 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ'। লেখক, চণ্ডীচরণ সেন। তিনি তাঁর উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। মোট ১৮৮ পৃষ্ঠার বই এটি। এতে অবতরণিকা

ও উপসংহার সহ ৩২টি অধ্যায়। ১২৯২ সালে ৬৪-১ মেছুয়া স্ট্রীট হতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক উপন্যাসটিকে ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করার জন্য পরিশিষ্টে কোম্পানীর নথিপত্র ও চিঠিপত্রাদির উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে বাস্তবায়িত করে তুলেছেন।

ইংরেজ শাসন ও শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে উত্তর বংগের জনসমাজ কত বেশি সচেতন ছিল, তা আগেই বলে এসেছি। হেস্টিংসের একান্ত মন্ত্রদাতা দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও ইজারাদার দেবীসিংহ যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন; তা অবর্ণনীয়। এই অত্যাচার ও শোষণচিত্র আঁকলেন চণ্ডীচরণ তাঁর 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' উপন্যাসে। এই রচনার পেছনে তাঁর ইতিহাস বোধ, মানবিকসত্তা ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল সন্দেহ নেই। একদা ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি লিখেছিলেন ;—"বড় দুঃখের বিষয় যে আমাদের দেশীয় সুশিক্ষিত লোকেরা দেশের ইতিহাস একেবারে জানেন না…।"১৪০

আবার ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এক জবাবদিহিতে তিনি জানালেন ;—"সিরাজউদ্দৌল্লার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ তন্তুবায়, সুবর্ণ বণিক এবং বঙ্গের কৃষকদিগের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয় …।" আরো আছে। "বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিতে জনসাধারণের রুচি হয় এই নিমিত্তেই উপন্যাসের আকারে এই পুস্তক লিখিত হইল।"১৪১
এই উদ্ধৃতি দুটিতে লেখকের ঐতিহাসিক চেতনার সম্যক্ পরিচয় মেলে আর এই চেতন-প্রবাহ থেকেই তিনি তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' লিখেছিলেন ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে।

এখানে বলে রাখা ভালো, আলোচনার এই ধারাটি সন্ন্যাসীবিদ্রোহের অধ্যায়ে পর্যায়ভুক্ত করার প্রয়াস পেয়েছি। কারণ, আমরা সন্ন্যাসী ফকির বলতে যাদের বিদ্রোহী বলেছি; তারা স্থানীয় জনগোষ্ঠীরই একটি অংশ। এক্ষেত্রে স্থানীয় জনমানসের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ও সহায়তার প্রশ্নটি-ও গভীর করে ভাবতে হয়। তাই, আঠারোশতকের উত্তর বাঙলার প্রজা বিদ্রোহকে সন্ন্যাসীবিদ্রোহ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা চলে না। একটি উদ্ধৃতি দিই; "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অত্যাচারে প্রপীড়িত উত্তর

বঙ্গের সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বিদ্রোহ তথা কৃষক বিদ্রোহকে ভিত্তি করে চণ্ডীচরণ তাঁর দ্বিতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' রচনা করেন।"১৪২

উপন্যাসে : ঐতিহাসিক ভিত্তি

এক

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানি লাভই হলো শোষণোৎসবের পরিণামবহ প্রত্যক্ষ একটি সংকেত। আমরা আগেই বলেছি, বাংলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে নিষ্ঠুর নাজিম রেজা খাঁ-এর ওপর। রেজার প্রীতি ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে দেবীসিংহ ভাগ্য ফেরালেন। তিনি পূর্ণিয়ার ইজারা ও শাসনভার পেলেন। পশ্চিম ভারতের পাণিপথের নিকটবর্তী কোনো এক গ্রামের মানুষ তিনি।১৪৩ ভাগ্যান্বেষী দেবীসিংহ মুর্শিদাবাদে এলেন। রেজাখাঁ-এর সৌজন্যে লুণ্ঠন ও উৎপীড়নের জাদুকাঠি তিনি হাতে হাতেই পেলেন।

পূর্ণিয়া হাতে পেয়ে দেবীসিংহ পীড়ন-রঙ্গ সুরু করলেন। দিনে দিনে নোতুন কর বসাতে লাগলেন। খাজনা আদায়ের ক্ষেত্রে তিনি কঠিন প্রতিমূর্তি। ছ'লক্ষ টাকা খাজনা আদায় যেখানে সম্ভব হতো না; সেখানে শাসকবর্গকে খুশি করার জন্য বার্ষিক যোলো লক্ষ টাকার বন্দোবস্ত করলেন।১৪৪ ফলত, পূর্ণিয়া ধ্বংসের মুখে পড়ল। অসহনীয় শোষণে সেদিনের মানুষ জংগলে আশ্রয় নিল। তাতে-ও তাদের রেহাই ছিল না। ইজারাদার জংগলে গেলেন পলাতক অনাদায়ী প্রজার খোঁজে। খাজনাই শেষ কথা। না দিতে পারলে মৃত্যু-বিধানই তাঁর শেষ দান। এই অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি চায় পূর্ণিয়াবাসী। তাই তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। বিদ্রোহের আগুন জলে ওঠে সর্বত্র। হেস্টিংস বিষয়টি অনুধাবন করলেন। দেবীসিংহ পদচ্যুত হলেন। কিন্তু দেবীসিংহের গুণের-ও শেষ ছিল না। উৎকোচ দিয়ে হেস্টিংসকে বশীভূত করলেন। দেবীসিংহ এ-ও জানতেন, উৎকোচ দেবার মধ্যপন্থা কী এবং কেমন! তাই তিনি এমন একটি মানুষের খোঁজ করলেন;

যাতে করে তার সুযোগ ও সহায় মেলে। পেলেন-ও তিনি। হেস্টিংসের প্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দের ছায়াতলে এলেন তিনি। কারণ তিনি জানতেন: "দেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার ও প্রতারণা এবং প্রবঞ্চনামূলক ব্যবহারে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ হেস্টিংসের কনিষ্ঠ সহোদর সদৃশ ছিলেন।"১৪৫ তাই দেবীসিংহ যখনই কঠিন সমস্যায় পড়েছেন, তখনই গঙ্গাগোবিন্দের সম্প্রীতি-আশ্রয়ে ছুটে এসেছেন।

এখানে সমুল্লেখ্য যে, ভ্রাম্যমাণ সমিতির (Committee of Circuit) সভাপতি হিসাবেই হোক, আর ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডিরেক্টরদের খুশি করার জন্যই হোক ; তিনি বাধ্য হয়ে দেবীসিংহকে পদচ্যুত করলেও দেবীসিংহের উৎকোচ-প্রলোভন ও গঙ্গাগোবিন্দের সুপারিশকে অবজ্ঞা করতে পারেন নি। ফল কথা, আবার তিনি দেবীসিংহকে ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে বর্দ্ধমান, ঢাকা, পাটনা ও দিনাজপুরের প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিলের দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। অনেকটা এই যুক্তিতে যে, দেশীয় রাজস্ব আদায় তরুণ ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব নয়। দেবীসিংহ স্বার্থের পরবশ। সুতরাং তরুণ ইংরেজদের জন্য অলস-আয়েশের ঢালেল ব্যবস্থা করলেন। এদের নর্তকীবৃত্তেরও ঠেলে দিয়ে তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। এতে নিজের সম্পত্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। রাজস্ব ভাণ্ডারে অল্পস্বল্পই জমা পড়ল। এ সময়ে দেবী-সিংহের অত্যাচার সম্পর্কে চারিদিকে প্রতিবাদ ওঠে। হেস্টিংস তখন প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল ভেঙ্গে দিয়ে দেবীসিংহকে দিনাজপুর ও রঙপুর অঞ্চলের ইজারা দান করেন। শুধু তাই নয়, দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান পদে-ও নিযুক্ত করলেন মাসিক একহাজার টাকার বেতনে।

সুতরাং স্পষ্টই দেখ্‌ছি যে, হেস্টিংস দেবীসিংহকে বাধ্য হয়ে অপসারিত করলেও অপর আরেকটি লোভনীয় পদে নিয়োগ করার চিন্তা করে রাখতেন আগে ভাগে। এর কারণ, হেস্টিংসের অপরিমিত অর্থপ্রীতি। তারই যোগানদার ছিলেন দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দসিংহ। ফলে দুজনকেই তাঁর রাজকাজে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। যাইহোক পূর্ণিয়া গেল তো দিনাজপুর এলো। দেবীসিংহের পীড়ন-তাড়নের নবতর পর্যায় সুরু হলো। রাজ-পাত্রমিত্রদের সন্তোষ বিধানের মাধ্যমে তিনি রাজার কৃপালাভ করেছেন।

তাই তাঁর অন্তহীনলোভ তাঁকে প্রায় উন্মত্ত করে তোলে। দিনাজপুরের দেওয়ান হওয়ার পর তিনি রঙপুর ও ইদ্রাকপুর পরগণার ইজারা-বন্দোবস্ত নিলেন। সংগী নিলেন হররামকে। "হররাম নামে এক পিশাচ প্রকৃতির মনুষ্য তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইয়া দেশ মধ্যে ভয়াবহ কাণ্ডের ক্রীড়া দেখাইতে লাগিল। কি জমীদার, কি প্রজা, কি পুরুষ, কি স্ত্রী কাহারও বিন্দুমাত্র নিষ্কৃতি ছিলনা। এরূপ লোমহর্ষক অত্যাচার কেহ কখন ও দেখে নাই, কেহ এখনও শুনে নাই।"১৪৭

দেবীসিংহ খাজনা আদায়ের যে কৌশল-এর অবলম্বন করেছিলেন ; তা হলো এই ঃ

১. দেবীসিংহ জমিদার ও ভূস্বামীদের ওপর কর বৃদ্ধি করলেন। বৃদ্ধি-জমা এমনই অবিশ্বাস্য রকমের চাওয়া হলো যে, অনেকেই জমিদারী বিক্রী করে-ও দেবীসিংহের আকাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণ করতে পারলেন না। আবার আশ্চর্যের বিষয় হলো এই, জমিদারগণ যখন জমিদারী বিক্রী করতে বাধ্য হতেন, তা কেনার লোক শুধু দেবীসিংহই ছিলেন। তিনি নাম মাত্র মূল্যে সেসব কিনে নিতে লাগলেন।

২. দেবীসিংহ সমস্ত নিষ্কর ব্রহ্মত্র 'লাখেরাজ' সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন।

৩. অনাদায়ের অভিযোগে স্ত্রীজমিদারদের১ জমিদারী পর্যন্ত হস্তান্তর করা হলো। এমন কি, তাদের মূল্যবান অলংকারাদি-ও বাদ গেল না।১৪৮

সুতরাং দেবীসিংহের আরোপিত কৌশলের ফলে নিরীহ চাষীদের ওপর ক্রমাগত চাপ পড়ল। তারা মহাজনদের কাছে-ও হাত পাতে। হাতে যা পেতো, তা দেবীসিংহের চরণে নিবেদন করে-ও দেবীসিংহের রাজস্ব-ঋণ পরিশোধিত হলো না। শেষে, "পিতা পুত্রকে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইল, স্বামী স্ত্রীকে চিরবিসর্জ্জন দিল। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থসংসার হাহাকার ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।"১৪৯

১. দেবী চৌধুরাণী প্রসংগত উল্লেখ্য।

দুই

"এই সমস্ত ভীষণ অত্যাচারের অভিনয় করিয়াও যখন প্রজাদের নিকট হইতে আপনার আশানুযায়ী, আকাঙ্ক্ষানুযায়ী অর্থ প্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা হইল না, তখন দেবীসিংহ ··রাজস্ব সংগ্রাহকের পদ পরিবর্তন করিতে লাগিলেন।"১৫০ এর ফল-ও দ্রুত ঘটল। নোতুন নোতুন সংগ্রাহকদের কীর্তি কলাপ-ও অভিনব। স্ব-কীয় পরাক্রম দেখাতে এরা কসুর করেনি। এমনকি, তারা প্রজাদের ওপর শারীরিক নির্যাতন ও চালিয়েছে। সেসব নির্দয় কাণ্ডের দৃষ্টান্ত১৫১ এরূপ;—নিরীহ প্রজার আঙুল 'রজ্জুতে বন্ধন' করে ক্রমাগত পাকদিয়ে বিচ্ছিন্ন করা, কিংবা হাতুড়ির আঘাতে চূর্ণ করা হতো। অথবা ক্রমাগত বেতমারা, আবার কখন-ও বেত-লাঠির আঘাতের পর 'বিল্বশাখা'র দ্বারা আঘাত করা হতো। এবং তুষারশীতল জলে ডুবিয়ে রাখা, কিংবা পিতা ও পুত্রকে একই বন্ধনীতে রেখে প্রহার করা হতো। এমন শাস্তি চলত নারী পুরুষ নির্বিশেষেই। নারীদের ক্ষেত্রে যেমন, "স্বামীর অঙ্ক হইতে স্ত্রীদিগকে কাড়িয়া আনা হইত। ···সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে সাধারণের সমক্ষে উলঙ্গ করিয়া অবিরত বেত্রাঘাত করা হইত! ...ইহাতেও নিস্তার নাই, তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশ খণ্ড১৫২ বক্রভাবে নত করিয়া যুবতীগণের স্তনবৃন্তে বিঁধিয়া দিত! ···পরে তাহাদের সেই সমস্ত ক্ষতস্থান শুল ও মশালের আগুনে দগ্ধ করিয়া যন্ত্রণার সীমা ক্রমেই বৃদ্ধি করা হইত!"

ইংরেজদের মহামোহ-ইংগিতে দেবীসিংহ দিনাজপুর ও রঙপুরে যে শোষণ-উৎপীড়ন-অত্যাচার করলেন; তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-বহ্নি অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রজা সাধারণের মধ্যে যে চেতনার সঞ্চার হলো তা ছিল মুক্তি সঞ্চারী। ফলে সুরু হলো গণ-জাগরণ। দেবীর বিরুদ্ধে রঙপুরের কালেক-টর গুডল্যাড সাহেবের নিকট প্রতিবাদ জানানো হলো। কিন্তু তিনি দেবী পন্থী। তাই জটিলতায়-ও পরাঙ্মুখ। ফলকথা, বিদ্রোহ সুরু হলো। বিদ্রোহীরা নুরুলউদ্দিন নামে একজনকে নেতা নির্বাচন করল। নুরুলউদ্দিন নিজেকে নবাব বলে ঘোষণা করলেন। দয়াশীল১৫৩ নামে একজনকে তাঁর দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। এবং সমবেত একটি সভায় স্থির হলো, দেবী-সিংহকে আর কর দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র বিদ্রোহের সুষ্ঠু পরিচালন ও

ব্যয় নির্বাহের জন্য ডিং-খরচা (Ding-khurcha) নামে এক প্রকার কর ধার্য করা হলো।১৫৪

১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রঙপুরে বিদ্রোহাগ্নি ছড়িয়ে পড়ে। অবারণীয় তার গতি ও উদ্যম। এ হলো উত্তরবংগের হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত চ্যালেঞ্জ। আসলে বাঙালীর চিত্তপ্রান্তে যে বিচিত্রতর অনুভূতির জাগৃতি হয়েছিল সেদিন; সেই ক্রমপিনদ্ধ বাঙালীর দীপ্ততেজের কাছে তখনকার মত ইংরেজও দেবীসিংহরা সুবিধে করতে পারলেন না। সুতরাং বিদ্রোহ কাজীরহাট, কাঁকিনা, টেপা, ফতেপুর ও চাকলায় ভীষণ রূপ নিল। বিদ্রোহীরা কর সংগ্রাহকদের বিতাড়ন ও দেবীসিংহের নায়েব গোমস্তাদের হত্যা সুরু করল।১৫৫ দেবীসিংহ ভীত হলেন বিদ্রোহীদের দুর্মদ প্রতাপে। তিনি গুডল্যাড করপুটের অভয় আশ্রয় চাইলেন। সাহায্যের হাত প্রশস্তই ছিল। দেবীসিংহের অসহায় অবস্থা গুডল্যাডের মনেও স্পর্শ লাগে। তিনি দেবীর নিরাপত্তার জন্য সিপাহীবাহিনী প্রেরণ করলেন। এতে নেতৃত্ব দিলেন লেফ্‌টেনান্ট ম্যাকডোনাল্ড সাহেব।১৫৬ উত্তর ও দক্ষিণ থেকে ইংরেজবাহিনীর সাঁড়াশী-অভিযানে দুটি খণ্ড যুদ্ধ হলো। একটি মোঘল হাট ও অপরটি পাটগ্রামে। মোঘল হাট ছিল দেবীসিংহ ও ইংরেজদের প্রধান ঘাঁটি। বিদ্রোহীদের আক্রমণে শাসক শ্রেণী ক্ষণিক হতচেতন হলে ও অল্পসময়ের মধ্যে অবস্থা আয়ত্তে আনলেন। দু'পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হলো। এই যুদ্ধে নূরুলউদ্দিন আহত হলেন। এই আহত যন্ত্রণা-ই মুক্তিকাম অন্তর-দীপটিকে নিভিয়ে দিল। তখন-ও বিদ্রোহের তরংগভংগ হয়নি বটে। কিন্তু শেষ দৃশ্যটি অভিনীত হলো পাটগ্রামে; ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি। লেঃ ম্যাকডোনাল্ড-এর একটি বিশেষ কৌশল ও অকস্মাৎ আক্রমণে বিদ্রোহী বাহিনী সম্পূর্ণ পরাস্ত হয়। এতে ষাটজন মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বহু আহত ও ধৃত হলো।১৫৭

কাল ঘোষণা করল 'পাটগ্রাম কলঙ্ক' বলে। কিন্তু মহাকাল সংগ্রামী মানসের কামনা ভাবনার সর্বতোভদ্র যে রূপ, আর মহোচ্চ সংগ্রামী ঐতিহ্য তাকে স্মরণ করে গৌরবের সংগে।

তিন

"দেবীসিংহ, গঙ্গাগোবিন্দসিংহ, গুডল্যাড্ এবং হেস্টিংস রঙ্গপুর দিনাজপুরের অত্যাচার গোপন করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কালে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল। কারাগার বাসিনী অনাথা রমনীগণের ক্রন্দন সমুদ্র পার লইয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত পৌছুল। শান্ত সুশীলা লজ্জাবতী বঙ্গ মহিলাগণ অতি ক্ষীণস্বরে কারাগারে বসিয়া যে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, সেই দুর্ব্বল ক্রন্দন ধ্বনি, সেই ক্ষীণ আর্ত্তনাদ কালে মহাত্মা এডমাণ্ডবার্কের সুগভীর কণ্ঠধ্বনিতে প্রকাশিত হইয়া জগদ্ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, করুণ রস পরিপূর্ণ জীবন্ত ভাষায় ইতিহাসে সে ক্রন্দন ধ্বনি উল্লিখিত হইয়া ভাবী-বংশাবলীর কর্ণে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে লাগিল।"১৫৮

কলকাতা কাউন্সিল এই বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানার্থে পেটারসন সাহেবকে রঙপুরে প্রেরণ করলেন। পেটারসনকে নিযুক্ত করার সময় হেস্টিংস আশান্বিত ছিলেন যে, তিনি শুধু বিদ্রোহীদের দোষ ত্রুটি সম্পর্কেই অনুসন্ধান করবেন এবং হেস্টিংস শিবিরের বিরুদ্ধাচরণ করবেন না। কিন্তু ঘটনা বিপরীত। তিনি যা দেখলেন, যেমন শুনলেন, সে সব তথ্য-কাহিনীর রিপোর্ট দাখিল করলেন। হেস্টিংস বললেন, মিথ্যাবাদী, সত্যকথন এতে নেই। অতএব তদন্ত হোক। পেটারসনকৃত রিপোর্টের ওপরই তদন্ত-কমিশন বসল।

সে তদন্ত পাঁচ-ছ' বছরে-ও (১৭৮৪-৮৯) শেষ হলো না। অবশ্য ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে হেস্টিংস স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করলেন। যাত্রা সন্ধিতে হেস্টিংস এত দিনের নিত্যসহচর গঙ্গাগোবিন্দকে উপহার দিলেন দিনাজপুরের অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণা। কিন্তু হেস্টিংসের স্থলাভিষিক্ত কর্ণওয়ালিস১৫৯ এই অন্যায় ভূমিদান অবশ্য না-মঞ্জুর করেছিলেন।

কমিশনের তদন্তরায়ে "নরহন্তা পরস্বাপহারক সয়তান (দেবীসিংহ সম্পর্কে) মুক্তি পাইল! ন্যায় ধর্ম্ম মলিন মুখে বঙ্গভূমি হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন!"১৬০ উক্ত কমিশনের রায়ে দেবীসিংহ মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু হররামের এক বৎসর কারাদণ্ড হলো। উপরন্ত দেবীসিংহ বিত্তশালী

হিসাবে পরিগণিত হলেন এবং রাজোপাধির সম্মানে ভূষিত হলেন।১৯১ এর পর অবশ্য তিনি কোম্পানীর কোনো কাজে লাগেননি। কর্ণওয়ালিস-ও সে সুযোগ দেননি। অতঃপর দেবীসিংহ মুর্শিদাবাদের নসীপুরে নিতান্তই দিন কাটিয়ে গেলেন রাজ সুখ-ভোগে

প্রসংগ : সাহিত্য

ইতিহাসের আলোকে দেবীসিংহ ও উত্তরবংগের বিদ্রোহী মানসের পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। এখন আমরা আবেগ বিদ্রোহের সংগে সাহিত্যের যোগ আছে এমন বিষয় বস্তু ; যা এই সেদিনে-ও পাঠকের চিত্তে বিস্ফার সঞ্চারিত করেছিল, তাকে আলোচনার পরিধিতে টেনে আনতে পারি অনায়াসেই। প্রসংগত উল্লেখ্য, আমাদের আলোচনার পরিসরে (১৭৬০-১৮০০) কিংবা অন্তত পরবর্তী কালেও খুব বেশি সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা-ও নয়। এর মধ্যে 'আনন্দমঠ' ও 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' বিদ্রোহের আভাস-ইংগিত দেয়মাত্র এবং 'দেবী চৌধুরাণী' সমকালীন সংকটকে স্বীকার করে বটে। আনন্দমঠ দেশচেতনার আধারে রচিত। আর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ উপন্যাসটি একটি শোষণচিত্র। এতে-ও আছে দেশ চেতনার ব্যঞ্জনা। একটির মধ্যে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বৈচিত্র্য ; আরেকটির মধ্যে শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রাণবান চিত্তের আলোড়ন বৈচিত্র্য। আনন্দমঠ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি। এখানে আমরা যুগচেতনার আধারে রচিত অতীত ইতিহাসের মূল সুরটি সাহিত্যের পশ্চাদ্‌পটে কতটা স্পর্শ করেছে তা বুঝে নেবো।

এক

হেস্টিংসের চরিত্র সম্পর্কে চণ্ডীচরণ সেন লিখেছেন : "দেশের হর্তাকর্তা বিধাতা ওয়ারেণ হেস্টিংস। ভূমিতে জমিদারদিগের কোন চিরস্থায়ী স্বত্ব আছে বলিয়া, তিনি স্বীকার করেন না। তাঁহার অনুগ্রহ ক্রয় করিতে না পারিলে, কাহারও আপন জমিদারী ভোগ করিবার সাধ্য নাই।

ওয়ারেণ হেস্টিংস অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারী লোক। তিনি দেশের আচার ব্যবহার আইন কানুন মতে চলেন না; কোর্ট অব ডিরেক্টরের হুকুমও বড় মান্য করেন না; আপন ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন। তবে দশ বিশ হাজার টাকা উৎকোচ দিতে পারিলে, তাঁর অনুগ্রহের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।"১৬২

উপন্যাসটিতে লেখক হেস্টিংসের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন তা বাস্তবানুগ। হেস্টিংসের স্বৈরাচার, উৎকোচ প্রবণতা ও দেশাচার বিরোধিতার জন্যই তিনি ইতিহাসে কলঙ্কিত। ঔপন্যাসিক এখানে নিপুণশিল্প তুলিতে, কয়েকটি শব্দচিত্রে হেস্টিংস-চরিত্র যথাযথই ফুটিয়ে তুলেছেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরিচয়ে চণ্ডীচরণ সেন লিখলেন; বাংলার নায়েব সুবাদার মহম্মদ রেজা খাঁ-এর অধীনে কানুনগোর কাজ করতেন গঙ্গাগোবিন্দের বড়ো ভাই রাধাগোবিন্দ সিংহ। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে গঙ্গাগোবিন্দ রাধাগোবিন্দের স্থলাভিষিক্ত হলেন। কিন্তু রেজা খাঁর পদচ্যুতির পর রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানী নিজেদের হাতেই রাখলেন। হেস্টিংস তখন বাংলার গভর্ণর ছিলেন। সুচতুর, কার্যদক্ষ গঙ্গাগোবিন্দ হেস্টিংসের সুনজরে পড়লেন। হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দের ওপর এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা রাজস্ব কাউন্সিলের দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলেন। "এতদ্ভিন্ন হেস্টিংসের গৃহের দেওয়ান অথবা ঘরের সরকারে কার্য্য করিতেন।"১৬৩

কিন্তু হেস্টিংসের বিপক্ষ শিবির-ও ছিল। তাই উৎকোচের অন্ধি-সন্ধিতে গঙ্গাগোবিন্দের স্বচ্ছন্দ বিহার সম্পর্কে যখন কলরব উপস্থিত হলো; তখন তাতে হেস্টিংস-ও শংকিত হয়ে উঠলেন। ফলে, একরকম বাধ্য হয়েই গঙ্গাগোবিন্দকে অপসারণ করলেন ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে। কিন্তু বিপক্ষ শিবির তথা কর্ণেল মনসনের মৃত্যুর (১৭৭৬) ফলে হেস্টিংস প্রায় কণ্টক-মুক্ত হলেন। আবার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি (৮ই নভেম্বর, ১৭৭৬) গঙ্গা-গোবিন্দকে পুনর্বহাল করলেন দেওয়ান পদে। এর পর থেকেই গঙ্গাগোবিন্দ অপ্রতিহত ক্ষমতায় বলীয়ান হলেন।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখি, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রেরিত ব্রাহ্মণ পত্রবাহক "মহারাজের জয় হউক" বলে যে পত্রটি দিলেন তার আদ্য-পাঠে ছিল গঙ্গাগোবিন্দ স্তুতি! স্তুতিটি এই রকম ;—

"দরবার অসাধ্য, পুত্র অবাধ্য"
"কেবল ভরসা গঙ্গাগোবিন্দ"

এতে একটি জিনিস পরিষ্কার যে, হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে যে ক্ষমতা দিয়েছিলেন, সে ক্ষমতা-ব্যবহারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিনি সুকৌশলেই হেস্টিংসের নজরের মণি ও প্রিয়পাত্র হয়েছিলেন।

এরপর লেখক গঙ্গাগোবিন্দের সংগে দেবীসিংহের সদ্ভাব-সম্প্রীতির কিছু পরিচয় দিলেন। পারিষদ পরিবেষ্টিত গঙ্গাগোবিন্দের সভায় একদিন "মূল্যবান সুচারু পরিচ্ছেদে সুসজ্জিত একজন কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার পুরুষ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইয়া, সাদর সম্ভাষণে, তাঁহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন; তাঁহার সহিত নানা প্রকার বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন।"১৬৪

বাক্যালাপের কিছু নমুনা উদ্ধার করা গেল ;১৬৫—

'নবাগত কৃষ্ণকায় পুরুষ বলিলেন, মহাশয় আপনার দ্বারা যে আমার অনিষ্ট হইবে, তাহা আমি কখনও মনে করিতাম না। আপনি আমার একমাত্র বল, ভরসা।

গঙ্গাগোবিন্দ। আমার দ্বারা অনিষ্ট হইয়াছে! সেকি?

দ্বিতীয়ব্যক্তি। (আগন্তুক) পদচ্যুত হইলাম এও অনিষ্ট নহে?

গঙ্গাগোবিন্দ। (ঈষৎহাস্য করিয়া) পদচ্যুতির পর আবার তো মকবর হইয়াছেন।

দ্বিতীয়ব্যক্তি। আবার মকবর হইয়াছি বটে; কিন্তু দাগী লোক হইয়া রহিয়াছি। নামের উপর কলঙ্ক পড়িয়াছে।

গঙ্গাগোবিন্দ। মহাশয়, দাগী হওয়াই ভাল। আবশ্যক মতে সেই দাগ দেখিয়াই লোক বাছিয়া লওয়া যায়। সেই দাগ ছিল বলিয়া, মুর্শিদাবাদের রাজস্ব সমিতির দেওয়ান হইয়াছেন।...

গঙ্গাগোবিন্দ । আপনি এখন চিহ্নিত লোক। ওয়ারেণ হেষ্টিংস নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, আপনি অত্যন্ত কার্য্যদক্ষ এবং উপযুক্ত কর্ম্মচারী। আপনাকে তিনি কখনও ছাড়িবেন না।

দ্বিতীয় ব্যক্তি । আপনার এই সকল কথার কিছু অর্থ আমি বুঝিনা। গভর্ণর জেনেরেল যদি আমাকে কার্য্যদক্ষ মনে করিতেন, তবে ১৭৭২ সনের পরিদর্শন কালে আমাকে পদচ্যুত করিলেন কেন? আমিতো প্রাণপনে সরকারি কার্য্য সাধন করিয়াছি। ১৭৭০ সনের ঘোর দুর্ভিক্ষের সময় ও রাজস্ব আদায় করিতে কোন ক্রুটী করি নাই।

গঙ্গাগোবিন্দ । রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে আপনার ন্যায় কার্য্যদক্ষ লোক যে পাওয়া যায় না, তাহা গভর্ণর জেনেরেল বিলক্ষণ জানেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি । তাহা জানেন, তবে বরখাস্ত করিলেন কেন?

গঙ্গাগোবিন্দ । তিনি কি আর ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন। বিলাতি সভ্যতার অনুরোধ—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অনুরোধে—আপনাকে তখন বরখাস্ত না করিলে চলে না, তাই আপনাকে বরখাস্ত করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় ব্যক্তি । আপনার কথা আমি কিছুই বুঝিনা। বিলাতি সভ্যতার অনুরোধ কি—খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অনুরোধই বা কি—বুঝাইয়া বলুন দেখি।

গঙ্গাগোবিন্দ । পুর্ণিয়ার লোকেরা আপনার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ, উপস্থিত করিয়াছিল। রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত কত কত জমিদার, তালুকদারের স্ত্রীলোক দিগকে পর্য্যন্ত আপনি মালের কাছারিতে আনিয়া বিবস্ত্র করিয়া রাখিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক দিগের প্রহার করা কিম্বা তাহাদিগকে বিবস্ত্র করা, বিলাতের লোকেরা বড় অন্যায় বলিয়া মনে করেন। এই সকল বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে পর, হেষ্টিংস সাহেব আপনাকে বরখাস্ত

না করিলে, তাঁহার নিজের উপর দোষ পড়িত। সুতরাং বাধ্য হইয়া আপনাকে তখন বরখাস্ত করিয়াছেন। কিন্তু আপনি জানিবেন যে, আপনি তাঁহার একজন বিশেষ প্রিয়পাত্র। আপনার নাম তিনি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন।"

সতর্ক পাঠক মাত্রেই লক্ষ করবেন যে, উভয়ের কথোপকথন লেখক আভাস-ইংগিতে শোনালে-ও আসলে এতে আছে সাহিত্যের মোড়কে সত্য ইতিহাসের উপলব্ধি। এবং কথোপকথনের মধ্যে যে গভীর তত্ত্ব ধরা পড়েছে; তা আমরা আগেই বলে এসেছি। এখানে ঔপন্যাসিকের অসহিষ্ণু প্রাণা-বেগ প্রকটিত হয়েছে। তিনি অতীত ইতিহাসে বিচরণ করেছেন। তাই তাঁর উপন্যাসে যত বেশী না সাহিত্যের গুণ আছে, তার চেয়ে ঢের বেশী আছে ইতিহাসের উপাদান। তবুও বলা যায়, ইতিহাসের মৌলিক বিচার যেমন সাহিত্যের আঙিনায় সম্ভব হয়নি; তেমনি সাহিত্যের রসবিচারে লেখকের অত্যুগ্র ইতিহাস প্রবণতা শিল্পরসকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলতে পারেনি।

দুই

আমাদের বিচার্য সাহিত্যটি দুট সূত্রে গ্রথিত : প্রথমটিতে হেস্টিংস ও তার দুই সহচর গঙ্গাগোবিন্দ ও দেবীসিংহের মিলিত শোষণ অত্যাচার। দ্বিতীয়টিতে, লেখক জানিয়েছেন বিক্ষুব্ধ রামানন্দ গোস্বামীর পুত্র প্রেমানন্দের বীরত্ব ও দেশপ্রেম। লেখক সুনিপুণ তুলিতে এঁকেছেন প্রেমানন্দের চিন্ত-ভাবনা, প্রাণময় আবেদন এবং যুদ্ধ ভাবনার ক্রিয়া-কৌশল।

আমাদের অনুমান, লেখক দেশকে দেখেছেন ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিকায়। তাঁর মনে দেশাত্মবোধ আবেগ সক্রিয় ছিল। উদাহরণ স্বরূপ প্রেমানন্দের চরিত্র সৃষ্টির কথা উল্লেখ করা যায়। নায়কোচিত অন্তর্দৃষ্টি, মহোচ্চ-আদর্শ এবং কল্যাণবোধ সমন্বিত কর্মধারা ইতিহাস ঘটনার সংঘাতে অমূলক না হলেও নায়ক প্রেমানন্দ তাঁর কল্পিত-পুরুষ। আমরা আগেই লক্ষ করেছি,

চাকলার রাজা শিবচন্দ্র-ও দেবীসিংহের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সমবেত রাজা-প্রজা পাত্রমিত্রদের উদ্দীপ্ত করে তুলতে চেয়েছিলেন গভীর অনুভূতিতে।

তাই, মোঘলহাট যুদ্ধে পরাজয়ের পর উপন্যাসের নায়ককে বলতে শুনি: "ভাই জয়পরাজয় উভয়ই আমাদের সমান। আমরা রাজ্যলাভের নিমিত্ত যুদ্ধ করিতে আসি নাই। দেশ প্রচলিত অত্যাচার নিবারণ করিয়া সমগ্র মানবমণ্ডলীর উপকার সাধন করাই আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে ও, ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি দেবীসিংহের ন্যায় নরপিশাচকে রাজস্ব আদায়ের ভার প্রদান করিয়া আর প্রজার উপর অত্যাচার করিতে কখনও সাহস করিবে না। যে অত্যাচার নিবারাণার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিলাম, সে অত্যাচার বিদূরিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের দুঃখের কোন কারণ দেখিনা। কিন্তু আমরা যদি সংগ্রামার্থ প্রস্তুত না হইতাম, তবে এ অত্যাচারের স্রোত চিরকাল প্রবাহিত হইত। চিরকাল দেবীসিংহের কারাগারে শত শত প্রজার বিনাশ…শত শত কুলকামিণীর ধর্ম্ম নষ্ট হইত।"১৬৬

আবার পাট গ্রামের আসন্ন বিপদে প্রেমানন্দ যখন অনুগামীদের পালিয়ে আত্মরক্ষার নির্দেশ দিলেন তখন তারা হৃদয়াবেগে, সমস্বরে তা অস্বীকার করে। এই হৃদয়ানুভূতি ও আত্মোৎসর্গের কারণ কি? এক্ষেত্রে লেখকের ভাবাবেগ লক্ষণীয়। "দেবীসিংহের কারাগারেই তো পচিয়া মরিতাম। কিন্তু যাঁহার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া ছিলাম বলিয়া আমাদের পুত্র পৌত্রগণ দেবীসিংহের অত্যাচার হইতেই নিষ্কৃতি পাইবে, যাঁহার সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম বলিয়া, ভবিষ্যতের জননী, স্ত্রী, ভগ্নী এবং কন্যার আর কখনও ধর্ম্ম নষ্ট হইবে না; আজ তাঁহাকে একক সংগ্রাম ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া আমরা কখনও পলায়ন করিব না।"১৬৭

কাহিনীর অভিনব সংযোজন হলো এই অংশে। তার সংক্ষিপ্তি এই: উপন্যাসের নায়ক প্রেমানন্দের পিতা রামানন্দ গোস্বামী। পরমধার্মিক বৈষ্ণব রামানন্দ খাজনার দায়ে দেবীসিংহের কোপে পড়লেন। রাণী ভবানীর কাছে ঋণ করে তিনি দায় মেটালেন। দেবী সিংহ তাতে-ও তৃপ্ত নন। পেয়াদা

পাঠালেন, তাঁর আরো চাই। পুত্রের পরামর্শে তিনি গৃহ ছাড়লেন ; সংগে পুত্রবধূ। প্রেমানন্দ সুতীক্ষ্ণ ছুরি নিয়ে সিংহ দরবারে এলেন। সেখানে চলছিল নারী-নির্যাতন, তাদের চরম অপমান। সহ্য করতে পারলেন না তিনি ; "শরবিদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জনপূর্ব্বক" দেবীসিংহকে আক্রমণ করলেন। কিন্তু ভর্জন-গর্জনই সার হলো। তিনি দেবীর দরবারে হাত-বন্দী হলেন। অপর দিকে প্রাণনগরের জংগলে রামানন্দ ধরা পড়লেন। তিনিও কারাগারে প্রেরিত হলেন। পুত্রবধূ সত্যবতী রামানন্দের দুই শিষ্য জগা ও রূপার সহযোগিতা নিয়ে শ্বশুর-উদ্ধারে নামলেন। বেশ পাল্টায়। এখন তার নাম নানকু। সে কথার বিনুনি দিয়ে কারাগারের নজরদার রামসিংহের কোমল হৃদয় জয় করে। এবং শ্বশুরকে উদ্ধার করে।

অন্য আরেকটি চিত্র আছে। মুর্শিদাবাদের কোনো এক গ্রামের সম্পন্ন-পরিবারের কর্তা জগন্নাথচক্রবর্ত্তী। তিনিও গঙ্গাগোবিন্দের নেকনজরে পড়ে সর্বস্বান্ত হলেন। তিনি আত্মহত্যা করলেন। তাঁর স্ত্রী কমলা দেবী বিপর্যয়ে ঘর ছাড়লেন। বুকে দুটি মৃত শিশুপুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রনাথ দিল্লীর দরবার-অভিমুখে ছুটেছে বিচারের উদ্দেশে। পাগলিনী কমলাদেবীর রূপ-লাবণ্যে দেবীসিংহ মুগ্ধ। অসৎ তাঁর উদ্দেশ্য। স্ত্রী-খোঁয়াড়ে কমলা দেবীকে আবদ্ধ রাখা হলো। কিন্তু পূর্ণিয়ার কারাগারের শিখজমাদার, নজরদার-ও বটে, লক্ষণসিংহের দয়ায় কমলা দেবী মুক্তি পেলেন। একদিন প্রকাশ্য-পথে এক ব্রাহ্মণ যুবার প্রাণনাশের উদ্যোগ চলছে। কমলাদেবীর অনুরোধেই লক্ষ্মণসিংহ তাকে-ও উদ্ধার করেন। এই ব্রাহ্মণ যুবাই কাহিনীর নায়ক প্রেমানন্দ। কাহিনী বিচিত্র মুখী হয়ে ওঠে। যাইহোক, এরপর প্রেমানন্দ ও লক্ষ্মণ সিংহ কমলা দেবীর হারানিধি ক্ষেত্রনাথের অনুসন্ধানে বেরুলেন। কাশীতে এসে তাঁরা এক পরমহংসদেবের নিকট জানলেন ; পাঞ্জাবের দয়ালবাবু নামে সৈনাধ্যক্ষই আসলে ক্ষেত্রনাথ। প্রেমানন্দ এহ সংবাদটুকু সম্বল করে ফিরে এলেন। আর লক্ষ্মণসিংহ গেলেন পাঞ্জাবে, ক্ষেত্রনাথকে আনতে।

প্রেমানন্দ বিদ্রোহী বাহিনীর নেতা। তাই তাঁর বিচরণ ইতস্তত, ফলত আবার তিনি ধরা পড়লেন। এসময়ের সকল সংবাদ কমলাদেবীর গোচরে। তিনি বিদ্রোহীদলের পরিচালিকার কাজ করেছেন। এক সময় তাঁর সংগে

প্রেমানন্দের স্ত্রী সত্যবতীর পরিচয় ঘটে। এখানেই মেলে প্রেমানন্দের পরবর্তী সংবাদ। এরপর সুরু হয় সত্যবতীর নয়া-অভিযান। কলকাতায় এল ; সংগে রামানন্দের শিষ্য জগা। পুরুষ বেশ ধারণ করে রামকৃষ্ণ অধিকারী নাম নেয় সে। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের খোঁজে মুর্শিদাবাদে আসতে হলো। পৈতৃক বাড়িতে এসেছেন গঙ্গাগোবিন্দ। উপলক্ষ, মাতৃশ্রাদ্ধ। তিনি এসময় কল্পতরু হয়েছেন। কল্পতরুর কাছে সত্যবতী ওরফে রামকৃষ্ণ প্রেমানন্দের মুক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দ জানালেন, তিনি দাবি মতন টাকাকড়ি দিতে পারেন ; অন্য কিছু নয়। আবার তারা ফিরে এল কলকাতায়।

কলকাতার পথ। বটবৃক্ষ তলে তারা বসে। পথে এক ব্যস্ত পথিকের হাত থেকে খসে পড়ে কয়েকটি কাগজ। পথিকের খেয়াল নেই। সত্যবতী জগাকে পাঠিয়ে কাগজগুলি দিয়ে আসতে বলে। কাগজগুলি পেয়ে পথিক তদগত। কৃতজ্ঞ পথিকের নাম রামচন্দ্র সেন। তিনি এই উপকারের বিনিময়ে তাদের-ও উপকার করতে চাইলেন। জগা তাদের সমস্যার কথা বলে। রামচন্দ্র সেন সব শুনে রাজস্ব কমিটির অফিসে এলেন। কমিটির কর্তা পিটার মুয়র গঙ্গাগোবিন্দের কাছে জানতে চাইলেন ; প্রেমানন্দ ও তাঁর সংগীদের কয়েদ করার কারণ। তিনি সদুত্তর না পেয়ে বন্দীমুক্তির পরওয়ানা বের করে দিলেন।

মুক্তির পরবর্তী অধ্যায়টুকু বড়ই রমণীয়। স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হলো নিতান্তই অপরিচিত ভাবভঙ্গিতে। রামকৃষ্ণ অধিকারী যেমন নিজের পরিচয় দিলেন না। প্রেমানন্দও চিনতে পারলেন না। কিন্তু এতটা সাহসে ভর করে, শ্রমস্বীকার করে যে তাঁর মুক্তি-প্রয়াসে সফল হয়েছে, সে যে একান্তই আত্মীয়-বান্ধব ; ভাবলেন বটে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। প্রেমানন্দ অন্য পথে চলেন বিশেষ কার্যোদ্ধারে। স্বামীসংগ লাভের সুখটুকু সত্যবতী হারাতে চায় না। তাই সত্যবতী বলে, সে-ও যাবে তাঁর সংগী হয়ে যুদ্ধে নামবে। কিন্তু প্রেমানন্দ আপত্তি জানায়। সে তাঁকে নির্দেশ দেয় পিতা ও কমলাদেবীর কাছে ফিরে যেতে। তখন সত্যবতী বলেন যদি একান্তই অন্যত্র যেতে হয় 'কাণে কাণে একটা কথা শুনিয়া' যান। কথাটা যে কী তা বুঝবার উপায়

নেই। কারণ সংগোপনে বলা হয়েছে। কথাটা যাই-ই থাক, দেহ-মনের যে উত্তাপ এতক্ষণ আলো-আঁধারিতে ছিল ; তা একে অপরের সংলগ্ন হওয়া মাত্রই উভয়ের দেহ মনে বিদ্যুৎ-স্পর্শ সঞ্চারিত হলো। অনুমান করি, গভীর হৃদয়ের প্রতপ্ত উন্মোচন কথা-ই হলো ঔপলক্ষিক। ফলকথা, আনন্দাশ্রুর মধ্যে উভয়ের মিলন হলো অনির্বচনীয় আবেগে।

এরপর প্রেমানন্দ স্ত্রীকে নিয়ে ফিরে এলেন পাড়ুয়ায়। এসে দেখলেন পিতা মৃত্যুমুখী। যেন তারই আশায় এতক্ষণ বেঁচে। পুত্রকে দেখে আভাসে-ইংগিতে রামানন্দ নির্দেশ দিলেন, ভিক্ষার ঝুলিতে যে কাগজ আছে আর তাতে যেমন লেখা আছে তেমনই যেন তাঁর সমাধিস্তম্ভে লেখা হয়। অবশ্য সত্যবতী শ্বশুরের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করেছিলেন ; শুধুমাত্র দুটি শব্দ পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন ; 'পাপাত্মাদুর্মতি' স্থলে 'পুণ্যাত্মা সদাচারী' লেখা হয়েছিল সমাধিস্তম্ভে। সত্যবতী শ্বশুরের ঋণ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। তাই তিনি রাণী ভবানীকে জানালেন ; শ্রম দিয়ে শ্বশুরের ঋণ পরিশোধ করতে চান। কিন্তু রাণী রামানন্দের ঋণ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সেতো ঋণ নয় ; দান। সুতরাং বিনিময়ে শ্রমকিনাহ হাত তাঁর কাম্য নয়। অপরদিকে লক্ষণসিংহ পাঞ্জাব থেকে ক্ষেত্রনাথকে নিয়ে এসেছেন। মাতা পুত্রের মিলন হলো। উপন্যাসটি মিলনাত্মক। শেষ পর্যন্ত পিতা পুত্রের দেখা পেয়েছেন। স্ত্রীর মিলন হয়েছে স্বামীর সংগে কিংবা মাতার সংগে পুত্রের। যাইহোক, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দসিংহ উপন্যাসটির আবেগ-সর্বস্ব উচ্ছ্বাসের অবারিত-উৎসার এই পর্যন্ত-ই।

উপন্যাসে, লেখকের সরস মনের পরিচয় মেলে। কাহিনী বিন্যাসের মধ্যে এই যে সরলবিবৃতি, সহজ পরিণতি ও বর্ণনার স্নিগ্ধভাব—এখানেই লেখকের কুশলতা। আর এই কুশলী ঢঙ-টুকু আমাদের আকর্ষণ করে। তবু-ও প্লট্-এর বিন্যাসে সু-সমতা হারায় যখন ঘটনা কল্পনাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। তখন সুখিত, সুসংযত বিন্যাস-ও অসংলগ্নতা ও একঘেয়েমিতার দোষে দুষ্ট হয়। সুতরাং রসসিদ্ধির পথ ব্যাহত হয়। আর একটি কথা। লেখার উৎকর্ষ সর্বত্র সমান নয়।

ইতিহাসের গতি প্রকৃতির যে চিত্রায়ণ এতে মেলে ; তা বাস্তবানুগ। এবং উপন্যাসের মধ্যে বীরোচিত কর্মকাণ্ড, দেশ চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালীর মনো-প্রকৃতির যে নিপুণ বিশ্লেষণ তিনি করতে চেয়েছেন ; তা দেশ প্রেরণাপ্রসূত। এবং প্রকৃত ইতিহাসের মূলসুরের সংগে বিশেষ অনৈক্য নেই। এমন কি তিনি সুকৌশলে মিলন ঘটিয়েছেন সন্ন্যাসী ফকিরদের সংগে উত্তরবংগের নিপীড়িত জনমানসের। বাঙালীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-বেদনা প্রভৃতি দৃশ্যায়নের প্রয়োজনেই প্রেমানন্দের দীপ্ত-আবির্ভাব। অথচ এত আবেগ-ও সফল হয় নি। সেটুকু লেখক আরো প্রযত্নে তুলে ধরলে, উত্তর-বংগের প্রজা বিদ্রোহ ও বাঙালীমানস বুঝবার পক্ষে উপন্যাসখানি ; সাহিত্য ইতিহাসে একটি সুগঠিত-সুপরিণত প্রামাণ্য দলিল হয়ে উঠতে পারত।

তিন

সন্ন্যাসীবিদ্রোহ আলোচনা প্রসংগে আমরা উত্তরবংগের প্রজা বিদ্রোহের বিস্তৃত আলোচনার চেষ্টা করলাম এই জন্য যে সময়ের পরিধিতে শোষিত, অত্যাচারিত বাঙালীর প্রতিবাদী চরিত্রটিকে স্পষ্ট করে চেনা সহজতর হয়। শোষণাহত বাঙালীর চিত্তভাবনার যে তীব্র দাহ সুরু হয়েছিল ; তারই পরিপুষ্টিতা লক্ষ করা যায় উত্তরবাংলার বিদ্রোহী চেতন প্রবাহের মধ্যে। এর-ও কারণ ছিল। উত্তরবংগের পর্বত ও বনভূমি বিদ্রোহীদের অপার সুযোগ দিয়েছে শক্তিবৃদ্ধি ও পুষ্টিতে। ফলত, ইংরেজ শক্তিকে বেগ পেতে হয়েছে, দিশেহারা হতে হয়েছে। আর এর কারণেই বিদ্রোহ টিকে-ও ছিল বহুকাল। উদাহরণ স্বরূপ একটি ঘটনা।১৬৮ প্রায় সাতশত সন্ন্যাসী ফকিরের একটি দল রঙপুরে প্রবেশ করল। গ্রামবাসীদের কাছে সংগঠন উদ্দেশ্যে কিছু কিছু দান চাইল। বিষয়টি টের পেলেন ইংরেজ কর্তৃপক্ষ। তাদের দমনে লেঃ ম্যাকডোনাল্ড সাহেবকে প্রেরণ করা হলো। সেনাপতির তৎপরতা লক্ষ করে সন্ন্যাসীরা গা-ঢাকা দেয় রঙপুরের পার্বত্য অঞ্চলেই। এইভাবে তারা সরে থাকলো তিন বৎসর। তারপর দেওয়ানগঞ্জের ওপর দিয়ে ব্রহ্মপুত্র পার হয়ে অন্যত্র সরে যায়।

আরেকটি ঘটনা।১৬৯ বৈকুণ্ঠপুরের জংগলে ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ডাকাতের সমবেশ ঘটনার উল্লেখ ইংরেজ রেকর্ডে আছে। আসলে তা ছিল

দেবীচৌধুরাণীর দল, যাদের সংগে ইংরেজের কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ-ও হয়েছিল। এখানে-ও কোনো কিছু সিদ্ধান্ত হলো না। দেবীচৌধুরাণীর বাহিনী নেপাল-ভূটানের দিকে পালিয়ে যায়। সুতরাং বলা যেতে পারে, সন্ন্যাসীদের কাছে অরণ্যাঞ্চল ছিল বিশেষ সুযোগ ও সহায়।

একটু চিন্তা করলে একটি জিনিস পরিষ্কার যে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীতে জংগলের যে বর্ণনা ভাষা পেয়েছে তা' উদ্দেশ্যগত। বিদ্রোহের সহায়ক ক্ষেত্র-ভূমি হিসেবে যে পর্বত অরণ্যের দরকার তা-ও নয়। আসলে বঙ্কিম একশত পূর্বের ইতিহাস ও ইতস্তত তথ্যানুসন্ধানে যেমন জেনেছেন; তারই পটভূমিকায় উপন্যাস লিখতে বসে তাঁর উপন্যাসে যে আবহ তৈরী হয়েছে; তা ইচ্ছেই হোক আর অনিচ্ছেই হোক; তা হয়েছে সত্য ধর্মের পরিপ্রেক্ষিকায়। প্রত্যাঘাতের অন্ধি-সন্ধিতে শোষিত জনমানস অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন অনন্ত কৌশলে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে, অরণ্য-পর্বতের ফাঁকে ফাঁকে। এ বঙ্কিমের কবি কল্পনা নয়। আচার্য যদুনাথ বলেছেন; "মনে রাখিতে হইবে যে, 'দেবীচৌধুরাণী'র জন্য কাল ও স্থান, এ দুইটিই বিদ্রোহের সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া বাছিয়া লওয়া হইয়াছে।"১৭০

বঙ্কিমচন্দ্র দেবীচৌধুরাণীতে ঐতিহাসিক নাম ব্যবহার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বলেছেন, "দেবীচৌধুরাণী, ভবানীপাঠক, গুড্‌ল্যাড্ সাহেব, লেফ্‌-টেনাণ্ট ব্রেনান্ এই নামগুলি ঐতিহাসিক।"১৭১ শুধু উপন্যাসটি যে ঐতিহাসিক নয় একথা বলেছেন। অথচ স্থান কাল পাত্র সবই ইতিহাসের পরিমণ্ডলে আবর্তিত। সুতরাং এটি যে ইতিহাসের ভাবধারায় সংগঠিত নয়, তা-ই বা কেমন করে বলা যায়। আচার্যের ভাষায়, "যে চিত্রপটের সামনে এই গ্রন্থের ঘটনাবলী অভিনীত হইয়াছে, তাহা অর্থাৎ 'দেবী চৌধুরাণী'র সামাজিক আবহাওয়া, একেবারে সত্য।" তিনি আরো বলেছেন "হেষ্টিংস লাট হইবার পর (১৭৭২) এ দেশের দশা যেরূপ ছিল, বঙ্কিম তাহার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বর্ণনা করিয়াছেন।"১৭২

আমরা রঙপুরের ইতিহাসে গুডল্যাড সাহেবের অন্যায় অবিচারের কথা জেনেছি। আবার মেঃ মেক্লারের রিপোর্ট থেকে-ও একজন স্ত্রী [illegible]

সন্ধান মিলেছে। দেবীচৌধুরাণী তাঁর নাম। তাঁর সংগে ভবানী পাঠকের যোগসূত্র ছিল। বেতন ভোগী বিরাট বরকন্দাজ বাহিনী নিয়ে দেবী সর্বদা নৌকাতেই বাস করতেন।১৭৩ আবার যখন ব্রেনান স্ত্রী ডাকাতকে ধরার অনুমতি চেয়ে রঙপুরের কালেকটরকে চিঠি লিখলেন। তার-ও উত্তর মিলেছিল। উত্তরাংশ উদ্ধৃত হলো :

"I can not at present give you any orders, with respect to the female Dackoite mentioned in your letter.—If on examination of the Bengal papers which you have sent it shall appear that there are sufficient grounds for apprehending her, and if she shall be found within the limits of my Jurisdiction I shall hereafter send you such orders as may be necefsary."১৭৪

সুতরাং ইতিহাসের এতগুলি চরিত্র যেমন গুডল্যাড্ সত্য, দেবীচৌধুরাণী ও ভবানী পাঠকের ডাকাতিকর্ম ও সত্য; ব্রেনানের সংগে দেবীর জলযুদ্ধ সত্য তাহলে ইতিহাসের সংগে উপন্যাসের মূল চারিত্রিক কাঠামোর অমিল কোথায়? অন্যভাবে বলা যায়, ইংরেজশাসনের প্রারম্ভে উত্তর বংগের সাধারণ প্রজা যে ভাবে শোষিত ও নিগৃহীত হয়েছে; তার থেকে অব্যাহতি পেতে কিছু মানুষ লুটপাট, ডাকাতি করেছিল ইংরেজ ও ইংরেজ অনুগৃহীত জমিদার ও সামন্তদের ধনসম্পত্তি। এতে উত্তর বংগের প্রায় সকল মানুষই অংশ গ্রহণ করেছিল প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে। একটি কথা মনে রাখা দরকার, বিরাট গণসমর্থন না থাকলে বিদ্রোহের স্থায়িত্বলাভ কিংবা একদল লোক লুটপাট করে দিনেরপর দিন ইংরেজদের চোখে ধুলো দিতে পারত না। একটি দৃষ্টান্ত।১৭৫

"রঙ্গ (রঙ্গরাজ)। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুটিয়াছে। তাই আপনাকে খুঁজিতেছি।

ভ (ভবানীপাঠক)। চল, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া, গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি। গ্রামের লোক আনুকূল্য করিবে?

রঙ্গ। বোধ হয় করিতে পারে।"

উপন্যাসে রঞ্জনপুর হলো সম্ভবত রঙপুরের একটি বড়ো গ্রাম। ইজারাদার হলেন স্বয়ং দেবীসিংহ। এই যে ডাকাতি কর্ম এবং তার যে উদ্দেশ্য

বঙ্কিম জানালেন, এটা বঙ্কিমের কল্পনা প্রসূত নয়। সেদিনে অনেক জমিদারই ডাকাতি করেছেন। আবার অর্জিত সম্পদ বিলিয়ে-ও দিয়েছেন। যাইহোক এই ডাকাতি কর্ম-ভাব দাহনোত্তর পরিশুদ্ধতা ও পরিশীলতার গুণেই মার্জিত। তাই বঙ্কিম এ ডাকাতদের প্রতি দুর্বলতা সুগোপন করতে পারেননি। তারপর আরো একটি কথা। বঙ্কিম লিখলেন, "ইংরেজরাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।"১৭৬ এতে কি এটা মনে হয় না যে, ভবানীপাঠক ডাকাতি করতেন দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য! আর এ দায়িত্ব যখন ইংরেজরা শোষণের ঊর্ধ্বে স্থান দিলেন; তখন ভবানীঠাকুর তাঁর কর্মপথ হতে সরে দাঁড়ালেন। সুতরাং এ ডাকাত সৃষ্টি হয়েছে দেশ কালেরই তাগিদে, অনেকক্ষেত্রেই কল্যাণাত্মিক প্রয়োজনে। ফলত, অসামাজিক, অনৈতিকতার উৎক্রমণ হয়েছে নির্মল হৃদয় বৃত্তিতে। মানবিক সহানুভূতি এরজন্য তাঁদের প্রাপ্য।

ভবানীপাঠক সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর বিশ্বকোষে যা জানিয়েছেন তা এখানে উদ্ধৃত হলো ;—

"ভবানী পাঠক, বারেন্দ্রভূমিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান। দস্যু সর্দার বলিয়া সাধারণে পরিচিত। বাল্যকালে রীতিমত শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়া তিনি জন্মভূমির দুঃখে কাতর হন। মুসলমান-রাজের যদৃচ্ছশাসন হইতে স্বদেশীয় দীনদুঃখী প্রজাবর্গের ক্লেশাপনোদন জন্য তিনি ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিসেনা-সাহায্যে মুসলমানের রাজস্ব অপহরণ করিতেন এবং সেই প্রজারক্ত প্রজার হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেন। ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে ভবানী ও দেবী রঙ্গপুর অঞ্চলে যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসে প্রকটিত আছে। উহা ইতিহাসে ১৭৭৩ খৃঃঅব্দের সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

প্রায় ৫০ সহস্র সন্ন্যাসী অনুচরে পরিবৃত পাঠক খরবেগা ত্রিস্রোতার সলিলরাশি ও তীরভূমি আলোড়িত করিয়া ইংরাজ হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। পাঠকের অপর একজন বন্ধুর নাম মজনুশাহ। শাস্ত্রকুশলী পাঠকের দূরদর্শী পরামর্শ দেবী ও মজনুর করাল-কৃপাণের সহযোগিতা পাইয়াছিল। একে এই সময়ে দেশ দুর্ভিক্ষে প্রপীড়িত, তাহাতে

হেষ্টিংস বাহাদুরের অমানুষিক অত্যাচার। অনাহারে প্রজ্যবর্গ হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কঠোরতাপূর্ব্বক প্রজার রক্ত শোষণে তিলমাত্র বিরাম নাই। এই সমস্ত দেখিয়া শাস্ত্রাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তিনি অন্নবস্ত্রহীন দুঃখী প্রজা দিগকে 'রাজার দোষে প্রজার কষ্ট' দেখাইয়া উত্তেজিত করিলেন, ক্রমে তাহারা দলপুষ্ট হইয়া বিদ্রোহি দলে পরিণত হইল। কিন্তু ইংরাজের কামানগুলির সম্মুখে তরবারি, তীর ও সড়কী লইয়া বাঙ্গালী সৈন্য কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে। যে সময়ে তিনি ইংরাজের বল অধিক দেখিতেন, তখন নিবিড় অরণ্যে লুকায়িত হইয়া আত্মরক্ষা করিতেন। শুভাবসর পাইলেই, তিনি ইংরাজকে শাস্তি দিতে বিরত হইতেন না। এইরূপে সেনানী টমাস প্রভৃতি সসৈন্য বিদ্রোহীদের হস্তে জীবন দান করেন। তিনজনের উপদ্রবে অস্থির হইয়া রঙ্গপুরের তৎকালীন কালেক্টার গুডল্যাড সাহেব লেপ্টনান্ট ব্রেনানকে একদল সিপাহীর সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহারবন্দেই ভবানীপাঠকের সহিত ব্রেনানের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সন্ন্যাসিগণ পরাজিত না হইলেও পরিণামদর্শী ভবানী পাঠক ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া আত্মসমর্পণ করেন।" "শুনা যায়, ইংরাজ-বিচারে তিনি দ্বীপান্তরিত হন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্রেনানের যুদ্ধে ভবানীপাঠক ও তাঁহার অধীনস্থ তিনজন সেনাপতি নিহত, আটজন আহত এবং ৪২ জন বন্দী হয়।"১৭৭

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত "দেবী চৌধুরাণীর গুরু ভবানী পাঠককে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সুস্পষ্টরূপেই ব্রিটিশদের বিরোধী শক্তির নেতা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন, কিন্তু বস্তুগত কারণে ভবানীপাঠককে 'ডাকাইত' বলে ও উল্লেখ করেছেন, অথচ এই ডাকাত সর্দারের প্রতি আন্তরিক পক্ষপাত ও শ্রদ্ধাকেও পুরোপুরি গোপন করেননি। একটু তলিয়ে দেখলেই 'আনন্দ মঠে'র সন্তানদের সংগে 'দেবীচৌধুরাণী'র ডাকাতদের শনাক্ত করা যায় এবং এভাবে শনাক্ত করলে বোঝা যাবে যে দুটি উপন্যাসের ঐতিহাসিক সত্য হলো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসীদের অভ্যুত্থান।"১৭৮

বাংলার জীবনসংস্কৃতিতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের প্রভাব কিছু কম নয়। সন্ন্যাসীদের দুটি দল পূর্ববংগে প্রবেশ করেছিল। একটি দল উত্তর বংগ

থেকে কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা মহকুমার চিলমারী-রৌমারী-মহেন্দ্রগঞ্জ পথে এবং কামারজানি-দেওয়ানগঞ্জ হয়ে গভীর অরণ্য ও বালুকাময় পথে সেরপুর ও আলাপসিংহের পরগণায় প্রবেশ করে। এই দলের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল গারো পাহাড়ের শাহ কামালের দরগা। অপর দলটি সেরপুরে আশ্রয় নেয়। সেরপুরের উত্তরে চরণতলায় ছিল সন্ন্যাসীদের গোপন ঘাঁটি। এখান থেকে পরিচালিত হয়েছে অনেক অভিযান। সন্ন্যাসীরা বিক্ষুব্ধ কৃষকদের সংগে মিলিত হয়ে ইংরেজ ও সামন্তসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আক্রমনের পরিকল্পনা রচনা করেছে।১৭৯ কিন্তু সেই বিদ্রোহীদের পবিত্রতম চেষ্টার প্রতি উত্তরসূরিদের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাই এদের জীবনচর্যা ও সংস্কৃতি মানসে সেই স্মৃতি আজও বহমান। "চরণতলায় যে অক্ষয়বটের নীচে সন্ন্যাসীরা প্রথমে আস্তানা করিয়াছিল সেইখানে এখনও প্রতিবৎসর বৈশাখমাসে হাজং কোচ, প্রভৃতি আদিবাসিগণ মেলায় জমায়েত হয় এবং কালী পূজায় প্রায় লক্ষ ছাগ, মহিষ, কবুতর বলি দেয়। সমবেত মেলার জনতা সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে জয় ধ্বনি করে।... নালিতা বাড়ীর দুইমাইল পশ্চিমে সন্ন্যাসীভিটা, ব্রহ্মপুত্রের বেলা-ভূমিতে সন্ন্যাসীর চর আজও সেই বিদ্রোহীদের অমর স্মৃতি স্বাক্ষর বহন করিতেছে।"১৮০

একটি আশ্চর্যের বিষয়। আজ-ও ভবানীপাঠক ও দেবীচৌধুরাণীকে সাধারণীকৃত করা হয়। ইংরেজদের শুষ্ক নথিপত্রের একমুখিন প্রতীতির ব্যাপক বিশ্লেষণ হয়নি বটে। তবু-ও বলা যায় ভবানীপাঠকও দেবীচৌধুরাণীর দেবত্বীকরণ ও শ্রদ্ধানুভব উত্তর বাংলার জন চেতনার মধ্যে এখনও মিলিয়ে যায় নি। একটি উদাহরণ। "শিলিগুড়ি—জলপাইগুড়ি পিচের সড়কে মাইল দশেক গিয়ে, বাঁহাতি এক কাঁচা রাস্তায় অদূরের সন্ন্যাসীর হাট গ্রামে (এ এলাকা একদা বৈকুন্ঠপুর জঙ্গলের শামিল ছিল) টিন ছাওয়া এক সাধারণ মন্দিরে তাঁদের প্রায় পূর্ণাবয়ব দুটি কাঠের মূর্তি দেবদেবী জ্ঞানে বহুদিন যাবৎ উপাসিত। ছলে বলে কৌশলে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের সেই প্রথম যুগে, দীনবন্ধু এই সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী প্রবলতর শক্তির বিরুদ্ধতা করে নিহত হন। দেশবাসী কিন্তু তাঁদের ভোলেনি, তাঁদের পুণ্য চেষ্টাকে ডাকাতের নিষ্ফল প্রয়াস বলে মেনেও নেয়নি।"১৮১

৪. দিনাজপুরের কবিতা...

দিনাজপুরকে নিয়ে একটি কবিতা১৮২ পাওয়া গেছে। দ্বিজ জগন্নাথের রচনা এটি। এর একটু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আমরা আগেই জেনেছি, হেস্টিংস প্রভিন্সিয়াল কাউন্সিল ভেঙে দিয়ে দেবীসিংহকে দিনাজপুর ও রঙপুরের ইজারা দিলেন। এবং দিনাজপুরের নাবালক রাজার দেওয়ান-ও নিযুক্ত করলেন মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে। ১৮৩

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে দিনাজপুরের রাজা বৈদ্যনাথ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হন। তাঁর বিধবা পত্নী রাণী সরস্বতী জ্ঞাতিপুত্র রাধানাথকে দত্তক নিলেন। হেস্টিংসের কাছ থেকে রাণী রাধানাথের নামে উত্তরাধিকার সনন্দ-ও পেলেন। কিন্তু নাবালক রাজার তত্ত্বাবধায়ক ও জমিদারীর ওপর কর্তৃত্ব ইংরেজদের মর্জি-মাফিক হতো। এ বিষয়ে ইংরেজদের সংগে তাঁর মত-পার্থক্য দেখা দেয়।১৮৪ রাণী চেয়েছিলেন রাজার তত্ত্বাবধান-দায়িত্ব ভ্রাতা জানকীরামের ওপর রাখতে। কিন্তু ইংরেজ সরকার এ দায়িত্ব দেবী সিংহকে দিলেন। পরে অবশ্য জানকীরামের ওপর-ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু জানকীরামের পরিচালনায় ইংরেজ সরকারের রাজস্ব বাকি পড়ার অজুহাতে ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অব রেভিনিউ রাজবংশেরই রামকান্ত রায় নামে একজনকে 'ম্যানেজার' নিযুক্ত করেন। এতে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো। দুরেক কর্তার কর্তৃত্ব সুরু হলো।

রাধানাথ অবশ্য ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে রাজদায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি মাতৃ-শিবিরকে অবজ্ঞা করেননি; জানকীরামকেই পরামর্শ দাতা নিযুক্ত করলেন। আবার রামকান্ত রায়কে-ও বাতিল করেননি। অন্যভাবে বলা যায়, বাতিল করার ক্ষমতা ছিল না। রাজার আবার বাতিক অনেক। তার মধ্যে শিকার একটি। রাজ-কার্যে মন নেই। সতর্কতা-ও নেই। ফলে অন্দরে-অন্তরে ষড়যন্ত্র রাজা টের পেলেন না।

কবি ভাবেন, এটাই বিধিলিপি।

"বিধি নিয়োজিত কর্ম্ম বুঝা নাহি যায়।
নৃপতির মতি হৈল অক্টীর১ প্রায়॥
রাজ্য যেন কার্য্য নাহি উচাটন মন।
মির২ শিকারী সঙ্গে করি ফিরি বনে বন॥

---

১. অক্টী=ব্যাধ, শিকারী। ২ মির—মুখ্য, প্রধান, মির্জা ফার্সী 'মীর' শব্দজাত

রাজার জন্ত রাজ্য নষ্ট। শুধু কি তাই? তা-ও নয়। আরো কারণ আছে। কবির উৎকণ্ঠা:

এক ভুমেতে দেওান১ দুই নাহিক বন্দেজ।
কার কথা কেউ না রাখে কেবল দন্দেজ॥
কার কথা কেউ না রাখে পরস্পর দ্বেষ।
তাথে হৈল রাজ্য নষ্ট কাখে২ দিব দোষ॥

একই রাজ্যে দু'জন ক্ষমতালিপ্সু দেওয়ান জানকীরাম ও রামকান্ত রায়। দুজনেই দু'পক্ষের শক্তি নিয়ে দ্বন্দ্বে নেমেছেন। রাণীর শক্তি ভ্রাতার ওপর বর্তায়, আবার ইংরেজ শিবিরের মহাশক্তি রামকান্ত পেলেন। ফলে পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ, রাজ্যে অমংগলের সূচনা করে। কবি সেই কাহিনী পুরাণের সংগে প্রতিকীকরণ করে বর্ণনা করলেন। যেমন,

প্রজার পাপে পিড়েও৩ রাজা আর নষ্ট রাজ্য।
যাগযজ্ঞ করিতে হয় বেদবিহিত কার্য্য॥
অশ্বমেধ রাজসূয় রাজপ্রিয় আদি।
তিন যুগে রাজাগণ কৈল নানা বিধি॥

কবি ভাবেন, রাজার দেব-দ্বিজে ভক্তি নেই। যাগ-যজ্ঞে বিশ্বাস নেই। ধর্মে কর্মে মন নেই; এ অনাচারে রাজ্যটিকে না। কবি হতাশ হলেন:

শুন ধর্ম্ম সে সব কর্ম্ম লোকে নাহি করে।
যুগ কলিতে হৈল জন্ম রাজ্য দিনাজপুরে॥
নিষ্কৃম যজ্ঞের ক্রম দেবতা বহির্ভূত।
বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি যেন কৈলা আর মত॥
ব্রহ্মা লালা মাণিকচাঁদ জালেন আনল।
হোতা আচার্য হৈল বল্লভ যুগল॥
দেওান রায় রামকান্ত অধিষ্ঠিত হয়্যা।
নিষ্কৃম যজ্ঞের ক্রম যেন বাড়াইয়া॥

১. দেওান=দেওয়ান
২. কাখে=কাকে
৩. পিড়ে=পীড়ন করেন

পলাতক হৈল মন্ত্র শ্রেত রকম ফের।
বিলাত বাকী আদ্যস্থলী হইল যজ্ঞের॥
চক তাথে তহবিল তলব বই নিষ্ফল।
উদখোল হাজি নান্দা আইল মুশল॥

* * *

সর্ব্বযজ্ঞের অঙ্গ প্রমাণ ভোজন।
তাহাবএ আছে মির শিকাবী ভোজন॥

এখানে আমরা কবির বর্ণনাতে জানতে পাই লালা মাণিকচাঁদের নাম। এবং অপর জনের নাম রামকান্ত রায়। অথচ সরকারী কাগজ পত্রে রামকান্ত রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম জানকীরাম বলেই জানা যায়।১৮৫ তিনি ছিলেন রাণী-ভ্রাতা। একদিকে রামকান্তরায়ের দুর্নৈতিকতা, অপরদিকে জানকী রামের (মাণিকচাঁদ ?) অতিচার, অনাচার এবং তাঁর দুই সহচর কৃষ্ণবল্লভ ও রামবল্লভের উৎপীড়ন রাজ্যে অরাজকতা দেখা দেয়। এরফলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এই পীড়ন-তাড়ন থেকে তারা মুক্তি খোঁজে। রাজ্যের অবস্থা কত মর্মান্তিক কবি সযত্নে ফুটিয়ে তোলেন তথ্য-চিত্রে।

বহাল রাইত ফিবর করে বিনামেত পাট্টা
ঘরে থাকি না দেয় কড়ি আমলা সহে সাট্টা॥
ভর্ত্তা জমা খাস্ত করে লিখে রকম ফের।
পাট্টা লইয়া বেটা প্রজা দরবারেএ সের॥
বিনে পাট্টায় জমি কেহ করে জবর কবি।
তজবিজেতে১ সাবের হইলে ধরিতে না পারি॥
বিনামপাট্টা ফের করিয়া ভর্ত্তা সামেল করে।
অনায়াসে খায় জমি কেহ ধরিতে না পারে॥

এর ফলে প্রজারা খাজনা দিতে অপারগম। কবির বক্রোক্তি লক্ষণীয়:

বহুকৈলে রয় প্রজা কাম ধেনু।
সার বিনা না হয় চন্দন মলায়ত রেণু॥

অথচ রাজার রাজ্য-পাটে মন নেই। দৃষ্টি বিমুখ তাঁর। অনন্তর তাঁর খরচ, অর্থহীনদানে। ফলত, কবি বিমর্ষ হলেন এই ভেবে—

১. তজবিজ—বিচার পূর্বক সিদ্ধান্ত, রায়

ভোমে১ গেল ভোমের কড়ি তদারক বিনে।
খরচ ঋণের বৃদ্ধি হৈল দিনে দিনে॥

প্রজারাও বুঝলেন, তাঁদের দুর্ভাগ্যের সীমা নেই। কেননা,

যোগীর যোগ রাজার রাজ্যপাট
উল্টা হইল সেহি কর্ম্ম মহাল হইল লাট॥

কর্তব্য-বিচ্যুত রাজার কর্মদোষে লাট বিক্রীর উপক্রম হলো। তবুও রাজার তাতে দৃক্‌পাত নেই। রাজ্যের রাজস্ব বাকি পড়ল সত্তর হাজার টাকা। বোর্ড অব রেভিনিউ দাবি জানালেন। রাজা দিতে না পারায় রাজার লাট নীলামে উঠল। সে লাট কেনার জন্ম রাজার দাসদাসীরা পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছে।

লাটবন্দি মহাল সব হৈল থরে থরে।
লাট গেল ইস্তাহার মালগুজারির২ তরে॥

* * *

মহাজন মোসাহেব রাজা জমাদার।
মণ্ডল রাইওত আর সিপাহী সন্ন্যাসী॥
লাট কিনিতে আসে রাজার দাসদাসী।
হাড়িগুড়ি করে যুক্তি লাট লইতে যায়॥
যে পাইল সেই লইল যার কপালে ছিল।
কেহবা লইয়া লাট বাজারে বিকাইল॥

কবি এই বর্ণনার মধ্যে বিশৃঙ্খল রাজপরিবারের অন্তিম দশাকে জীবন্ত করে তুলেছেন। রাজার অলসতন্দ্রা যখন ভাঙল তখন বিশেষ কিছু করার ছিলনা। এক দিনান্তে দেখলেন; সব হারিয়ে বসেছেন বেহিসেবি জীবনাচরণে। মর্মপীড়িত রাজা নির্জীব খোলস ছেড়ে এগুলেন বন্ধকী-শর্তে। গ্রহীতাদের মধ্যে রামকান্ত ছিলেন অন্যতম। রাজমাতা সরস্বতী দেবী ও পত্নী ত্রিপুরা-সুন্দরী লাট কিনেছিলেন বলে-ও জানা যায়।
এ সম্পর্কে দিনাজপুরের গেজেটীয়ারে বলা হয়েছে :

১. ভোমে =বিহবল, নেশা
২. মালগুজারি=সরকারের প্রাপ্য মালজমির খাজনা ; রাজস্ব

"The Raja struggled to save his estates by raising money on mortgages (one of his principal creditors being Ramkanta Roy,) and buying back parts of his estate under assumed names. His wife Rani Tripura Sundari and the old Rani Saraswati also Purchased lands to a considerable extent, ১৮৬

পাদটীকা

১. সুরজিৎ দাশগুপ্ত. ভারতবর্ষ ও ইসলাম,

২. সুপ্রকাশ রায়. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,

৩. ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতের রেশম শিল্প সম্পর্কে যে অসন্তোষ দেখা দেয় তা নিম্নোক্ত কবিতাটিতে স্পষ্ট আভাসিত। কবিতাটি *Gentleman's Magazine*-এ প্রকাশিত হয়—

"The silk-worms form the wardrobe's gaudy pride;
How rich the vest which Indian looms provide;
Yet let me here the British Nymphs advise
To hide these foreign spoils from native eyes;
Lest rival artists, murmuring for employ,
With savage rage the envied work destroy."

দ্র, Reginald Reynolds, *White Sahibs in India*, London, 3rd edition, 1946, P 26.

৪. Ibid. P. 26.

৫. ডিরেকটরগণ পার্লামেন্টের সিলেকট কমিটিকে জানিয়েছিলেন: "This regulation, (যে নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্র বাঙলাদেশের প্রতিনিধিদের নিকট প্রেরিত হয়েছিল) seems to have been productive of very good effects, particularly in bringing over the winders, who were formerly so employed to work in the factories. Should this practice through inattention have been suffered to take place again, it will be proper

to put a stop to it, which may now be more effectually done, by an absolute prohibition under severe penalties, by the authority of the Government."

—Ibid, p. 26.

আবার সিলেকট কমিটির মন্তব্যটি-ও লক্ষণীয়, "This letter, contains a perfect plan of policy, both of compulsion and encouragement, (রেশম বস্ত্র তৈরী না করতে বাধ্য করণ, এবং রেশম উৎপাদনে উৎসাহ দান) which must in a very considerable degree operate destructively to the manufactures of Bengal. Its effects must be to change the whole face of that industrial country, in order to render it a field for the produce of the crude materials subservient to the manufactures of Great Britain."—Ibid, P 26.

৬. সুপ্রকাশ রায়, তদেব. পৃ ৮৪

৭. Edward Thomson and G. T. Garratt, *Rise and Fulfilment of British Rule in India*, Second edition, 1958, Allahabad, P. 115

৮. Muhammed Mohasan Fani, Dabistan, উল্লেখ করেছেন Troyer তাঁর *Preliminary Discourses on Dabistan* গ্রন্থে। প্রসংগ—Jamini Mohan Ghose, *The Sannyasi and Fakir raiders in Bengal*, (Bengal Secretariat Book Depot), 1930 P. 11

৯. Richardson, Arabic—Persian Dictionary.

১০. H. H. Wilson, *Hindu Religions*
প্রসংগ—*The Sannyasi and Fakir raiders in Bengal*, P. 11

১১. Ibid, P. 11

১২. J. M. Ghose, Ibid, P. 12

* ভিনসেন্ট স্মিথের মতে এই যুদ্ধের কারণ তীর্থ স্থানে স্নান যাত্রীদের স্বেচ্ছাদান অর্থ গ্রহণের ব্যাপার নিয়ে লড়াই।

—Ghose, Ibid, P. 13

১৩. Muhammed Mahasan Fani.

১৪. Jamini Mohan Ghose, *The Sannyasis in Mymensingh*, 1923, P. I

১৫. Petition of the Zemindars of paragans Mymensigh, Jafarsah, Alapsigh and Sherpur, dated 6.3.1783. প্রসংগ, *The Sannyasis in Mymensigh*, P. 4 অবশ্য [illegible] পক্ষ থেকে সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকদের নিকট একটি পত্র লেখা হয়েছিল বটে ৪. ৭. ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে। অথচ এতে [illegible] সুস্পষ্ট বীতরাগ ধরা পড়ে নি। দ্র, F. A. Sachse, Bengal District Gazetteers : *Mymensigh*, 1917, P. 29.

১৬. এ চিঠিটি তারিখ বিহীন। পূর্বোক্ত চিঠিটির পরে লেখা হয়েছিল বলেই মনে হয়।

১৭, Secret Department Proceedings, dated 21st and 25th February,

1760—দ্র, James Long, *Selections from Unpublished Records of Govt.* (1748-1767), 1869, P. 206.

* গিরি সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা ছিলেন হিম্মত গিরি। কখনও-ও আবার এঁকে হিম্মত বাহাদুর বলা হয়েছে কোম্পানীর নথিপত্রে। এঁর আসল নাম ছিল অনুপগিরি। দ্র, *The Sannyasis in Mymensigh*, P. 4

১৮. Letter from Sayyid Bandal Khan, Faujdar of Hooghly to the Governor at Fort William, dated 12th May, 1764. প্রসংগ—Jamini Mohan Ghose, *The Sannyasi and Fakir raiders in Bengal*, P. 15,

১৯. Edwin T. Atkinson, *The Himalayan Districts of the North-Western Provinces of India*, Vol II, Allahabad 1884, Pp. 601-603

২০ Letter from the President and Council (Secret Department) to the Court of Directors, dated 15th January, 1773, Para 13. I. O. R. প্রসংগ—W. W. Hunter, *Annals of Rural Bengal*,

২১. Letter of 1st March, Para 16, I. O. R. Hunter, Ibid, P. 44

২২. Letter from the Committee of Circuit to the Council at Fort William, dated Cossimbazar, 15th August, 1772, Hunter, Ibid, P, 45

২৩. Hunter, Ibid, P, 44

২৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বংগদেশের কৃষক', চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

২৫. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ. ২১

২৬. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃ ১৪০

২৭. Santimay Ray, *Freedom Movement and Indian Muslims*,

২৮. Secret Department Proceedings, dated 21st and 25th February 1760—Long's *Selections*, P. 206

২৯. Captain H. Grant তৈরি করেছিলেন একটি বিশেষ বাহিনী। বলা হতো "Grantki-Pultan"। পরে তা চতুর্থ সিপাহী বাহিনীতে সংযুক্ত হয়।

৩০. Secret Department Proceedings, dated 5th December, 1763—Long's *Selections*, P. 342

৩১. Letter from the Collector of Laskarpur to the President of the Council, dated 4th March, 1773 পত্রে স্মৃতি চারণা। প্রসংগ—Jamini Mohan Ghose, *The Sannyasi and Fakir raiders in Bengal*, P. 37

৩২. Hunter's, *Statistical Account of Bengal*, Vol. X. P, 412

* The Surveyor-General.

৩৩. Hobson-Jobson. 2nd edition, P, 872
Ghose, Ibid, P 39, দ্র, A, K, Jameson : *Bengal Past and Present*, অধ্যায় 'James Rennell', Vol XXVii (1924) Pp.1-11

৩৪. The Extract of THOS. RUMBOLD'S letter, dated 20th April, 1767, —Long's *Selections*, P. 526

৩৫. রেনেল তাঁর বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, সন্ন্যাসীরা একটি মৃত্তিকা-দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দিয়েছিল সন্ন্যাসী কোটা। আসলে এটি হবে সন্ন্যাসীকাটা। বর্তমান এটি জলপাইগুড়ি জেলায়।

৩৬. Ghose, Ibid, P. 42

৩৭. Ghose, Ibid, P, 47
মূলচিঠিটি কোশলী-ভাষায় লেখা হয়েছিল; একথা বলেছেন সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম গ্রন্থে। পৃ. ২৯
চিঠিটির অনুবাদ সম্ভবত রায় সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ করেছেন। আর চিঠির অনুবাদ কতটুকু যথাযথ হয়েছে, এ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন সুরজিৎ দাশগুপ্ত ভারতবর্ষ ও ইসলাম গ্রন্থে। পৃ, ১৪২

৩৮. Bogra District Records of 1772
প্রসংগ, সুপ্রকাশ রায়, তদেব, পৃ. ২৯

৩৯. Letter from the Controlling Council of Revenue at Murshidabad to the Supervisor of Rajshahi, dated 16th March, 1772—Ghose Ibid. P, 49

৪০. Extracts from Mr. Purling's letters to Warren Hastings, dated 29th and 31st December, 1772—Public Proceedings : 11th January, 1773 Pp 20-23. Ibid, Pp 50-51

৪১. Hasting's letter to Sir George Colebrooke dated 31st March, 1773 দ্র, G, R, Gleig, *Memoirs of Warren Hastings*, Vol I, London 1841, Pp 296-298

৪২. Bengal Secret Consultations, 1773
প্রসঙ্গ—খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ, কোচবিহারের ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১৯৩৬, পৃ. ২০৮

৪৩. Revenue Board consisting of the whole Council, Original Consultation, No. 9, dated 20th July, 1773 Ghose—Ibid, P. 58

৪৪. হেস্টিংসের পত্রে জনগণের অসহযোগিতা ও ক্যাপটেন এডওয়ার্ডস-এর মৃত্যু-পরিণতির কথা উল্লেখিত হয়েছে। দ্র, Hasting's letter to Sir George Colebrooke, dated 31st March, 1773, প্রসংগ, Gleig's *Memoirs of Warren Hastings*, Vol, I, Pp, 296-297.

৪৫. Extracts from the letters of Mr. Grueber, Collector of Dacca, Secret Proceedings, 10th March, 1773. Nos. 2, 4-7, Pp. 150-159
প্রসংগ, সুকুমার মিত্র, উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র ১৩৬৩, পৃ, ৩৪-৩৫

৪৬. Secret Consultation No, 6, dated 21st January 1773.
প্রসংগ—Brajendra Nath Banerji, *Dawn of New India*, 1927, P, 33

৪৭. Secret Department Proceedings, dated 15th March, 1773. দ্র, Banerji, Ibid, P. 50 এবং Ghose, Ibid, P 65

লক্ষণীয় : ২০,৩.১৭৭৪ তারিখে Laurence Sulivan কে এক পত্র লিখেছিলেন হেস্টিংস। এতে তাঁর কঠিন মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। চিঠিটির অংশ বিশেষ :

"It is my intention to proceed more effectually against them (সন্ন্যাসীদের) by expelling them from their fixed residences which they have established in the north-eastern quarter of the province, and by making severe examples of the Zemindars who have afforded them protection or assistance."

দ্র, Gleig's *Memoirs of Warren Hastings*, Vol, 1, P, 395

* হেস্টিংস দেশীয় সিপাহীদের আখ্যা দিয়েছেন 'Rascally Corps'.

৪৮. Brajendra Nath Banerji, Ibid, P 64

৪৯. Letter from Richard Goodlad, the Collector of Rangpur to Charles Grant, Resident at Malda, dated 20th April, 1783 দ্র, Rangpur District Records Vol, IV (1779-85), Bengal Secretariat Book Depot, 1921, P 155.

৫০, Letter from the Collector of Revenue to the Governor-General-in Council, dated 18th Oct., 1784, Ghose, Ibid, P. 91.

৫১. এ সম্পর্কে বগুড়ার কালেকটর চাম্পিয়ন সাহেব ২, ৩. ১৭৮৬ তারিখে একটি পত্র লিখেছিলেন রেভিনিউ কমিটিকে। Ghose, Ibid, P. 94.

৫২. চিঠিটির জন্য দ্রষ্টব্য, Walter K. Firminger edi, Bengal District Records : Dinajpur, Vol, I, 1914, P. 17

৫৩. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, পৃ. ৩৮

৫৪. Letter from the Collector of Dinajepur to Edward Hay, the Secretary to the Governor General, dated 19th December 1787. দ্র, Bengal District Records ; *Dinajpur* vol, II, Bengal Secretariat Book Depot, 1924, P. 160

৫৫. Letter from the Collector of Dinajpur to Major Dunn, dated 5th March, 1787, Bengal Districts Records : *Dinajpur* vol, II, P. 65

৫৬, Letter from the Collector of Dinajpur to the Collector of Rajshahi dated 24th March, 1788. Ghose, Ibid, P. 101.

৫৭. Letter from the Collector of Dinajpur to the Collector of Murshidabad—Matthew Dawson, dated 22nd June, 1788, Bengal District Records : *Dinajpur,* vol, II, P 235

৫৮, দ্র, Gleig's *Memoirs of Warren Hastings*, vol, I P. 395.

৫৯, We just catch a glimpse from the Lieutenant's report of a female dacoit by name Devi Chaudhuranee also in league with Pattak who lived in boats ; had a largeforce of Burkandazes in her pay and committed dacoities on her own account besides getting a share of the booty obtained by Pattak"

দ্র, E. G. Glazier, *A Report on the District of Rungpore*, 1873, P 12

৬০. Glazier, Ibid, P 67

৬১. Ibid, P 67

৬২. শাসকগণ "offered a reward of Rs. 4,000 for the apprehension of sobunally the leader of a numerous band of marauders inhabiting the Morang hills who have long infested Dinagepore and the adjacent Districts"
—Judicial General letter dated 31st Oct., 1799, Ghose, Ibid, P 135

৬৩. Judicial General letter, dated 5th Sept., 1800.
Ghose, Ibid, P. 136

৬৪. প্রসংগ—ড. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য, বাংলাগাথা কাব্য, ১৯৬২, পৃ. ২

৬৫. তদেব.

৬৬. তদেব.

৬৭. তদেব, পৃ. ৭

৬৮. তদেব,

৬৯. *Encyclopaedia Britannica*, Vol, 2, P. 641—642

৭০, Ibid, P.642

৭১. Collier's *Encyclopaedia*, Vol, 3. P. 490

৭২. দ্র, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র, প্রথমবর্ষ ১৮৯৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০১—৩০৪। এতে কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হয়েছে। *মেদিনীপুরের লৌকিক দেবী-রঙ্কিণী। সাধারণের বিশ্বাস ময়নাগড়ে রঙ্কিণী কালী ও লোকেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ রাজা লাউসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই দেবীকে ঘিরে অনেক জনশ্রুতি আছে। প্রসংগ—যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৬, পৃ. ১১৬

৭৩. দ্র, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র. প্রথমবর্ষ, ১৮৯৯ এপ্রিল, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০১

৭৪. দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ, ১৪৩০

৭৫. Dr. Sukumar Sen. *History of Bengali Literature*, Revised edi; P, 158

৭৬. দ্র, পরিচয় পত্রিকা, ত্রয়োবিংশবর্ষ, প্রথমখণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা আশ্বিন, ১৩৬০ প্রকাশক বিনয় ঘোষ। কবিতাটি প্রথমে 'বীরভূমি' মাসিক পত্রিকায় ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় শিবরতন মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মূল গাথাটি নেওয়া হলো পরিচয় পত্রিকা থেকে। এটি সম্পর্ণ।

৭৭. তদেব, পৃ. ১৮২—১৮৩

৭৮. কবিতাটির রচনা কাল নিয়ে সংশয় আছে। ড. বহ্নিকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে ১২৮০ সালে কবিতাটি রচিত বলে জানিয়েছেন, পৃ. ১৩১ কিন্তু ড. অমলেন্দু মিত্র জানিয়েছেন, "বীরভূমে দুবরাজপুর চৌকির কুখুটীয়া গ্রাম নিবাসী দ্বিজদ্বারিকানাথ ১২০০ (বাং) সালে 'গোরার গান' রচনা করেন"। দ্র. রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর ১৯৭২, পৃ. ১৮৭ কিন্তু কবিতাটি ১২০০ সালে রচিত হতেই পারে না। ১২২১ সালের পর রচিত হয়েছে বলেই মনে হয়।

৭৯. বাংলা গাথা কাব্য, পৃ. ১৪২—১৪৩

Dr. Sen, Ibid, Pp 158—159.

৮০. সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১, পৃ. ১৭৮

ড. ভট্টাচার্য-ও উল্লেখ করেছেন, পৃ. ১৪৪

৮১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৭৮

* জাগ গান: "মদন চতুর্দশী উপলক্ষে গীত ও রচিত গানকেই জলপাইগুড়িতে বলে'মদন কামের' গান। কোচবিহারেও এই নাম চালু আছে। এইরূপ নাম হইবার কারণ মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন নির্দেশ করিয়াছেন। যথার্থই ইহা 'কাম' জাগাইবার গান। কাম দেবতা মদনদেবের পূজা করিয়া এই সময় কামের গানই গাওয়া হইয়া থাকে। ইহা "Phallic God"—দ্র. ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোক সঙ্গীত,

৮২. দীনেশচন্দ্র সেন, তদেব, পৃ. ১৪১৩

৮৩. তদেব, পৃ. ১৪১৩—১৪১৮। কবিতাটী এখানে সম্পূর্ণ নয়। দ্রষ্টব্য পরবর্তী গ্রন্থ।

৮৪. সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১৭৯

* "মজনুর কবিতা" সম্পূর্ণ উদ্ধৃত।

৮৫. রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, পঞ্চম ভাগ, বিশেষ সংখ্যা, সেরপুরের ইতিহাস, পৃ. ৭৯—৮০।

দ্র, J.M. Ghose, the *Sannyasi and Fakir raiders in Bengal*,(Appendix): বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংখ্যাটি পাওয়া যায় নি।

৮৬. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম

৮৭. তদেব, পৃ. ১৪১

৮৮. Letter from the Deputy Supervisor of Bogra to the Council, dated 14th January, 1772.

দ্র, *Bogra District Records*, 1772

প্রসংগ—সুপ্রকাশ রায়, তদেব, পৃঃ ২৯

৮৯, Letter from the Supervisor of Natore to the Revenue Council dated 25th Jun, 1772. প্রসংগ—তদেব, পৃ. ৩০

৯০. সুরজিৎ দাশগুপ্ত, তদেব, পৃ. ১৪১

৯১. গোরার কবিত্ত', রচয়িতা দ্বিজ্ঞাবকানাথ। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

৯২. পুঁথি—'সুলতান জমজমা', রচয়িতা মোহাম্মদ কাসিম/লিপিকর বাকর আলি, ১৮৪৫। দ্র, আবদুল করিম, পুথি-পরিচিতি. ঢাকা, ১৯৫৮ পৃ. ১৫১

৯৩. পঞ্চানন মণ্ডল, পুঁথি পরিচয় ১ম খণ্ড, ১৯৫১. পৃ. ৯৩

৯৪. দ্র, নিখিল নাথ রায়. মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১৩১০ পৃ. ৬২০

৯৫. "ধুয়া হইল গানের মধ্যে সুরগত একটি কর্ম বা রীতি বিশেষ। ইহার আক্ষরিক অর্থ অপেক্ষা সুরগত মূল্যই বেশি। ধুয়ার আক্ষরিক অর্থ গানের মধ্যে ভাবের ক্ষেত্রে নতুন কোনো ব্যঞ্জনার সঞ্চার করিতে পারেনা।" দ্র, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক. প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত. পৃ. ৩৮৩

৯৬. দীনেশ চন্দ্র সেন, মৈমনসিংহ গীতিকা. ১৯৫৮, ভূমিকাংশ।

৯৭. বাংলাগাথা কাব্য, পৃ. ১০.

৯৮. সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, তদেব. পৃ. ৮২-৮৪। কবিতা দ্রষ্টব্য।

৯৯. শচীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়. বঙ্কিম জীবনী, ১৯৩১, পৃ ২৮৮

১০০. ড. ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সামগ্রিক অধ্যয়ন সুস্পষ্ট। লেখক নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন বঙ্কিমের চিন্তা-ভাবনা।

১০১. তদেব, পৃ. ৭৮

১০২. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয় খণ্ড) বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

১০৩. আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড. অষ্টম পরিচ্ছেদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৫৪

১০৪. তদেব

১০৫. বিবিধ প্রবন্ধ (প্রথম খণ্ড)—ভারত কলঙ্ক : ভারতবর্ষ পরাধীন কেন ?

১০৬. আনন্দমঠ, প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ

১০৭. তদেব

১০৮. শ্রীশিবানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণ,

১০৯. আনন্দমঠ, চতুর্থখণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১১০. চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, পৃ. ১৩৫

১১১. বঙ্কিম জীবনী, পৃ. ২৯৪

আরো একটি কথা। "বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নাকি সভাবাজার রাজবাটিতে একদিন নিমন্ত্রিত হন সভাতে কথাচ্ছলে সেকালের কয়েকজন লেখক ও কবিদের নিকট

বলিয়াছিলেন, "তোমরা দেখবে এই বাংলাদেশে আমার 'আনন্দমঠ' জলজ্যান্ত অভিনীত হবে মহাবিপ্লব আনবে।" বিশেষ বিশেষ ঘটনার ঠিক পরেই এই রকম উক্তি পরিকল্পিত হয়ে থাকে। এই উক্তিও সেই প্রকারের বলেই মনে হয়।" দ্র. হেমচন্দ্র কানুনগো, বাংলায় বিপ্লব প্রচেষ্টা ১৯২৮, পৃ. ১

১১২. সুকুমার মিত্র, উনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র, পৃ. ২৩

১১৩. আনন্দমঠ, প্রথম সংস্করণ, চতুর্থখণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ, শেষ পংক্তি। দ্র, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ 'আনন্দমঠের পাঠভেদ' অধ্যায়।

১১৪. বঙ্কিম জীবনী, পৃ, ৩০৩

১১৫. ড. অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম মানস, এতে মনোজ্ঞ আলোচনা আছে।

১১৬. তদেব

১১৭. গোপালচন্দ্র রায়, বঙ্কিমচন্দ্র ও কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্র (প্রবন্ধ) দেশ, ৪ চৈত্র,

১১৮. ড. ভবতোষ দত্ত, তদেব, পৃ. ১৬৩

১১৯. ড. অরবিন্দ পোদ্দার, তদেব. পৃ ৯৩

১২০. ড. বিজিত দত্ত, বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপাদান, পৃ. ১১২

১২১. প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্ত, উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, পৃ. ২৪৫ এবং দ্রষ্টব্য W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, Calcutta reprint, এতে কল্পনাস্তকারী ছিয়াত্তর মন্বন্তরের মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

১২২. উপন্যাস সাহিত্যে বঙ্কিম, পৃ. ২৪৫

১২৩. অপর্ণা প্রসাদ সেনগুপ্ত, বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস,

১২৪. আনন্দমঠ, সাহিত্য পরিষৎ-এর বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

১২৫. তদেব

১২৬, তদেব

১২৭. তদেব

১২৮. তদেব

১২৯. তদেব

১৩০. সুকুমার মিত্র, তদেব, পৃ. ৩১

১৩১. তদেব, পৃ. ২৪

১৩২. আনন্দমঠ তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন, দ্র, বঙ্কিম-শতবার্ষিক সংস্করণ।

১৩৩. আনন্দমঠ পঞ্চমবারের বিজ্ঞাপন।

১৩৪. তদেব, তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

* লক্ষণীয়, হান্টারের 'অ্যানালস্ অব রুরাল বেঙ্গল' বের হয় ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এবং

... আনন্দমঠ ১৮৮২তে। গ্রন্থ মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে বঙ্কিম মন্বন্তর ও সন্ন্যাসীদের কাহিনী পেয়েছিলেন হান্টারের গ্রন্থ থেকে। এই বক্তব্যের সমর্থন মিলবে ড. অতুল সুরের সাম্প্রতিক একটি প্রবন্ধে। দ্র. আনন্দবাজার, ৪ শ্রাবণ.

১৩৫. দ্র. নবগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, উনবিংশ শতকের বাঙলায় বঙ্কিমসাহিত্যের ভূমিকা, (প্রবন্ধ) মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক,

১৩৬. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এর বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণে সম্পাদকদ্বয়ের মন্তব্য:— 'আনন্দমঠে'র বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩৭. সুকুমার মিত্র, তদেব. পৃ. ২৪

১৩৮. ড. ক্ষেত্র গুপ্ত. বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস: শিল্পরীতি,

দ্রষ্টব্য: যোগেশচন্দ্র বসু বলেছেন: "বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ভারতের এই সন্ন্যাসী-বিদ্রোহের ভিত্তির উপরেই নির্মিত।" দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, প্রথমভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৬, পৃ. ২৫৩

১৩৯. নিখিল নাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১০, পৃ ৫৩৯

১৪০. চণ্ডীচরণ সেন, মহারাজা নন্দকুমার অথবা শতবর্ষের পূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা (১২৯১ ইং ১৮৮৫)

১৪১. চণ্ডীচরণ সেন, তদেব, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

১৪২. সুকুমার মিত্র, তদেব, পৃ, ৩৭

এই গ্রন্থের অন্যত্র তিনি লিখেছেন: ১৭৮৩ খ্রী: অব্দে রংপুরে যে ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছিল এ আজ সর্বজন স্বীকৃত। নিপীড়িত কৃষক ও অন্যান্য শ্রেণীর মানুষের দ্বারা সমর্থিত সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বাহিনী যে বেশ শক্তিশালী ছিল তা গ্লেজিয়ার সাহেব স্বীকার করেছেন।' পৃ. ৩৯

১৪৩, নিখিলনাথ রায়, তদেব, পৃ. ৫৪.

১৪৪, তদেব, পৃ. ৫৪২

১৪৫. চণ্ডীচরণ সেন, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ১২৯২, পৃ. ৫

১৪৬. দেবীসিংহের নর্ত্তকী সমাজে দৌলৎজান, মেলখোসবিবি প্রভৃতি নামের সুন্দরী ও সুগায়িকা ছিল। দ্র, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ. ৫৪৯

১৪৭. নিখিলনাথ রায়, তদেব, পৃ, ৫৫৩

১৪৮, তদেব, পৃ, ৫৫৭

১৪৯. তদেব, পৃ. ৫৬০ এবং দ্রষ্টব্য E. G. Glazier, A *Report on the Dist. of Rungpore*, 1873, দ্র, Goodlad's Report, P. 71

মন্বন্তর বাংলায় "মনুষ্য বিক্রয়ের দলিল সম্পাদন হইত। এই সকল দলিল পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঐ সময় এক একটি মানুষ ২, ৩ হইতে ৭, ৮ টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইত।" কেদারনাথ মজুমদার, ঢাকার বিবরণ, ১৯১০, পৃ. ১৩০

বিক্রমপুর পরগণায় মানুষ বিক্রীর একটি দলিলের প্রতিলিপি নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত করা হলো : দ্র, ঢাকার বিবরণ, পৃ. ১৬০

লিখান সহী—
শ্রী সুমতী সাক্ষী
সাং তালতলা।
সাং ভেলা
লিখান সহী
শ্রী জগন্নাথ সাক্ষী
সাং জাফলাবাদ।

"৵৭ ইয়াদিকীর্দ্দ শ্রীইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ওলদে জোগেশ্বর চক্রবর্ত্তী ইবনে দুর্গা-প্রসাদ চক্রবর্ত্তী সুচবিত্তেষু—
লিখিতং শ্রীমতী অপূর্ব্বা ওলদে নারান দেও জওজে চান্দদেও ও শ্রীমতী সুন্দরী ওলদে চান্দদেও জওজে উদয়রাম দেও ও আমার পুত্র সানন্দরাম দেও বএস ৪ চাইর বৎসর ও তস্য ভগ্নীর বএস ৪ চাইর মাস মনিস্য আপ্ত বিক্রয় কবজ-পত্র মিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমরা আপনার স্থানে দস্তবদস্ত নগদ মূল্য পুরও জন দহমাসী ২৫ রূপাইয়া কবজ দিলাম। ইতি সন ১১৯১ একানব্বই সন তেরিখ ১৮ ফাল্গুন।"

১৫০ নিখিল নাথ রায়, তদেব, পৃ. ৫৬২

১৫১. তদেব, পৃ, ৫৬২-৫৬৩

১৫২. এডমণ্ডবার্ক মহাসভায় সেই বংশখণ্ড সম্পর্কে তীব্র উত্তেজনায় বলেছিলেন : " Here ; in my hand is authority ; for otherwise one would think it incredible." Burkes, *Impeachment of Warren Hastings*, Vol. 1, P. 190 প্রসংগ, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ. ৫৬৫.

তুলনীয়, 'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাস। যেখানে ভবানীপাঠক প্রফুল্লকে জানালেন, ইংরেজ রাজ্যশাসন করতে জানেনা, করেও না। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তিনি রাজত্ব করছেন। এর জন্য তাঁর অবলম্বন ডাকাতি। কারণ, ভূম্যধিকারীর দুর্বিসহ দৌরাত্ম্য, কাছারী কর্মচারীরা বাকিদারের ঘর বাড়ী লুঠ করে লুকানো ধনের তালাস করে; না পেলে "মারে, বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণ বধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্ব সমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ,

সর্ব্বসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়।······এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্ব্বলকে রক্ষা করি।"

দ্র, দেবী চৌধুরাণী, সাহিত্য পরিষদ-এর বঙ্কিম-শতবার্ষিক-সংস্করণ, পৃ. :৫৪

১৫৩ চণ্ডীচরণ সেন তাঁর 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' উপন্যাসে এই ব্যক্তির নাম জানিয়েছেন 'দয়ারাম'। দ্র, পৃ. ১৬২। কিন্তু E. G. Glazier, তাঁর *A Report on the Dist. of Rungpore* গ্রন্থে 'Appendix' অংশে বলেছেন, 'দয়াশীল' নাম ছিল ঐ ব্যক্তির। তিনি গুডল্যাড সাহেবের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেছেন। সুতরাং রিপোর্টে ব্যক্তির নাম নির্ভুল হওয়াই সম্ভব।

১৫৪ **Glazier, Ibid, P, 21,**

১৫৫ **Ibid, P, 21,**

১৫৬ গুডল্যাড সাহেব এক অসহায় অবস্থায় পড়ে এবং আদেশক্রমে লেঃ ম্যাকডোনাল্ডকে প্রেরণ করেছিলেন রঙপুরে। বিদ্রোহীরা দুর্বার। এ এক সংকট মুহূর্ত। তিনি এমন আদেশের জন্য কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে পারেননি। কেন যে পারেননি, তা তাঁর বক্তব্যে আভাসিত। **"I had no time to wait for Orders from my superiors ; and had I even given the insurgents an idea that I was deficient in authority to punish them, I never could have got the better of the insurrection."**

—Extract from Mr. Richard Goodlad's Report, Dated, Rungpore, March, 1783,

১৫৭ **Glazier, Ibid,** এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে **Goodlad's Report,** দ্র, **Appendix, P. 71.**

১৫৮ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, পৃ. ১৬৭.

১৫৯ "বস্তুতঃ দিনাজপুরের বিদ্রোহই যে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল কারণ তাহার কোন সন্দেহ নাই।" তদেব পৃ. ১৭২

১৬০ মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ. ৫৭৭.

১৬১ মুর্শিদাবাদের কালেকটর ১৮০৫ সালের ৬০শে এপ্রিলের একটি পত্রে দেবীসিংহকে 'মহারাজ' বলে উল্লেখ করেছেন। **Hunter's Bengal Records, vol, IV, P,** ২২৪. প্রসংগ, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পৃ. ৫৭৮। অবশ্য, দেবীসিংহকে 'রাজা' বলে সম্বোধন করা হয়েছে ইংরেজদের লিখিত চিঠিপত্রে। এমন একটি চিঠি ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই এপ্রিলে লেখা হয়েছিল। দেবীসিংহ সম্পর্কে অভিযোগ তদন্তের সহযোগিতা চেয়ে জে. শোর গুডল্যাডের নিকট চিঠি লিখেছিলেন। চিঠির কিয়দংশ এই :—

"Sir,

The Vakeel of Rajah Gournaut Zeminder of Edrakpore having

preferred a petition, containing many articles of Accusation against Raja Deby Sigh.

We have thought it necefsary for the purpose of making a particular Enquiry into the feveral charges alleged, to depute Mr. Francis Redfearn with a special commifsion for this purpose......"

—Walter K, Firminger, edi, *Bengal District Records*, *Rangpur*, Vol, II, P..219.

১৬২. দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, প্রথম অধ্যায়, অবতরণিকা অংশ, পৃ. ১.

১৬৩. তদেব, পৃ, ৫.

১৬৪. তদেব, পৃ, ৬.

১৬৫. তদেব, পৃ. ৬-৭ .

১৬৬. তদেব, পৃ. ১৬৩

১৬৭. তদেব, পৃ. ১৬৫

১৬৮, Glazier, Ibid, P, 52

১৬৯. Ibid, এবং সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, দেবী চৌধুরাণী, পৃ, ৯০

১৭০. দেবী চৌধুরাণী, সাহিত্য পরিষৎ-সংস্করণে যদুনাথ সরকারের ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য।

১৭১. তদেব

১৭২. দ্র, যদুনাথ সরকারের ভূমিকা

১৭৩. Glazier, Ibid, Pp. 41-42

১৭৪. Letter from D. H. Mc Dowall to Lieutenant A. Brenan, dated 12th July, 1787. দ্র, *Bengal District Records : Rangpnr* (1786-87) Vol, VI, Bengal Secretariat Book Depot, 1928, P, 211

১৭৫. দেবীচৌধুরাণী, সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, পৃ. ৪১

১৭৬, তদেব, পৃ. ১৩৬

১৭৭. নগেন্দ্রনাথ বসু, বিশ্বকোষ, ১৩শ ভাগ, পৃ. ৩০৩

১৭৮, সুরজিৎ দাশগুপ্ত, ভারতবর্ষ ও ইসলাম, পৃ. ১৩৯

১৭৯, প্রমথনাথ গুপ্ত, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী, পৃ. ২৫-২৬

১৮০. তদেব, পৃ. ২৬

১৮১. অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীরূপা দেবীচৌধুরাণী. (একটি নিবন্ধ) দ্র. যুগান্তর, ২১শে জ্যৈষ্ঠ,

সংযোজন—১

আমরা আগেই জেনেছি, সন্ন্যাসীরা দু'ভাবে বসবাস করেছিলেন। তাঁদের অনেকেই আবার ভূসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন ; এমন একটি প্রমাণ নিম্নের তালিকায় বোঝা সম্ভব। এটি মৈমনসিংহ জেলার।

ক্রমিক নং	পরগণা	তৌজী নং	সম্পত্তি অধিকারীর নাম	প্রজাদের রাজস্ব টাকা	আনা	পাই
১.	পুখুরিয়া	৪২২৯	অজিত গির সন্ন্যাসী	১১০৬	৬	০
২.	ঐ	৪২৪১	কৃষ্ণ অমর গির সন্ন্যাসী	১১৮	৩	৯
৩.	ঐ	৪২৯৪	ঐ	৬২৩	১৩	০
৪.	ঐ	৪৩৯১	মন্মথ গির সন্ন্যাসী	২১	১৫	০
৫.	ঐ	৪৮০৪	বেণী গির সন্ন্যাসী	২৩৫	৫	৯
৬.	ঐ	৫০৩৬	কৃষ্ণ অমর গির সন্ন্যাসী	৪২৩	৫	০
৭.	ঐ	৫০৫৭	ঐ	৩৭৮	১২	০
৮.	শেরপুর	৫০২২	(ভাবরা) বলবন্ত গির সন্ন্যাসী	১৭	৬	০
৯.	ঐ	৫০৩০	(বাটাজোড়) ঐ	১৬	১৫	০
১০.	কাগমারি	১৩৬২	বসন্ত গির সন্ন্যাসী	১৪২	৬	০
১১.	ঐ	১৪৯৬	রাজ গির সন্ন্যাসী	৪৪	৫	০
১২.	ঐ	১৫২৯	দুলার গির সন্ন্যাসী	৩২	৫	০
১৩.	ঐ	১৫৯৩	ঐ	১২	১৩	০
১৪.	ঐ	১৫৯৪	ঐ	২৪	২	০
১৫.	ঐ	৪৮৫০	পরাণ গির সন্ন্যাসী	৮৯	০	০

দ্র, J. M. Ghose, *The Sannyasis in Mymensigh*, 1923, P, 47.

সংযোজন—২

ড. ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত জানিয়েছেন, উত্তর বঙ্গের এক বিদ্রোহকারী নারীর নাম ছিল 'রাণী চৌধুরাণী'। তিনি রংপুরের [illegible] মহিলা ছিলেন।

ইনি-ই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে দেবী চৌধুরাণী রূপে বর্ণিত হয়েছেন। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে লেখককে রঙপুরের জনৈক বৃদ্ধ জমিদার বলেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস (দেবী চৌধুরাণী) প্রকাশিত হবার পর এঁদের সেরেস্তায় যে সব কাগজ পত্রে জমিদার হরবল্লভ ও পুত্র ব্রজসুন্দরের নামোল্লেখ ছিল ঐ সব চিঠিপত্র, নথিপত্র তাঁরা গোপন করে ফেলেছেন।

দত্ত মহাশয় বলেছেন, এর কিছুদিন পরে ঐ পরিবারের বর্তমান বংশধরেরা এ-তথ্য স্বীকার করেন। এবং ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে ঐ পরিবারের বর্তমান জমিদারের পত্নী মহোদয়া জানিয়েছেন যে, দেবীর আসল নাম ছিল 'রাণী চৌধুরাণী'। এঁদেরই জমিদারীর মধ্যে দেবীর প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ী আছে। সেখানে হস্তাক্ষরে লিখিত রাণী চৌধুরাণীর জীবন-চরিত আছে।

দ্র, ড. ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, বাঙ্গলার ইতিহাস, ১৩৭০, পৃ. ২০২

১৮২. হরগোপাল দাসকুণ্ডু সংগৃহীত—রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৫ সালে প্রকাশিত। প্রসংগ, সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, পৃ., ১২০-১২৩

১৮৩. "The Rajah of Denajepore, Radhanath was a minor and Devisingh was appointed as the Dewan of Dinajepore at a salary of Rs. 1,000" দ্র, W.K Firminger, edi, *The District of Rung*pore Vol, I (1770-1779), Pp 26-27

১৮৪. "The Ranee was not even allowed to take care of her adopted son, 9 or 10 years old, but he was made over for education to the manager, Ramkanto Roy, for whom she had a strong personal aversion."

দ্র, F. W. Strong, edi, Eastern Bengal District Gazetteers—*Dinajpur*, 1912, P, 26

১৮৫. Eastern Bengal Dtstrict Gazetteers—*Dinajpur*-এ বলা হয়েছে, রাণী সরস্বতীর ভ্রাতার নাম জানকী রাম। এতে রামকান্ত রায়ের উল্লেখ আছে। Pp. 25-26

১৮৬. Ibid, P. 26

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমসের গাজীর বিদ্রোহ

(১৭৬০-১৭৬৩)

ক. ইতিহাস পর্ব

কথারম্ভ

১. *বিদ্রোহ কাহিনী*

২. *সমসেরের শাসনব্যবস্থা*

খ. সাহিত্য পর্ব

১. *প্রসংগ ঃ গাজিনামা*

২. *নাটক ঃ বিদ্রো[illegible] বাঙ্গা*

২ ।। অধ্যায় ঃ সমসের গাজীর বিদ্রোহ

ক. ইতিহাস পর্ব

...কথারম্ভ...

অষ্টাদশ শতকের ষষ্ঠদশকে ত্রিপুরার রোশনাবাদ চাকলায় সমসের গাজির নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ সুরু হয়েছিল; বলা যেতে পারে, তা ছিল শোষণ মুক্তির বিদ্রোহাভিযান।

জীবন কেন্দ্রিকতায় তপ্ত-অসন্তোষ, আকাঙ্ক্ষার আর্তনাদ সমসের শুধুমাত্র নিজের জীবন পরিধিতেই লক্ষ করলেন না; শোষণ দীপশিখার নিষ্ঠুর ছায়া-সম্পাৎ বাঙালীর জীবন প্রচ্ছদে ও লক্ষ করেছিলেন। ফলত, সমসেরের চিত্ত বিপ্লব ঘটলো স্বাভাবিক কারণেই। এই অগ্নিময় চিত্ত বিপ্লবের কারণটুকু বুঝে নেওয়া সম্ভব হবে যদি আমরা বাস্তব গৃহালোকে সমসেরের দৈনন্দিন জীবন জটিলতাকে পর্যালোচনা করি।

সমসের ছিলেন এক দরিদ্র কৃষকের সন্তান।১ কৃষকপিতা দারিদ্র্য-যন্ত্রণা মুক্তি পেতে বাৎসল্যসম্বল বিকিয়ে দিলেন ত্রিপুরারই অধীন রোশনাবাদ চাকলার দক্ষিণ শিক পরগণার প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার নাসির মহম্মদের কাছে। কিশোর সমসেরের ক্রীতদাস জীবন সুরু হলো। অনিশ্চয়তা আর মর্মযন্ত্রণার গভীরতায় ও তিক্ত অভিজ্ঞতায় সমসের বয়োপ্রাপ্ত হলেন। জমিদার নাসির মহম্মদ তখন তাঁকে এক 'কুতঘাটের'র তহশীলদারের কাজে নিয়োগ করলেন।২

কর্মক্ষেত্রে এসে সাধারণ মানুষের যে দুঃখ-দুর্দশা তা তিনি উপলব্ধি করলেন। রাজকীয় বাহিনী, জমিদার ও কোম্পানীর [illegible] অতি-মাত্রিক শোষণ, উৎপীড়ন, ব্যক্তি-মানবের ওপর যে অন্তহীন যন্ত্রণা সৃষ্টি

করেছিল, তার মূলোৎপাটন এবং প্রতিকূল তরুদের বিরুদ্ধাভিযান সুরু করলেন এক মহতী-আকাঙ্ক্ষায়।

নিজের দাসজীবনের তমিস্রা এবং কৃষকের দুঃখ-দুর্দশা, এ দুই সত্য : বলা যেতে পারে—এই সত্যানুরাগেরই অভিব্যক্তি বিদ্রোহ সরণির কঠিন প্রান্তে পৌঁছে দিল তাঁকে। ফলত, অনন্তমুক্তি—দাসমুক্তির সাধনা সুরু হলো। শুধু কি তাই, সুরু হলো শ্রমসংগ্রাম, উদ্দেশ্য সমষ্টিমংগল। সমসের দল গড়তে আরম্ভ করলেন।৩ তিনি বুঝেছিলেন যে একক সংগ্রামে ব্রতী হলে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা যায় বটে, কিন্তু মহতী চেষ্টাব সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই তিনি সমবয়সীদেব ত্যাগ-তিতিক্ষার উদাব মাধুর্যে ও আত্মদানের স্বভাবচিহ্নে সুদীপ্ত হযে ওঠার আহবান জানালেন। সমসেরের মনোজীবনের উদ্বেলতা, ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা তরুণদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করল। বলাবাহুল্য, আবেগস্পন্দনজনিত সে আহবান ব্যক্তি-মানসের অন্তরঙ্গ স্পর্শ বলেই তা ছিল নিবিড। আব এবজন্যই সমসেরেব সুগম্ভীর আহবান শুধ ভস্ম হয়েই থাকেনি, জীবন সত্যকামে পবিণত হযেছিল। সুতরাং সমসেরের বাহিনী জীবন যুদ্ধে ঝাঁপ দিলেন।

১। বিদ্রোহ কাহিনী...

সমসের দলের মহৎ উপলব্ধি, উজ্জ্বল অনুভূতি, অকৃত্রিম অনুরাগ ও দীপ্ত তেজ-শক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদী হয়ে সমর-অভিযান সুরু করলেন। তিনি প্রথম আঘাত দিলেন জমিদার নাসির মহম্মদের ওপর। একদিন যে আশ্রয় ছিল ক্রীতদাসের আশ্রয় : সেখানেই তিনি দিলেন প্রথম আঘাত। বিরুদ্ধাচারণের কৌশলটি ও ছিল অভিনব। সমসের দলের মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে সংকোচ ও লজ্জার ব্যূহ ভেদ করে মৃদু, শান্ত অথচ নিরুচ্ছ্বাস-আবেগে জমিদার কন্যার পাণি গ্রহণ করতে চাইলেন।৪

বহিঃসংস্কারের সংঘাত যে কত প্রবল, আত্মাভিমানের ওপর কতটা কার্যকরী এবং আভিজাত্যের ওপর কতটা আঘাত : তা বোধ করি বিবরাট টের পেলেন জমিদার। আর টের পেলেন বলেই জমিদার নাসির মহম্মদ সমসেরের দৃঢ়-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলেন। সমসের উপস্থিত বিপদ

অনুধাবন করে সরে পড়লেন বটে, কিন্তু তিনি ও প্রস্তুত হতে লাগলেন সংগোপনে। দরিদ্র, বঞ্চিত, নিপীড়িত হিন্দু-মুসলমান তরুণেরা এসে তাঁর দলে যোগ দিল। বিদ্রোহী বাহিনী সুসংগঠিত, সুদৃঢ় হলো। সুরু হলো অস্ত্র শিক্ষা। অভ্যাস শেষে আরম্ভ হলো অভিযান।

ঘনীভূত বিক্ষোভ সুরু হলো শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। সুতরাং নাসির মহম্মদ হলেন তাঁদের প্রথম 'টার্গেট'। সমসের যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সমসের সুযোগ বুঝে জমিদার গৃহ আক্রমণ-ও করলেন তিনি। এই যুদ্ধে

দ্রষ্টব্য :
১৩৩ থেকে ১৪৩ পৃষ্ঠার শিরোনামে 'সন্ন্যাসী বিদ্রোহ' ছাপা হয়েছে। পড়তে হবে 'সমসের গাজির বিদ্রোহ'।

অবিচল উদ্দেশ্য উদ্‌যাপন সম্ভব হয় না। তিনি রাজাকে প্রতিবাদ ও জানালেন রাজতান্ত্রিকতার অন্যায় অবিচার ও শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে। এবং রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করলেন। এমনকি তিনি নিজেকে রোশনাবাদ চাকলার স্বাধীন রাজা বলেও ঘোষণা করলেন।৭

এ সময়ে, রাজপরিবার অন্তর্বিরোধ দেখাদিল। রাজা বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর সংগে সংগে রাজপরিবারে অস্থিরতা, অব্যবস্থার সৃষ্টির হলো। বলা যেতে পারে, সমসেরের সংগ্রামী মানসের বলিষ্ঠ বিবর্তনের ক্ষেত্রে আরো সুযোগ ও সময় এনে দিল। বিপ্লবী মানস রূপপ্রাপ্ত হলো।

ত্রিপুরা রাজ পরিবারের অন্তর্বিরোধের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে সমসের শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুললেন। এতে সৈন্য সংখ্যা ছিল দু'হাজার। সমসের ,এই বাহিনী নিয়ে ত্রিপুর রাজার তৎকালীন রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করলেন এবং যুবরাজ কৃষ্ণমণি প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন বটে, কিন্তু তাতে

তাঁর জয় হলো না। অবশেষে রাজপরিবারের লোকজন সহ তিনি আশ্রয় নিলেন আগরতলায়। সেখানেই তাঁর রাজ্যপাট সুরু হলো।৮
পরাজয়ের বেদনা ও গ্লানি হতে মুক্তিলাভের জন্য হীনরাজনীতি-ও সুরু করলেন যুবরাজ কৃষ্ণমণি। তিনি পাহাড়ী অঞ্চলের দুর্ধর্ষ কুকিদের অর্থে প্রলুব্ধ করে ক্ষেপিয়ে তোলেন। তাতে তাঁর উদ্দেশ্য কিছুটা সিদ্ধি হয়। কুকিগণ সমসের বাহিনীকে অন্যায় আক্রমণ করে।৯ কিন্তু ছোট খাটো সংঘর্ষ-সংঘাতে এদের পরাজয় ঘটে প্রতিক্ষেত্রেই।

সমসেরের অনর্থক যুদ্ধে মন নেই। রাজা কৃষ্ণমাণিক্য ও ইংরেজ বণিকের প্রতিই তাঁর কেন্দ্রিভতচিত্ত। সুতরাং তিনি তাঁর মন্ত্রী রামধন বিশ্বাসকে পার্বত্য অঞ্চলের উগ্র-অধিবাসীদের কাছে পাঠালেন।১০ ইনি কুকিদের বোঝাতে পেরেছিলেন বিদ্রোহী সমসের সম্পর্কে। ফলত, কুকিদের ভুল ভাঙলো। এরপর তারা সমসেরকেই রাজা বলেই মানলো।১১ অবশ্য তিনি রাজপরিবারের একজনকে সিংহাসনে স্থাপন করে কার্যত রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন।

২। সমসেরের শাসনব্যবস্থা...

সমসের নিপীড়িত মানবতার মহিমাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং নিপীড়নের দুঃসহ যন্ত্রণাকে অধ্যয়ন করে ছিলেন বলেই তাঁর মধ্যে জীবন জটিলতার সীমাতিক্রমণের প্রয়াস ও আত্ম প্রতিষ্ঠার সচেতন অনুভূতি লক্ষ করা যায়। নির্যাতন ও বন্ধনের প্রতি তীব্র বিরাগ মানসে জনকল্যাণের পবিত্র আকাঙ্ক্ষার নিজেকে নিয়োজিত করলেন। মহতী প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন। প্রথমেই দরিদ্র প্রজাদের ও ব্রাহ্মণদের বিনামূল্যে জমি বন্টন করলেন। এমনকি দরিদ্র প্রজাদের কোনো কর দিতে হলো না।১২

সমতল ক্ষেত্রের প্রত্যেক পরগণায় সমসের গাজি একজন করে শাসক নিয়োগ করেছিলেন। আবদুল রজক নিযুক্ত হলেন সৈন্যবাহিনীর দেওয়ান এবং বিশালঘর খণ্ডল পরগণার শাসনভার ছানা-উল্লার (সানাউল্লা) হাতে সমর্পিত হলো। নূরনগর ও গঙ্গা মণ্ডলের কর্তৃত্বে ছিলেন আবদুল নামে এক ব্যক্তি। শাসকগণের মধ্যে জগৎপুরের গঙ্গাগোবিন্দ ও চৌদ্দগ্রামের

হরিশচন্দ্র প্রভৃতি হিন্দুও ছিলেন।১৩ "অন্যেরা সকলেই সমসেরের স্বজাতীয় ও সম্পর্কীয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু রাজস্ব বিভাগের কার্য্য তাঁহাদের দ্বারা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইত না। এজন্য হিন্দু শাসন কর্ত্তার প্রয়োজন হইয়াছিল। ধর্মপুর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ প্রধান দেওয়ান ও খণ্ডল নিবাসী হরিহর নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারা রাজস্ব বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন।"১৪

সমসের বহু জনহিতকর কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এবং এর জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হতো তা সংগৃহীত হতো লুণ্ঠন করে। ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের বিভিন্ন পরগণার জমিদারগণের সম্পত্তি লুণ্ঠন করতেন।১৫ এ প্রসংগে সমসের জীবনচরিতকার সেখ মনুহর জানিয়েছেন : "সমসের একজন কৃপণ জমিদারের গৃহে ডাকাতি করিয়া একলক্ষ টাকা আনিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত জমিদার "দানখয়রাত" করিত না। এ জন্যই তাহার গৃহে ডাকাতি করা হইয়াছিল।"১৬

শুধু কি তাই, সাধারণ জনমানসে নিশ্চিত সুখ বিধানে তৎপর হলেন। দরিদ্র বঞ্চিত মানুষেরা যে দুঃখ বেদনা এবং অন্তর্জ্বালায় ছিলেন পীড়িত; তা দূর করতে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই যেখানে অন্যায়, উদ্দাম অনৈতিকতা লক্ষ করেছেন, সেখানেই তিনি কঠিন হয়েছেন। এ কথাও ঠিক দৈনন্দিন ঘাত প্রতিঘাতে তাঁর চিত্ত-ধাতু এমনিতেই কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি দেশকাল পরিস্থিতে সমাজ শত্রুদের সহজে চিনেছিলেন ও ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এমনকি, সুযোগ বুঝে কোনো অসাধু ব্যবসায়ী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি করতে না পারে তার জন্য আশ্চর্য রাজনিয়ম প্রচলিত ও প্রচারিত হলো।

এ ক্ষেত্রে রাজমালার সাক্ষ্য-উদ্ধার করি।১৭

"সমসের গাজি তাঁহার অধিকার মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয়ের আশ্চর্য নিয়ম প্রচলিত করিয়াছিলেন। ৮২সিক্কা ওজনে সের ধার্য্য হইয়াছিল। সেরের পরিমাণে কোন্ দ্রব্য কত মূল্যে বিক্রয় হইবে তাহার একটি তালিকা প্রত্যেক বাজারে লটকাইয়া দিয়াছিলেন। কেহ ইহার অন্যথা করিতে পারিত না।"

তালিকাটি এরূপ ;১৮

চাউল	/১ সের	এক পয়সা	মশুরি	/১ সের	দুই পয়সা
লঙ্কামরিচ	/১ সের	এক পয়সা	মটর	/১ সের	দুই পয়সা
গুড়	/১ সের	দুই পয়সা	মুগ	/১ সের	চারি পয়সা
লবণ	/১ সের	দুই পয়সা	অড়হড়	/১ সের	চারি পয়সা
রসুন পিঁয়াজ	/১ সের	দুই পয়সা	তৈল	/১ সের	তিন আনা
কার্পাস	/১ সের	পাঁচ পয়সা	ঘৃত	/১ সের	পাঁচ আনা।
কলাই	/১ সের	এক পয়সা			

সমসেরের রাজপতাকাতলে থেকে সাধারণ মানুষের দুঃখের দিন অপসৃত হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি। কারণ তাঁর ত্রিপুর রাজ্য জয় স্থায়ী হয়নি। কৃষ্ণমণি সমসেরকে পরাস্ত করার জন্য বাংলার নামমাত্রী নবাব মীরকাশিমের সাহায্য চাইলেন। নবাব ইংরেজ পুষ্ট সৈন্যদল প্রেরণ করলেন। নবাবের সুসজ্জিত শিক্ষিত বাহিনীর কাছে সমসেরের ক্ষুদ্রবাহিনী পরাস্ত হলো। সমসের নবাবের বন্দী হলেন। পরে তাঁকে "নবাবের হুকুমে তোপের মুখে বন্ধন করিয়া সমসের গাজিকে হত্যা করা হয়।"১৯

এক

এখানে একটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে সমসের গাজির শাসন কাল সম্পর্কে। দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন: নবাব আলিবর্দ্দি মুর্শিদাবাদে সমসের গাজিকে পুনঃপুনঃ ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন সমসের রোশনাবাদে রাজত্ব করতেন দোর্দণ্ড প্রতাপে। তাই আবুবখর নবাবকে বুঝিয়ে ছিলেন, "তাটীর বাঘ বন্দী করি ছাড়ি দিবা কেনে। আসিয়া মারিবে দেশ সম্মুখে সে রণে। কাড়ি নিল দক্ষিণ-শিক জমিদারে মারি। রাজবংশ খেদাইল রোসনবাদ (ত্রিপুরা) কাড়ি। অদ্যাপি তাল আছে বন্দী করি আনি। নতুবা পশ্চাতে ভয় হবে পেরশোনি।"২০ আলিবর্দ্দির আদেশে তিনি মুর্শিদাবাদ যেতে সম্মত ছিলেন না। সমসেরকে মুর্শিদাবাদে যেতে নিষেধ করেছিলেন তাঁর এক জামাতা। ইনি ছিলেন

ঢাকার এক নবাব। কিন্তু এক সন্ন্যাসীর প্ররোচনায় ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন। সুতরাং এর থেকে মনে হতে পারে সমসের গাজি ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব থেকেই রাজত্ব করতেন।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধে কৈলাস চন্দ্র সিংহের সংগৃহীত 'গাজিনামা'র খণ্ডিত পুথির কথা উল্লেখ করছেন। এর ওপর ভিত্তি করে জানিয়েছেন "সমসের গাজি ১২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (১৭৪৬-৫৮খ্রী) এবং শেষ ৫ বৎসর···বিদ্রোহীরূপে রাজ্যের অংশ বিশেষ শাসন করিয়াছিলেন।"২১ অর্থাৎ দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় বলতে চেয়েছেন, সমসেরের বিদ্রোহী ভূমিকা ছিল ১৭৫৩ থেকে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

শ্রদ্ধেয় গবেষক সুপ্রকাশ রায় মহাশয় লিখেছেন সমসের গাজির বিদ্রোহ ধ্বংস করার জন্য যুবরাজ কৃষ্ণমণি বাংলার নবাব মীরকাশিমের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন। নবাব কৃষ্ণমণিকেই ত্রিপুরার রাজা বলে স্বীকার করে ছিলেন। তারপর নবাব ইংরেজ বণিকদের সাহায্য পুষ্ট এক বিশাল বাহিনী ত্রিপুরায় প্রেরণ করলেন। একটি যুদ্ধ হলো বটে। কিন্তু অসম যুদ্ধে সমসের বন্দী হয়ে মুর্শিদাবাদ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তাঁকে তোপের মুখে বন্ধন করে হত্যা করা হয়।২২ এক্ষেত্রে তিনি নির্ভর করেছেন 'রাজমালা'র ওপর। এতে কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় লিখেছেন: "সমসেরের সৌভাগ্য তপন পশ্চিমাকাশে বিলম্বিত হইল। অশেষ গুণালঙ্কৃত আলিজা মিরকাশেম বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাব সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিলেন। ···তিনি যুবরাজ কৃষ্ণমণিকে "ত্রিপুরাপতি" বলিয়া স্বীকার করিলেন। নবাবের প্রেরিত সৈন্যগণ ত্রিপুরার উপনীত হইয়া সমসেরকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পশ্চাৎ নবাবের অনুমতি ক্রমে তোপের মুখে বন্ধন করিয়া সমসের গাজির প্রাণদণ্ড করা হইয়াছিল।"২৩

অবশ্য সুপ্রকাশ রায় মহাশয় সমসেরের মৃত্যুকাল নির্দ্ধারণ করেছেন ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ। এর যথোপযুক্ত কারণ তিনি দেননি। তবে অনুমান করা যেতে পারে মীরকাশেমের ক্রোধের শিকার অপরের হস্তে নিহত হওয়া সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে সমসেরের মৃত্যু ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে না হওয়াই সম্ভব। যাইহোক সমসের গাজির বিদ্রোহের চরম সীমাটি চিহ্নিত করা যায় বিজয় মাণিক্যের

মৃত্যু ও কৃষ্ণমাণিক্যের সিংহাসনে আরোহন কাল থেকে। কৃষ্ণমাণিক্য সিংহাসনে বসে ছিলেন ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে। দীনেশ চন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে-ও এই সালটির কথা বলেছেন। ত্রিপুরা ডিস্ট্রিকট গেজেটীয়ারে-ও তাই বলা হয়েছে।২৪

আমরা আলোচনা সূত্রে দেখেছি, সমসের রাজতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক তার শোষণ নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিলেন; যার ফলেই তিনি বিদ্রোহী। তাই তিনি কোথায়-ও স্বীকৃত, প্রশস্তি, অভিনন্দিত আবার কোথায় ও তিনি ধিকৃত, ঘৃণিত। যাইহোক, তাঁর বিদ্রোহী সত্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে কৃষ্ণ মাণিক্যের রাজ-পাটের প্রথম লগ্নেই। আমরা আগেই জেনেছি, তিনি রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করেছিলেন ফলত, রাজাকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে আগতলায় সরে যেতে হয়েছে। সুতরাং তিনি নবাব আলিবর্দ্দির হাতে বন্দী হননি। এবং তাঁর রাজ্যাঙ্ক ১৭৪৬ থেকে ১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ও নয়। অবশ্য ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের পরের ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করা চলে রোশনাবাদ দখল ও নাসির মহম্মদের হত্যা ও বিজয়মাণিক্যের সঙ্গে তাঁর বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি। আমাদের অনুমান, যুবরাজ কৃষ্ণমণি সিংহাসন দখলের জন্য ইংরেজের সাহায্য নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা ডিস্ট্রিকট গেজেটীয়ারে লেখা হয়েছে: "In 1760 the British troops from chittagong invaded Tippera in support of the Mughals and established krishna Manikya on the gadi..."২৫ এবং পরে সিংহাসন বিচ্যুত হয়ে ফের তা আয়ত্তে আনার জন্য তিনি নবাবের সাহায্য নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে 'ত্রিপুরার ইতিবৃত্তে' লেখা হয়েছে;—"সমসের গাজি ও আবদুল রজফ চাকলে রোসনাবাদ শাসন করিতেন।...যুবরাজ কৃষ্ণমণি স্বয়ং কাশিম আলি খাঁর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত অবস্থা জানাইয়াছিলেন। নবাব সৈন্য প্রেরণ করিয়া সমসের গাজি ও আবদুল রজফকে বন্দি ভাবে আনয়ন পূর্ব্বক কামানের মুখে বন্ধন করিয়া গোলাতে যবনদ্বয়ের প্রাণ বধ করেন।"২৬ এর থেকে জানা যায়, রোশনাবাদ চাকলাদার শুধুমাত্র সমসের গাজি-ই ছিলেন না; আরো একজন ছিলেন।

সুতরাং এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান, সমসের গাজি মীরকাশিমের নির্দেশেই নিহত হন কৃষ্ণমাণিক্যই রাজা বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সমসেরের

মৃত্যু ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে হয়েছিল বলেই মনে হয়। কারণ ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দ, মীরকাশিমের কাছে ছিল রাজনৈতিক অন্তিম মুহূর্ত।

দুই

একদিন যে ছিলেন ক্রীতদাস, আরেকদিন সে হলেন রাজা। বহুমানিত রাজা। যাঁর সংগ্রাম ছিল শোষণ, পীড়নের বিরুদ্ধে। বাঙালীর কাল-গৌরব রোশনাবাদ নায়কের স্বপ্নভঙ্গ একটি ব্যর্থতার ইতিহাস। মানুষের সেবার লক্ষ্য নিয়ে যিনি জীবনব্যাপী সংগ্রাম করলেন সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে; তাঁর নিদারুণ পরিণতি বেদনার ইতিহাস হয়ে রইলো। আরো একটি কথা। দেশকাল পরিস্থির তুলনায় সমসের কত বেশি যুক্তিবাদী ছিলেন তা-ও বিবেচ্য। কারণ, তাঁর শাসন-শৃংখলার কথা-ই বলতে হয়। যে মানুষটি মুক্তমননিয়ে, রেনেসাঁর মননিয়ে, ন্যায়নীতির কষ্টিপাথরে যাচাই করলেন শোষণ মুক্ত সুখ-সত্যকে; আর তার জন্য তিনি যে প্রতিবিধানের নিদান রচনা করলেন তা বর্তমান যুগধর্ম-ও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবে; কিংবা ভাবীকাল-ও।

১. প্রসংগ : গাজিনামা…

ইতিহাসের পটভূমিকায় সমসেরের বিদ্রোহীমানসের পরিচয় নিতে চেষ্টা করেছি। এখন সমসেরের যে আত্মস্বরূপ বিক্ষোভে বিদীর্ণ ছিল, তার প্রভাববৈভব সাহিত্যের কোনো শাখায় শিল্পিত হয়ে উঠেছে কিনা ; তার আলোচনায় আমরা অগ্রসর হবো। কিন্তু আমাদের বাধাপেতে হয় তথ্য-সূত্র সন্ধানের ক্ষেত্রে। সমকালীন যুগসমস্যার বাস্তব চিত্র এখন-ও সংকেত তির্যকরহস্যে নিহিত। সমসের জীবনচরিত 'গাজিনামা'র আদ্যন্ত খণ্ডিত একটি পুঁথির সন্ধান দিয়েছেন দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য।২৭ এটির সংগ্রহ করেছেন কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয়। দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার একটি স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে আলোচনা করলেন বটে, কিন্তু মূল পুঁথিটির বিস্তৃত পাঠ ও আবশ্যকীয় সংবাদ দেননি।

এখানে উল্লেখ্য, মূল পুঁথিটির একটি মুদ্রিত সংস্করণ ও বের হয়েছিল। ১৩২০ সালে নোয়াখালির সিরিস্তাদার মৌলবী লোতফল খবির সাহেব সেখ মনুহরের রচিত 'গাজিনামা' মুদ্রিত করেন। এটির সম্পর্কে দীনেশবাবু মন্তব্য করেছেন ; "বিশেষতঃ গ্রন্থকারের বহুতর ভণিতার মধ্যে মাত্র একটী মুদ্রিত হওয়ায় (পৃ ৮০) এবং গ্রাম্য কবির কুল পরিচয় সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হওয়ায় গ্রন্থের কাল নির্ণয় ও প্রামাণিকতা বিষয়ে ভ্রমপ্রমাদের অবকাশ সৃষ্টি করিয়াছে।"২৮ সুতরাং সমসেরের বিপ্লবীমানস, সত্তাবোধ, মনের অগ্নিদীপ্তি, জীবন যন্ত্রণার তীব্রতম অনুভূতি এবং বি-সমভাবধারার আশ্চর্যকীর্তি সকল এখন-ও স্পষ্ট নয়। তাই ইতস্তত আলোচনার সূত্র থেকে প্রসংগের উপক্রম করা যেতে পারে।

সমসের গাজি প্রসংগে দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় গাজির গানের উল্লেখ করেছেন।২৯ তিনি জানিয়েছেন, সমসের একজন ডাকাত ছিলেন। এক

সময় তিনি এমনই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন যে, ত্রিপুররাজকে সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করেছিলেন এবং নিজেকে প্রধান হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন। সমসের লুণ্ঠন করে যে সম্পদ লাভ করতেন তা নাকি তাঁর সংগে সংগেই বাহিত হতো। এই গানে এমন ও উল্লেখ রয়েছে গাজির এই সম্পদ, বাহকদের দ্বারা উদয়পুরের পার্বত্য-অরণ্যের গভীরে আনিত হলেই গাজি বাহকদের বিতাড়ন করতেন। এবং যে বাহক গর্ত খনন করে তা মাটিতে প্রোথিত রাখত; সমসের তার শিরশ্ছেদ করতেন, যাতে গোপনীয়তা রক্ষা হয়। এমন ও শোনা যায়, কোনো কোনো কাঠুরে গহীন-অরণ্যে অকস্মাৎ সমসেরের লুকনো ধনসম্পদের সন্ধান পেয়েছে। এই বিষয়কে ঘিরে ত্রিপুরা অঞ্চলে ইতরবিশিষ্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে গাজির গানের প্রচলন আছে। এসব গান রচিত হয়েছে সমসেরের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই।

দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় এইতথ্যটি কোথায় পেলেন, তা জানাননি। এমনকি, কৈলাস চন্দ্র সিংহের 'রাজমালা' হতে সমসের গাজির গানের যে অংশটি উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থে ৩০; তাতে কিংবা রাজমালায় এ তথ্যের উল্লেখ নেই। কৈলাস চন্দ্র সিংহ মহাশয় গানের এই অংশটি ব্যতীত আর কোনো উদ্ধৃতি দেননি। গানের উদ্ধৃত অংশটি হলো এই৩১ঃ

তবে গাজি যে সবারে দিল লাখেরাজ ১।
পাকড়ি২ আনিল রাজা লইতে খেরাজ ॥
সকলে মিনতি করে মহারাজ-আগে।
মহারাজ দোহাই দিয়া ক্ষমা-বর মাগে ॥
তচ্ছ্রুদক খাইমোরা ফকীর খোনার৩।
ভট্ট৪ ব্রাহ্মণ মোরা পেসা নাই আর ॥
মহারাজ বলে তোরে কি দিল নিষ্কর।
বলে, দিছে হেন রজক সমসর ॥

১. লাখেরাজ=নিষ্কর
২. পাকড়ি (হিন্দীশব্দ)=ধরে আনা
৩. খোনার=ধন্দকার
৪ ভট্ট>ভাট। যে ব্রাহ্মণগণ সাময়িক বিষয় ও অন্যান্য বিষয়ে কবিতাদি শোনাতেন।

এক পুরিয়া জমিদার দিল আমারেরে১।
পোত্তাপোদ্দি হই তুমি চাহ ভাজিবারে॥
এতেক শুনিয়া রাজা হইল সলজ্জিত।
পাত্রগণ বুঝাইল রাজার বিদিত॥
রায়ত হইয়া কর্ত্তা দিয়াছে নিষ্কর।
আপনি লইলে কর লজ্জা বহুতর॥
তবে মহারাজ বহাল করিল সবারে।
খয়রাত নিষ্কর বিনা আর দেবোত্তর॥

অবশ্য, গাজিনামাতে সমসেরের লুণ্ঠন কাহিনী স্বীকৃত। এখানে বলা হয়েছে :

জগতপুর খণ্ডল অবধি মণিপুর
চৌদ্দগ্রাম গোসাইর মেহেরকুলপুর॥
নুরনগর লৌহগড় উদয়পুরে গিয়া।
আটজঙ্গল বিশালগড় সকলে লুটিয়া॥
দান্দার বাউরপুর যাব ভুলুয়া নগরী।
উমরাবাদ আহম্মদাবাদ যতেক নগরী॥

গাজিনামা থেকে সমসেরের একসহচরের নাম জানা যায়। ত্রিপুর রাজের সংগে সমসেরের দ্বান্দ্বিক সূত্রেই তাঁর ভূমিকা স্পষ্ট হয় : কবি তাঁর পরিচয়ে সামান্যই বলেছেন :

হাজি হোসেন৩২ মোগল ঢাকাতে বসতি।
সমসের গাজি দস্যু দক্ষিণ শিকপতি॥
গাজিয়ে মনে করে ত্রিপুর রাজ্য লইতে।
হাজি হোসন মুরব্বি করিল কোন মতে॥

এখানে একটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, সমসের গাজি মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় যে তথ্য দিয়েছেন; তাতে তাঁকে ডাকাত হিসাবে চিত্রিত করতে হয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই, না জীবন ধর্মের মৌলবিচারে তিনি অন্য মানুষ ছিলেন? আমরা ইতিহাস পর্বে লক্ষ করেছি যে, তিনি লুণ্ঠন করেছেন। আর সে লুণ্ঠন প্রয়োজনের পথবাহিত

১. আমারেরে=আমাদিগের

হয়েছিল। কারণ, জনসেবার লক্ষ্যই ছিল তাঁর জীবনব্যাপী সংগ্রাম। এর জন্যই শোষক অত্যাচারীর স্ফীত-ভাণ্ডার তাঁর রোষ দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পায়নি। মোটকথা, সমসেরের বিদ্রোহী মানস, কল্যাণাত্মিক এক নিবিড় অনুভূতির কেন্দ্র বিন্দুতে তাঁকে সংহত রেখেছে। সুতরাং সমসের গাজিকে আতঙ্ক-পাণ্ডুতার প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করা ঠিক নয়। আর তা ছাড়া 'গাজি'৩৩ শব্দার্থের মধ্যে ও তাঁর চরিত্র বোঝা কষ্ট কল্পনা নয়।

গানের উদ্ধৃত অংশে আমরা দেখ্ছি, সমসের গাজি তাঁর স্বল্পকালীন জমিদারিতে অনেক নিষ্কর জমি বণ্টন করেছেন। এ বণ্টন জাতি ধর্ম নির্বিশেষেই হয়েছে। আর এরজন্যই প্রজারা-ও কৃতজ্ঞ। যখন ত্রিপুর মহারাজ এই নিষ্করতার প্রসংগে কঠোর হলেন ও নিষ্করভোগীদের ধরে আনার হুকুম দিলেন। তখন অসহায় প্রজাবা সমসের সত্তার এবং আত্মার অমর উপলব্ধি করে বিনম্র চিত্তে জানায় ;—

"এক পুরিয়া জমিদার দিল আমারেরে।
পোত্তাপোস্থি হই তুমি চাহ ভাঙ্গিবারে ॥" ৩৪

(অর্থাৎ—এক পুরুষের জমিদার সমসের গাজি জমি নিষ্কর দিয়েছেন আর মহারাজ পুরুষানুক্রমে প্রাচীন অধিপতি হয়েও সে নিয়ম ভাঙতে চাইছেন!)

একটি বিষয়ের ওপর সমসেরের মনোধর্ম বিশ্লেষণ করলে সমসেরের প্রকৃতি বোঝা সহজতর হবে। তা হলো ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার বিষয়ক কাহিনীটি। আগেই বলেছি, সমসেরের কাছে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কৃষ্ণ-মণি উদয়পুর ছেড়ে আগরতলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন।* ফলত, রাজসিংহাসন সমসের দখল করলেন বটে, তবুও তিনি নিজে সিংহাসনে বসলেন না। প্রথাগত বিশ্বাসে প্রজাদের হয়তো আনুগত্য বেশি। তাই প্রজাদের মন সন্তুষ্টির জন্য স্বয়ং রাজা নাম না গ্রহণ করে ত্রিপুরা রাজবংশীয় ধর্মমাণিক্যের পৌত্র ও গদাধর ঠাকুরের পুত্র লক্ষ্মণ ঠাকুরকে 'লক্ষ্মণ মাণিক্য' আখ্যা দিয়ে রাজ সিংহাসনে স্থাপন করেন। আসলে, সমসের ঠিক রাজতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে ছিলেন না ; ছিলেন রাজতন্ত্রের শোষণ, পীড়নের বিরুদ্ধে। 'কৃষ্ণ মালা'র ৩৫ বিবরণে বলা হয়েছে।

সমশের গাজী গেল আপনা বাড়ীতে।
না হইলে ত্রিপুরা রাজা না দিলে ত্রিপুরা ॥

ভুবনে বিখ্যাত ধর্ম্মমাণিক্য নৃপতি।
গদাধর ঠাকুর যে তাহার সন্ততি॥
লবঙ্গ ঠাকুর গদাধরের সন্ততি।
উদয়পুরেতে তিনি করয়ে বসতি॥
তাহাকে করিব রাজা রিহাঙ্গেতে গিয়া।
তবে সে ত্রিপুর সব মিলিব আসিয়া॥
এত ভাবি লবঙ্গ ঠাকুরের কারণ।
উদয়পুরেতে লোক পাঠাইল তখন॥
লোক আসি লবঙ্গ ঠাকুরকে লইয়া।
উপস্থিত হইলেক রিহাঙ্গেতে গিয়া।
লক্ষণমাণিক্য নাম তখনে করিয়া।
রাজা করিলেক তানে রিহাঙ্গেতে গিয়া॥

সমসেরের মনোপ্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রসংগে একটি বিশেষ দিকের আলোকপাত সম্ভব। তা হলো তাঁর শিক্ষানুরাগ। সেখ মনুহরের 'গাজিনামা'তে এর সাক্ষ্য মেলে। এই সাক্ষ্য থেকে শুভ ইচ্ছা সম্পন্ন মানুষটিকে চেনা সম্ভব হয়। স্বল্পকালীন শাসন ব্যবস্থায় প্রজা সাধারণের আত্ম বিকাশের যে সুযোগ তিনি করে দিয়েছিলেন; তাতে তাঁর শিক্ষা সংস্কৃতির রসরুচিও ধী-শক্তিরই জয় ঘোষণা করে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃত অংশটিতে সে ইচ্ছা পূরণের উত্তাপ উপলব্ধি সহজেই বোঝা যাবে :

শিক্ষা ব্যবস্থা।৩৬

তোলাব খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া
গাজী পালে সে সকলে অন্নবস্ত্র দিয়া।
সন্দ্বীপের অন্ধ এক হাফিজ আনিয়া
কোরান পড়াএ সব পুণ্যের লাগিয়া।
হিন্দুস্থান হৈতে এক মৌলবী আনিল
আরবী এলেম ছাত্রগণে শিখাইল।
যুগ দিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী।
ঢাকা হইতে মুন্সী আনি ফারসী পড়াএ
হেনমতে নানা ভাষাএ এলেম শিখাএ।

দিন মধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে
দশদশ দণ্ড ধরি ভূভাগে পড়িতে।
ভোররাত্রি চারিদণ্ড আগাজে প্রহর
পাঠের সময় করি দিল গাজীবর।

আলোচনার সূত্র থেকে সমসেরের জনশাসনের কল্যাণাত্মিক রূপটি বোঝা যায় বটে। আসলে তিনি মানুষ হিসাবে নিষ্ঠুর ছিলেন না; বরং রসিক৩৭ ছিলেন। সেখ মনুহর সমসেরের যে চরিত্র চিত্রণ করেছেন তা মিশ্র প্রকৃতির। এর বড়ো কারণ, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না। তিনি তা স্বীকারও করেছেন :

কহে সেক মনুহরে পাঞ্চালি রচিয়া।
পীতামোহ মুখে বাক্য সকল শুনিয়া॥ ৩৮

এছাড়া, তাঁর বর্ণনায় কোনো তারিখের উল্লেখ নেই। তিনি সমসেরের বিজয় কাহিনী ও যুদ্ধ বিবরণ যেভাবে দিয়েছেন : তাতে মনে হবে সকল ঘটনা একই সময়ে ঘটেছিল।৩৯ ফলত, তাঁর তথ্য বিবৃতি থেকে ভ্রম সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব।

কবি সমসেরের বংশ পরিচয় কিছু দিতে পারেননি বটে, তবে তিনি নিজের আত্মপরিচয় আমাদের জানিয়েছেন। তাঁর ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষ 'মাহাম্মদ নাছির' ছিলেন ভুলুয়ার তালুকদার। তাঁর পৌত্র 'সেকগাজি'—

ছাড়িয়া ভুলুয়া দেশ "দক্ষিণ সিকে" প্রবেস,
স্থান কল্য "পানুয়া" মকাম।

এই দক্ষিণশিক পরগণাই সমসেরের 'জন্মস্থান ও লীলাভূমি'। শেখ গাজির কনিষ্ঠ পুত্র 'সাদক মাহাম্মদ'-ই কবির পিতামহ। এরপর কবি মাতামহকুল সম্পর্কে জানালেন—

"হুগলির বন্দর" ছাড়ি দক্ষিণসীকে কল্য বাড়ি,
নিবাসি উত্তর পানুয়াতে।

কবির প্রমাতামহ 'তাহির উকিল' ছিলেন সমসের গাজির প্রতিনিধি স্বরূপ।৪০

কবির রচনার নিদর্শন স্বরূপ সমসেরের মৃত্তি ঘরের (মুক্তাগার) বর্ণনাটি উল্লেখ করা যায়। এটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ। এখানে তাঁর

কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো :

একাবলি ছন্দ

একতোলা ঘর সোভা।	মুনীগণ মোন লোভা॥
জেহেন অমরাপুরী।	সভানের মোনহারি॥
দেখীতে নিয়াছন্দা।	জেন সত চন্দ্র বান্দা॥
ঝলকে তারকগণ।	চারিপাসে অভরণ॥
সেই যে ঘরের ঝরা।	শুভিত মুতির ছরা॥
জেহেন চামর দোলে।	সুবর্ণ মুতির জল॥
বিন্দু বিন্দু বারি মোহে।	গ্রীষ্ম উষ্ম নাহি রহে॥
আনন্দে পুলকে চিত।	কামের সবারে নিত॥
সুগন্ধি চামর তায়।	নিতি ডংসে কামরায়॥
সুকের সাগরে মনা।	নিতি প্রতি করে থানা॥
আনন্দসানন্দ মন।	জেন শ্রীবৃন্দাবন॥
রাধিকার কোরে কানু।	জেন বৈসে জোগভানু॥ ৪১

২. নাটক : বিদ্রোহী বান্দা…

"বিদ্রোহীবান্দা" একখানি নাটক। রচয়িতার নাম প্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। নাটকটির রচনা কাল ১৩৮১। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২। নাটকখানি চতুর্দশাধিক পুরুষচরিত্র এবং চতুর্থাধিক নারীচরিত্র সমন্বিত। এটি পঞ্চম অংক বিশিষ্ট এবং আটটি গানে সমৃদ্ধ। ৪২

সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

কৃষ্ণ মাণিক্য ত্রিপুরার রাজা। তাঁর দেওয়ান সূর্যকান্ত। অসীম তাঁর প্রভাব রাজার ওপর। রাজার অগাধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে সূর্যকান্ত সমগ্র দেশে অত্যাচার উৎপীড়ন করে। প্রজারা শোষিত, বঞ্চিত। বিক্ষুব্ধ তারা অন্তরে অন্তরে।

সমসের গাজি একজন কৃষক নেতা। রোশনাবাদের চাকলাদার তিনি। প্রজাদের জন্য সাধারণভাবে সুখ বিতরণে তিনি কৃত সংকল্প। তাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান বলে কিছু নেই। সকলেই তাঁর পরম আত্মীয়। গঙ্গা-গোবিন্দ আরেকজন কৃষক নেতা। তিনি সমসেরের নিত্য সহচর। কৃষ্ণ মাণিক্য প্রজা চিন্তায় মগ্ন নন। সূর্যকান্ত সেই সুযোগে ত্রিপুর রাজা হবার স্বপ্ন দেখেন। রাজার ভগ্নী স্বর্ণলতার প্রেমিক সে। অথচ রাজমাতা অহল্যাদেবী ভেবেছেন কৃষ্ণমাণিক্যের শ্যালক সঞ্জীবের সংগে স্বর্ণলতার বিয়ে দেবেন। তা হবার নয়। কেননা স্বর্ণলতা সূর্যমুখী। অবশ্য চরিত্রবান, আদর্শ পুরুষ সঞ্জীবের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে প্রজাদের কথা নিরন্তর-ভাবে। তাদের দুঃখে সে দুঃখী। কিন্তু সূর্যকান্ত সঞ্জীবকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবেন। সঞ্জীবকে বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র বিস্তার করেন। সঞ্জীব সমসের গাজীর বিদ্রোহী চেতনাকে অভিনন্দন জানায়। প্রজার জাগরণে তিনি বীজমন্ত্র দিয়ে চলেন।

সমসের গাজি বিদ্রোহী। রাজার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ। রাজতান্ত্রিকতা তাঁর অসহ্য নয়, অসহ্য রাজার নীরব ভূমিকা আর দেওয়ান কর্মচারির অত্যাচার, উৎপীড়ন। তাই তিনি কুকি নেতা রাজারামকে বুঝিয়ে বলেন; যে সংগ্রাম সুরু হয়েছে, সমষ্টি মংগল হলো এর উদ্দেশ্য। অত্যাচারিত প্রজাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য তিনি কুকি নেতাকে আহবান জানালেন। কুকি নেতা রাজারাম সূর্যকান্তের ষড়যন্ত্রে প্রথমে কৃষ্ণমাণিক্যের দলে যোগ দিলেও তিনি পরে তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সমসেরকেই গ্রহণ করলেন। সমসের তাঁকে ভাই বলে আলিঙ্গন করলেন।

রাজমাতা অহল্যা অবিনীত পুত্র কৃষ্ণমাণিক্যকে অনেক বোঝালেন। নিপীড়িত প্রজাদের অসন্তোষের যৌক্তিকতা বোঝাতে চেষ্টা করলেন বটে। কিন্তু নিষ্ফল হলো তা। কৃষ্ণমাণিক্য সমসেরকে বিদ্রোহী ভাবেন, বিধর্মী বলে ঘৃণাও করেন। পুত্রের এই কথা শুনে মায়ের রূঢ়-অভিভাষণটি লক্ষণীয়:

"অহল্যা। বিধর্মী তোমরা। অসহায় দেশবাসীর দুঃখে যার প্রাণ কাঁদে, ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে ক্ষিধের ভাত তুলে দিতে, মরণকে তুচ্ছ করেও যে পশুশক্তির বিপক্ষে রুখে দাঁড়ায়, দীন-দরিদ্র মুমূর্ষের সেবাই যার ধর্ম, সে কখনও বিধর্মী হতে পারে না" ।৬৩

যাইহোক, রাজমাতা হাজার হাজার প্রজা-পুত্রের জন্য আত্মজ-কে ত্যাগ করলেন। তিনি সমসেরকে ভরসা দিলেন মোহাচ্ছন্ন রাজার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের

কিন্তু রাজার দেওয়ান সূর্যকান্তের চক্রান্তের শেষ নেই। তিনি মীর-কাশিমের দরবারে হাজির হলেন। সেনাপতি মীর্জা হাকিম ত্রিপুরা দখলের স্বপ্ন দেখেন। তাছাড়া দাদা নাসির মহম্মদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে সমসেরের বিরুদ্ধে একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। সূর্যকান্ত সেই সুযোগ এনে দিলেন। নবাব বিভ্রান্ত। আদর্শবাদী নবাব নিকট-অতীত ভুলতে পারেন না। সিরাজের পরিণাম ভেবে শিউরে ওঠেন। ভুলতে পারেন না কোম্পানীর উদ্ধত ক্রিয়াকলাপ ও শোষণ-পীড়ন। তার ওপর এই আভ্যন্তর গোলযোগে তিনি দিশেহারা হলেন। তাই চঞ্চল চরণে, ছদ্মবেশে ত্রিপুরায় এলেন। এসে দেখলেন, হিন্দু মুসলমান সকল মানুষই সমসেরকে প্রিয় বলে ভাবে। এমনকি গঙ্গাগোবিন্দের স্ত্রী কুন্তলা সমসেরকে ভাই বলে মানে। তাঁর জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন পর্যন্ত দিতে পারে।

মীরকাশিম সমসেরের জনপ্রিয়তায় মুগ্ধ। তিনি ছদ্মবেশ উন্মোচন করলেন।

সমসের বললেন : "ছদ্মবেশের কি প্রয়োজন ছিল জাঁহাপনা ?

মীর। প্রয়োজন ছিল সামশের। ছদ্মবেশেই গোটা ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরে বুঝেছি, মীর্জা হাকিম আর দেওয়ান সূর্যকান্ত কতবড় জালিয়াৎ। বুঝেছি বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হয়েও আমি প্রজাদের যে শ্রদ্ধা কুড়োতে পারিনি, তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি শ্রদ্ধা—অনেক বেশি ভালোবাসা পেয়েছো।"৪৪

সূর্যকান্ত ও মীর্জা হাকিমের কৌশলে ত্রিপুরায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে পড়ে। সে বিষ এখন অন্তরে অন্তরে। সে বিষের দহনে জ্বলছে সমসের পত্নী ফাতেমা। সমসের শ্যালক মনসুর ফকিরের ছদ্মবেশে কুন্তলাকে দিয়ে যায় রক্ষা-কবচ। স্বামীর মংগলের জন্য নির্দেশ মতই আঁচলে বেঁধে রেখেছে সে। কিন্তু এই রক্ষা কবচই তার জীবনে কলঙ্ক বয়ে আনল। গঙ্গাগোবিন্দের কুচক্রী খুল্লতাত ভগীরথের হীনজালে গঙ্গাগোবিন্দ। সে গঙ্গাগোবিন্দকে বোঝাল, ঐ রক্ষা কবচ সমসেরের সংগে কুন্তলার অবৈধ সম্পর্কের নিদর্শন। গঙ্গাগোবিন্দ কুন্তলাকে ভুল বুঝলেন। একই ভুলের শিকার হয় সমসেরের পত্নী ফাতেমা। ফাতেমা তাই সমসেরের অমংগল চাইল।

মীর্জা হাকিম এই সুযোগে জেনে নিয়েছে ভ্রাতুষ্পুত্রী ফাতেমার কাছ থেকে সমসেরের গোপন অস্ত্রাগারটি। গঙ্গাগোবিন্দ সমসেরের বিরুদ্ধে বিচার চাইলেন নবাবের কাছে। সে এখন হিংস্র, উন্মত্ত। অথচ তাঁর স্ত্রী কুন্তলা বিধর্মী ভাইয়ের জন্য জীবন মরণ পণ করেছে। সমসেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। একমাত্র বন্ধু রাজারাম প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলেছেন। সমসেরের তাতে শেষ রক্ষা হয়না। তাঁর অস্ত্রাগার ধ্বংস হয়েছে। একান্ত সহচর গঙ্গাগোবিন্দ পাশে নেই। স্ত্রী ফাতেমাও বিপক্ষে। সমসের অসহায় বোধ করেন। এটি নাটকের চরম মুহূর্ত।

এসময় ঘটনা বিচিত্রমুখী হয়ে ওঠে। কুন্তলা সূর্যকান্তের কবলে। কামান্ধ সে। তাকে উদ্ধারের জন্য সঞ্জীব নিজের জীবন দিল। রাজমাতা অহল্যা মীরকাশিমকে এই অনর্থক যুদ্ধ থামাতে অনুরোধ করেছেন। মীরকাশিম নির্দে‘শ-ও দিয়েছেন। অন্যদিকে ভুল শুধ্‌রোবার পালা সুরু হয়েছে। গঙ্গাগোবিন্দ নিজের ভুল বুঝেছেন। ফাতেমা-ও। গঙ্গার অনুশোচনা স্ত্রী কুন্তলাকে ফিরিয়ে আনতে পারেনি। সূর্যকান্ত তাকে হত্যা করেছে। বন্ধু সমসেরকে-ও বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেছেন গঙ্গা-গোবিন্দ ; পারেননি। মীরকাশিমের পাঞ্জা নিয়ে বন্দী সমসেরকে উদ্ধার করতে তিনি মুঙ্গেরে গেলেন বটে কিন্তু মীর্জা হাকিম শুধু দাঁতাল-হাসিতে বলে ছিলেন : ‘কাম ফতে।’—অর্থাৎ সবশেষ।

কয়েকজন ঐতিহাসিক পুরুষ এবং কল্পিত চরিত্র নিয়ে নাটকটি রচিত। এতে কুন্তলা, ফাতেমা ও রাজকন্যা স্বর্ণলতা অনেকখানি স্থান জুড়ে। সূর্যকান্ত স্বর্ণলতার প্রেম, কুন্তলা ও গঙ্গাগোবিন্দের মনের অভিব্যক্তি কিংবা সমসের গাজি ও ফাতেমার বিপরীত চিন্তাধারা নাটকটিকে গতিদান করেছে। সঞ্জীবের আত্মত্যাগ, রাজমাতা অহল্যার প্রজা-ভাবনা, সমসেরের দেশ-ভাবনা ও মৃত্যু বরণ, রাজারামের বন্ধুতা, মীরকাশিমের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, কৃষ্ণমাণিক্য ও সূর্যকান্তের ষড়যন্ত্র ; নাটকের মৌল-বিষয়। নাট্যকার একটি আদর্শগত প্রেরণায় নাটকটির রচনা ও প্রচারণা করেছেন। সমসেরের দেশহিতৈষণা, আত্মত্যাগ, বিদ্রোহী চেতন প্রবাহ এবং সর্বোপরি তাঁর মহিম স্বভাবটি সমকালীন মানুষের বন্দনা না পেলেও সর্বকালে শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভের যোগ্য ;—সে কথাটি নাটকের গভীর উপলব্ধি। তাই যে কোনো

বিপর্যয়ের সংকেতে, দুর্মদ এই মানুষটির জন্ম কবির বন্দনা গান ;

…হোক না রাত্রি নীরব নিঝুম,
প্রলয়ের ডাকে ভেঙে যাবে ঘুম,
জেগেছি আমরা জাগিবে সকলে করিতে শত্রুক্ষয় ॥" ৪৫

পাদটীকা

১. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২, পৃ. ৪৮

"এক সামান্যা রমণীর গর্ভে ও জনৈক ফকিরের ঔরসে তাঁহার (সমসেরের) জন্ম। সমসেরের জীবন চরিত লেখক তাঁহাকে "পীরের নন্দন" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।"

দ্র, কৈলাস চন্দ্র সিংহ, রাজমালা, ১৩০৩, পৃ. ১২০

২. কৈলাস চন্দ্র সিংহ, রাজমালা, পৃ. ১২০

৩. তদেব, পৃ. ১২২

৪. J, E. Webster, *Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: Noakhali* (1911) P, 23

৫, রাজমালা, পৃ. ১২২. এবং Noakhali D. G. P, 23

৬. Noakhali D. G,-এ অন্যভাবে বলা হয়েছে : "The Raja sent soldiers against him, Samser made his peace with the Vizier and obtained the Zamindary of the Pargana and afterwards took Pargana Meher-Kul in farm"

রাজমালায় বলা হয়েছে—"ত্রিপুরেশ্বর এই সংবাদ (নাসির মহম্মদের মৃত্যু সংবাদ) শ্রবণে তাহার বিরুদ্ধে (সমসেরের) একদল সৈন্য প্রেরণ করিলে সমসের বলে ও কৌশলে মহারাজার উজিরকে বাধ্য করিয়া কয়েক সহস্র মুদ্রা "নজর" প্রদান পূর্বক দক্ষিণ শিকের জমিদারীর সনন্দ গ্রহণ করিলেন।" পৃ. ১২২

৭. তদেব. পৃ. ১২২

৮. রাজমালা, পৃ. ১১২ এবং Noakhali D. G. P. 23.

শ্রীকালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর 'শ্রীরাজমালা'য় উল্লেখ করেছেন—"মহারাজ ডাঙ্গর-ফা বীর সপ্তদশ পুত্রের মধ্যে রাজ্য বিভক্ত করিবার সময় আগর-ফা নামক

পুত্রকে এই স্থান (আগরতলা) প্রদান করিয়াছিলেন। অনেকের মতে, আগর-কা-এর নামানুসারে এই স্থান আগরতলা নামে খ্যাত।" পৃ. ২৩৮

৯. সুপ্রকাশ রায়, তদেব, পৃ. ৫০। অবশ্য রাজমালায় অন্যরকম উল্লেখ আছে—"রিয়াং, কুকি প্রভৃতি অধিকাংশ পার্ব্বত্য প্রজা যুবরাজ কৃষ্ণ মণির পক্ষে ছিল।" পৃ. ১২৪ আবার রাজমালাতে একথা-ও স্বীকার করা হয়েছে: "যুবরাজ কৃষ্ণমণি বল (শক্তি) সংগ্রহের অভিলাষে দীর্ঘকাল কাছার মণিপুর রাজ্যে ভ্রমণ করেন, কিন্তু আশানুরূপ সৈন্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন নাই।" পৃ. ১২৪

১০. তদেব, পৃ. ১২৩

১১. Noakhali D. G. P. 23

এতে বলা হয়েছে: "For a short time Samser Gazi was practically ruler of the Plains and was acknowledged even by few of the hills-men"

১২. রাজমালা, পৃ. ১২৬

১৩. তদেব, পৃ. ১২৪-১২৫

১৪. তদেব, পৃ. ১২৫

১৫. "...it is said he (সমসের) could not abandon his old robber-habits and would at times plunder the houses of the rich and distrtbute his booty among the poor." Noakhali D. G. P, 23

১৬. সেখ মনুহরের উক্তি সমসের গাজি সম্পর্কে। দ্র, রাজমালা পৃ. ১২৩
"সমসের গাজী প্রকৃত পক্ষে দাতা ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু মুসলমানকে চাকলা রোশনাবাদের মধ্যে অনেক নিষ্কর ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন।" তদেব, পৃ. ১২৬

১৭. তদেব, পৃ. ১২৫

"হাটে বাজারে গাজি মুনাদি ফিরাই।
ওজন করিয়া দিলা নিরিখ শিখাই॥
ওজনেও কম কেহ নারে বেচিবার।
মূল্য বাড়াইয়া কেহ নারে ঠকাবার॥
পাইলে নিয়ম ছাড়া শাস্তি করে গাজি।
খরিদদার বিক্রেতা সবে তারে রাজি॥

গাজি নামার সংকলন। প্রসংগ—দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৮৫১-১৮৬০

১৮. তদেব, পৃ. ১২৬

১৯. তদেব, পৃ. ১২৭

২০ দীনেশ চন্দ্র সেন, বৃহৎ বঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৪২, পৃ. ১০৪২

২১. দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, বাংলা সাহিত্যের কতিপয় ঐতিহাসিক কাব্য (প্রবন্ধ) দ্র. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮, ১ম-২য় সংখ্যা, পৃ. ১১

২২. সুপ্রকাশ রায়, তদেব, পৃ. ৫১

২৩. রাজমালা, পৃ. ১২৬-১২৭

২৪. দীনেশচন্দ্র সেন, বৃহৎবঙ্গ, পৃ. ১০৪২

২৫. J. B. Webster, *Eastern Bengal District Gazetteers*; *Tippera*, Allahabad, 1910, P, 14

২৬. কৈলাস চন্দ্র সিংহ, ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত, ১৮৭৬, পৃ. ৫৭

২৭. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৮

২৮. তদেব

২৯. Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and literature*, 1954, P, 663.

৩০. দীনেশ চন্দ্র সেন, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৪০৭-১৪০৮

৩১. রাজমালা, পৃ. ১৩২

৩২. হাজী হোসেনের কোনো পরিচয় কবি দেননি বটে, তবে হোসনাবাদ পরগণার প্রাচীন সনদে হাজি হোচন নামে এক পরগণা ওয়াদ্দারের নাম মেলে। দ্র, চুন্টা-প্রকাশ, আশ্বিন, ১৩৪৭, প্রসংগ—সুপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা-কবিতা, পৃ. ১১৫

৩৩. 'গাজী' শব্দার্থে বলা হয়েছে, ধর্মযোদ্ধা, প্রসিদ্ধবীর। দ্র, রাজশেখর বসু, চলন্তিকা, দ্বাদশ সংস্করণ, পৃ. ১৯০

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় শব্দকোষ-এ অর্থ দিয়েছেনঃ যোদ্ধা, বীরপুরুষ ইত্যাদি দ্র, ১ম খণ্ড,

৩৪. রাজমালা, পৃ. ১৩২

ঐ গ্রন্থের অন্যত্র বলা হয়েছে। "সমসের গাজি প্রকৃত পক্ষে দাতা ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু মুসলমানকে চাকলা রোশনাবাদের মধ্যে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন।" পৃ. ১২৬

* এখানে সমসেরের যুদ্ধ-বিক্রম সম্পর্কে কিছু বলা যায়।

গাজির তোপে দেখ করি হুহুঙ্কার।
গিরি-চূড়া উপাড়িয়া করে ছারখার॥
এত দেখি মণিপুরী হয় অন্তর্ধান।
রাজাকে লইয়া তারা করিল প্রস্থান॥
পলাইয়া গেল রাজা আগর তলায়।
কেহ বনে কেহ স্থলে সৈন্যেরা পলায়॥
ধ্বজা ছত্র সিংহাসন সব ফেলাইয়া।
একে একে সব লোক গেল পলাইয়া॥

লুধ্ফুল (লোতফল ?) খবির সাহেবের প্রকাশিত পুথি থেকে 'গাজিনামার' সংকলন করেছেন দীনেশ চন্দ্রসেন. দ্র, বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫১-১৮৬০

৩৫. প্রসংগ—সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ৯৯.

৩৬. দ্র. উদ্ধৃতি, ড. আহমদশরীফ, মধ্যযুগের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, ১৯৭৭, (মুক্তধারা প্রকাশনী) পৃ. ৪২৫

৩৭. মানুষ হিসাবে সমসের গাজি রসিক ছিলেন। একটি উদাহরণ দিয়েছেন দীনেশ চন্দ্রসেন। গাজির গানে উল্লেখ আছে। একদিন চন্দ্র ও উৎসব নামে দুই নাপিত সমসেরের ঘুমন্ত অবস্থায় ক্ষৌর-কর্ম করে। সমসের নাকি তা টের পাননি। সমসের তাই তাদের কৃতিত্বের জন্য পুরস্কৃত করেছিলেন। দ্র, বৃহৎবঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড পৃ. ১০৪২

৩৮. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, তদেব, পৃ. ১১-১২

৩৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ১১৪

৪০. দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, তদেব পৃ, ১১-১২

৪১. তদেব, প. ১২-১৩

৪২. প্রসাদ কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বিদ্রোহী বাঙ্গা, ১৯৮১। এটি কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ নাট্য-ভারতী যাত্রা পার্টি কর্তৃক সাফল্যের সংগে বহু রজনী অভিনীত হয়েছে।

৪৩. তদেব, পৃ. ৫৪

৪৪, তদেব. পৃ. ৬৫-৬৬

৪৫. তদেব, পৃ. ৪৭



তৃতীয় অধ্যায়

গণ বিদ্রোহ

(১৭৬০–১৮০০)

[ঐতিহাসিক—অনুবন্ধ

॥ ১ ॥

মেদিনীপুরের গণবিদ্রোহ

এক. ধলভূমের বিদ্রোহ

দুই. জঙ্গল মহালের বিদ্রোহ

॥ ২ ॥

বিদ্রোহ : বীরভূম ও বিষ্ণুপুরে

॥ ৩ ॥

অপ্রধান বিদ্রোহ চিত্র

এক. সিলেটে বিশৃঙ্খলা

দুই. পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ

তিন. সুবান্দিয়া বিদ্রোহ

চার. যশোহর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ

"মোগল ও ইংরাজশাসনের সন্ধি-যুগে দেশে ছিল অরাজকতা। দেশীয়লোকে সহজে বৈদেশিককে আমল দিতে রাজি ছিলনা। সুতরাং দেশীয়েরা যাহাকে স্বাধিকার বলিয়া জ্ঞান করিতেন, শাসকেরা তাহাই বে-আইন বলিয়া ঘোষণা করিতেন।"—
সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস,

৩ ॥ অধ্যায় ঃ গণবিদ্রোহ

ইংরেজশাসনের প্রথমলগ্নে বাঙলাদেশের বিভিন্ন গণবিদ্রোহ, ইংরেজদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত স্বরূপ। এসব বিদ্রোহের বিস্তার পরবর্তী সময়ে আরো চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত খণ্ড, সীমিত হলেও তা ছিল প্রায় গতিহীন ; পৌনঃপুনিক। কিন্তু মনন চেতনার স্বল্পতায়, দৃঢ়ব্যক্তিত্ব ও একনায়কত্বের১ বলিষ্ঠ সংগঠনের অভাবে ; আঠারো শতকের বিদ্রোহ-বিপ্লব সার্থক স্বাধীনতার উপলব্ধি ও সিদ্ধির অনন্তপথ সূচনা করতে পারেনি। তাহলেও আলোচ্য যুগের পটভূমিতে কোম্পানী রাজত্বের প্রথমভাগে, সেই বিদ্রোহ-অশান্তি-উপলব্ধির ইতিহাসকে আমরা আলোচনা করব। এতে বিদ্রোহীমানস ও সংস্কৃতির পরিচয় মিলবে এবং আন্দোলনের প্রলয়কল্লোল কতটা উত্থিত হয়েছিল, তা ও জানা যাবে।

॥ ১ ॥ মেদিনীপুরে গণবিদ্রোহ

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর, একটি সন্ধির শর্তানুসারে নবাব মীরকাশিম ইংরেজ কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও থানা ইসলামাবাদ* (চট্টগ্রাম) ছেড়ে দেন এবং ঐ বৎসরের ১৫ই অক্টোবর একটি সনদ প্রদান করলেন। এই প্রদেশে ইংরেজ কর্তৃত্ব বিস্তারের এই হলো প্রথম দলিল।২

কোম্পানী রাজ্যাধিকারের সময় মেদিনীপুর ছিল নিবিড় জংগলে পরিপূর্ণ। সরকারী চিঠিপত্রে জানা যায়, মেদিনীপুরের চারিদিক তখন অশান্তির আগুনে প্রধূমিত। স্থানীয় জমিদারগণ পারস্পরিক দাঙ্গা হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিলেন। দেশে অসামাজিক ও রাহাজানিতে একদল লোক নিয়োজিত ছিল। যেমন, শবরা, বাগ্দি প্রভৃতি জঙ্গল মহালের কয়েকটি অসভ্য জাতি

ঐ সময়ে মেদিনীপুরের নিরীহ প্রজাবৃন্দকে নানা প্রকার উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উহাদের দৌরাত্ম্যে কি ধনী কি নির্ধন সকলে সতত শঙ্কিত থাকিত। তীর-ধনুকই তাহাদের প্রধান অস্ত্র ছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গলে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে গৃহনির্মান করিয়া গোপনে বাস করিত।"৩ এছাড়া বর্গীর হাঙ্গামা মেদিনীপুরকে রিক্ত করে তুলেছিল তার ওপর স্থানীয় আরণ্য অধিবাসীরা যাদের ইংরেজ নথিপত্রে চোয়াড় নামে আখ্যাত করা হয়েছে; তারা ও দুর্বার গতিতে বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ চালিয়ে ছিল ইংরেজ ও দেশীয় সামন্ত প্রভুদের ওপর। প্রতিবাদীর সক্রিয়তম ভূমিকাটি আলোচনার ক্রমান্বিত ধারাসূত্রে স্পষ্ট হবে।

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের একখানি চিঠিতে জানা যায়, জঙ্গল মহালের দুষ্ট প্রকৃতির জমিদারগণই নাকি এসব চোয়াড়দের অসামাজিক ক্রিয়াকলাপে ইন্ধন যোগাতেন। আত্মরক্ষা ও পরস্বাপহরণ কাজে এদের প্রস্তুত রাখতেন। কোম্পানীর শাসনারম্ভের সংগে সংগে এসব অঞ্চলের জমিদার ও চোয়াড়দের কথা কোম্পানী অবহিত হলে ও ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেননি। ঐ বৎসরই কোম্পানী সিদ্ধান্ত নিলেন যে, স্থানীয় জমিদারগণকে রাজস্ব দিতে হবে এবং "তাঁহাদের দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া দুষ্টনীড় নষ্ট করিয়া দিতে হইবে।"৪

কোম্পানীর এই সিদ্ধান্তের কথা বাত্যাতাড়িত হলো। ফলত, একশত ক্রোশব্যাপী সমস্ত জঙ্গল প্রদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত হয়। মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট গ্রেহাম সাহেব, লেফ্‌টেনান্ট ফার্গুসন সাহেবকে এ বিদ্রোহ দমনে লিখলেন।৫ ফার্গুসন সাহেব ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে কল্যাণপুর দখল করলেন। ঝাড়গ্রামের জমিদার প্রথমে কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার না করায়, তাঁর দুর্গগুলি দখলীকৃত হয়। পরে অবশ্য তিনি ইংরেজ কর্তৃত্ব স্বীকার করেন। এইভাবে ফার্গুসনের নিরন্তর উদ্যমে রামগড়, লালগড়, জামবনী, শিলদা প্রভৃতি মহালের জমিদারগণ কোম্পানীর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। আসলে এসব অঞ্চলে ইংরেজ শাসন বিস্তার খুব সহজে হয়নি। প্রায় স্বাধীন জমিদারগণ দুরন্ত চোয়াড়দের বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধে নেমেছিলেন। কিন্তু শেষে সকলকেই পরাস্ত হতে হয়েছে। এঁদের মধ্যে ঘাটশিলার অর্থাৎ ধলভূমের জমিদারই বিশেষ শক্তিশালী ছিলেন। ত্রৈলোক্য

নাথ পাল মহাশয় লিখেছেন,—"জঙ্গল জমিদারগণের মধ্যে ঘাটশিলার জমিদার সর্ব্বাপেক্ষা স্বীয় অদম্য সাহস ও ভীষণ পরাক্রমের অধিকতর পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী ইংরাজের পক্ষপাতিনী।"৬

এক

ধলভূমের বিদ্রোহ

ধলভূমকে কেন্দ্র করে যে বিদ্রোহ অগ্নি প্রধূমিত হয়েছিল তার আত্যন্তিক চিত্রটি হলো এই। ধলভূমের (ঘাটশিলার) জমিদার ইংরেজের সংগে যুদ্ধে তাঁর দুর্গটি হারালেন। তিনি পালিয়ে গেলেন। ফার্গুসন ২২. ৩. ১৭৬৭ তারিখে ধলভূম অধিকার করলেন। ইংরেজ বৃদ্ধরাজার ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ ধলকে রাজপদে বসালেন বাৎসরিক বিরাট এক আর্থিক চুক্তিতে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জগন্নাথ ধলের এ দায়িত্ব পালন করার ইচ্ছা ও ক্ষমতা কোনোটাই ছিল না। সুতরাং ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে লেঃ রুক্ তাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত হলেন; আর্থিক চাপ ও রাজনৈতিক বশ্যতা স্বীকার আদায়ের উদ্দেশ্যে। ঐ বৎসরের জুলাই মাসে-ও ক্যাপটেন মরগান এলেন একই উদ্দেশ্যে। ইংরেজের প্রতি, ধলভূম জমিদারের আশ্চর্য বিরোধিতা স্বচক্ষে দেখলেন ক্যাপটেন। আর এ-ও জানলেন, মেদিনীপুরের সকলেই ইংরেজ শাসন মানতে চায় না; পরন্তু জগন্নাথের প্রতি মহলবাসীদের রয়েছে অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা। তিনি সরকারকে এসব কথা লিখলেন। এবং জগন্নাথ ধলকেই ধলভূমের রাজপদে বহাল রাখার প্রকৃত প্রস্তাব-ও দিলেন।৭

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জগন্নাথ ধল বিরাট ভূমিজ বাহিনী নিয়ে ইংরেজের ওপর আক্রমণ চালালেন। মেদিনীপুরের রেসিডেন্ট তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করলেন।৮ কিন্তু জগন্নাথের আক্রমণের গতি এত বেশী উদ্দাম ও কুশলী হয়ে উঠেছিল যে; হলদিপুকুরের কমাণ্ডার সিড্ নিস্মিথ মেদিনীপুরের চিফ্‌কে জগন্নাথের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাবাহিনীর প্রয়োজনের কথা জানালেন। এমন কথা-ও জানালেন, জগন্নাথ পাহাড়ীলোক-বল নিয়ে যে ধ্বংসকার্যে নেমেছেন; তাতে ইংরেজ পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ

হবে অসীম। জগন্নাথ ধলকে স্বপদে অধিষ্ঠিত হতে না দিলে কোম্পানীর তরফে একআনা-ও আদায় সম্ভব হবে না।৯

এরপরে দুইপক্ষের আক্রমণ প্রতি-আক্রমণ হয়েছিল অনেক। তবুও শেষে কোম্পানীকে জগন্নাথ ধলকেই রাজপদে মেনে নিতে হলো, অন্তত আরো কিছুকাল। দুইশক্তির বিরোধিতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং জনসাধারণের ইংরেজের প্রতি স্বাভাবিক বিরূপতা সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক সুন্দর মন্তব্য করেছেন :

"This is instance of baronial resistance to the growth of the British Supremacy in Bengal. The direction of the movement was in the hands of zamindars who fought with the help of their retainers, and hirelings and other bandits who lived by pillage , yet the part played by the people in this struggle dose not bear impress of zamindary promptings altogether. They must have disliked the imposition of the British rule and reacted in their usual way "১০

দুই

জঙ্গল মহালের বিদ্রোহ

মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মানভূমের বিস্তৃত বনাঞ্চল হলো জঙ্গল মহালের পরিধি। চোয়াড়গণ বিভিন্ন সময়ে জঙ্গল জমিদারদের পক্ষাবলম্বন করে দুর্বার হয়ে উঠেছে, সে কথা বলেছি। এখানে একটা কথা স্পষ্ট করে নিতে হয়। তাহলো এই আরণ্য অধিবাসীদের স্বাধীনতা প্রিয়তা। তাদের মধ্যে সংঘবদ্ধ ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য-চেতনা সুস্পষ্ট। তাই শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে কোম্পানীর সংগে তারা বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তারা কোম্পানীর উদ্ধত অনুশাসন-ও মেনে নিতে পারেনি সহজে। এরজন্য তাদের ব্যাপকতর প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে। প্রতিবাদ ধ্বংসের তাণ্ডব লীলায় রূপান্তরিত হয়। তারা মেদিনীপুর জেলার শিলদা পরগণার অন্তর্গত ছটি গ্রাম ভস্মীভূত করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐ বৎসরের জুলাই মাসে গোবর্ধন দিকপতি নামে এক বাগদী সর্দারের নেতৃত্বে চারশত চোয়াড়দের একটি দল চন্দ্রকোনা, কাশিজোড়া, তমলুক, জলেশ্বর, ময়না ও নারায়ণগড় প্রভৃতি পরগণায় বিদ্রোহ প্রকাশ করে। এর সংগে দুর্জন ক্রিয়াদি-ও

আরম্ভ হলো। আতঙ্কতাপিত প্রজারা প্রমাদ গুণ্‌ল। কর্ণগড় ও আবাস-গড়ের কেন্দ্র হতে চোয়াড়দের অভিযান সেই হলো সুরু।১১

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্রোহীরা ঘোষণা করল যে, কৃষ্ণ-পক্ষের এক রাত্রিরে তারা মেদিনীপুর শহর আক্রমণ করবে। মেদিনীপুরের কালেক্টর এই সংবাদে ভীত হলেন। তোষাখানার টাকা বুরুজখানায় স্থানান্তরিত করার উদ্দেশ্যে তিনি এক পত্র লিখেছিলেন কর্নেল ডনকে। ১৬ই মার্চ চোয়াড়গণ আনন্দপুর আক্রমণ করে দুজন সিপাহীর প্রাণ নাশ করে। অবশিষ্ট সৈন্য মেদিনীপুরে পালিয়ে যায়। ২১শে মার্চ তারিখের এক পত্রে কালেক্টর জানিয়েছিলেন, একটি কূট-কৌশল প্রয়োগের ফলে চোয়াড়দের আক্রমণ হতে তখনকার মত রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। কৌশলটি হলো এই ;—যে রাত্রে চোয়াড়দের আক্রমণ সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল, সেই রাত্রেই কোম্পানীর দেওয়ান পাল্টা প্রচার করেছিলেন ; কোম্পানীর সৈন্য-ও সশস্ত্রে প্রস্তুত রয়েছে। এতেই কাজ হয়েছিল। চোয়াড়রা আক্রমণ করতে সাহস পায়নি।১২ তবু-ও কালেক্টর সাহেবের শংকা ছিল। তাই আতঙ্কপাণ্ডুর কালেক্টর কোম্পানীর বোর্ডকে লিখলেন ঃ "কোম্পানী হয় ইহার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করুন নয় তাঁহাকেই স্থানান্তরিত করুন।"১৩

গল্পের বিনুনি দিয়ে জনৈক লেখক এই বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে জানিয়েছেন। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহীদের তাণ্ডব নৃত্যে সারা মেদিনীপুর তখন কাঁপছে। পুলিশ, কালেক্টর কেউ ভয়ে বেরুতে সাহস করছে না। যারা ইংরেজের সহ-যোগিতা করেছে, যে সব তহশীলদার খাজনা আদায় করেছে তাদের ঘরদোর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। যে সব গ্রাম পুলিশ কিংবা সৈন্যদের খাবার দিয়েছে সে সব জালিয়ে দেওয়া হলো।. কোথায় ও ইংরেজ বরকান্দাজদের মাথা কেটে প্রকাণ্ড গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। দেখতে দেখতে ইংরেজ শাসন অচল হয়ে পড়ল।১৪

আবার অন্যত্র১৫ লেখা হলো, বিদ্রোহীদের এই ধ্বংস কাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার কারণ রয়েছে যথেষ্ট। দুর্জন সিংহ ছিলেন রায়পুরের প্রতাপশালী জমিদার। তিনি নির্ধারিত খাজনা কোম্পানীকে দিতে পারলেন না। তাঁর জমিদারী নিলামে তোলা হলো। তিনি দেওয়ানি ও সদর আদালতে অনেক আবেদন

নিবেদন করলেন। সুযোগ চাইলেন। কিন্তু ফল হলো না। তিনি নিগৃহিত হলেন। এর ফলে দুর্জনসিংহ প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠলেন। পরের'শ চোয়াড় সংগে নিয়ে রায়পুরের বাজার লুণ্ঠন করলেন। ভস্মীভূত করলেন। নিলামজয়ী শিউপ্রসাদ পালিয়ে গেলেন। একদিন দুর্জনসিংহ ধরা-ও পড়লেন। বিচার বসল। কিন্তু কোনো মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন না। ফলে তিনি মুক্তি পেলেন। আবার তিনি নবউদ্যমে ধ্বংস কার্যে নামলেন। এই সম্পর্কে বাঁকুড়া জেলা গেজেটীয়ারে লেখা হয়েছে : "Durjan Singh was not the man to remain a helpless spectator of the devious legal processes which deprived him of his ancestral properties.".৬

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের সুরু থেকে কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়েছিলেন। অবশ্য বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে। কিন্তু ঐ সালের এপ্রিল মাস থেকে পরিকল্পিত অভিযান-তৎপরতা লক্ষ করা গেল। ২০শে এপ্রিলের মধ্যে কোম্পানী পাঁচ দল সিপাহী প্রেরণ করে চোয়াড়দের দুটি গোপন ঘাঁটি কর্ণগড় ও আবাসগড় দখল করলেন। চোয়াড়দের সহকারিতা সন্দেহে কর্ণগড়ের *রাণী শিরোমণিকে বন্দিনী করে আনা হয় বিচারের উদ্দেশ্যে।১৭ শুধুমাত্র কর্ণগড় ও আবাসগড়ের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা হয় নি। আনন্দপুর সহ এই জেলার আর-ও ছটি কেন্দ্রের ওপর নজর রাখা হলো বিশেষ ভাবে। সুবাদার, জমাদার ও হাবিলদারের অধীনে বহু সৈন্য মোতায়েন রাখা হলো। এতে সাময়িক শান্তি ফিরে এল বটে। সাময়িক-শান্তি বলার কারণ, আমরা লক্ষ করব, কোম্পানীর শাসকরা যতদিন না জমিদারদের সম্ভ্রমের সঙ্গে অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছেন; কিংবা পাইক ও চোয়াড়দের প্রতি সহানুভূতির দৃষ্টিতে কিছু-কিঞ্চিৎ সুবিধে দিয়েছেন; ততদিন মেদিনীপুরে শান্তি সংস্থাপিত হয়নি।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি সরকারী একখানি রেকর্ডে উল্লিখিত রয়েছে যে, কৃষ্ণচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জমিদারীতে চোয়াড়গণ প্রবেশ করে লিমরি, ইনায়েতপুর, ঘোষপুর, রঘুনাথপুর এবং এদিপুর মৌজায় আক্রমণ চালিয়েছে।১৮ আরেকটি চিঠির কথা উল্লেখ করা যায়। চিঠিটি লিখে-ছিলেন স্ট্রেচি সাহেব। তদানীন্তন সরকারের বিচার বিভাগীয় সেক্রেটারি মিঃ ডাওডস্ওয়েলকে তিনি লিখে জানিয়েছিলেন : দু'বছর আগে-ও চোয়াড়গণ হাজারে হাজারে প্রবেশ করে পরগণার পর পরগণা ধ্বংস করত। কিন্তু

তিনি এর প্রতিবিধানে এমন একটি ব্যবস্থা নিলেন (এবং তিনি মনে করেন এ ব্যবস্থা ছাড়া উপায় ছিলনা। এটি অভূতপূর্ব পন্থা-ও বটে) যাতে পূর্বতন জমিদারেরা নিজ নিজ জমিদারিতে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। অবশ্য এঁদের শাসন ক্ষমতা সহ পুনঃ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত দেশের শান্তি স্থাপন সম্ভব ছিল না।১৯ আমাদের বক্তব্যের স্বভাবিক প্রয়োজনে স্ট্র্যাচি সাহেবের চিঠিটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান।

বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট রান্টসাহেবের লেখা আরেকটি চিঠিতে প্রকাশ যে, চোয়াড়দের গতি প্রকৃতি ১৮০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লক্ষ করা গেছে। তিনি সরকারকে জানিয়েছিলেন যে, রায়পুর জংগলে পাঁচশত চোয়াড় সমবেত হয়েছে। এতে তিনি একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ; বাঁকুড়ার সংগে রায়পুরের জংগলকে রেখে বাঁকুড়াকে একটি স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে চিহ্নিত করা হোক।২০ যদি-ও ও'ম্যালি সাহেব জানিয়েছেন, স্থানীয় চোয়ড়দের দৌরাত্ম্য এমনই ব্যাপক ও উদ্ধত ছিল যে, ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বগড়ি অঞ্চলে কোম্পানী-শাসনের সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি।২১

১

এখানে একটি প্রশ্ন অযৌক্তিক নয়। কেন এই অরণ্যের আদিম অধিবাসীদের 'চোয়াড়' নামে আখ্যাত করা হলো! কেনই-বা তারা ইংরেজের প্রতি রুষ্ট, উত্তেজিত হয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল, কিংবা বনানীর বাইরে আলোক দীপ্ত মানুষের ওপর অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল। কেনই বা তাদের মধ্যে ভীষণ উদ্দাম, অনৈতিকতা লক্ষিত হয়। এমন কি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য তারা দীর্ঘকাল ব্যাপী আত্মিক-সংগ্রামে নেমেছিল! এর উত্তর মিলবে ইতিহাসের গর্ভকোষে।

আমরা তত্ত্বগত ও তথ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি। 'চোয়াড়'* শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো অসভ্য, বর্বর, দুর্বৃত্ত, গোঁয়ার ইত্যাদি। গালগালাজের নিম্নরুচি সম্মত শব্দ হলো 'চোয়াড়'। এই শব্দ-ভূষণ, ভূমিজ আদিবাসী যারা নিজস্ব সংস্কৃতির রসরুচির মধ্যে লালিত পালিত হয়ে হয়ে কৃষ্টির এক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছিল ; তাদের প্রতি আরোপিত হবার কারণটির মধ্যে বোধকরি মূল্যমানসিকতার পরিচয়

বহন করে না। এটা সত্য, আরণ্যবাসিন্দারা পাইক হিসাবে কাজ করত বিভিন্ন জমিদারদের অধীনে। বিনিময়ে জায়গীর পেত। সুতরাং অরণ্যের বহির্ভাগের জনজীবনের সংগে কর্ম ও ধর্মের সম্মিল বন্ধনে এদের যোগসূত্র ছিল অচ্ছিন্ন। তাই এদেরকে অসভ্য বলা ঠিক হবে না। হতে পারে, তাদের নিজের প্রথায় চাষ-বাস, জীবনধারণ প্রণালী। এদের জীবন চর্যার সংগে অরণ্যের বাইরের মানুষের কিঞ্চিৎ অমিল থাকলেও সর্বদেশে, সর্বকালে সকল শ্রেণীর নিজস্ব পরিধিতে গঠিত হবার কারণটির মধ্যে জীবনসংস্কৃতির নিজস্ব ধারা বর্তমান। সুতরাং এদেরকে 'চোয়াড়' আখ্যা দেবার কোনো সংগত কারণ নেই। বোধকরি এদের উদ্ধত, ক্ষিপ্ত, দুর্মদ, বলিষ্ঠ, 'রণং দেহি' ভাবের জন্য এরূপ সম্বোধন করা হয়। কিন্তু কেন যে তাদের এই ভৈরব মূর্তি তা ইংরেজ শাসকগণ তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেননি। বা দেখলেও প্রকাশ করেননি, সত্য গোপন করেছেন।

ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের স্পষ্টভাষণ আমাদের সূত্র। তিনি বলেছেন: 'চোয়াড়' নামে কোনো জাতি নেই। এ নাম যাদের প্রতি আরোপিত হয়েছে তারা 'বঙ্গ ভাষী বাঙ্গালী'। পাইকেরা-ও বঙ্গভাষী বাঙ্গালী ছিলেন।২২ এদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাগ্দী জাতীয় লোক। সর্বোপরি ছিলেন মেদিনী-পুরের জমিদার-গৃহিণী অর্থাৎ কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি। বিক্ষুব্ধ জমিদার ও সর্দারগণ এতে নায়কত্ব করেছিলেন। কাসিমবাজার রাজা সুন্দর নারায়ণ ও তাঁর জামাতা ছিলেন জনগণকে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তোলার কাজে অগ্রণী।২৩

আগেই বলে এসেছি, আরণ্যবাসিন্দারা নিজস্ব সত্তায়, স্বাধীন চেতনার সংগে লালিত হচ্ছিল। কিন্তু ইংরেজ এ দেশ করতলগত করে বনাঞ্চলের স্নিগ্ধতাকে যখন অপহরণ করতে চাইলেন, তখনই এদের অখণ্ড জীবনের অবকাশ, নিজস্ব সংস্কৃতির পতন আতঙ্কে এরা ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। শুধুকি তাই, তা-ও নয়। অরণ্যচারী এই ভূমিজ সম্প্রদায় স্বাধীনতার সংগে জংগল মহালের জমিতে বিনা খাজনায় বসবাস ও চাষ আবাদ করে জীবন ধারণ করছিল। কিন্তু কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সংগে সংগে এদের ভোগ দখলের সকল জমি কেড়ে নেওয়া হলো। ইজারা দেওয়া হলো। এসব জমির খাজনা ধার্য হওয়ায় নোতুন পওনি গড়ে উঠল। সুতরাং এই ভূমিজ শ্রেণী ত্বরিত নিষেধে কোম্পানীর সংগে সশস্ত্র বিরোধিতায় নামল।

২

ইংরেজ শাসকগণের পরবর্তী কাজ হলো পাইকান জমির বাজেয়াপ্ত-করণ। পাইক হলো রাজা, জমিদারদের পদাতিক সৈন্য বা মিলিটারি। রাজ্যের শান্তিরক্ষা এবং যুদ্ধবিগ্রহে এরাই ছিল সৈনিক। এসব গ্রাম্য পুলিশ বা মিলিটারি অর্থাৎ পাইকেরা কাজের বিনিময়ে বেতন পেত না। তাদের দেওয়া হতো নিষ্কর জমি। দেখা যেত কতকগুলি পরিবার বংশানুক্রমে রাজা বা জমিদারের পাইক হতো।২৪ এই পাইকদের জমিকে বলা হয় পাইকান জমি। এসব পাইকান জমির পরিমাণ ছিল প্রায় লক্ষ বিঘা। এই জমি হতে প্রভূত আয়ের সম্ভাবনা দেখে কোম্পানী পাইকান জমির বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করলেন। ফলকথা হাজার হাজার মানুষ তাদের বংশগত জমির অধিকার হারায়। এ ছাড়া ছোট ছোট ব্যবসায়ীর ওপর কর বসানো হলো। সব কিছু মিলে জনসাধারণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। আর তার প্রকাশ ঘটলো গণবিদ্রোহের মধ্যে। চারিদিকে বিদ্রোহের অনল জ্বলে উঠলো।২৫ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে জেলার কালেক্টর রেভিনিউ বোর্ডকে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন; তাতে সুদৃঢ় মন্তব্য রয়েছে। তিনি বলেছেন; —এটা বিস্ময়ের কিছু নেই যখন কোম্পানী পুলিশের ব্যয় সংকুলানের জন্য পাইকদের বংশানুক্রমিক ভোগদখলের জমি কেড়ে নিলেন তখন স্বভাবতই তারা বিদ্রোহী হয়েছে, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে।২৬

একথা-ও ঠিক, ভূমি বিচ্যুত এই ভূমিজ সম্প্রদায়ের রোষ-বহ্নির স্পর্শ শুধু মাত্র ইংরেজদেরই লাগেনি; অত্যাচারী জমিদার ও ইজারাদারদের-ও লেগেছিল। এ প্রসংগে ট্যাপা বাহাদুর পরগণার অত্যাচারী ইজারাদার কৃষ্ণ-ভূইঞার পরিণতির কথা স্মরণ করা যায়। তিনি বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন।২৭ আবার এটা লক্ষণীয়, বিদ্রোহীদের প্রতি জমিদারও লোক সাধারণের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। কারণ হিসাবে এটা নিশ্চিত, যে, সেদিন কেউ ইংরেজের শাসন ও বশ্যতা স্বীকার করতে চায়নি। "প্রত্যেক জঙ্গল জমীদার বা তাঁহাদিগের প্রজাগণ অর্থাৎ চুয়াড়েরা কোন প্রকারেই ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করিতে বা তাঁহাদিগের শাসনাধীনে থাকিতে চাহে নাই।"২৮

মোটকথা ইংরেজের সর্বাত্মক শোষণ-তাড়ন, দুর্বিনীত ব্যবহার এবং সর্বোপরি পুরুষানুক্রমে পেশা পাইকান জমির স্বত্বলোপে যাদের আশ্চর্য কীর্তি; তাদের জঙ্গল মহালের অধিবাসীরা ক্ষমার চোখে দেখেনি। ফলকথা এরা জীবন সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়েছিল। তাই এদের ভৈরব মূর্তি স্বাভাবিক। সুতরাং বেঁচে থাকার আত্মিক-সংগ্রামকে খাটো করে দেখা যায় না কোনোমতেই।

৩

বিস্ময়ের কথা হলো এই, বিদ্রোহ-বিক্ষোভের তরংগকে ইংরেজ সরকার দেখলেন কূট-কুশলতা দিয়ে। নোতুন পরিকল্পনা কিছু গ্রহণ করলেন বটে তবুও তাঁদের স্থূল দৃষ্টির ঐকিক নিয়ম এখানে দুর্লক্ষ্য নয়।

শাসকগণ যে নোতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন, তা রেভিনিউ বোর্ডের সিদ্ধান্ত থেকে স্পষ্টকিত হবে। এতে বলা হয়েছে—এই বিদ্রোহ পাইকদের দ্বারা সংগঠিত। এতে দুর্দান্ত, পাহাড়ী অধিবাসী চোয়াড়গণই শক্তি বৃদ্ধি করেছে। এসব অঞ্চলে পাইকগণই শান্তি স্থাপন করতে পারে। সুতরাং আগের মতই মুক্ত-রাজস্ব শর্তে পাইকদের জমি ফিরিয়ে দিতে হবে। আর জঙ্গল মহালের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব জমিদারদেরই হাতে অর্পিত হোক। পাইকদের অপেক্ষাকৃত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করা হলো। এবং রাজস্ব বাকি পড়ার কারণে জঙ্গল মহালের কোন জমিদারি বিক্রয় করা সংগত হবে না, এমন মতামত প্রকাশ করা হয়।২৯

অনুমান করি, এই সুপারিশের সূত্র ধরে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট এই ব্যবস্থার উপান্তে পৌঁছুলেন। সে কথা প্রাইস সাহেবের সাক্ষ্য-ও মেলে, জমিদারগণ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের অনুমোদন নিয়ে থানাদার, সর্দার ও পাইকদের পুলিশের কার্যে নিযুক্ত করবেন। কর্তৃপক্ষের কাছে অধীনস্থের জবাবদিহি করতে হবে। প্রতি গ্রামের অনুন্নত সম্প্রদায়কে তালিকাভুক্তি করতে হবে। বিনা অনুমতিতে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবে না। এবং জঙ্গল এলাকায় কোম্পানীর পুলিশ বাহিনী মোতায়েন থাকবে।৩০

অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন প্রাইস সাহেব। বেশ কূট-ব্যাখ্যা। তিনি মনে করেন ইংরেজ ও জমিদারদের কর্তৃত্ব বশ্যতা স্বীকার চোয়াড় ও পাইক সম্প্রদায়ের ধাতুতে নেই। এই বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়কে শান্ত করতে হলে জঙ্গল এলাকার গভীরতম অংশের জন্য তাদের সর্দারদের কর্মে নিযুক্তি দিতেই হবে। এতে এরা সন্তুষ্ট হবে এবং বিশ্বস্ততার সংগে কর্মের পরবশ হবে।৩১

মানতেই হবে মেদিনীপুরের সংগ্রামী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক হলো এই আরণ্য আদিবাসী। যাদের বিপ্লব চর্যার উত্তর সাধক ঊনিশ শতকের বাঙলা; এর গভীর প্রভাব সম্পর্কে সুপ্রকাশ রায় মহাশয় বলেছেন: "এই বিদ্রোহ এক সময়ে উক্ত অঞ্চলগুলির (জঙ্গল-মহাল) কৃষকদের ইংরেজ ও জমিদার-বিরোধী সংগ্রামকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল এবং সেই প্রভাবের রেশ আজ পর্যন্ত এই সকল অঞ্চলের কৃষক তাহাদের সংগ্রামের মধ্যে অনুভব করে।"৩২

এটা সত্য, জীবন বাণীর মৌল প্রেরণায়, সংগ্রামে নেমে অরণ্যচারীদের কর্ম ও ধর্মের যে জীবন জটিলতা দেখা দিল; তার ফলে দেশ কাল পরিধির অনন্য যাচাই এদের জীবনে আগম হলো। জীবন চর্যার সমূহ পরিবর্তনের সূত্রে এরা এগিয়ে গেল। এদের মনে জাগল অকুণ্ঠ আগ্রহ দীপ্তি। ফলে, এদের সংস্কৃতি আলোকময়ভাবের সুচিহ্নিত বৈশিষ্ট্যে রূপধন্য হলো। সুতরাং বাঙলার সংস্কৃতিতে এই বিদ্রোহের প্রভাব তাই অনস্বীকার্য।

॥ ২ ॥ বিদ্রোহ : বীরভূম ও বিষ্ণুপুরে

বীরভূম ও বিষ্ণুপুরে কোম্পানীর শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সংগে সংগে এই দুটি স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কোম্পানীর শাসকগণ হতচকিত হয়ে সরকারের কাছে বিরাট সৈন্য দলের প্রয়োজন জানিয়ে বারবার আবেদন করতে লাগলেন। বীরভূমের সীমান্তবর্তী পাহাড়ী এলাকা ও সমতল ভূমির মানুষই কোম্পানীর অগ্রগমনে বাধা দান করেছে। একটি কথা স্পষ্ট। পাহাড়ী ও সমতল ভূমির মানুষদের মধ্যে পার্থক্য ছিল অনেক। সে পার্থক্য জীবন চর্যার দিক হতে-ও। স্বভাবতই কঠিন ধাতুতে তৈরি এই পাহাড়ী বাসিন্দারা সমতল ভূমির অধিবাসীদের শত্রুর চোখে দেখত। সুযোগে লুণ্ঠনও চালাত। এদের প্রতিহত করা কিংবা রাজস্ব প্রদানে বাধ্য করা বীরভূমের রাজার পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং ইংরেজ শাসকগণ সে চেষ্টা যখন করলেন তখনই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু হলো।

ছিয়াত্তর মন্বন্তরের মহাপ্রকোপে পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত বীরভূম ও বাঁকুড়ার গ্রাম-সমাজ ধ্বংস হয়। তারপর শাসক ও জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়ন অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেকেই পাহাড় ও বন জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তারাই ফসলের সময় পাহাড়িয়াদের সংগে নিয়ে ভূমির ফসল লুণ্ঠন করত। শাসকশক্তি যখন "এই একমাত্র উপায়টি-ও সামরিক শক্তির দ্বারা বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তখনই তাহাদের সেই জীবন-রক্ষার সংগ্রাম শাসক শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের আকারে দেখা দিয়াছিল।"৩৩

সুখ ও সার্থকতা অন্বেষণে দু'প্রান্তের মানুষই এক। তাই ইংরেজ শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য উভয় শ্রেণী দৃঢ়বদ্ধ হলো। ঐক্যবদ্ধ হলো সমতল ও পাহাড়ী এলাকার মানুষ। সংগী হলো একে অপরের।৩৪ ফলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। শাসকগণ বিপদে পড়লেন। হাণ্টার সাহেব এই উত্তেজনার আগুন সম্পর্কে লিখলেন : বীরভূম ও পশ্চিম সীমান্তে যে বিশৃঙ্খলার ঝড় বয়ে গেছে তার রূপ "chronic civil war"৩৫ থেকে আলাদা করা কঠিন। শাসকগণ বিদ্রোহ দমনের [illegible] করলেন। জেলা কালেক্টর ও সৈন্য-বাহিনীর প্রধান হিসাবে নিযুক্ত হলেন [illegible]স্টোফার কিটিং। তিনি বিরাট এক বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। অবস্থা

কোনোমতে আয়ত্তে আনলেন বটে। কিন্তু কয়েকমাস পরে ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে পাহাড়ী বাসিন্দারা ইংরেজ সৈন্যাবৃত ঘাঁটির উপর আক্রমণ চালায়। এবং লুণ্ঠন চালায় জেলার অভ্যন্তরীণ গ্রামগুলিতে।৩৬ ফলত, সর্বত্রই সন্ত্রাস, রক্তপাত সুরু হলো।

২১শে ফেব্রুয়ারি কিটিং সাহেব কয়েকশত বিদ্রোহীদের সশস্ত্র বাধাদানের উদ্দেশ্যে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সংগে অনিয়মিত সৈন্য বাহিনীকে সংযুক্ত করলেন; একযোগে বিদ্রোহ দমনের ব্যাপক উদ্যোগ-আয়োজন করলেন। কিন্তু "The evil was not to be so easily dealt with."৩৭ সুতরাং গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর কাউন্সিল অনুধাবন করলেন, এহেন পরিস্থিতিতে জেলার স্বাতন্ত্র্য ব্যতিরেকে সকল সৈন্যের কর্মসহযোগে বিদ্রোহীদের বাধাদান ও বিদ্রোহদমনের আয়োজন করা উচিত। কিটিংসাহেব এই দায়িত্ব যথার্থই পালন করলেন। ফলে ভীষণ যুদ্ধ হলো। এতে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হয় ও পশ্চাদপসরণ করে।

ঠিক একই চিত্র বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের বিশৃঙ্খলা প্রসংগে হান্টার সাহেব তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, "The disorders in Bishenpore would in any less troubled time, have been called rebellion."৩৮ রাজস্ব বাকি পড়ার অজুহাতে বিষ্ণুপুরের রাজাকে আটক রাখলেন কোম্পানী। আর্থার হেসিলরিজ্‌ নামে একজন ইংরেজ বিষ্ণুপুরের কর্মভার নিলেন। আর এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিষ্ণুপুরে জনবিক্ষোভ সুরু হয়। তার ক্রমপরিণতি গণবিদ্রোহ। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের জুনমাসে ইংরেজ সৈন্য প্রেরিত হলো বিদ্রোহ দমনে। কিন্তু বিদ্রোহীরা ইংরেজ বাহিনীকে সম্মুখ সমরে পরাজিত করে। বিদ্রোহীদের উদ্দামগতি ও আক্রমণের ব্যাপকতা সম্পর্কে কিটিং সাহেব কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন; আরো জানিয়েছিলেন, সশস্ত্র বিদ্রোহীরা অজয়নদী পার হয়ে বীরভূমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হলে প্রশ্নাতীতভাবেই বিরাট সামরিকশক্তির প্রয়োজন।৩৯

বর্ষাঋতু সুরু হওয়ার সংগে সংগে বিদ্রোহীদের গতিপ্রকৃতি স্তিমিত হয়ে এল। অন্য বিপত্তি-ও দেখা দিল। বর্ষায় বিদ্রোহীদের স্থান সংকুলান হয় না বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরে। তাই তাদের একটি ছোটদল বিষ্ণুপুরে অবস্থান করল, বাকি দল ফিরে গেল পাহাড়ী এলাকায়। তারা অপেক্ষা করতে লাগল

সূর্যকরোজ্জ্বল দিনের। কিটিং সাহেব এতে সুযোগ পেলেন। তিনি ১৬. ১০ ১৭৮৯ তারিখে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসকে একটি পত্র লিখলেন। এতে তিনি বললেন ; আমাদের সৈন্যসংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। জেলা তাতে রক্ষিত হবে না। আমাদের সৈন্যগণ শৃঙ্খলাহীন এবং উদ্যমী নয়। তারা লুণ্ঠনকারীদের প্রতিহত করার চেয়ে শাসকদেরই বিরুদ্ধাচরণ করে।৪০

এরপর সরকার সেনাবাহিনীকে ঢেলে সাজালেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করলেন। সীমান্তের ৬টি প্রবেশ পথে সৈন্য মোতায়েন করলেন। বলা যেতে পারে, নভেম্বর মাস থেকে কোম্পানীর তৎপরতা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। আর বিদ্রোহীরা-ও নব-উদ্যমে ইংরেজের ওপর আক্রমণ চালাতে থাকে। শাসকগণ স্বতন্ত্রভাবে দুটি সৈন্যদল অপেক্ষাকৃত অশান্তির এলাকা বিষ্ণুপুর ও ইলামবাজারে রাখলেন। এসময় বিদ্রোহীরা বীরভূম আক্রমণ করল। বিদ্রোহীদের কুশলী আক্রমণে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়ল। এই শোচনীয় অবস্থা প্রসংগে হান্টার সাহেব মন্তব্য করেছেন। তাতে সেনাবাহিনীর অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন : বিদ্রোহীদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে পরিণত করা হলো বটে কিন্তু এরা শুধু রাত্রিকালীন পরিক্রমণে ক্লান্তই হলো। বিদ্রোহীদের দমনে সমর্থ হলো না। তারা প্রধান প্রধান শহরগুলির রক্ষা কার্যেও ব্যর্থ হয়েছে।৪১

১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে বিদ্রোহীরা বীরভূমের অন্তর্গত রাজনগর শহরটি দখল করে। এ সময় বীরভূম ও বিষ্ণুপুরকে নিয়ে শাসকগণ সংকটে পড়লেন। এ সংকটের কারণ সরকারের সীমিত সৈন্যবল। এতে দুদিক রক্ষা হয় না। বীরভূমকে রক্ষা করার জন্য বিষ্ণুপুর থেকে যখন কিটিং সাহেব সৈন্য সরিয়ে আনলেন তখনই বিষ্ণুপুরে প্রায় একসহস্র বিদ্রোহীর সমাবেশ ও আক্রমণ সুরু হয়।

১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের বর্ষণ মুখর দিনে আবার যুদ্ধ বন্ধ হলো। এ সময়ে বিদ্রোহীদের সংগঠন ও শক্তি বৃটিশ বাহিনীকে ভীত করে তুলেছিল। বিদ্রোহীদের পরাস্ত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বিদ্রোহীরা নিজেদের ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিক্ষুব্ধ। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ নিলেন সেনাপতি কিটিং। তিনি সুসংহত পরিকল্পনায় বিদ্রোহীদের নির্মূল করার আয়োজন করলেন। একদিন

পাহাড়ী ও সমতল এলাকার বিক্ষুব্ধ মানুষেরা ইংরেজ ও সামন্ত শ্রেণীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল মানসিকতার পালতুলে যে যাত্রা সুরু করেছিলেন ; তা যেন ত্বরিত-নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল নিজেদের ক্ষণিক ভুলে। এমনি অসংখ্য ভুলের নিয়ামক ইংরেজের শাসন-শোষণের স্থায়িত্ব দিয়েছে।

যাইহোক বীরভূম ও বিষ্ণুপুরে বিদ্রোহীদের যে উত্তপ্ত প্রবাহ দেখলাম, তা সার্থকতায় সুচিহ্নিত হতে পারল না বিদ্রোহীদের অন্তঃস্বভাবে সংঘাতের ফলেই। তবু-ও বলতে হয়, যে বলিষ্ঠ উদ্যমে বাঙালী ও পাহাড়িয়ারা একত্র হয়ে মূলত ইংরেজের বিরুদ্ধে গোটা আন্দোলনটির সংগে অচ্ছিন্ন নিবিড় সংযোগ রক্ষা করেছিলেন ; তার স্থায়িত্ব যত কম হোক না কেন তার মূল্যায়ন দেশকালের নিরিখে করলে দেখা যাবে, মুক্তি সিদ্ধির অনন্ত পথ সূচনা করেছিলেন সমকালীন বিদ্রোহী মানস।

৩ ॥ অপ্রধান বিদ্রোহচিত্র

এক
সিলেটে বিশৃঙ্খলা

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সিলেট কোম্পানীর করতলগত হয়। কোম্পানীর অধিকারের সংগে সংগে সেখানে বিশৃঙ্খলা ৪২ দেখা দেয়। কোম্পানীর রাজস্ব নীতি-ই এর জন্য দায়ী। কোম্পানীর কালেকটরদের অন্যায় অব্যবস্থা এবং কোম্পানীর হাবিলদার ও অন্যান্য কর্মচারীদের অসৌজন্য মূলক আচরণে-ও সিলেটে এই বিশৃঙ্খল। এর প্রকাশ ব্যাপক ভাবে ঘটে ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে। একটি বিশেষ ঘটনা হিসাবে রাধারামের কাহিনী উত্থাপন করা চলে। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী রাধারামকে জমিদারী থেকে উৎখাত করেন। এর ফলে তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তিনি খাসিয়াদের সংগে নিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ চালালেন। এতে এক পুলিশ কর্মচারী ও কুড়িজন সৈন্য নিহত হয়। কোম্পানী তৎপর হয়ে উঠলেন। রাধারাম ধরা পড়লেন। বিচারের উদ্দেশ্যে তাঁকে সিলেট কোর্টে আনা হলো। কোম্পানীর শাসকগণ অনুধাবন করলেন যে, রাধারামের শক্তি যুগিয়েছে রয়েছে দুর্দান্ত খাসিয়ারা। তাই তাদের জন্য প্রেরিত হলো

ঘুষ, উপঢৌকন। সরকার কালেকটরকে জানালেন এই উদ্দেশ্যে তিনি বার্ষিক ছয় হাজার সিক্কা টাকা ব্যয় করতে পারবেন। কিন্তু কোম্পানীর এই ঘুষ-প্রদান নীতি ফলপ্রসূ হয়নি। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৫ই অক্টোবরের এক রিপোর্টে জানা যায় বিদ্রোহীদের এক বিধ্বংসী আক্রমণের কথা।

ক॥ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে সিলেটে একটি ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এটি একান্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নির্ভর। আগামহম্মদ রেজা নাম ধারী এক ব্যক্তি কাছাড় থেকে সিলেটে এলেন। তিনি নিজেকে দেশের রূপকার ও প্রভু হিসাবে বোঝাতে চাইলেন। ইনি কুকিদের সহায়তা লাভ করে স্থানীয় জমিদারদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করলেন। তিনি প্রচার করলেন ইংরেজের ওপর আক্রমণ চালাতে হবে। দেশকে মুক্ত করতে হবে কোম্পানীর কবল থেকে। তিনি হলেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ইমামমহাত্রি। সুতরাং তিনি বুঝতে পেরেছেন ; এতে দেশের জয় সুনিশ্চিত। তিনি অনুগামীদের সংগে নিয়ে বন্দাসী থানা আক্রমণের পরিকল্পনা করলেন। বান্দাসী থানা এই সংবাদ পেয়ে সামরিক প্রস্তুতি নিল। ফলত যে যুদ্ধ সংঘটিত হলো তাতে ইমামের পরাজয় হলো। এতে তাঁর পক্ষে ৯০ জন হত হয়। ইমামের পাঁচটি কামানইংরেজ সৈন্য দখল করে নেয়। এই খণ্ড যুদ্ধের পর ইমাম পালিয়ে যান।

খ॥ আরেকটি ঘটনা। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে রাজস্ব অনাদায়ের অভিযোগে বালিসায়রার জমিদারী নিলামে তোলেন কোম্পানী। নিলামে নির্ধারিত গ্রহীতা জমিদারী দখল নিতে এলেন। বালিসায়রার পূর্বতন জমিদার দখল নিতে দিলেন না। খণ্ড যুদ্ধ সুরু হলো। জমিদারের পক্ষাবলম্বন করে প্রজারা এই বিরোধে, সক্রিয় ভূমিকাটি পালন করল। ফলে প্রাক্তন জমিদারের জয় হলো। এতে কোম্পানীর তরফে বহু সৈন্য আহত ও দুজন নিহত হলো। পরে অবশ্য কোম্পানী অবস্থা আয়ত্তে এনেছিলেন।

এইসব খণ্ডচিত্র থেকে একটি জিনিস পরিষ্কার যে, অনেক সময়ই জমিদারেরা নিজেদের স্বার্থে শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রজাদের বিদ্রোহী করে

তুলেছেন। তাই বলা যায় আভিজাত্যিক বিক্ষোভ-বিদ্রোহে জনসাধারণের অনিবার্যতা হাতিয়ার হিসাবেই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, আভিজাত্যিক বিদ্রোহ লোক সাধারণের বিদ্রোহে রূপান্তরিত হয়েছে। তার কারণ বৈদেশিক বিতাড়ন ইচ্ছাটির মধ্যে প্রতিবাদীর চরিত্রটি সুস্পষ্ট ॥

দুই

পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ

কোম্পানীর শাসকদের স্থানীয় বিদ্রোহীদের কাছে নতিস্বীকার করতে হয়েছে অন্তত সাময়িকভাবে ; এর প্রমাণ পাওয়া যাবে আলোচনার ধারা সূত্রে। চট্টগ্রামের পার্বত্য চাকমা জাতির কাছে কর্তৃপক্ষের পরাজয় সেই দৃষ্টান্তকে উজ্জ্বলতর করে।

আমরা আগেই জেনেছি, ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে মীরকাশিম এক সন্ধির সূত্রে ইংরেজ কোম্পানীকে চট্টগ্রাম ছেড়ে দেন। এরপর থেকে সেখানে চলতে থাকে অব্যাহত শোষণ। পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল কৃষি হলো একমাত্র তুলা। পার্বত্য আদিবাসী চাকমা জাতি এই ফসল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ইংরেজ রাজস্ব মেটাতেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে এঁরা বঞ্চিত হতেন, ঠকতেন। কিন্তু ইংরেজ শাসক পার্বত্য এলাকাগুলির ইজারা দিলেন। ফলে ইজারাদার-দের অকথ্য অত্যাচার সুরু হয়। এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভিন্ন চাকমাদের বাঁচার উপায় ছিল না। এতে রণুখাঁ নামে একজন নেতৃত্ব দিলেন। জেলার কালেক্টর এই মর্মে গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেস্টিংসের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন ১০. ৪. ১৭৭৭ তারিখে। এতে তিনি উল্লেখ করলেন রণুখাঁর দৌরাত্ম্য। কোম্পানীর ইজারদারদের সংগে এই ব্যক্তি সর্বদা হাঙ্গামায় লিপ্ত; সে কথা পত্রে উল্লেখ করলেন।৪৩

কর্তৃপক্ষ অনেক চেষ্টা করলেন রণুখাঁকে দমন করার। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। অবশেষে কোম্পানী অর্থনৈতিক অবরোধ-পন্থা গ্রহণ করলেন। ফলে পাহাড়ী এলাকার মানুষেরা সমতলভূমিতে নেমে আসতে পারলেন না। তাঁদের বাজার বন্ধ হলো। মোট কথা হাতে না মেরে ভাতে মারার ব্যবস্থা হলো। এর ফলে রণুখাঁ ধরা দিলেন। এরপর অবশ্য তাঁর উল্লেখ আর মেলেনি।৪৪

তারপর শেরদৌলত খাঁর পুত্র জানবক্স খাঁ চাকমা জাতির স্থায্য দাবি আদায়ে তৎপর হলেন। তিনি ইজারাদারদের চাকমা অঞ্চলে প্রবেশ বন্ধ করলেন। এর ফলে ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজস্ব আদায় চাকমা অঞ্চল থেকে সম্ভব হয়নি। কালেকটর কলকাতা কর্তৃপক্ষের নিকট জানবক্সের বিদ্রোহকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে, পূর্বের স্থায় অর্থনৈতিক অবরোধের একটি প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু কলকাতার কর্তৃপক্ষ নরমপন্থা গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন। এবং পার্বত্য অধিবাসীদের হাতে চাষের এলাকাগুলি ছেড়ে দেওয়ার সহজ-নীতি গ্রহণ করা উচিত হবে কিনা; তা-ও দেখতে বললেন।৪৫

যাইহোক শাসকগণ পার্বত্য এলাকার বিদ্রোহীদের যে পরিচয় পেয়েছেন, তাতে তাঁদের আশংকার অবধি ছিলনা। শেষে হ্যারিস সাহেব রেভিনিউ বোর্ডকে ইজারাদার প্রথা লোপ ও খাজনা আদায়ের ভার চাকমা দলপতির ওপর ছেড়ে দেওয়ার যে সুপারিশ করলেন; কর্তৃপক্ষ তা নীতিগত ভাবে মেনে নিলেন।৪৬ সুতরাং পার্বত্য অধিবাসীদের রাজনৈতিক জয় হলো, আর এ জয় বিদ্রোহপ্রসূত ছিল তা বলা-ই বাহুল্য।

তিন
সুবান্দিয়া বিদ্রোহ

সুবান্দিয়া হলো বাখরগঞ্জ জেলার দক্ষিণে সাহাবাজপুরের একটি বিশেষ অঞ্চল। ব্যবসায়ের ক্রূরনীতিতে বণিকগণ কিভাবে এ জেলাকে শোষণ করেছেন তা বিভিন্ন নথিপত্রে ছড়িয়ে আছে। ইংরেজ বণিকগণ বাঙলাদেশের জনজীবনে 'কুগ্রহের' মতই দেখা দিয়েছিলেন। তাঁরা এখানের উৎকৃষ্ট চাল, সুপারি নারকেল, লবণ প্রভৃতি বিদেশে চালান দিয়ে মুনাফা লুটতেন।৪৭

এর ওপর ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ বাখরগঞ্জ জেলাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। জেলার কালেক্টর ডগলাস সাহেব ৬.৪. ১৭৯০ তারিখে রেভিনিউ বোর্ডকে একটি চিঠি লেখেন, তাতে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ রূপটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছেন: "the most dreadful calamity ever remembered by the oldest inhabitant of the district...:"। এতে ষাট হাজারের ওপর মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।৪৮

তবুও পরবর্তী কালেক্টর ডে-সাহেব রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিলনা। ফলে এতদিন যারা জেলাভ্যন্তরে জীবন-ধারণের কোনোমতে চেষ্টা করছিল ; তারা অন্যত্র সরতে বাধ্য হলো।৪৯

কিন্তু সমগ্র বাঙলাদেশের অবস্থা সর্বত্রই সমান। তাই তাদের জীবন অন্য পথে বাহিত হলো। অনেকেই দস্যুবৃত্তি করে জীবনধারণ করে দিন কাটাতে চেষ্টা করল। সুন্দরবন এলাকায় নদীপথে লুণ্ঠন চালাতে থাকে। এরকম লুণ্ঠন ও দস্যুবৃত্তির সংবাদ মেলে মহম্মদ হায়াৎ ও আলাউদ্দিন সর্দারের নেতৃত্বে। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে অবশ্য তারা ধৃত-ও দ্বীপান্তরিত হয়।৫০

ইংরেজের শাসন-শোষণ ও জমিদার শ্রেণীর উৎপীড়ন হতে অব্যাহতির জন্য বাখরগঞ্জ জেলার জনমানস সচেষ্ট ছিলেন। এই সময় বোলাকি শাহ নামে এক কৃষক-ফকির এই বিক্ষুব্ধ জনসমাজের নেতৃত্ব দিলেন। তিনি কৃষক-দের নিয়ে একটি বিদ্রোহী দল তৈরী করলেন। সুদৃঢ় সংগঠন আর সমরাস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। সুবান্দিয়ায় একটি দুর্গ তৈরী করলেন। সাতটি কামান ও দুটি বন্দুক সংগৃহীত হলো। দুর্গের মধ্যে দুজন দিবারাত বারুদ তৈরীর কাজে নিযুক্ত ছিল।৫১ বোলাকি শাহ নলচিঠির নিকটবর্তী সুজাবাদ নামক স্থান থেকে কামানগুলি সংগ্রহ করেছিলেন। এগুলি ছিল মোঘল সৈন্যের ব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত।৫২

এরপর বোলাকি শাহ ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই যুদ্ধে বোলাকি শাহের সৈন্যরা প্রাণপণে যুদ্ধ করল বটে কিন্তু ইংরেজের শিক্ষিত বাহিনীর কাছে পরাস্ত হতেই হলো। ফলে তাঁর দুর্গ ইংরেজ সৈন্যের দখলে যায়। এই সংক্ষিপ্ত বিদ্রোহ চিত্রে জনমানসের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ কিরূপ বলিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে তার নিদর্শন মেলে।

চার

যশোহর-খুলনার প্রজা বিদ্রোহ

ইংরেজ শক্তিকে অনেক সময় বিদ্রোহীদের নিকট সাময়িক পরাস্ত হতে হয়েছে, সেকথা আগেই বলেছি। এখানে আরেটি ঘটনা হিসাবে নড়াইল জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীশংকরের বিদ্রোহী মানস সম্পর্কে কিছুটা উপক্রম করা যেতে পারে। দীর্ঘকাল ব্যাপী তাঁর সংগে কোম্পানীর

বিরোধ চলছিল। যশোহরের প্রথম জজ ম্যাজিস্ট্রেটের আমলে (১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দ) কালীশংকর ও তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দকিশোরের নামে লুঠতরাজের এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়। ম্যাজিস্ট্রেট হেঙ্কেল সাহেব তাঁকে 'ডাকাত'৫৩ নামে অভিহিত করলেন। কিন্তু কালীশংকর ইংরেজের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে চাইলেন না। এবং তিনি প্রজাদের মধ্য থেকে একটি বাহিনী তৈরী করলেন। হেঙ্কেল সাহেব তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করলেন বারংবার। কিন্তু তাঁকে ধরা গেল না।

১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে অবশ্য কালীশংকর ধরা পড়লেন। এতে যশোহর ও খুলনায় ব্যাপক প্রজা বিদ্রোহ দেখা দিল। কারণ শোষণের বিরুদ্ধে, যে সংগ্রাম সুরু করেছিলেন কালীশংকর, তাতে যশোহর খুলনার প্রজা মাত্রেরই সায় ছিল। এসব অঞ্চলে বিদ্রোহ এমনই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, ইংরেজ-শক্তি ভীত হয়ে কালীশংকরকে মুক্তি দিলেন; খাজনার পরিমাণ হ্রাস করে দীর্ঘবিবাদ মেটাবায় চেষ্টা করলেন।৫৪ সুতরাং প্রাগুক্ত বিদ্রোহগুলিকে 'গণবিদ্রোহ' আখ্যা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি, কারণ জনগণ মানসের প্রতিবাদের বলিষ্ঠ ও ব্যাপকতর রূপটির জন্য। শাসকশ্রেণীর অতিমাত্রিক শোষণ-পীড়ন থেকে মুক্তি ও স্বাধীন হবার মূল লক্ষ্যে জনচিত্ত স্পন্দিত হয়েছে কালান্তরে।

পূর্বোক্ত গণবিদ্রোহগুলি সাহিত্যের কোন শাখায় শিল্পিত হয়ে উঠেছে বলে আমাদের জানা নেই। অবশ্য লৌকিক ছড়া, গাথা, গাল-গল্প, প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি থাকলে-ও থাকতে পারে। সে সব সংগৃহীত হয়নি। সুতরাং সমকালীন সংস্কৃতি মনস্কতার পরিচয় অস্পষ্ট। তবে আমরা দুটি প্রবাদের উল্লেখ করতে পারি। "সমাজ জীবনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে যে জীবন সমুদ্র মন্থন হয়, তারই নির্যাস হলো মানুষের জীবন দর্শন। আর সমাজ সম্পৃক্ত দর্শনের ক্ষুদ্রতম বাণী-স্ফটিক হলো প্রবাদ।"৫৫

১

'রণু খাঁ আমল অ মিধা'।[৫৬]
এটি চাকমা প্রবাদ। এর অর্থ রণুখাঁর আমলই মিঠা অর্থাৎ সুখ-সমৃদ্ধি। রণুখাঁ ইংরেজের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন ও পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাদের নিয়ে প্রতিরোধের যে দুর্গ তৈরি করেছিলেন তা বিস্ময়াবহ। তাঁর সাংগঠনিক নেতৃত্বে প্রজারা সুখেই ছিলেন। তাঁর আমলের সুখৈশ্বর্যের কথা চাকমারা স্মরণ করছেন। তাই সেদিনের কৃতজ্ঞ প্রজার ভাষা আজ প্রবাদ।

২

'জানি ছাড়'।
রাজস্ব বাকি পড়ার অজুহাতে বিষ্ণুপুরের জমিদারী বাজেয়াপ্ত ও নীলামে বিক্রয়ের আদেশ দেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।[১] এসব ১৭৯৬-৯৮ এর কাহিনী। কিন্তু কোম্পানীর তরফে বিষ্ণুপুরের প্রজাদের কাছ থেকে আদায় বড়ো হয় না। নিষ্করভোগী অনেকেই। শেষে কোম্পানী নিষ্কর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন। ফলত, স্থানে স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। কোম্পানী বিব্রত। বিষয়টি বিবেচনা করে দেখার জন্য হিজলীসাহেব এলেন। তিনি যেমন বুঝলেন, খেয়াল খুশী মতো ছাড় লিখে দিলেন।[৫৭] প্রজারা কিছু স্বস্তি পেয়েছিলেন এই ভেবে; সাহেব সব জেনে শুনেই ছাড় দিয়েছেন।

পাদটীকা

১. ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'গণ বিদ্রোহ' প্রসংগে বলেন যে, এর দোষ ত্রুটি হলো কেন্দ্রীয় কর্ম পদ্ধতি ও একনায়কত্বের অভাব। অথচ মহাভারতে দৃষ্ট হয় বৃহস্পতি ও শুক্রনীতি অনুসারে একনায়কত্বের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু জনগণ কালক্রমে এটি ভুলেছে। দ্র. বাঙলার ইতিহাস, ১৩৭০, পৃ. ২০০

* আদিনাম চট্টগ্রাম। মগদস্যুদের দৌরাত্ম্য ভিতিবিরক্ত সম্রাট ঔরংগজেব। বাংলায় শায়েস্তা খাঁ সুবেদার হয়ে এলেন। এক জলযুদ্ধে তিনি মগদস্যুদের বিপর্যস্ত করলেন কৃতিত্বের সংগে। ঔরংগজেব চট্টগ্রামের নাম বদলে ইসলামাবাদ রাখার নির্দেশ দিলেন।

২. দ্র, যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৩৮৬ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, পৃ. ২৩৯

৩. তদেব, পৃ. ২৪০

৪. তদেব, পৃ. ২৪১

দ্র. W. K. Firminger, edi, *Bengal District Records : Midnapore, 1763-1767*, Vol I, No. 60, P. 48

৫. ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারি মাসের এক পত্রে এনসাইন্ জন গ্রেহাম সাহেব লিখলেন :

"To the westward of Midnapore there is a very large tract of country comprehended within the limits of the province, but of which the zeminders taking advantage of their situation, support themselves in a kind of independence .....The party, which you are appointed to command of, is destined, therefore, to proceed against these zeminders, with a view to reduce them to a proper subjection to our Government on payment of a just revenue, to enforce their obedience to the authority of the resident of Midnapore."

—Ibid, p, 48

৬. ত্রৈলোক্যনাথ পাল, মেদিনীপুর ইতিহাস. প্রথমভাগ, ১৮৮৮, পৃ. ১০

৭. J. C. Price, *Notes on the History of Midnapore*, Vol, I, 1876, P, 51

৮. Ibid, Pp 60-61

৯. Ibid, Pp 120-123

১০. Dr. S. B. Chaudhuri. *Civil Disturbances During the British Rule in India, 1765-1857*, Calcutta, 1955, P. 56

১১. যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃ. ২৪৩-২৪৫

১২. তদেব, পৃ. ২৪৪-২৪৫

১৩. তদেব, পৃ. ২৪৫

১৪. প্রবোধকুমার ভৌমিক, মেদিনীপুর কাহিনী, ১৩৬৪, পৃ. ৬০

১৫. L. S. S. O' Malley, *Bengal District Gazetteers : Bankura*, 1908, Pp. 37-38

১৬. West Bengal District Gazetteers, *Bankura*,

১৭. প্রবোধকুমার ভৌমিক, তদেব, পৃ. ৫৯-৬১

* স্মরণ করা যেতে পারে, রাণী শিরোমণি ছিলেন মেদিনীপুরের প্রথম রাজনৈতিক বন্দিনী।

১৮. *Report of the Regional Records Survey Committee for West Bengal, 1949-50*—Surveyed by Messrs A. Tripathi and T. Mukherjee, P. 61 দ্র, Chaudhuri, Ibid, P, 70

১৯. Letter from Mr. Strachey to George Dodeswell, dated 1802, Chaudhuri, Ibid P, 71,

২০. *Report of the Regional Records Survey Committee for West Bengal, 1949-50*. P, 34 Chaudhuri, Ibid, P. 72

২১. L. S. S. O' Malley, *History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule*, 1925, P. 300

* দ্র, সংসদ বাঙলা অভিধান, চণ্ডিকা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দ কোষ'-এ অর্থ লিখেছেন : ১. ব্যাধজাতি, চণ্ডাল, যুদ্ধ ব্যবসায়ী
২. গৌণ অর্থে—অসভ্য, উগ্রস্বভাব ব্যক্তি
১ম খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৭৮, পৃ. ৮৮৭

২২. ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বাঙলার ইতিহাস, ১৩৭০, পৃ. ১৯৯-২০০

২৩. তদেব, পৃ. ২০০

২৪. J. C. Price, *The Chuar Rebellion of 1799*, (1874) P. I. এবং ভৌমিক, তদের পৃ. ৫৮। প্রাইস সাহেবের গ্রন্থটি অধুনা দুষ্প্রাপ্য। মহাকরণ গ্রন্থাগারে এক কপি রক্ষিত আছে।

২৫. ভৌমিক, পৃ. ৫৯

লক্ষণীয়, ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বলেছেন, এ বিদ্রোহকে ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ 'চোয়াড় বিদ্রোহ' আখ্যা দিয়ে সত্য তথ্যকে গোপন করেছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের "ইহা গণবিদ্রোহ।" দ্র, বাঙলার ইতিহাস, পৃ. ১৯৯

২৬. Collector's Report to the Board, dated 25th May, 1799, দ্রষ্টব্য District Gazetteer, *Midnapore*, P, 44

২৭. Price. Ibid, P, 3

২৮. ত্রৈলোক্যনাথ পাল, মেদিনীপুর ইতিহাস, পৃ. ৯

২৯. Proceedings of the Board of Revenue dated 17th January, 1800

৩০. Price Ibid, P. 12.

৩১. Ibid, P. 12

৩২. সুপ্রকাশ রায়, তদেব, পৃ. ১২৮

৩৩. তদেব, পৃ. ১৯

৩৪. Captain Sherwill's Report. দ্র, উদ্ধৃতি Hunter's *Annals of Rural Bengal*, 1897, 7th edi, P. 75

৩৫. Hunter, Ibid, P. 74

তুলনীয়. "The early period of British administration in Birbhum was a time of trouble and uncertainty."

দ্র, *West Bengal District Gazetteers : Birbhum*,

৩৬. Hunter, P. 77

৩৭. Ibid, P. 78

৩৮. Ibid, P. 78

৩৯. Ibid, P. 79

৪০. চিঠিটির উদ্ধৃতি দ্রষ্টব্য, Hunter, Ibid, P, 79

৪১, Hunter, Ibid, P.80

৪২. *Civil Disturbances During the British Rule in India* গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। Pp. 72-74

৪৩. T. H. Lewin : *The Hill Tracts of Chittagong and the dwellers therein*, P. 64 প্রসংগ,—সতীশচন্দ্র ঘোষ, চাক্মাজাতি, সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী ২৪শ খণ্ড, ১৩১৬ পৃ. ৭৬-৭৭

৪৪. তদেব, পৃ. ৭৭

৪৫. L. S. S. O' Malley : *Eastern Bengal Dstrict Gazetteers : Chittagong*, 1908. P. 38

৪৬ সতীশচন্দ্র ঘোষ, তদেব, পৃ. ৭৮-৭৯

৪৭. J. C. Jack, *Bengal District Gazetteers* : *Bakarganj*, 1918 P. 21

৪৮. H. Beveridge, *The District Bakarganj : its history and statistics*. London, 1876, P. 314

৪৯. Ibid, P. 313

৫০. J. C. Jack, Ibid. P. 22

৫১. Ibid, P. 26

৫২. H. Beveridge, Ibid, P. 317

৫৩. ওয়েস্টল্যাণ্ড কালীশংকরের চরিত্র চিত্রণ করেছেন সুন্দরভাবে। তিনি কালীশংকরকে ডাকাত বলেননি। তাঁকে তিনি লাঠিয়াল জমিদার হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। দ্র, Westland, *Jessore*, 1871, P. 60

৫৪. সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড. এবং সুপ্রকাশ রায়, তদেব, পৃ. ৯৫

৫৫. ড. দুলাল চৌধুরী, চাকমাপ্রবাদ,
৫৬. তদেব, পৃ. ২৯
৫৭. ফকিরনারায়ণ কর্মকার, বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, দ্বিতীয় সংস্করণ

॥ পরিশিষ্ট ॥

পাঁচেট বিদ্রোহ

বরাভূমের উত্তরে পঞ্চকোট১ বা পাঁচেট। পাহাড় ঘেরা অঞ্চলে ভূমিজরাই এর মূল বাসিন্দা। পঞ্চকোট রাজা আর ভূমিজ প্রজারা আরণ্যক জীবনচর্যায় সুখেই ছিলেন। আঠারোশতকের ১৭৬০-এর দশক থেকে কোম্পানীর কর্তৃত্ব বিস্তারের সংগে সংগে স্থানীয় রাজা ও সর্দার ঘাটওয়াল ও ভূমিজরা প্রতিরোধ করতে থাকেন। প্রতিরোধ ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের রূপ নেয়।

রাজস্ব বাকি পড়ার অজুহাতে পঞ্চকোটের জমিদারী নিলাম হতে থাকে। কোম্পানীর অনুগ্রহপুষ্ট, ভাগ্যান্বেষী বিত্তবানেরা সে সব কিনে নেন। তাঁদের মধ্যে এই জেলার ব্রিটিশ সরকারের দেওয়ান রামসুন্দর মিত্র অন্যতম। "মিত্র মহাশয় ব্রিটিশের দেওয়ান ফন্দিফিকিরে অদ্বিতীয়, অসাধারণ কূটবুদ্ধি, কাজেই স্বনামে বেনামে, অনুচরদের নামে তিনি জমিদারী কিনতে আরম্ভ করেন।"২ এর ফলে "ভূমিজরা, তাদের সর্দার-ঘাটওয়ালরা এবং রাজারা হতভম্ব হয়ে দুর্গম জঙ্গল মহলের রঙ্গমঞ্চে এই বিচিত্র দৃশ্যাভিনয় দেখতে দেখতে অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।"৩

ফলকথা ভূমিজ বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। স্থানীয় ইংরেজ শাসকগণ হতচকিত হলেন। সমরনিপুণ সৈন্যদের নিয়ে বিদ্রোহের প্রতিরোধ করতে চাইলেন। কিন্তু ভূমিজদের অবারণীয় বিদ্রোহোদ্যমে শাসকগণ নাজেহাল হলেন। এর কারণ পঞ্চকোট রাজার বারোজন জায়গীরদার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অনেক জমিদার এতে অংশ নিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁরা স্বজাতি গৌরবের কথা ভুলে 'ব্রিটিশের দাসানুদাসে' পরিণত হয়েছিলেন। সে আরেক ইতিহাস। কিন্তু ভূমিজদের বিদ্রোহী চেতনার মধ্যে যে ব্রিটিশবিরোধী বিশিষ্টতা লক্ষ করা গেছে, তার ফল ছিল দূর-প্রসারী।

---

১. পঞ্চকোট রাজার এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়েছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পাষাণময় পঞ্চকোট নিয়ে তাঁর বিখ্যাত তিনটি কবিতা স্মর্তব্য : 'পঞ্চকোট গিরি', 'পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী' এবং 'পঞ্চকোট গিরিবিদায়-সঙ্গীত'।

২. বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭৬ পৃ. ৪২৮

৩. তদেব

জগদীশ চন্দ্র ঝা, ভূমিজ-বিদ্রোহের ওপর গবেষণা করেছেন। দ্র, The Bhumij Revolt, 1832-33, Delhi, 1967.

চতুর্থ অধ্যায়

সমীক্ষণ

॥ ১ ॥

শোষণের ধারা / বিদ্রোহ . [illegible]

॥ ২ ॥

ইতিহাসের গতি ; [illegible] / [illegible] ধারা

৪ ॥ অধ্যায় ঃ সমীক্ষণ

॥ ১ ॥

[illegible]

"অপূর্ব্ব শুনহ সবে স্বর্গের যতেক দেবে
বিলাতে হইলা সাহেব কপী।
ছাড়িলা আহ্নিক পূজা পরিধান কুর্ত্তি মুজা
হাতে বেত শিরে দিলা টুপী ॥
বাঙ্গালার অভিলাষে আইলা সদাগর বেশে
কৈলকাতা পুরাণা কুঠি আদি।
গওমল সুভেদারী শুভসন বাহাদুরী
আংরেজ আমল তদবধি ॥..."১

বাঙলায় ইংরেজ শাসনের প্রাগ্বাধে যেসব বিদ্রোহ ঘনীভূত হয়েছে, তা ছিল ক্ষীণতম স্পর্শে-ও জ্যোতির্ময়। সংগ্রামী মানসের বলিষ্ঠ বিবর্তন দৃঢ় পিনদ্ধ হতে যদি-ও সময় লেগেছিল; তবুও বলা যায়: ইংরেজের প্রতি বাঙালীর প্রত্যাঘাতের যে চেষ্টা সুরু হয়েছিল;—তারই ফলে উনিশ শতকের বিপ্লব চর্যা প্রতিষ্ঠ হয়েছে।

আমরা আঠারো শতকী বাংলার বিদ্রোহ, বাঙালী মানস ও বাঙলা সাহিত্যে এর প্রভাব নিয়ে আলোচনার প্রয়াস পেয়েছি। এখানে বলে রাখা ভালো, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে বিদ্রোহের প্রভাব প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ-ভাবে পড়েছে; তা নিয়েই আমাদের আলোচনা। এক্ষেত্রে, অবিভক্ত বাঙলার রূপটি মনে রেখেছি। আমরা আগেই বলে এসেছি, ইংরেজাধিকার হওয়ার পরই বাঙলায় সংকট উপস্থিত হয়েছে। এর কারণ সূত্রবদ্ধ করা যায়। বণিকদের একচেটিয়া বিকিকিনি ভাব, শোষণ-পীড়ন, অত্যাচার অনাচার প্রভৃতি। ফলশ্রুতি, অত্যাচারিত বাঙালী বিদ্রোহ-বিপ্লবের কঠিন সরণিতে চলতে বাধ্য হয়েছে, কেননা মুক্তি অনুভবই ছিল তরঙ্গায়িত।

এক

ইংরেজের অনুসৃত নীতি—কি শাসন নীতি, কি অর্থনীতি ছিল কলুষ চিহ্নিত। এর ওপর তাদেরই সৃষ্টি দানবোপম নায়েব দেওয়ান রেজাখাঁ, দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অতিমাত্রিক শোষণ অত্যাচার। ফলে দেশের মধ্যে ইংরেজ শাসন সম্পর্কে ভীতি ও ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল। বণিক শাসনকে অপ্রসন্নচিত্তে গ্রহণের সুতীব্র প্রকাশ বাঙালীর জীবন চর্যার মধ্যেই ছিল। ইংরেজদের অনুসৃত নীতিতেই মন্বন্তর কবলিত হয়েছিল বাঙলা। এর অর্থনৈতিক দিক আমরা দেখেছি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশকে এত বেশি রিক্ত করে তুলেছিল ; যা পরবর্তী চল্লিশ বৎসরেও পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ঐতিহাসিক হাণ্টারের মতে ব্রিটিশ শাসন আরম্ভের চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসে 'ছিয়াত্তর' একটি আঘাত স্বরূপ। তিনি লিখলেন :

"In the cold weather of 1769 Bengal was visited by a famine whose ravages two generations failed to repair... But the disaster which from this distance floats as a faint peak on the horizon of our rule, stands out in the contemporary records in appalling proportions. It forms, indeed, the key to the history of Bengal during the succeeding forty years."২

একটি ছড়াতে ইংরেজ নায়েব দেওয়ান রেজাখাঁর অত্যাচার ও মন্বন্তর জনিত শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। ছড়াটি এরকম :৩—

"নদনদী খালবিল সব শুকাইল।
অন্নাভাবে লোকসব যমালয়ে গেল॥
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
দেশ ছারখার হ'ল রেজাখাঁর ডরে॥
একচেটে ব্যবসা দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হ'ল ভয়ঙ্কর॥
পতিপত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে
মরে লোক, অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে॥"

ইংরেজের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝান যায়। বীরভূমের সুপারভাইজর হিগিন্স সাহেব ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির এক

পত্রে কাউন্সিলকে জানালেন : মন্বন্তর পীড়িত বীরভূমের অবস্থা শোচনীয়। শত শত গ্রাম জনমানবহীন অবস্থায় পড়ে আছে। এমন কি বড়ো বড়ো শহর পর্যন্ত মনুষ্য বাসের অযোগ্য। চাষের লোক নেই। সর্বত্রই ধ্বংসের করাল ছায়া বর্তমান।

তিনি পত্রে একটি প্রার্থনা-ও জানিয়েছিলেন। হতভাগ্য যে ক'টি প্রজা এখনও এই মরুভূমির দেশে কোনোমতে গবাদি পশু ও গৃহস্থালি জিনিসপত্র বিক্রি করে বেঁচেবর্তে আছে; এদের খাজনা মুকুব করে আগামী চাষের সুযোগ দেওয়া হোক। ফলে মরশুমি চাষ ব্যাহত হবে না। এতে রাজস্বের ক্ষতি হবে বটে, কিন্তু তার পরিমাণ বিপুল হবে না। বলা বাহুল্য, কোম্পানীর অনুসৃত নির্দয় নীতির সূত্রে হিগিন্সের মতো বাস্তব বাদী মানুষের আবেদনে কাউন্সিল কর্ণপাত করেননি। বরং পাল্টা পরামর্শ দিলেন, আদায় অব্যাহতি নয়, শুধুমাত্র সময় দেওয়া হলো পরবর্তী মরশুমে একত্র আদায়ের।৪ বিষয়টি এমন যে হতভাগ্য ডুবছে, তাকে আরো গভীরে ঠেলে দেওয়া!

মন্বন্তর বাংলা সম্পর্কে 'কলিকাতার কথা'য় লেখা হলো : "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর দেশের লোকের ভয়ানক দুরবস্থা হইয়াছিল; জমিদার, ব্যবসাদার, কৃষক, শিল্পী সকলেই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন ব্যবসা নৌকা যোগে হইত, ব্যবসার ক্ষতি হওয়ায় মাঝিরা পর্যন্ত তাহাদের দুঃখের গান গাহিত :

"মনমাঝি তোর বৈঠা নেরে তাই আর বইতে পারিনে।"৫

দুই

রাজনৈতিক ইতিহাসে হেস্টিংসের ভূমিকা বোধকরি বিধ্বংসী নায়কের। এখানে স্মরণ করি তাঁর নির্দয় নীতি ও কূটকুশলতাকে। যিনি ছিলেন বাঙালীর জীবন ও মনন সম্পর্কে উপেক্ষাপরায়ণ এবং বিপরীত আচরণ ধর্মে মহাকর্মী। হেস্টিংস এদেশকে কিভাবে লুটেপুটে নেওয়ার উদ্যোগ করেছিলেন তার প্রাসংগিক আলোচনা আমরা করতে পারি।

আমরা আগেই লক্ষ করেছি, হেস্টিংসের শাসনাধীনে বাংলায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ব্যাপক রূপ ধারণ করে। হেস্টিংস-ও এ বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য, হেস্টিংসের ইজারানীতি ছিল বাঙালী জীবনে এক আঘাত স্বরূপ। একে তো মন্বন্তর উত্তর দেশ তখন ধুঁকছিলো। এই সময় তাঁর ইজারা নীতিতে নবীন ভূস্বামী সম্প্রদায় সৃষ্টি হলো। উচ্ছেদ করা হয়েছে খাজনা যেটাতে অপারক্রম প্রাচীন জমিদারের। হেস্টিংস জমিদারী ইজারা প্রথমে বার্ষিক পরে পাঁচ বা দশ বৎসরের মেয়াদে দিয়েছিলেন। "তখন জমি জায়গা পাঁচ বা দশ বৎসরের ইজারা বিলিতে উচ্চ হার করার বাঙ্গালাদেশে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সৃষ্টি হইয়াছিল। পৈত্রিক জমি জায়গা সাতপুরুষের জমিদারেরা নূতন ইজারাদারের হাতে কেমন করিয়া বিনা যুদ্ধে তুলিয়া দিবে ?"৬

আমাদের বক্তব্যের প্রাঞ্জলতম প্রকাশ এই উদ্ধৃতিটিতে-ও মিলবে : "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাঙ্গালার জমিদারগণের যে অপকার হয় নাই উহার সহস্রগুণ ক্ষতি হেষ্টিংসের ইজারা বিলিতে হইয়াছিল। ...হেষ্টিংসের সার্টিফিকেট সভা বাঙ্গালার বনিয়াদি জমিদারগণের খাজনার হার অতিরিক্ত করিয়াছিল। সেজন্য সেই সকল জমিদার কলিকাতায় বন্দী অপমানিত হইত এবং শেষে তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ভাল সম্পত্তি গঙ্গাগোবিন্দ, নবকৃষ্ণ বাহারবন্দ কান্তবাবু, ভুলুয়া ও শালবেড়ে গঙ্গাগোবিন্দের হয়। তাহারা সম্পত্তি হারাইয়া ইংরাজের পক্ষপাতী হন নাই। বীরভূম প্রভৃতি স্থানের জমিদার রাজারা প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়াছিল ও খাজনা দেয় নাই। অগত্যা ঐতিহাসিক হন্টার সাহেবের কাছে তাহারা ডাকাত।"৭

এখানে উল্লেখ্য, মুসলমান রাজত্বকালে জমিদারগণ কর আদায়, শান্তি রক্ষাদি প্রভৃতি কাজ পাইক দ্বারা করাতেন। কিন্তু ইংরেজ রাজত্বে হেস্টিংস এই ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করে কালেকটর নিযুক্ত করে প্রজার ও জমিদারগণের সর্বনাশ করলেন। এবং এর ফলে "পাইক ও জমিদারগণ প্রজাপীড়ক ডাকাত হইয়া পড়ে, চারিদিকে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়।"৮

এখানে সমুল্লেখ্য, ওয়ারেণ হেস্টিংস তাঁর নিত্যসহচর দেবীসিংহ, গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ, কান্তবাবু, নবকৃষ্ণ ও কাশিনাথের সহযোগিতায় বাংলায় শোষণ-পীড়নের অত্যাশ্চর্য সুযোগ পেয়েছিলেন। এই [illegible] সহচরদের

পঞ্চপাণ্ডব ও হেস্টিংসকে শ্রীকৃষ্ণ বলে পরিহাস করেছেন প্রমথনাথ মল্লিক মহাশয়।৯ দেবীসিংহ ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ সম্পর্কে আগেই বলে এসেছি। এখানে হেস্টিংসের আরেক প্রিয় পার্শ্বচর কান্তবাবুর সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করতে পারি। যদি-ও ইনি দেবীসিংহ বা গঙ্গা গোবিন্দ সিংহের ন্যায় হিংস্র ছিলেন না। কিন্তু অবৈধ বহু কর্মে তিনি লিপ্ত ছিলেন। এই কান্তবাবুই হলেন কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। হেস্টিংসের কান্তবাবুকে পছন্দ করার পেছনে একটি কাহিনী-ও প্রচলন আছে। কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠিতে মুহুরীর কাজ করতেন কান্তবাবু। নবাব সিরাজউদ্‌দৌল্লা যখন কাশিম বাজার দখল করলেন, তখন ওয়াটসন্ সাহেব ছিলেন এর অধ্যক্ষ আর হেস্টিংস ছিলেন সামান্য এক কর্মচারী। সিরাজের আক্রমণে ইংরেজ পক্ষ পরাজিত হয় এবং হেস্টিংস-ও বন্দী হলেন বটে। বন্দীদের মুর্শিদাবাদে আনা হলো। কথিত হয়, হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ হতে পলায়ন করে কাশিমবাজারে কান্তর আশ্রয় গ্রহণ করেন। আবার এমন-ও বলা হয় যে, হেস্টিংসের মুক্তিলাভের সংগে কান্তবাবুর একটি বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় কান্তবাবুর ভাগ্যোদয়ের সূচনা হয়।১০

এই কাহিনীর বিস্তার নিয়ে কৃষ্ণনাগরিক রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর একটি রস-রচনা আছে। সেটি ছড়া।১১ তা হলো এই :

"হেষ্টিংস সিরাজ ভয়ে হয়ে মহাভীত।
কাশিম বাজারে গিয়া হন উপনীত॥
কোন্ স্থানে গিয়া আজ লইব আশ্রয়।
হেষ্টিংসের মনে এই নিদারুণ ভয়॥
কান্তমুদী ছিল তার পূর্বে পরিচিত॥
তাহারি দোকানে গিয়া হন উপনীত॥
নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে।
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে॥
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান॥
মুস্কিলে পড়িয়া কান্ত করে হায় হায়।
হেষ্টিংসে কি খেতে দিয়া প্রাণ রাখা যায়?

ঘরে ছিল পান্তাভাত আর চিংড়ি মাছ।
কাঁচালঙ্কা, বড়িপোড়া, কাছে কলা গাছ॥
*　　　*　　　*
সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে।
হেষ্টিংস ডিনার খান কান্তের ভবনে॥"

ঘটনা যাই-ই হোক না কেন, কান্তবাবুর প্রতি হেস্টিংসের সুহৃৎ-আচরণের পেছনে গূঢ়তত্ত্ব আছে, সন্দেহ নেই। কান্তর প্রতি হেস্টিংসের সদানুভবের একটি দৃষ্টান্ত দিই।

রাণীভবানীর এলাকাভুক্ত বাহারবন্দ। হেস্টিংস বাহারবন্দ ছিনিয়ে কান্তবাবুর নাবালক পুত্রের নামে প্রথমে ইজারা এবং পরে ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিলেন ৬৩৯ টাকায়। কারণ, কান্তবাবুকে খুশি করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু প্রজারা এই আপত্তিক-ব্যবচ্ছেদে বিক্ষুব্ধ হলেন। আরো আছে। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারিতে কান্তবাবু বাহারবন্দ পরিদর্শনে গেলেন। হেস্টিংস রঙপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবকে এত্তেলা পাঠালেন; বিদ্রোহী প্রজাদের দমনে কান্তকে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। বলা-বাহুল্য প্রজার টুঁটি চেপে রাজ আদেশ মানিত হলো। ১২

আরেকটি দৃষ্টান্ত :

বারাণসী রাজ চৈৎসিংহের বালিয়া পরগণা দেওয়া হয়েছিল কান্তবাবুকে। এর ফলে কান্তবাবুর অবৈধ সম্পদ লাভ হয়েছিল। তা নিয়ে একটি ছড়া।১৩ :

"মহারাজ চেৎসিং কাশীধামে ছিল, হেষ্টিংসের সনে তার বিবাদ ঘটিল, মাঝ থেকে কান্তবাবু লুটে মজা নিল, মহামূল্য ধনরত্ন ঘরে নিয়ে এল। রাজার ঠাকুর আর সুন্দর দালান, নিয়ে এসে বসায়েছে করিয়া আপন, পুকুর চুরির কথা জমিদারে জানে, দালান চুরির কথা হেষ্টিংস যে জানে।"

মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসির বিধান দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এ নিয়ে-ও হেস্টিংসের কলঙ্ক কম নয়। একটি ছড়া।

"আজগুবী এক আইন হয়েছে,
কোলচলিদের সাথে হেষ্টিন ঝগড়া বাঁধিয়েছে।

'হায়রে হায় একি হোল বামুনের ফাঁসি হোল,
নন্দকুমার মারা গেল, গুরুদাস ধূলায় পড়েছে।''১৪

অন্যত্র,১৫

"বাঙ্‌লা এগারশত বিরাশির সালে, ২১শে শ্রাবণ শনিবারের সকালে।
ব্রহ্মনাশ হয়ে গেল আলিপুরের মাঠে, হেষ্টিংসের হৃৎকম্প হতো যার দাপটে।
লোকারণ্য মাঠ ঘাট লাগিল কাঁদিতে, ফাঁসি হবে শুনে লোক লাগিলছুটিতে।
লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি যেই নিল শিরে, এই পরিণাম তার লোক চিন্তা করে।
লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল ইহার, কে জানে হেষ্টিংস ইম্পের কেমন বিচার।''

একটি গ্রাম্য গীতে,১৬

"মহারাজ নন্দকুমাররে,
তোর রাজ্যপাট কারে দিলিরে?
নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গালার অধিকারী।
হেষ্টিং সাহেব এলো জান করিবারে বারি॥
নন্দকুমার মা কাঁদে, ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে।
আর না আসিবে বাছা যোড়া ডিঙ্গি বেয়ে॥
খোপেতে কৈতর কাঁদে, কোঁহারাতে হাঁস।
যোড় বাঙ্গালায় কাঁদে সোনার শুলতি বাঁশ॥
ছোট রাণী উঠে বলে বড় রাণীগো দিদি।
সিঁতে ছিল কড়া সিন্দুর বঞ্চিত করলেন বিধি॥''

তিন

পলাশী উত্তর বাংলায় বিভিন্ন গণবিদ্রোহের মধ্য দিয়েই সুরু হয়েছিল ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লবী কুঠারাঘাত। একান্ত স্থানিক এইসব বিদ্রোহের প্রকৃতি ভিন্নতর হলেও মৌল চিন্তার ক্ষেত্রে একতাসূত্রে সুচিহ্নিত করা যায়। সওদাগর শ্রেণীর শাসন ও শোষণে পিষ্ট বাঙালী মুক্তি স্বাচ্ছন্দ্যের শ্রেয় সত্তায় ক্রম বিশ্বাসী হয়ে উঠছিলেন। ইংরেজদের চিত্ত সান্নিধ্যে এসে বাঙলার জীবন জটিলতা ক্রমশঃ ব্যাপকতর হচ্ছিল। ফলে শোষণহীন সমাজ রাষ্ট্রের দূর-ভাবনায় ভাবিত হলেন। সুতরাং মুক্তি আকাঙ্খার মধ্যে স্বাধীনতার স্পষ্ট অনুভূতি অনুপস্থিত নয়।

সমকালীন বাঙালীর আকাঙ্ক্ষার সমূর্ত্তি সম্ভব হতো যদি সর্বত্র বিদ্রোহের সুরু ও স্থিতিতে মোটামুটি ঐক্য বজায় থাকতো। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। আগেই বলেছি, একনায়কত্বের অভাব, বলিষ্ঠ সংগঠন আর সংযুক্ত কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির অভাবেই গণ বিদ্রোহগুলি ব্যাপকতর হতে পারেনি। অবশ্য এসব বিদ্রোহ সমকালীন রাজনীতির ক্ষেত্রে নব জিজ্ঞাসার সৃষ্টি করেছে।

বাঙালী তার প্রস্তুতি পবে রূপান্তর আনতে চাইলেন। বলিষ্ঠ উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করলেন। এই চেষ্টার 'গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক' টুকু তাঁরাই করলেন। ফলে ভাবীকালের বিপ্লব প্রচেষ্টার মধ্যে দেখি দীপ্ত বৈচিত্র্য। আর, ইংরেজ ভাবলেন নোতুন সূত্র, বিভেদ বৈষম্যের। তার পরীক্ষাও সুরু হলো। নব্য জমিদার সম্প্রদায় গড়ে উঠলো। এরা ইংরেজদেরই আজ্ঞাবাহী। সংগে সংগে মহাজন ও মজুর সম্প্রদায়ও গড়ে উঠলো। সুতরাং প্রাচীনের সংগে নবীনের বিরোধ উপস্থিত হলো। নবীন ভূস্বামী-দের জুলুম, অত্যাচারে সাধারণ কৃষক প্রজা প্রমাদ গুণ্‌ল।

আবার ধর্মীয় বৈষম্য-ও কি কম! মুসলমান হাত হতে রাজ্যপাটের হস্তান্তর হয়েছিল বলেই মুসলমানেরা ইংরেজদের বিদ্বেষ পূর্ণ চোখে দেখতে লাগলেন। এ সময় আবার ইংরেজরা স্বাভাবিক কারণেই হিন্দুদের সুযোগ সুবিধে বেশি রকম দিতে লাগলেন। ইংরেজদের বিভেদ নীতির কূট কৌশলে দুসম্প্রদায়ের বিষতিক্ত আবহাওয়ার সেই হলো সুরু। ফলে, ধর্মীয় বৈষম্য বজায় রেখে মুসলমানেরা অসহযোগীর মনোভাব নিলেন। এতে মুসলিম সংস্কৃতি ভিন্নতর পথে প্রবাহিত হতে থাকে।

তাহলেও বলব, আঠারো শতকের বিপ্লবী সত্তার নির্বাধগতি, কুশলী প্রয়াস ও সতর্ক সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তর সূরীদের মধ্যে অনুশীলিত হয়ে-ছিল ব্যাপক ও গভীর ভাবে।

॥ ২ ॥

ইতিহাসেরগতি : মানস বিবর্তন / সাহিত্যের ধারা...

ঐতিহাসিক ব্যক্তিসত্তার বিপরীত মূল্যায়ন বাংলাসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। কালের পরিমাপে বিভিন্ন ঐতিহাসিক দৃষ্টিভংগিতে কিংবা সাহিত্যের আঙিনায় ব্যক্তি চরিত্রের রূপ বদল হয়েই থাকে। এ যেন একটি ধারা। একটির সংগে আরেকটির মিল নেই। আবার তা অপরিহার্য-ও নয়। একটি দৃষ্টান্ত।

সিরাজের ব্যক্তি চরিত্রে কলুষ আরোপিত হয়েছে। তাঁর জন্যই বাংলার কালগৌরব অস্তমিত। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছে। ইংরেজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, সিরাজের পতন ও ইংরেজ শাসন অপরিহার্য ছিল। এ মত স্বীকৃত। নবীনচন্দ্র সেন ইংরেজ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতেই সিরাজের চরিত্র কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত করেছেন। ক্লাইভকে বীরপুরুষ বানিয়ে ইংরেজের জয় ঘোষণা করেছেন। ডক্টর সুকুমার সেন বলেছেন, এর-ও কারণ ছিল; "নবীনচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে সিরাজদৌল্লার সমর্থন করেন নাই। কেন না তখনও সিরাজের ইতিহাস একতরফাই জানাছিল—ইংরেজ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে। প্রধানত চাকুরির খাতিরে ক্লাইবের বিরুদ্ধে কিছু বলাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অগত্যা মোহনলালকে কাব্যের নায়ক করিয়া নবীন চন্দ্রকে দুইকুল রক্ষা করিতে হইয়াছিল।"১৭ নবীনচন্দ্র সেন সিরাজকে উচ্ছৃংখল, মদ্যপ, কামাচারী বলে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু প্রকৃত সিরাজ নাকি শিক্ষিত ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর 'সিরাজদ্দৌল্লা' গ্রন্থে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি তথ্যানুসন্ধান ও সত্যাসত্যের যাচাই করেছিলেন কিনা তা জানা নেই, তবে নবীনচন্দ্রের অভিমতের সংগে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের বক্তব্যের অমিল নেই।১৮

যাইহোক, নবীনচন্দ্র পলাশীর কাহিনী যেখান থেকেই নিয়ে থাকুন না কেন এবং সিরাজকে তিরস্কার করলে-ও কবির আক্ষেপ সিরাজকে নিয়েই। এই আক্ষেপের বন্যায় 'পলাশি যুদ্ধ' কাব্যে স্বদেশ প্রীতি, দেশপ্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কবির কাছে পলাশীর কাহিনী মর্মবেদনার-ও কারণ বটে। ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত লিখেছেন "পরাধীনতার বেদনা এবং স্বাধীনতার উন্মাদ-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশই এখানে লক্ষ্য, পলাশির যুদ্ধ উপলক্ষ মাত্র।"১৯

দ্রষ্টব্য :

"আঁধারিয়া ভারতের হৃদয়-গগন
স্বাধীনতা শেষ আশা গেল পরিহরি।" (৪র্থ সর্গ)

কবির ক্ষোভ যেখানে দুর্বার :

"সিরাজের ছিন্নমুণ্ড চুম্বিয়া ভূতলে
পড়িল, ছুটিল রক্ত স্রোতের মতন।
নিবিল গৃহের দীপ, নিবিল তখন
ভারতের শেষ আশা, হইল স্বপন।"

(৫ম সর্গ, শেষ চারটি চরণ)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়-ও সিরাজদৌল্লাকে সমর্থন করেননি। তিনি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের বিবরণই অনুসরণ করেছিলেন। অবশ্য তিনি নবীনচন্দ্রের মতো সিরাজকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেননি। কবি তাঁকে হতভাগ্য বলেছেন। তাঁর পরিবেশ, পরিস্থিতি ও চরিত্র তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী। কিন্তু সিরাজ যতই দুর্বৃত্ত হোন না কেন, তাঁর শোচনীয় পরিণাম কবিকে ব্যথিত করেছে।২০

যাইহোক, ঐতিহাসিক গবেষণায় স্বীকৃত হয়েছে যে, সিরাজ যতটা হতবুদ্ধি ও হতভাগ্য ছিলেন, ততটা দুর্জন ছিলেন না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'সিরাজদৌল্লা' নাটকে কর্তব্য পরায়ণ সিরাজের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। যেখানে সিরাজ লুৎফউন্নিসাকে বলছেন : "যদি সুখ-ইচ্ছায় রাজ্যভার গ্রহণ করতেম, তাহলে ছার রাজ্য পরিত্যাগ করে তোমার সহিত নির্জ্জনে বাস করতেম। কিন্তু রাজ্যের সহিত আমার উপর গুরুভার স্থাপিত।"২১

এই নাটকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্পষ্টকিত করলেন, কর্ম ও ধর্মে যে মানুষটি খাঁটি কিছুমাত্র অত্যাচার, অনাচার সে তো তারুণ্যের ত্রুটি। আর তা যদি ব্যক্তি জীবনকে কলুষিত করে তবে জীবন ধর্মের বিচারে ব্যক্তির গুণাবলীকে-ও সত্য আলোকে পুরস্কৃত করতে হয়। ঠিক এমনি একটি মনোভাব, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাসে' প্রকাশ করেছেন।২২

দৃষ্টান্তটি একটু বিবৃত হলো। কারণ, বাংলা সাহিত্যে কিংবা ইংরেজের তক নথিপত্রে ইতিহাসের ব্যক্তি চরিত্রের যে রূপায়ণ হয়েছে; তা

যে যুগের হাতে পুনর্বিচারের অপেক্ষা রাখে তা অনস্বীকার্য। তাই ইংরেজের চিত্রিত মজনুশাহ অথবা গাথা চিত্রের মজনুশাহকে আমরা ডাকাত হিসাবে দেখি। নির্বিকার ঔদাসীনতায় মজনুর কর্মকাণ্ড এ সবে বিধৃত। এখানে তাঁর বীরত্ব স্বীকৃত হয় না। আদর্শ-ও কথিত হয় না। কিন্তু তথ্য ও তত্ত্বের গভীরে এমন সূত্র অনাভাসিত নয় যে, এই মানুষটির আদর্শ, দেশ-হিতৈষণার মধ্যে বিদ্রোহী বাঙলার সূচনা হলো। সুতরাং কালের জিজ্ঞাসায় ব্যক্তির মর্যাদা তাঁকে দিতেই হয়। আমাদের বক্তব্যের স্বাভাবিক প্রয়োজনে সাম্প্রতিক একটি নাটকের উল্লেখ করা হলো। এতে দেখা যাবে মজনুশাহ বিদ্রোহের কেন্দ্রীয় পুরুষ এবং দেশ সাধনায় নিবেদিত দুটি প্রাণ ভবানীপাঠক ও দেবীচৌধুরাণী। নাটকটির নাম 'সন্ন্যাসীর তরবারি' ।২৩

এক

সন্ন্যাসীর তরবারি··

নাট্যকার ও চরিত্রাভিনেতা উৎপল দত্ত সন্ন্যাসী বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে একখানি নাটক রচনা করেছেন। এটির নাম সন্ন্যাসীর তরবারি। প্রকাশকাল ১৩৮১। এটি দ্বাদশাধিক পুরুষ চরিত্র ও ষষ্ঠাধিক নারী চরিত্র সমন্বিত। এতে দশটি গীত সংযোজিত হয়েছে। নাটকখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৮। এর মূল কাহিনীটি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম ও দ্বন্দ্বাত্মক প্লটে সুবলম্বিত।

সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

হেস্টিংস বাংলার গভর্নর জেনারেল। কূট তাঁর চরিত্র। বাঙলার সর্বনাশের কথা তিনি সদাই ভাবেন। সহকর্মী রেনেলের সংগে অবিরাম তাঁর সেই আলোচনা। তিনি এদেশকে 'বর্বর অসভ্য' ভাবেন। চাষীদের নিংড়ে খাজনা আদায়ের আদেশ দেন বাজপুরের নির্দয় অমানুষ জমিদার শশাংক দত্তকে। তাঁরই নির্দেশে রেনেল ও শশাংক দত্ত তুতনাথপুরের মহিলা তালুকদার প্রফুল্লমণি চৌধুরাণীর তালুক কেড়ে নেবার দুর্ণাজাল বিস্তার করেন। এরজন্য প্রফুল্লমণির স্বামী ব্রজেশচন্দ্রকে কোর্ট উইলিয়মে কয়েদ করে রাখা হয়।

শশাঙ্কে দত্ত প্রফুল্লমণিকে ভ্রষ্টা, দুশ্চরিত্রা বলে প্রচার করেন। তাঁকে কেড়ে নেন। সামাজিক অংগনে তাঁর স্থান মেলেনা। ফলে তিনি হলেন গৃহহীনা। কিন্তু সমগ্র দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে একটি শক্তি গোপনে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। অনেকেই খবর রেখেছে তা। হরমণি জগাই-এর মা। তিনিও জানেন মজনু ফকিরের লোক মুসাফকির গান গেয়ে দেশের লোককে জাগাবার চেষ্টা করছেন। জগাই তা বোঝে না। জগাই বলে: "মজনু? মজনু শা তো ডাকাত।" (পৃ, ২৩) পুত্রের কথায় মায়ের মজনু বিষয়ক হৃদয়োত্তাপ; "ডাকাত? তা হবে, ডাকাতের রাজ্যে ভালো লোকেরাই ডাকাত।" (পৃ, ২৩)

ইংরেজ দেশে অত্যাচার, অনাচারের বন্যা বইয়ে দিয়েছে। নারীদের চরম সর্বনাশ সুরু করেছে তারা। অপর দিকে বিদ্রোহী নেতা মজনু ফকির সীমান্তের অরণ্য মোরাং অঞ্চল থেকে অত্যাচারিত ভাইবোনদের আহবান জানিয়েছেন, তাঁর উন্মুক্ত তরবারির তলে সমবেত হওয়ার। মুসার উদ্দীপ্ত কণ্ঠ:

"তোমরা অস্ত্র হও, হও তরবারি…
এদেশ নয় স্বাধীন।" (পৃ, ৫২)

প্রফুল্ল গৃহহীনা হলেন বটে, কিন্তু কৃপানন্দ তাঁকে আশ্রয় দিলেন পরম-স্নেহে। তিনি তাঁকে দেবী চৌধুরাণী নামে অভিষিক্ত করলেন। নিজের পরিচয় দিলেন। সন্ন্যাসী-ডাকাতের রহস্যময় পরিচয়। ইনি-ই নাটকের প্রাণপুরুষ ভবানীপাঠক। তিনি প্রফুল্লমণিকে দেশ-মন্ত্র দিলেন: "অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম। বলপূর্ব্বক সেই অন্ন কেড়ে নিতে হবে। তাই তোমার ডাক এসেছে, চলো।" তিনি জানালেন, এমন একজন মেত্রীর জন্য অপেক্ষা করছেন সন্ন্যাসী মজনু শা।

বিদ্রোহীবাহিনী সংগঠিত। তাঁরা সন্তান বলে পরিচিত। এতে যোগ দিয়েছে অনেকেই। অনেকে আবার নোতুন নামে পরিচিত হয়েছেন। জগাই এখন রামানন্দ, সাদির মিয়া চেরাগ আলি, মধু নাম নিয়েছেন শিবানন্দ। আবার ভবতারণ মুখার্জী নামে ইংরেজের গুপ্তচরও সন্তানদলে ভিড়েছে।

যুদ্ধ সুরু হয়েছে। সন্তানদল চারটি যুদ্ধে জয়ী। ইংরেজশক্তি বিপর্যস্ত। এক্ষেত্রে নাটকের গতি দুর্বার। আবার মায়ের মনের আকুতি নাট্যরূপ

পেয়েছে। দেবী সব ছেড়ে এসেছেন। কিন্তু ভুলতে পারেন না পুত্র প্রফুল্লকে। মায়ের মন কাঁদে। এ দুর্বলতা অরণ্যচারিণীর ক্ষেত্রে বেমানান। কিন্তু বাৎসল্যটান বড়ই নিবিড়, নিয়ম মানেনা। অন্যদিকে সন্ন্যাস জীবনের মধ্যে রামানন্দের ক্ষণিক স্খলন ঘটে। তিনি দেবীর প্রতি আকৃষ্ট হন দুর্বল মুহূর্তে। কিন্তু দেবীর রোষান্বিত দৃষ্টি তাঁকে ফিরিয়ে আনে।

সন্তানদলের প্রতি ভবতারণের বিশ্বাসঘাতকতায় বিদ্রোহীদলের অনেক গোপন খবরই ইংরেজের কাছে চলে যায়। এর ফলে মহাস্থানগড়ের যুদ্ধে সন্ন্যাসী দলের পরাজয় ঘটে। এতে মজনু শা আহত হন। ইংরেজের কূট-নীতিতে মহাস্থানগড়ের কৃষকরা মজনুকে ভুল বুঝে আশ্রয় পর্যন্ত দেয়নি। অপর দিকে রামানন্দ সন্তানদল ত্যাগ করে ইংরেজ শিবিরে চলে গেলেন। না, দলে যোগ দিলেন না। আত্মগোপন করলেন। ছদ্মবেশ নিলেন মার্ক সাহেব নামে। তিনি দেশদ্রোহী শশাংকের হাত থেকে দেবীর পুত্রকে বাঁচালেন। মায়ের কাছে তাকে পাঠিয়ে দিলেন।

আবার যুদ্ধ। ইংরেজ অরণ্যের দক্ষিণভাগে অগ্নিসংযোগ করেছে। পতনের মধ্যে ও কৃপানন্দের অগ্নিভাষণ: "গোরাদের তাক করে গুলি চালাও। বলো বন্দেমাতরম! বলো ইয়া আলি, ইয়া আলি! বলো পলাশীর প্রতিশোধ!" (পৃ, ১২৯)। কিন্তু তাতে শেষ রক্ষা হয়নি। রামানন্দ ধরা দিয়েছেন। কারাগারে তাঁকে রাখা হয়েছে, গোপনে বিষ দেওয়া হয়েছে। মৃত্যু আসন্ন। শেষবারের মতো দেবী তাঁর সংগে দেখা করে জানতে চাইলেন, এই স্বেচ্ছা মৃত্যুর কারণ। তিনি জানিয়েছেন, তিনি সন্ন্যাসীজন, কেবল "সন্ন্যাসীর তরবারি মাত্র।" (পৃ. ১৪৩) এরপর তিনি সংগোপনে মজনুশার তরবারির সংবাদ জানিয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণতে থাকেন। অবশ্য ইংরেজ ঢোল নামালেন অন্যরকম। রামানন্দ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পরলোক গমন করেছেন। কিন্তু দেবী এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সমবেত জনতার উদ্দেশে, নিজের পরিচ্ছদের মধ্য থেকে মজনুশার দীর্ঘ তরবারি উত্তোলন করে বললেন: "মজনু শার তরবারি রামানন্দ গিরি। ইস্পাতের মৃত্যু নেই, অস্ত্রের মৃত্যু নেই। এ-অস্ত্রকে শক্ত মুঠোয় ধরতে পারলেই হয়। সন্ন্যাসীর তরবারির মৃত্যু নেই।" (পৃ. ১৪৮) নাটকটির উজ্জ্বলিত উৎসার এই পর্যন্তই।

জীবনের অগ্নিমন্ত্র : সত্যপথ, ত্যাগ তিতিক্ষার আদর্শ। এই সমস্তের সারাৎসার যাঁর মধ্যে থাকে তিনি প্রকৃত ইস্পাতের ন্যায় বিশুদ্ধ। তরবারি-সদৃশ। আর যে কোনো ব্রত উদ্‌যাপন করতে হলে প্রত্যেককেই এই আদর্শ অনুসরণে নিরন্তর উত্তম চালাতে হবে : এই মহৎ উপলব্ধির প্রোজ্জ্বলতম প্রকাশ ঘটেছে সমগ্র নাটকটির মধ্যে। নাট্যকার নিজে-ও সার্থক শিল্পী। কঠিন রূঢ় বাস্তবকে তিনি জীবন দিয়েই অনুভব করেন ; তাই মহৎ কর্ম পদ্ধতি, আদর্শ ও মহত্ত্বকে অস্বীকার করতে পারেন না বলেই সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের মধ্যে যে সূত্র তিনি আবিষ্কার করেছেন তার প্রচারণায় নেমেছেন।

অবশ্য তিনি ইতিহাস থেকে বিচ্যুত নন। কাল্পনিক রেখা চিত্রে কয়েকটি চরিত্র পরিস্ফুট হলেও ইংরেজের চণ্ডনীতি, শশাংক দত্তের ন্যায় নিষ্ঠুর জমিদার, ভবতারণ মুখার্জীর ন্যায় বিশ্বাসঘাতক এবং জনসাধারণের ব্যাপক অংশ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদ্রোহীদের একক লড়াই এবং তাদের আদর্শগত সংঘাত ইতিহাসের ধারানুসারী। মোটকথা, নাট্যকার ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার উল্লেখে অতীত যুগের পরিবেশ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। কিন্তু এতে শৈল্পিক নিষ্ঠার অভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে বঙ্কিম চন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী' লক্ষণীয়। এতে প্রফুল্লের প্রতি মিথ্যা অপবাদ এবং একাদশ ও দ্বাদশ অধ্যায়ে ভবানীপাঠক ও প্রফুল্লের সাক্ষাৎ এবং তাঁর হাতে আত্মসমর্পনের কাহিনীর যে গুরুতর পর্বান্তর ঘটেছে ; সেসব উপস্থাপনায় নাট্যচমক নেই। নাটকখানি মূর্ত হতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি।

দুই

সাহিত্যের ধারায় বীরোত্তমকে প্রতিষ্ঠার অনুসরণ অলক্ষিত হবার নয়। রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে আধুনিক সাহিত্যে পর্যন্ত 'কালচার হিরো' 'ম্যানিজ্‌ম' ক্রমবর্ধিত, ক্রমসংস্থিত। উত্তর বঙ্গের প্রজা বিদ্রোহকে ঘিরে চণ্ডীচরণ সেন তাঁর 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ' উপন্যাসে নায়ক প্রেমানন্দের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। এখানে তার বীরত্ব, দেশপ্রেম ও আবেগ প্রবাহের মহিমরূপটি সিদ্ধিত করেছেন। কারণটি বোধকরি এই : দণকালের যে

অরাজকতা, তার হাত হতে অব্যাহতির জন্যই মুক্তিদূত হিসাবে কল্পিত হয়েছে প্রেমানন্দ। অবশ্য, সমকালের প্রেরণা শক্তিরই এক জাগ্রত মূর্তি হিসাবে এই আপাত-বিক্ষেপ পরিণামী অর্থবহ। পূর্বেই বলেছি, সময়ের পরিধিতে দেশপ্রেম, বীর-নায়কোচিত কর্মকাণ্ড এবং তার পরিস্ফীতি ইতিহাসের ধারা-নুসারী। যেন নায়কের আবির্ভাব অনেকটা পরিত্রাতার ভূমিকা নিয়েই। যেমন বঙ্কিম দেখালেন 'আনন্দমঠ'-এ আনন্দসেনানীদের আর 'দেবী চৌধুরাণী'তে ভবানীপাঠক ও দেবী চৌধুরাণীকে।

অনেক সময় সাহিত্যে অতীতাশ্রয়ী ঘটনা ও বাস্তব পরিবেশের ঐক্যসূত্র আবিষ্কৃত হয়। আবার তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবেই চিত্রিত হয়। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ কিংবা উত্তর বংগের প্রজাবিদ্রোহের কেন্দ্রভূমি ছিল শান্ত স্নিগ্ধ রহস্যময় বিস্তৃত বনভূমি। বঙ্কিমচন্দ্রের অরণ্যপ্রীতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের মধ্যে অরণ্যের বস্তুনিষ্ঠ চিত্র অংকিত হয়েছে। অরণ্য কেমন, যেন 'বিচ্ছেদশূন্য', 'ছিদ্রশূন্য', 'আলোক প্রবেশের পথমাত্র শূন্য'। আবার অরণ্যের গহনতা বিশালতা প্রকাশ পেয়েছে যেমন 'ক্রোশের পর ক্রোশ'। "নিস্তব্ধ অন্ধকারের ভয়াবহতা এবং বিশাল আরণ্যক জগৎ যেন গোটা উপন্যাসের পটভূমি ব্যাপ্তি করেছে।"২৪ এবং দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসে জঙ্গল কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে কয়েকবার। লক্ষণীয় 'ভারি', 'গাঢ়তর', 'নিবিড়' প্রভৃতি বিশেষণের প্রয়োগ।

আসলে শিল্পরসিক বঙ্কিমের উপন্যাস আঙ্গিকে এসব নিয়ে শিল্পরূপ বিচার করবেন বটে, কিন্তু এর মধ্যে রহস্যময়তা আছে। অরণ্য গুপ্ত বিদ্রোহী-দের নিরাপদ আশ্রয়ও বটে। এবং প্রস্তুতিপর্বের সহায়ক বন্য বৃক্ষরাজি ও নদী-পর্বতের সংগে এদেশীয়দের যোগসূত্র ছিল অনন্য। এসব বিদেশীদের কাছে নিতান্তই অকুশল। সুতরাং সন্তান-জনতার বিদ্রোহী চেতনা ও ভাব-প্রকাশের ক্ষেত্রে অরণ্য দ্যোতক। বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম'২৫ সংগীতের মধ্যেও সেই ভাবচেতনা বন্দী হয়ে আছে।

এই প্রসংগে ভূমিজদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে কিছু বলা যেতে পারে। ভূমিজদের সংস্কৃতি মনস্কতার মধ্যে, লোকাচার বা লৌকিক নিয়মের মধ্যে আরণ্যক-সভ্যতার ঐতিহ্য লক্ষ করা যায়। যেমন বিয়ের পর একজন ভূমিজ 'গ্রামবৃদ্ধ' বরকনেকে আশীর্বাদের সময় বরের হাতে একটি তীর দিয়ে,

বলবেন, এখন থেকে কনের মাংস (দেহ) ভোগ করার অধিকার তোমার থাকবে কিন্তু অস্থি বা হাড় নয়। কনের মৃত্যুর পর তা ফেরৎ দিতে হবে নতুবা এই তীর তোমার বুকে বিঁধবে! আরো আছে। বিয়ের অষ্ট মঙ্গলের দিন স্বামী সেই তীরটি নিয়ে এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়। নব বিবাহিত স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনেরা উপস্থিত থাকে। সকলের সামনে নোতুন বর তীরধনুক নিয়ে শিকারীর ভূমিকায় অভিনয় করবে। তিনবার তীর ছুড়বে। বধূ তা কুড়িয়ে এনে বরের কানে কানে বলবে কোনো একটি প্রাণীর নাম—পাখি কিংবা খরগোস। বর তখন বধূকে বলবে শিকারে যা ধরা পড়েছে সেটির মাংস তোমার, হাড় আমার।২৬ এই আনুষ্ঠানিক অভিনয়ের মধ্যে যে সব পটভূমি রচনা করা হয় তার উপকরণ যেমন তীরধনুক, প্রাণী জন্তু-জানোয়ার, এ সবই আরণ্যক জীবনের বোধিমনস্কতার পরিচায়ক।

তিন

পলাশী যুদ্ধে বাঙলা দেশের রাজা বদল হলো। বাঙালী জীবনের সুস্থিরতা নষ্ট হলো। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হলো। এতে প্রায় এককোটি মানুষের জীবনান্ত হলো। হেস্টিংস, জনশোর, কর্ণওয়ালিস এবং লর্ড ওয়েলেসলি প্রভৃতি গভর্ণর জেনারেল এলেন গেলেন। এঁরা রাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাকা করে, সাম্রাজ্যবাদনীতি জোরদার করে শাসনের নামে দুর্নীতির বন্যা বইয়ে দিলেন। এ সবের উত্তপ্ত স্পর্শ বাঙালীর ওপর পড়ল। ফলে আঘাতে আঘাতে সর্বব্যাপী এক ভাঙনের পালা সুরু হলো।

একদিন মুর্শিদাবাদের জনসমাজ যে অলসকৌতুকে রাজাবদলের পালা দেখছিলেন, সে এক অতি সুখের কামনায়। এতদিনে সে কৌতুক করুণরসে সিক্ত হয়েছে। অনুশোচনায় দগ্ধ হয়েছে সে জনসমাজ। কলুষ-কামনার প্রায়শ্চিত্ত সুরু হয়েছে। তাই বাঙলার স্থানে স্থানে বিদ্রোহ বিক্ষোভের কল্লোল ওঠে।

কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশে অকল্যাণ যতটা হবার তা হলো। পুঁজির প্রভাবে জমিদারি ক্রত হস্তান্তরিত হতে লাগল। এতে অনেকেই যারা বিলম্ভ হলো। পূর্বের জমিদারেরা—"maintained order,

settled disputes, administered justice, and punished crimes; they encouraged religion and rewarded piety; they fostered arts and were patrons of literature. But the iron hand of the new system brought ruin upon this hereditary aristocracy."২৭। কিন্তু নবীন ভূস্বামীদের অন্যায় অসাম্যের ফলে বাংলার কৃষকদের দুঃখের অবধি ছিল না। ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক প্রাচীন ভূস্বামিগণ সরে যেতে বাধ্য হওয়ায় সংস্কৃতির অংগনে বিপর্যয় নেমে এলো স্বাভাবিকভাবেই। তার ওপর নবীনবাবুদের জীবনচর্যা সুরু হয়েছে নগরভিত্তিক। কলকাতাকে কেন্দ্র করে স্থূল তরংগে গা ভাসিয়ে দিন উপভোগ করতে লাগলেন। "এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইযা, বুলবুলি লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ, বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত· ।"২৮ এঁরা পবি পার্শ্বের প্রতি ছিলেন উদাসীন। অথচ শহর কলকাতার কত কিনা ঘটছিল।

ইংরেজ কর্মচারিগণ বাঙলা শিখছে। শাসন ও আইনের কাজে দেশীয় ভাষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আইন ও শাসনবিধি বাঙলায় অনূদিত হতে আরম্ভ হয়েছে। হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতায় ভগবদ্‌গীতার ইংরেজী অনুবাদ হলো। কালিদাস আবিষ্কৃত হলেন। বিচারপতি জোনস্‌-এর উৎসাহে প্রাচ্যচর্চার কেন্দ্রভূমি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়েছে। হেস্টিংসের অর্থানুকূল্যে গড়ে উঠেছে মক্তব, মাদ্রাসা। গ্লাডউইন, হলহেড, চার্লসউইলকিনস প্রভৃতি ইউরোপীয পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষার চর্চা সুরু করেছেন। অর্থাৎ "ইংরেজ জমিয়ে বসেছে কলকাতায়, গড়ে তুলেছে ভূগর্ভস্থিত আজব এক দুর্গ। আইন শৃঙ্খলা নূতনভাবে প্রবর্তিত হয়েছে। ইংরেজ জানিয়ে দিয়েছে যে আইনের সাম্রাজ্য তারা করবেন।"২৯

সাহিত্যে কিন্তু এ সবের কোনো স্পষ্ট প্রভাব পড়ল না। "সাহিত্যে তখন 'গানের যুগ'—কবি, টপ্পা, যাত্রা, পাঁচালি, চপ, কীর্তন, ভক্তিগীত আর প্রেমগীতির একাধিপত্য।"৩০ তবুও ভালো কবিওয়ালারা সাহিত্যের ইতিহাসে অতীত-বর্তমানের ক্ষেত্রে একটি যোগসূত্র রক্ষা করে চলেছিলেন।৩১ কিন্তু এই চর্চার যাঁরা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তাঁরা বিত্তস্ফীত ধনিক সমাজ। তাই নিঃস্ব প্রজার রুদ্ধ সংগীত শোনার আগ্রহ ও রুচি তাদের ছিল না। ফলে "সবই যেন চলচ্চিত্রের ছায়াসঞ্চারী মূক ঘটনার মত নিঃশব্দে বহিয়া গেল।"৩২

চার

রাঙালীর মানস বিবর্তনের সন্ধি পর্বে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংগে বাঙালীর নব পরিচয় হতে লাগল। পাশ্চাত্য চিন্তা জগতের নবলব্ধ জ্ঞান এদেশীয়দের ধর্ম, সমাজসংস্কৃতি এমনকি রাজনীতির ক্ষেত্রে নোতুন করে ভাবনার পথ উন্মুক্ত করল। সর্বত্রই এক রূপান্তর ঘটে যায়।

বাঙলাদেশের জনবিক্ষোভ, বিদ্রোহের কারণ, বাঙালীর জীবন সংস্কৃতি নিয়ে ভারতে বসে ইংরেজ। বলা ভালো, ইংরেজ এসব কূট-কুশলতা নিয়ে দেখলেন। জন পরিপালকের ব্যাপকতর ভূমিকা নিলেন। যে রীতিনীতি বাঙালী জনগোষ্ঠীকে আঘাত দিতে পারে, সে সম্পর্কে সাবধানী হলেন। শাসনের ক্ষেত্রে ঢালাও শোষণ অন্তর্ঘোড়কে রূপ নিল। অনেকক্ষেত্রে সুযোগ সুবিধে দেবার চেষ্টা চলল। তাঁরা বাঙালীর জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে আরো কুতূহলী হলেন।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ইংরেজদের যে শিক্ষা দিয়েছিল, তাতে পরবর্তী শাসকগণ সজাগ ও সতর্ক হয়েছিলেন। উত্তরবংগের ওপর তাঁরা আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। শোষণ এবার শাসনের নবতররূপে আরো গভীর ও ব্যাপকতর হয়ে নোতুন যুগের অনঙ্গ সূচনা করল। উনিশ শতকের পটভূমি সেই বিষম কালযন্ত্রণাকে ধারণ করল অগ্নিমন্ত্রে।

পাদটীকা

১. বাঙলা ১১৭২ সালে, ইংরাজী ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগষ্ট ; কোম্পানী দেওয়ানি লাভ করেন। ইংরেজের রাজনৈতিক জয়যাত্রা সেই হলো সুরু। কবিতাটির জন্য দ্রষ্টব্য অক্ষয় কুমার মৈত্রের সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্র, দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৮৯৯। পৃ. ৯৭

২. W. W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, Calcutta

তুলনীয়, "ছিয়াত্তর বাংলাকে শ্মশান করেছে, বাঙালীকে বিদ্রোহী করেছে, ডাকাত বানিয়েছে, পলাতক সাজিয়েছে। ছিয়াত্তরের পর প্রায় বাঙলায় নতুন বিন্যাস, নবতর বিধিবিধান। পরবর্তী চল্লিশ বছরের বাংলার শরীর, মন, এবং ভাবের জগতের নানা পরিবর্তন।" দ্র. শ্রীপান্থ, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (প্রবন্ধ) শারদীয়া আনন্দবাজার,

৩. সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, ১৩৬১, পৃ ৮৩

৪. দুর্ভিক্ষে বীরভূমের মর্মান্তিক অবস্থা। ১৭৬৫তে যেখানে ৬০০০ গ্রাম ছিল ১৭৭১-৭২ খ্রীস্টাব্দে কমে দাঁড়াল ৪৫০০-তে। চাষের সমস্ত জমিই জংগলে পরিপূর্ণ ছিল। সমসাময়িক একটি সংবাদ পত্রে বিবরণ দেওয়া হয়েছে যে, একদল সিপাহী ১২০ মাইল কোনোক্রমে হেঁটে গহীন অরণ্য ও বুনো জীবজন্তু থেকে রক্ষা পেয়েছে। চাষের জমি সৃষ্ট হয়েছে বটে কিন্তু তা এতই সংকীর্ণ যে দুটি তাঁবু ফেলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দ্র, L. S. S. O' Malley, *District Gazetteers, Birbhum*, 1910, P. 17

৫. প্রমথনাথ মল্লিক, কলিকাতার কথা, মধ্যকাণ্ড, ১৩৪২, পৃ. ১১

৬. তদেব, পৃ. ২০

৭. তদেব, পৃ. ২২

লক্ষণীয়, হেস্টিংসের ইজারানীতিতে জমিদারগণের যে অপকার হলো তা থেকে অব্যাহতি পেতেই তাঁরা বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এ বিদ্রোহকে কোম্পানীর কর্মচারিগণ সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলে উড়িয়ে দিলেও কাগজে কলমে অনুরূপ আছে। তদেব, পৃ. ২২

৮. তদেব, পৃ. ২২

৯. দ্র, কলিকাতার কথা, মধ্যকাণ্ড, পৃ. ১৬

১০. নিখিল নাথ রায়, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, ১৩১০, পৃ. ৪২২

১১. তদেব, পৃ. ৪২২। এবং সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, পৃ. ৮৮

১২. নিখিল নাথ রায়, তদেব, পৃ. ৪৩৫

১৩. কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর রচনা। দ্র. কলিকাতার কথা, পৃ. ১৪

১৪. ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা, পৃ. ৮৯

১৫. মল্লিক, তদেব, পৃ. ১১

১৬. রায়, তদেব, পৃ. ৪০৯

১৭. ড. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড. ১৯৪৩, পৃ. ৩৬০

১৮. Dr. Jadu Nath Sarkar, edi, *History of Bengal*, Vol 2, 1948 Pp 468-469

১৯. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বাংলাসাহিত্যের নবযুগ,

২০. কালিদাস রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ও গান,

২১. প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত গিরিশ রচনা সম্ভার,

২২. কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৫, পৃ. ২১৪-২১৫

২৩. নাটকটি কলিকাতার বিখ্যাত যাত্রাদল কর্তৃক বহু রজনী অভিনীত হয়েছে, বিশেষ করে ১৩৮৫-৮৬ সালে। নাটকটি জনসাধারণের মধ্যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল।

২৪. ড. ক্ষেত্রগুপ্ত, বঙ্কিম উপন্যাসের শিল্পরীতি.

২৫. "বন্দেমাতরম্ সংগীতে যে স্বদেশমন্ত্র উদ্গীত হয়েছে, অরবিন্দের ভাষায় যে 'religion of patriotism', বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর মুখ্য উপজীব্য, তারই উদ্দীপক শিল্পরূপ 'আনন্দমঠ'। আর, একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে, বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসের কাহিনী অতীতাশ্রয়ী হলেও তাঁর ঋষিদৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে সম্প্রসারিত। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য যে সন্তান সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন তা অতীত সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের ঐতিহাসিক কাহিনীর উপরই নির্ভর করে পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু 'আনন্দমঠ'-ই তাঁর বক্তব্য শেষ হয়নি। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের কাহিনী নির্ভর তাঁর দ্বিতীয় সৃষ্টি 'দেবী চৌধুরাণী'।"

দ্বিতীয় ভাগ

উনিশশতকের বিদ্রোহচিত্র

"Look to the East, where Ganges' swarthy race
Shall shake your tyrant empire to its base ;
Lo ! there Rebellion rears her ghastly head,
And glares the Nemesis of Native dead ;
Till Indus rolls a deep purpureal flood
And claims his long arrear of northern blood.
So may ye perish !..., when she gave
Your free-born rights, fordade ye to enslave."

Lord Byron, The Curse Of Minerva,

"বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে—
তব পুণ্য চেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস
এই জানে সবে ॥

অয়ি ইতিবৃত্ত কথা, ক্ষান্ত করো মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ী,
তোমার লিখন—'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবাজি উৎসব

কথামুখ

ব্রিটিশ পুঁজির উদ্যোগ-প্রসার ভারতের সমাজ-অংগনে নিষ্ঠুর অভিঘাত বয়ে আনে। এতেই ভারতীয় সমাজ নিদারুণভাবে ভাঙলো। কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে সাধারণ কৃষক প্রজার অনন্তর দুঃখের দিন স্থায়ী করলেন। আর এতে প্রতিক্রিয়াশীল ঔপনিবেশিক চরিত্র স্বার্থের কথা-ই ভেবেছে। "it was absolutely necessary to establish a social basis for their power through the creation of a new class whose interests, through receiving a subsidiary share in the spoils (one-eleventh, in the original intention), would be bound up with the maintenance of English rule."১

আমাদের কাছে এটি নির্মম মনে হলে-ও শ্বেত পুরুষরা কিন্তু ঐতিহাসিক সার্থকতা অন্বেষণ করেছেন এতে। তাই বেন্টিঙ্কের অভিব্যক্তিতে মেলে সুসংজ্ঞক ব্যঞ্জনা। "If security was wanting against extensive popular tumult or revolution, I should say that the Permanent Settlement, though a failure in many other respects and in most important essentials, has this great advantage at least, of having created a vast body of rich landed proprietors deeply interested in the continuance of the Bitish Dominion and having complete command over the mass of the people."২

বলাবাহুল্য, নব্যসামন্ত শ্রেণী উদ্ভবে লাভ হলো ইংরেজদেরই। চিত্ত ও বিত্তের কৌলীন্য যাঁদের সংস্পর্শে ক্রমবর্ধিত হয়েছিল; তাঁদের প্রতি এসব সামন্ত প্রভুরা কৃতজ্ঞ চিত্তেই তাকিয়েছিলেন। এঁদের দৃষ্টি ইংরেজ রাজের প্রতি ছিল উদার—তাই তাঁরা ইংরেজ শাসনের অংশগানে মুখর

হবে ; এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। অবশ্য. চিত্ত ও বিত্তের সীমারভির মধ্যে কোনো কোনো সামন্তপ্রভু যে একেবারেই ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করেননি ; তা নয়। তবে তার সংখ্যা যেমনই হোক না কেন, এটা মনে রাখা ভালো জমিদার নামে পুরুষানুক্রমিক মালিকানা যাঁদের সৃষ্টি, তাঁদের প্রতি এদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ জমিদারদের নরম দৃষ্টি, চিত্তপ্রবণতা শ্বেতপুরুষদের ধন ও রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষাকে দুর্বার করে তোলে। তাই মানতেই হয়, বেন্টিঙ্কের তত্ত্বগত উপলব্ধি অমূলক ছিল না।

আরো আছে। ইংরেজ খাজনা আদায়ের নিমিত্তে জমিদার সৃষ্টি করলেন। আবার জমিদার খাজনা ও তার সংগে বাড়তি মুনাফা লাভের জন্ত পত্তনিদার, দরপত্তনিদার সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ—আদায় অব্যাহত থাকলে দু'তরফেই উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ ব্যবস্থা। এই প্রজাবিলি ব্যবস্থার মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্ম হলো বটে কিন্তু এর কুফল সাধারণ রায়তের উপর পড়লো নির্দয়ভাবে।

কাজেই একথা স্পষ্ট, জমি দিয়ে এসেছে মানুষের ভাগ্যের উত্থান পতন। তবু-ও বলার থাকে। ভারতের অর্থনৈতিক জীবন-প্রচ্ছদে শেষ অভিঘাত এলো ব্রিটিশের নির্মম শিল্প পুঁজিবাদে।

কর্ণওয়ালিসের ব্যবস্থাপত্রে যে বিজ্ঞান ভিত্তিক শোষণবাদ ('Scientific exploitation') ছিল তার যাথার্থ্য ধরা পড়ে প্রায় সংগে সংগেই। তাই ভাঙাগড়ার দিনে শ্বেত প্রশাসকগণ "prepared the way for the new stage of exploitation by industrial capital, which was to work for deeper havoc on the whole economic of India than the previous haphazard plunder."৩

তাই বলা যায়, আঠারো শতকের মধ্যপাদ থেকে উনিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত ইংরেজদের পুঁজির—দিগঙ্গনে দুটি নির্মম বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হবে ১. বাণিজ্যিক পুঁজি বা 'Mercantile capital' শিল্পপুঁজি বা 'Industrial capital'। কথা হলো এই : পুঁজি বিনিয়োগ ব্যবস্থা যাই-ই হোক না কেন, ইংরেজদের এই দ্বিবিধ নীতির পুষ্টি, স্ফীতি ও অগ্রগমনে ভারতের অর্থনীতি অনিবার্য ভাবেই ভাঙলো।

॥ ১ ॥

আবার এই পুঁজিকে কেন্দ্র করেই আমাদের দেশের প্রবক্তাদের কল্পনা মত্ত প্রকর্ষ! তাঁরা ইংল্যাণ্ডের শিল্প বিপ্লব ও রাজনৈতিক আন্দোলন চর্চা করে রায় দিলেন, এদেশের কৃষি ও বাণিজ্যে ব্রিটিশ মূলধনের ব্যাপক উদ্যোগের প্রয়োজন। ইউরোপের লোক এখানে বেশি সংখ্যায় আসার ও প্রয়োজন। এর জন্য তাঁরা দরবার করলেন। এখানে উল্লেখ্য, এর উদ্যোক্তাদের অন্যতম হলেন রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর। ইংরেজ অস্তিত্বের ইতিবাচক দিক লক্ষ করেছেন তাঁরা। তাই রামমোহন রাজসিক-উল্লাসে বলতে পারলেন: "I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literacy, social and political affairs, a fact which can be easily proved by comparing the conditions of those of my countrymen who have enjoyed this advantage with that of those who unfortunately have not had that opportunity; and a fact which I could, to the best of my belief, declare, on solemn oath before any assembly."৪

এরকম মতবাদের বিরুদ্ধে সেদিনের সংবাদ পত্রে একাধিক প্রতিবাদ-লিপি প্রকাশিত হয়। 'সমাচার দর্পণ' ও 'বঙ্গদূত'-এ এসবের সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। জনৈক জমিদারের লেখা ২ জানুয়ারি, ১৮৩০। ২০ পৌষ, ১২৩৬ তারিখের একটি চিঠির অংশ বিশেষ:

"এদেশে যে প্রকারে কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্ম চলিতেছে ইহা এদেশীয়ের পক্ষে পরম মঙ্গল তাহার অন্যথা হইলে মহাদুঃখ হইবেক তাহার এক সাধারণ প্রমাণ দেখাই এ দেশের দীন দরিদ্রের স্ত্রী সকল চরকার সূতা কাটিয়া কালযাপন করিত বিলাত হইতে শিল্পযন্ত্র নির্ম্মিত সূতার আমদানী হওয়াতে তাহার দিগের অন্নাভাব হইয়াছে অতএব বিবেচনা কর শি [illegible] যাহারা বিলাতে থাকিয়া এদেশের লোকের অন্ন কাড়িয়া লইতেছে তাহারা এদেশে আইলে কি রক্ষা আছে।"৫

আরেকটি। ৯ জানুয়ারি, ১৮৩০। ২৭ পৌষ, ১২৩৬

"ইঙ্গরেজ লোক আসিয়া এদেশে ভূমির উপর ভূরিরূপে বসতিকরত কৃষিকর্ম্ম ও শিল্পকর্ম্মাদি নানাপ্রকার ব্যবসায় করিবেন ইহাতে কাহারং বিবেচনা হইয়াছে যে সাধারণের ঐশ্বর্য্য ও সুখবৃদ্ধি হইবেক এ আশা দুরাশামাত্র যেহেতুক তাঁহারদিগের শিল্পবিদ্যাদির ব্যবসায় দ্বারা এ দেশের লোকের বর্ত্তমানকালে যে দুরবস্থা হইয়াছে তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে জমীদারী বা তালুকদারীর সুখ ঐশ্বর্য্যতদেশের অবস্থাই দৃষ্টান্ত আছে ।"৬

বলাবাহুল্য, কিছু-কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ-প্রতিকূলতা শ্বেত প্রশাসকদের কর্ণ-গোচর হলো না। তাই ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ১৮০৩ এর চার্টার ভারতের বুকে অবাধ বাণিজ্যের উৎসার ঘটালো।

অথচ ইংলণ্ডে ভিক্টোরীয় যুগে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে। 'রিফর্ম এ্যাক্টে' (১৮৩২) মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ক্ষমতা হাতে পেলেও দরিদ্র বঞ্চিত মানুষের মনে তখন পুঞ্জীভূত অসন্তোষ। সক্রিয় রাজনীতি তারাও চেয়েছে। সাধারণ মানুষ তাদের অধিকার দাবি করল। সুরু হলো চার্টিস্ট আন্দোলন (১৮৩৮)। মানবাধিকারের জোর লড়াই। আমাদের দেশের সংগে সে দেশের তফাৎ অনেকখানি। ভিক্টোরীয় যুগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির যুগ। শিল্প বিপ্লবের সুফল ফলতে শুরু হয়েছে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে। বাহ্যিক সভ্যতার বৈভব বেড়ে যায় কিন্তু মানবমনআত্মা রিক্ত হয়ে ওঠে, সংস্কৃতি হয় বিপন্ন। সাহিত্যে স্বভাবত-ই এর প্রতিফলন দেখা গেল।

কিন্তু আমাদের দেশে তখন চলছে অর্থনৈতিক অবক্ষয়। সাম্রাজ্যবাদ নীতির তির্যক প্রতিক্রিয়া সুরু করছে আঠারো শতকের মধ্য পাদেই। ফলে ভারতের সর্বতো ভাঙন পরিলক্ষিত হলো। উনিশ শতকের মুৎসুদ্দি-গিরির জীবন প্রবাহ অবশ্য এখানে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিগত, কিন্তু রাজনৈতিক অধিকার তাঁদের দূরায়ত্ত। এই পর্বে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজের ইতিবাচক প্রসারে সবাই না হলেও অনেকেই এতই নিশ্চিত ছিলেন যার ফলে যে কোনো বিদ্রোহ বিপ্লবকেই এ'রা ভীতির চোখে দেখেছেন। স্বার্থ ক্ষুন্ন হোক এ তাঁরা চাইতেন না। তাই এ হেন পটভূমিতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবী মহল ছোটোখাটো বিদ্রোহকে বাদ দিলেও সাঁওতাল, সিপাহীবিদ্রোহের প্রতি উদাসীন থেকেছেন। নেতৃত্বতো দূরের কথা!

অন্যদিকে সাধারণ প্রজামাত্রেই জমিদার শ্রেণীর নির্মম প্রকোপ ও ইংরেজের শোষণ হতে অব্যাহতি চেয়েছে। কিন্তু অব্যাহতি সহজে মেলার কথা নয়। বাঁচার তাগিদ ও জীবনসূত্র জড়িয়ে আছে জমিতেই। তাই কৃষক প্রজা পীড়ন তাড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছে। কিন্তু বিবাদের আসরে নেমে তারা জেনেছে, সাহেব রাজা এই সব জমিদারদের মৌল প্রেরণাও ভরসা। তাই বিদ্রোহী জনমানস দুর্দশার মূলধরেই নাড়া দেবার চেষ্টা করেছে। অবশ্যই এসব ছিল নিতান্তই স্থানিক। তবু-ও এর মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর চেতনা দুর্লক্ষ্য নয়। অথচ এই চেতনা যদি জাতীয় চেতনায় উন্নীত হতে পারতো তা হলে ইতিহাসের গতি ভিন্নপথে বাঁক নিতো। অথচ কৃষক জনসমাজের অসন্তোষ প্রায় সর্বত্রই একভূমিক। অবশ্য শ্রেণীচেতনার মধ্যে দেশ চেতনার কোনো ঘাটতি ছিল না। তবু-ও তারা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু তারা যে সংগ্রামী চেতনা ও দুর্মর ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ করল; তার সাধারণীকরণ ইতিহাস বিরোধী। সুতরাং সেই লক্ষ্যেই পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উনিশ শতকের বাঙলার বিদ্রোহী মানসের পরিচয় নিতে চেষ্টা করব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে।

॥ ২ ॥

প্রসংগ থাকে নবযুগের কথা। "আধুনিক ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দী একটি সুবর্ণ যুগ। পরাধীন ভারতবর্ষের পক্ষেও ইহা কম গৌরবের ছিলনা। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির সংঘাতে এদেশে এক নবযুগের সূচনা হয় এবং সমগ্র শতাব্দী ধরিয়া ইহার রূপায়ণ চলিতে থাকে।"৭

কিন্তু উনিশশতক যে ভাবধারাকে আশ্রয় করে নোতুন যুগের সূচনা করল, তার সাড়ম্বর যাত্রা উনিশ শতকের গোড়াতেই প্রকটিত হয়েছে। এই ভাবধারার যুগমতা সম্পর্কে ডক্টর জীবেন্দ্র সিংহরায়ের ভাষিক-আভাসটি হলো এই; "উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভাবধারাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—রেভিলিউসান্, কাউণ্টার-রেভিলিউসান্ ও রিফরমেসান্। এই তিনে মিলে বাঙলার আকাশে বাতাসে এক বিরাট পরিবর্তনের ঝড়ো হাওয়া যে সৃষ্টি করেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।"৮

এখানে নবযুগের লক্ষণ নিয়ে কিছু বলা যেতে পারে। তা হলো বাঙালীর সংস্কৃতি অধিমানসের বিচিত্র বিবর্তন। সে আরেক ইতিহাস। স্বতন্ত্র একটি অধ্যায়ে সে প্রসংগ-ও আলোচিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

নায়েক বিদ্রোহ

(১৮০৬-১৮১৬)

ক. *ইতিহাস পর্ব*

১, *রাজা ছত্র সিংহের নরমনীতি*

২. *সেনাপতি অচলসিংহের বিদ্রোহ-উদ্যম*

খ. *সাহিত্য পর্ব*

ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ শালফুল

৫ ॥ অধ্যায় ঃ নায়েক ।বক্সে।

ক ইতিহাস পর্ব

ক্রিয়ামাত্রেই প্রতিক্রিয়া আছে। ইংরেজ শাসকগণ কর্তৃক জংগল মহালের পাইক ও ভূমিজশ্রেণীর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করার যে ফল হয়েছিল তার তাত্ত্বিক দিক আমরা জেনেছি। এখানে আমরা দেখবো, ঐ ভূমিজ-শ্রেণীর সমগোত্রীয় নায়েকদের জায়গীর-জমি বাজেয়াপ্ত ক্রিয়ার বিরুদ্ধে; জীবন-সম্ভব মানবিকতার রক্ষাকর্মে, মেদিনীপুর উত্তরাংশে বগড়ী অঞ্চলে কিভাবে নায়েকদের বিদ্রোহ প্রতিক্রিয়া সুরু হলো। আমরা সেই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ উপলব্ধিতে তৎপর হবো।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মেদিনীপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে আঘাত ও অধিকার করলেও এতদিন নায়েক অধ্যুষিত বগড়ী ছিল অনায়ত্ত। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে বগড়ীর ওপর ইংরেজের লোলুপ দৃষ্টি ও মর্মান্তিক আঘাত সুরু হয়। অবশ্য প্রত্যাঘাতের পালাও সুরু হয় ক্রুতান্বিত। কিন্তু আঘাত-প্রত্যাঘাতের অসম পালায় নায়েকদের বৈফল্য এলো। তবুও সংঘাত সমরের জের চলেছিল একটানা, প্রায় ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।

১. রাজা ছত্রসিংহের নরমনীতি...

বগড়ীর রাজা ছত্রসিংহ। তাঁর জমিদারী কেড়ে নিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। তাঁর সমস্ত জমিই বাজেয়াপ্ত করা হলো। এতে নায়েকগণ জীবনভূমি থেকে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে মৃত্যুর ভাব-উৎসে দাঁড়ালেন। ছত্রসিংহের রাজ্য হতে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার পেছনে একটু গূঢ়তত্ত্ব আছে। তা হলো এই। মোঘল শাসন প্রায় অপসৃত। গড়বেতার অধিপতি তখন যাদবচন্দ্র। ইংরেজ

তখন জাঁকিয়ে বসতে সবে সুরু করেছে। ইংরেজদের গ্রাসনীতিতে বগড়ী-ও পড়লো। অতএব রাজার কাছে কর চাওয়া হলো। নির্বিবাদী যাদবচন্দ্র ইংরেজ যাচিত কর দিতে আপত্তি করলেন না। রাজা ইংরেজের নির্দেশ মতই বর্ধমান রাজার হাতে দেয় কর তুলে দিলেন।১

কথিত আছে। রাজ্যের বার্ষিক কর নির্দ্ধারণের জন্য কয়েকজন ইংরেজ কর্মচারী প্রেরিত হয়েছিলেন নায়েক অঞ্চল বগড়ীতে। কিন্তু এঁদের দুই একজন যাদবচন্দ্রের শত্রুপক্ষীয় লোকের ষড়যন্ত্রে নিহত হলেন। ফলকথা, কোম্পানীর সৈন্যসামন্ত রাজপ্রাসাদে হানা দেয়। যাদবচন্দ্র বন্দী হয়ে কলকাতায় আনীত হলেন রাজচক্রান্তের দায়ে। অপমানে আহত রাজা আত্মঘাতী হলেন ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে।২

এরপর যাদবচন্দ্রের পুত্র ছত্রসিংহ দশশালা বন্দোবস্তের নিয়ম মেনে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হলেন। পিতার রাজ্যপাট ফিরে পেলেন বটে। কিন্তু রাখতে পারলেন না। ছত্রসিংহ সময়মতো কোম্পানীর নির্দিষ্ট রাজস্ব দিতে না পারায় রাজ্যচ্যুত হলেন। শাসকগণ সমগ্র বগড়ী করপুটে রেখে মাত্র বার্ষিক ছ'হাজার টাকা আয়প্রদ কয়েকটি মৌজার জমিদারী স্বত্ব দিলেন; এবং বগড়ীর বাকি অংশের জমিদারী স্বত্ব অন্যান্য ব্যক্তির সংগে বন্দোবস্ত করলেন।৩

দেওয়াতো নয় অনুকম্পা মাত্র। রাজা দেখলেন, সব হারানোর থেকে কিছুত রইলো। এতেই তাঁর সন্তুষ্টি। কিন্তু এই অবমাননা প্রজাদের প্রাণে লাগে। মানবতার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দয়া প্রদর্শন তাদের আত্মা-ভিমানে লাগে। বোধকরি, জাত্যভিমানে-ও। ফলে মুক্তিকাম অন্তরের আদর্শিক পথ পরিক্রমা সুরু হলো।

কারণের মধ্যে আরো আছে। বৃহৎ ভূখণ্ড থেকে বিচ্যুত রাজার পক্ষে ইংরেজ অনুগ্রহ নিয়ে সীমায়িত ভূখণ্ডে সকল প্রজার জন্য সাধ্যায়িত সুখ বিতরণ সম্ভব নয়। তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। অতএব, নায়কদের বিদ্রোহী হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিকতার কারণটিও দুর্লক্ষ্য নয়।

২. সেনাপতি অচলসিংহের বিদ্রোহ-উদ্যম...

ঘটনা বিদ্রোহ। সুরু হলো-ও তা। বিদ্রোহীদের পুরোভাগে দাঁড়ালেন বগড়ী রাজের সামরিক সেনাপতি অচলসিংহ। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বিদ্রোহ-অগ্নি বগড়ীর অরণ্যভূমি স্পর্শ করলো। নিবিড় শালবনের মধ্যে বিদ্রোহী-বাহিনী আশ্রয় গ্রহণ করে "বগড়ীর কেন্দ্র হইতে প্রান্ত স্থল পর্য্যন্ত ভীষণ বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করে এবং ইংরেজাধিকৃত বগড়ী পরগণার পার্শ্ববর্ত্তী যাবতীয় জনপদে আপতিত হইয়া ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বজাতীয় নরনারীর সর্ব্ব-নাশ সাধন করিতে থাকে। নাএকগণের দারুণ অত্যাচারে হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার সুবিস্তীর্ণ জনপদ কাঁপিয়া উঠে।"৪ এখানে উল্লেখ্য, নায়েকগণ আক্রমণের ব্যূহ রচনা করতেন অভিনব কৌশলে।৫ ফলে ইংরেজশাসকগণ নায়েকদের মুক্তপ্রাণের স্পন্দনে নাজেহাল হতে লাগলেন প্রতিক্ষেত্রেই।

বিদ্রোহের ভাবতরংগ এত বেশি বিস্তৃত হলো এবং ইংরেজশাসকগণ এতে এমনই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন যে, গভর্ণরজেনারেল ওকেলি নামে এক ইংরেজ সেনাপতিকে নায়েক বিদ্রোহ দমনে আদেশ দিলেন। গনগনির অরণ্যে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা সুরু হলো। গভীর অরণ্যে আড়াল কৌশলের এক উৎকট হল্লায় বিস্ফুর্ত নায়েকদের সংগে পেরে ওঠা ইংরেজের পক্ষে সম্ভব হলো না। তাই 'মারি অরি পারি যে প্রকারে' সেনাপতি হিংস্র, উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। একদিন রাত্রে ইংরেজ সেনাপতি কামানের গোলাবর্ষণে শান্ত বনস্থলীকে বিধ্বস্ত করলেন। হঠাৎ একটানা গোলাবর্ষণে "অনেকেই প্রাণ হারাইল। যাহারা বাঁচিয়া থাকিল তাহারা সে অনলের সম্মুখীন হইতে না পারিয়া যে যেদিকে পারিল পলাইল। ইংরাজ সৈন্য সে রাত্রে নায়েকদিগের সমস্ত আড্ডা-গুলি ধ্বংস করিয়া দিলেন। পরদিন বৃক্ষশাখায়, বনান্তরালে ও নদী-পুলিনে অনুসন্ধানপূর্ব্বক বহুসংখ্যক নাএক নরনারীকে হত, আহত ও বন্দী করা হইল। কিন্তু অচলসিংহের কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা।"৬

অচলসিংহের দ্রোহাত্মক মনোভাব। এক্ষেত্রে সে উদ্ধত, অবিনীত। তিনি নব উদ্যমে আবার সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। ক্রমান্বিত তাঁর প্রয়াস। আত্মসন্তোপলব্ধির প্রয়াসও কম নয়। বলিষ্ঠ উদ্যোগে শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন তিনি। উদ্দীপনার যে জ্বলদর্চি শিখা তাঁর মধ্যে

স্ফুরিত হয়েছে তা নেভার নয়, দমিত হবারও নয়। তিনি অনেক শ্রম উৎসর্গ করলেন। নোতুন করে শক্তি সঞ্চয় করলেন। মারাঠা, রাজপুত সৈন্য তাঁর দলে যোগ দিল। এদের অনেকেরই ইংরেজ শত্রু। তাই তারা প্রতিশোধের সুযোগ নিতে চেষ্টা করল অচল সিংহের দলে ভিড় জমিয়ে।৭

অচলসিংহের বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজাধিকৃত পল্লীসমূহের ওপর আঘাত হানলো এবং অসহযোগী ধনীদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিতে থাকে।৮ অপরদিকে ইংরেজ সৈন্য বিদ্রোহী নায়েকসিংহের সন্ধান করল মরিয়া হয়ে। অথচ কোম্পানীর শাসকগণ যখন নায়েকদের দমনার্থে ব্যর্থ হচ্ছিল এবং অচলসিংহের পরাক্রমে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠছিল, ঠিক তখনই "হতভাগ্য ছত্রসিংহ ইংরেজের হিতসাধন করিয়া প্রনষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার মানসে, বিবিধ উপায়ে অচলসিংহকে বন্দীকৃত করিয়া ইংরেজসৈন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আচরণে সংক্ষুব্ধ হইয়া নাএকবীর অচলসিংহ তাঁহার মস্তকে যে অভিসম্পাতবর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহা বিফল হয় নাই।"৯

অনুগ্রহ লাভের প্রতপ্তআকাঙ্ক্ষায়, অতৃপ্তির দহন হতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে, স্বার্থের ফন্দিফিকিরে নৈতিক প্রকর্ষকে জলাঞ্জলি দিয়ে যে বিশ্বাসঘাতকতা তিনি করলেন; তা অতুলনীয়। বাঁচার তাগিদে তাঁর জরুরী সূত্রটিতে কিন্তু ঈপ্সিত সাফল্য এলো না। ইনিও কারারুদ্ধ হলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হলো। সুতরাং বগড়ী রাজ্য ফিরে পাওয়ার স্বপ্নভংগ হলো তাঁর। অবশ্য শাস্তি প্রকরণে দশ বৎসর কারা যন্ত্রণা ভোগ করার পর তিনি বার্ষিক ছ'-হাজার টাকার বৃত্তিভোগী হয়েছিলেন।১০

অচলসিংহ ও তাঁর সহযোগীদের ফাঁসি হলো। তবুও নায়েকদের বিদ্রোহ সেই মুহূর্তেই থেমে গেলনা। এর উত্তপ্ত প্রবাহ চলেছিল ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত।* এর মধ্যে বহুখণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেছে। দুই পক্ষের-ও বহু সৈন্য হতাহত হয়েছে। কিন্তু ১৮১৬তেই নায়েকগণ ইংরেজের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এ সময় নায়েকদের দুর্ধর্ষ ঘাঁটিগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। দুশত বিদ্রোহীকে হত্যা করা হলো। ফলকথা, নায়েকদের সংগ্রামী মানসের ব্যর্থতার [illegible] রচিত হলো সেই নিষ্ঠুর পর্যায়ে।

যে দেশ ভাবনা ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক মহতী চেষ্টা নিয়ে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে সহায় সম্বলহীন একদল মানুষ লড়াইয়ে নেমেছিলেন, কিংবা বলা যেতে পারে, যে কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন সুরু করেছিলেন তা বাস্তবপক্ষে, কোনোভাবে সংবর্ধিত ও রূপায়িত না হলে-ও বাঙলার বিদ্রোহী মানসের বলিষ্ঠ দেশভাবনা আমাদের উপলব্ধিকে সঞ্জীবিত করে, উজ্জীবিত করে।

খ. সাহিত্য পর্ব

ঐতিহাসিক উপন্যাস ঃ শালফুল...

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'শালফুল' উপন্যাসখানি একটি বিশেষ সংযোজন। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। সগড়ীর নায়েক বিদ্রোহের তরংগপ্রবাহ এতে মেলে। উপন্যাসটির লেখক[১১] প্রবোধ চন্দ্র সরকার। বাঁকুড়ার 'মুখার্জী প্রেসে' রাজারাম ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছিল ; ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (ডিসেম্বর, ১৮৯৭)। এর মূল্য নির্ধারিত ছিল বারো আনা। গ্রন্থকারের স্বত্ব সংরক্ষিত ছিল। উপন্যাসটি ত্রিশটি পরিচ্ছেদ শেষ হয়েছে। ভূমিকা, উৎসর্গপত্রাদি বাদে মূল উপন্যাসটি ১৬৬ পৃষ্ঠার।

লেখক উপন্যাসটির সূত্র নির্দেশে জানিয়েছেন, তিনি "এই "শালফুল" উপন্যাসের কোন কোন অংশ মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট মহাত্মা এচ্, এল, হেরিসন সাহেবের লিখিত ১৮৭২-৭৩ খৃঃ অব্দের বার্ষিক রিপোর্টের স্থল বিশেষ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে এবং ইহার কিয়দংশ জনশ্রুতিমূলক ও অধিকাংশ ঔপন্যাসিক।"[১২] লেখক ভূমিকায় জানিয়েছেন : "বহুবিধ কারণে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ ভারতবাসী জনগণের স্মরণীয় হইবে ; একদিকে কংগ্রেস সভায় কতিপয় ভারত সন্তানের রাজনৈতিক জল্পনায় মধুর কল্লোল, রাজভক্ত ভারতবাসিগণের হীরক জুবিলি উৎসবে আনন্দোচ্ছ্বাস ; অপরদিকে প্লেগ, প্লাবন, ভূকম্পন, দুর্ভিক্ষ, সীমান্তে সমরানল এবং সমস্ত ভারতব্যাপী রাজনৈতিক গগনের তমোময় ভীষণচিত্র, ভারত—ইতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠায় জলন্ত অক্ষরে চিত্রিত থাকিবে। সেই জুলাই মাসে, যখন বোম্বাই প্রদেশের

শালফুল।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস।)

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সরকার
প্রণীত ও প্রকাশিত।

বাঁকুড়া "মুখার্জী প্রেসে"
[illegible] ভট্টাচার্য্য দ্বারা
মুদ্রিত।

অগ্রহায়ণ, সন ১৩০৪।

মূল্য ৸০ আনা মাত্র

'শালফুল' গ্রন্থের আখ্যাপত্র

বিমল আকাশে হঠাৎ একখণ্ড কালোমেঘ সমুদ্ভূত হইয়া নিমেষ কাল মধ্যে গভীর গর্জনে সমস্ত ভারতাকাশ সমাচ্ছন্ন করিল; যখন ভারতের যাবতীয় কৃতী সন্তানগণ ভয়াকুলচিত্তে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; কে কবে বন্দীকৃত হইবে, কে কবে নির্ব্বাসিত হইবে, কবে কাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে কবে মুদ্রাযন্ত্র শাসন আইনবিধিবদ্ধ হইয়া দেশীয় লেখকমণ্ডলীর লেখনী সঞ্চালন বন্ধ করিবে; যখন এই সকল দুশ্চিন্তার প্রবল স্রোতে ভারতের যাবতীয় নরনারী ভাসমান হইলেন; যে চিন্তার হস্ত হইতে ভারতবাসী আজও নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন নাই; সেই বিঘোর দুর্দ্দিনে ক্ষুদ্র গ্রন্থকার এই ক্ষুদ্র "শালফুল" উপন্যাস মুদ্রিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিন্তু কালের গতি দেখিয়া ক্ষীণ প্রাণ বাঙ্গালী গ্রন্থকার অভিনব উপন্যাসের যে কয়েক স্থলে কথঞ্চিৎ রাজনৈতিক ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছিল এবং যে যে স্থলে সময়ানুরূপ কোমল ভাষা প্রযোজিত হয় নাই, সে সকল অংশের ভাব ও ভাষা পরিবর্ত্তিত ও সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় সৌরভবিহীন বনকুসুম "শালফুল" একটুকু বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য গ্রন্থকার অপরাধী।"১৩

এতে দুটি জিনিস পরিষ্কার। এক, লেখকের দেশ ভাবনা একটি বেদনার অন্তর্লীন ভাব-প্রবাহ সঞ্জাত। এই বেদনার কারণ পরাধীনতা। তাই লেখকের আন্তরিকতার স্পর্শ মেলে কাহিনী নির্বাচনে। এটি লেখকের অনুপম দেশাত্মবোধেরও পরিচায়ক বটে।

দুই, উপন্যাসে লেখক যে কথা যেমনটি বলতে চেয়েছেন, তা বলা সম্ভব হয়নি। দেশকাল বিবেচনা করেই বলা সম্ভব ছিল না। এরজন্য 'শালফুল' বিকৃত হয়েছে। লেখক এক্ষেত্রে অপরাধ স্বীকার করেন বটে।

অচলসিংহ ও ছত্রসিংহের কথোপকথনে ঔপন্যাসিক দুটি বিপরীত চরিত্র ও বি-সম ভাবধারার মানুষের আত্যন্তিক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে অচল সিংহের দেশপ্রেম, বীরোচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে। আমরা আগেই জেনেছি, রাজা ছত্র সিংহকে ইংরেজ শাসকগণ বগড়ী রাজ্যচ্যুত করে একটি জমিদারির স্বত্ব দিলেন। এই ব্যবস্থা রাজা ছত্রসিংহ মেনে নিলেও বগড়ী রাজ্যের নায়েকগণ মেনে নিতে পারলেন না। তারা বিদ্রোহী হলেন।

অচলসিংহ-ও নেতৃত্ব দিলেন। লেখক "শালকুল" উপন্যাসে সেই বিদ্রোহ তরংগের পূর্বাভাস দিলেন। উত্তরের কথামালার মধ্যে বিদ্রোহ চিত্রটি বোঝা যেতে পারে।

কথন-চিত্র১৪

রাজা=ছত্রসিংহ

সেনাপতি=অচলসিংহ

"রাজা। দেখ সেনাপতি, এই বিষম কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা কিছুই নাই, কেবল তোমার নিজের ও আমার মহা-অমঙ্গল ঘটিবে। এখনও সময় আছে, ক্ষান্ত হও।

*[সেনাপতি ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সুরু করলেন। ইংরেজের বগড়ী গ্রাস নীতিতে নায়েকগণ ক্ষুব্ধ, রুষ্ট। সে কারণেই তারা উত্তেজিত ও বিদ্রোহী। রাজার বিষয়টি পছন্দ নয়]

সেনাপতি। মহারাজ, আপনি জানেন, এ দাস অন্যায় দেখিতে পারেনা। অন্যায়ের চরণে অবনত হইতে সেনাপতি অচলসিংহ কখনও পারিবেনা। ন্যায় রক্ষার্থে যদি অমঙ্গল ঘটে তাহাও মঙ্গল মধ্যে পরিগণিত।

রাজা। সত্যবটে, কিন্তু দুর্বল হইয়া প্রবলের প্রতিকূলে প্রধাবিত হওয়া রাজনীতি বিরুদ্ধ। সাধ্যাতীত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা নিবুর্দ্ধিতার পরিচায়ক।

সেনাপতি। মহারাজ যে কার্য কতিপয় বৈদেশিক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ব হইবে, তাহা সহায় সম্পদ সম্পন্ন শতশত স্বদেশবাসীর সাধ্যাতীত বলিয়া কি প্রকারে বুঝিব। বলিতে কি, অত্যাচার আর সহ্য হয় না। ভাবিয়া দেখুন, মহারাজের যে রাজ্যপীঠ প্রবল প্রতাপ যবন সম্রাটগণের সুদীর্ঘ শাসনকালেও স্বাধীন ছিল, তাহা এক্ষণে কয়েকজন বিদেশীপণ্যজীবি কোথা হইতে আসিয়া বলে কাড়িয়া লইতে চাহে; ইহা কি মনুষ্য প্রাণে সহ্য হয়!

রাজা। অচলসিংহ, তুমি ইংরেজের বল বিক্রমনীতি সম্যক অনুধাবন করিতে পারিলে এরূপ কথা বলিতেনা।...... ইংরেজের সহিত শত্রুতাচরণ করিয়া ভারতে কেহই থাকিতে পারিবে না।

সেনাপতি। মহারাজ, কিন্তু তাহা ভাবিয়া ভারতের ভাবতীয় স্বাধীনচেতা সংসাহসী পুরুষ যদি নিশ্চেষ্ট থাকেন, তাহা হইলে জগতের ইতিহাস ভারতবাসীর কিরূপ কলঙ্ক কাহিনী পরিকীর্ত্তন করিবে, তাহাও একবার চিন্তা করুন।

রাজা। ক্ষণকাল মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বলিলেন,—অচলসিংহ তুমি, সংসার-প্রেমশূন্য একজন সৈনিক পুরুষ। তোমার হৃদয় মরুভূমি অপেক্ষাও বিশুষ্ক। সংসার সুখে তোমার আস্থা নাই, জীবনে তোমার মমতা নাই; কিন্তু আমি সংসার-প্রেমে আবদ্ধ। আমি স্ত্রী পুত্র লইয়া সতত শঙ্কিত চিত্তে দীনবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে পারিবনা। তুমি আমার আজ্ঞায়১ না হউক, আমার অনুরোধে এই বিষম কার্য্যে বিরত হও। তোমার যাহা কিছু অভাব থাকে আমি তাহা পূরণ করিব।

[সুখ মোহগ্রস্ত রাজার কাতরোক্তি। রাজার সুখানুভূতি এতোই তীব্র, প্রবল যে, এতটুকু সুযোগ হারাতে নারাজ তিনি। তাই রাজকণ্ঠে আদেশ ক্ষমতা হারিয়ে যায়, আর এই বিলয় থেকেই রাজকণ্ঠে ধ্বনিত হয় মিনতি।]

সেনাপতি। মহারাজ, বীর সম্সের জঙ্গ বাহাদুরের১৫ বংশধরের মুখে এরূপ কাপুরুষজনোচিত কথা শুনিতে হইবে জানিলে, সেনাপতি অচলসিংহ বহুদিন পূর্ব্বে এই অসি শীলাবতী সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া বগড়ী ত্যাগ করিত। মহারাজ ক্ষমা করিবেন, এ দাস এক্ষণে আপনবশে নাই। অচলসিংহ এক্ষণে রণোন্মত্ত সিংহ।"

উপন্যাসের চতুর্থ অধ্যায়ে নায়েক সর্দার অচলসিংহ ও জনৈক মথুরানাথের কথোপকথনের মধ্যে অচলসিংহের অন্তর-গহনে যে মর্মপীড়া ছিল তারই অভিপ্রকাশ ঘটে।

মেদিনীপুর নিবাসী মথুরানাথ, কন্যা কমলাকে শ্বশুরালয় বিষ্ণুপুর থেকে নিয়ে আপন আলয়ে চলেছেন। বন পথ। পথে একদল সশস্ত্র লোক তাদের ধরে আনে অচল সিংহের কাছে। অচলসিংহ তাদের ভরসা দিয়ে বলেন;১৬ "দেখ কায়স্থ মহাশয়," আমরা দস্যু নই। আমি নাএক অধীশ্বর। এই বন আমাদের রাজধানী, বনের নিকটস্থ সমস্ত জনপদ আমাদের রাজ্য,

১. আজ্ঞায়—আজ্ঞায়

আমরা রাজার ন্যায় কার্য্য করি। আমরা বলপূর্ব্বক পরস্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করি না।" মথুরানাথ জানতে চাইলেন তাদের আটক রাখার কারণ। অচলসিংহ জানালেন, তাদের বিচারের উদ্দেশ্য সামরিক বন্দী করা হয়েছে। মথুরানাথ আবার জানতে চাইলেন তাদের অপরাধ। অচল সিংহের অভিনব উত্তর। "তোমরা এই অরাজকতার সময় দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছনা, ইহাই তোমাদের অপরাধ।"

"মথুরা নাথ ডাকাইত সর্দ্দারের মুখে উচ্চ ভাবের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন, দেশে অরাজক হয় নাই। দেশে রাজা আছেন, তোমরা রাজ বিদ্রোহী।

সর্দ্দার। দেশে এখন কেহ রাজা নাই, আমরা রাজবিদ্রোহী নই।

মথুরানাথ। কেন, দিল্লীর বাদসা ত আছেন, বাঙ্গালার নবাব ত এখনও বর্ত্তমান রয়েছেন।

সর্দ্দার। তুমি দেশের কোন খবরই রাখনা। দিল্লীর প্রকৃত বাদসা এখন কেহ নাই, আর বাঙ্গালার প্রকৃত নবাব ও কেহ নাই। এই অরাজকতা দেখিয়া এক্ষণে ইংরেজ কোম্পানি দেশের রাজা হইতে চায়।

মথুরানাথ। সত্যবটে এখন ইংরেজ কোম্পানি দেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা। তোমাদের মতলব কি—তোমরা কি দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া দেশ শাসন করিতে ইচ্ছা কর?

সর্দ্দার। হাঁ। আমরা তাই চাই।

মথুরানাথ। রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে?

সর্দ্দার। কেন, পারিবনা।—সাত সমুদ্র পারে আসিয়া কয়েকজন সওদাগর এ রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবে, আর আমরা দেশের লোক হইয়া রক্ষা করিতে পারিবনা! ..

মথুরানাথ। ইংরেজ বিক্রমশালী, রাজনীতি বিশারদ স্বজাতি-প্রেমিক একতা-প্রিয়।

সর্দ্দার। মথুরানাথকে বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমরা পরের গোলামী করিতে ভালবাস, দেশের লোককে ভালবাস না। তাই ইংরেজ তোমাদের মত লোকের চখে ভাল লাগে।"১৭

এর উত্তরে মথুরানাথ বলেন, ইংরেজ আমাদের শাসন করে বলেই আমরা

যেমন গোলাম তেমনই ইংরেজ শাসিতের-ও গোলাম কারণ, আমরা রাজকর দিই।

"সর্দার। হাস্য করিয়া বলিলেন,—"মহাশয় এ সকল আপনার বৈরাগিকের যুক্তি, স্বদেশ প্রেমিক বীর পুরুষের কথা নয়।"

মথুরানাথ। ভাবিয়া দেখুন, ভারতবাসী এক্ষণে শত শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া আপন আপন স্বার্থ সাধন জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে। ইহার মধ্যে এমন একটীও স্বদেশ প্রেমিক দক্ষনেতা নাই যিনি এই উচ্ছৃঙ্খল ভারবাসীকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিয়া জাতীয় হিত সাধনে পরিচালিত করিতে পারেন। ভারতের এই শোচনীয় দুর্দ্দিনে ইংরেজের ন্যায় শাসন কুশল বীর জাতির দ্বারা ভারত সংরক্ষিত না হইলে, ভারতবাসী হয় জাতীয় বিপ্লবে অথবা অন্য কোন পরাক্রান্ত জাতির উৎপীড়নে উৎসন্নদশাপ্রাপ্ত হইবে।"১৮

একথা স্বীকার করেন না অচলসিংহ। ইংরেজদের করতলগত হতে চাননা তিনি। অবশ্য মথুরানাথকে একসময়ে স্বীকার করতে হয় ' আপনার জীবনের উদ্দেশ্য উচ্চ এবং আপনার হৃদয় বীররসে পূর্ণ।"১৯

এরপর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে আমরা দেখ্ছি, মথুরনাথ 'বিষম সমস্যা'য় পড়েছেন। নায়েক সর্দার অচলসিংহ মথুরানাথের সঙ্গিনী স্ত্রীলোকদ্বয়ের জন্য মুক্তি পণ দাবি করেছেন দু'শত পঁচিশটি রজত মুদ্রা। ঐ মুদ্রা সংগ্রহের জন্য মথুরানাথকে এক সপ্তাহের সময়-ও অনুমোদন করেছেন তিনি। মথুরনাথ স্বগৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন। সংগী হলেন অচল সিংহের অনুচরদ্বয় বীরসিংহ ও বিজয় নায়েক। বীরসিংহ অবশ্য তার মানস প্রিয়া অচল দুহিতা চামেলীর সংগে একবার সাক্ষাৎ করে নিয়েছেন। জীবনে অনন্তর শঙ্কা আছে। তাই ক্ষণিক বিচ্ছিন্নতাকে দীপ্ত করে তোলার জন্য অকপট প্রেম নিবেদন মুহূর্তে একটি অঙ্গুরীয় পরিয়ে দেয় সে। ভালোবাসার স্মারক হিসাবে। তখন চামেলীর "হৃদয়, কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাব-সমীর হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া উঠিল।"২০ শুধু তাই নয়। যে প্রত্যূষে মথুরানাথের সংগী হয়ে বীরসিংহ স্থানান্তরে গেলেন সেদিন চামেলীর কি হলো? লেখক সরসে রমণীর আবেগ-ব্যাকুলতা বর্ণনা করেছেন। "চামেলীর মন আজ যেন একটু চঞ্চল, একটু শান্তিহারা। নির্ব্বাত নিষ্কম্প বিমল সরসী

বক্ষের ন্যায় প্রশান্ত হৃদয় সরোবরে কে যেন লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়াছে। চামেলীর বদনে আজ সে বাল্য ভাব নাই, মুখ যেন একটু ভারি ভারি। নয়নে সে সারল্য নাই, নয়ন যেন বিদ্যুৎ বিক্ষেপী সজল জলদ গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অঙ্গ ভঙ্গিতে সে স্ফূর্ত্তি নাই, শরীর জড়জড়ে।"২১

মথুরানাথের কন্যার নাম কমলা। অরণ্যের জেনানা মহলে বন্দিনী সে। একদিন অচলসিংহের কন্যা চামেলী দেখে ফেলে তাকে। আপন করে ডেকে নেয় কমলাকে। দুই নারীর কোমলানুভূতি উজ্জলতর হয়। দু'জনের জীবন সমস্যা-ও বিচিত্র। একে অপরের কাছের হয়। বয়সে কিছু বড়ো কমলা। চামেলী তাকে দিদি বলেই ডাকলো। পরম আবেগে দিদিকে সাজিয়ে দিতে চায় সে। নিপুণ হাতে সুগন্ধী তেল দিয়ে কবরী রচনা করল। সালঙ্কারা করে দেওয়ার বাসনা জানায় চামেলী। কিন্তু কমলা বিষন্ন বোধ করে। এ তো সুখের সময় নয়। বন্দিনী জীবনে অপ্রাপ্য কামনা তার চিত্তকে উৎক্ষিপ্ত করেছে। এক সময় চামেলীর কাছে-ও তা স্পষ্ট হয়। মুহূর্তের বেদনাকে ভুলিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তবু-ও শূন্যতা থেকেই যায়। চামেলী-ও তা বুঝল। কিন্তু কোনো বিশেষ আনন্দ নিরন্তর দুঃখ বেদনার ওপর কিছুটা প্রলেপ দিতে পারে; ক্ষণিক বিহ্বলতা সৃষ্টি করতে পারে। তাই চামেলী সখ্য-সূত্র গড়ে তোলে, সই পাতায়। বনকুসুম "শালফুল" কমলার খোঁপায় পরিয়ে দিয়ে বলে: "দিদি কমলে, তুমি আমার "শালফুল" আজ থেকে আমি তোমাকে শালফুল বলিয়া ডাকিব।"২২

চামেলী তার শালফুলকে নিয়ে সময় কাটায়—গল্প কথায়, পরিহাস-কৌতুকে। একদিন নৌকাযোগে ভ্রমণে বেরুলো দুই সখি। সংগে দুই পরিচারিকা রামার মা ও মতি। গড়বেতার প্রান্তে ইংরেজ ফৌজদের হাতে তারা ধরা পড়ে। কিন্তু কৌশলে, সেখান হতে তারা পালালো। গড়বেতার এক ভগ্ন দুর্গে এসে ক্ষণিক আশ্রয় নেয়। নিরাপদ স্থান এটি। চামেলী তার সখিকে বলল, তুমি এখান থেকে চলে যাও। বিষ্ণুপুরে গিয়ে স্বামীর সংগে মিলিত হও। পিতার বন্দিনীকে মুক্তি দিয়ে পরম বিস্ময়ে চেয়ে থাকে সে। ত্রস্ত পদে হেঁটে যাওয়া বধূ কমলার দিকে।

ঘটনা আরো ঘটেছে। মথুরানাথও অচলসিংহের অনুচরদের ইংরেজ,

সৈন্য বন্দী করেছে। কিন্তু লাভ ক্ষতির আংকিক হিসেবে ইংরেজের জমা হয় শূন্য। তাই এদেরকে মেদিনীপুরের জেল থেকেই ছেড়ে দেওয়া হলো। জেল থেকে প্রত্যাগত বীরসিংহ ও বিজয়নায়েক গড়বেতার দুর্গভাগে নায়েক-দের পান্‌সি দেখে বিপদ আশংকা করেন। কিছু অনুসন্ধানে তারা চামেলীর দেখা-ও পেলেন। সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে তারা আপন ডেরাতেই ফিরে এলেন। অরণ্য তখন কাঁপছে। নায়েক দমনার্থে ইংরেজ সৈন্য বনপ্রদেশে অবস্থান করছে। অচল সিংহের পরাক্রমে তারা নাজেহাল।

এই বিপর্যয়ের মধ্যে রাজা ছত্রসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। অনেক সুখের আশায়। তা হবার নয়, জানতেন। তবু-ও করলেন। যদি কিছু ভূখণ্ড দয়ার দানে মেলে। সুতরাং অচলসিংহের স্বপ্নরাজ্য—নায়েক রাজ্য তাঁর করায়ত্ত। তিনি বন্দী হলেন। বিচার হলো। রায়,—ফাঁসি। মেদিনী-পুরের প্রাচীন কেল্লার মাঠে অচলসিংহও তাঁর সহযোগীদের ফাঁসির আয়োজন সমাপ্ত। অতৃপ্ত নায়কসিংহের অশ্রুসজল মাধুর্য অনুভবে অসংখ্য দর্শক সমাগত। অদূরে দাঁড়িয়ে থাকে চামেলী। বীরসিংহ ও মথুরানাথের জামাই শশিশেখর-ও (কমলার স্বামী) এসেছেন। অন্তিম সময়ে প্রাণের দুহিতার সংগে দু'একটি কথা বলতে চান অচলসিংহ। আবেদন মঞ্জুর করেছেন ইংরেজ প্রশাসক। অচলসিংহ কন্যার কাছে এলেন। কণ্ঠে তাঁর সান্ত্বনার বাণীনির্মিতি। "বীরেন্দ্র নন্দিনীর প্রতিভাশালীর নয়নে অশ্রুধারা শোভা পায়না।"২৩

এর মধ্যে তাঁর শেষ ইচ্ছাটি প্রকাশ করলেন, "মা চামেলি, আমার ইচ্ছা যে তুমি বীরসিংহকে বিবাহ করিয়া অতঃপর সংসার সুখে কাল যাপন করিবে।"২৪ আরো একটি কথা বলেছেন। অতি সংগোপনে। গনগনির বনে তাঁর আবাস কক্ষের ধারে কয়েকটি ফুলগাছের নীচে সুড়ঙ্গ পথ আছে। তারই অভ্যন্তরে দুটি বাক্স পাওয়া যাবে। এতে ধনরত্ন আছে। একটির মধ্যে বীরসিংহের জীবন বৃত্তান্ত-ও আছে।

চামেলী মথুরানাথের সহযোগিতা নিয়ে পিতার রক্ষিত সম্পদ উদ্ধার করে। এতেই সে জানতে পারে বীরসিংহ সদ্বংশজাত। রামার মা বীর-সিংহের জননী। অজানা সম্পদের মতোই অজানা সম্পর্ক-ও উদ্ধার হয়। এরপর পিতার নির্দেশ মতোই কাজ হয়। চামেলী-ও বীরসিংহের বিয়ে হলো। একদিকে কমলাও শশিশেখরের মিলন ও অপরদিকে বীরসিংহও

চামেলীর বন্ধন—এই মধুর মিলনের আনন্দপ্লাবী ঘটনার মধ্যে উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে।

লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে এই সাহিত্য কর্মটি দেখলে তার সমগ্রতা ও বৈচিত্র্য বোঝা সহজতর হয়। লেখক তাঁর 'শালফুল' উপন্যাসের মধ্যে নিজের চিন্তার অপরূপ শিল্পলেখ্য রচনা করেছেন। জীবন যন্ত্রণার তিক্ততম বোধকে সার্বিক করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাঁর মনকে অধিকার করেছিল। তাই তাঁর চরিত্রায়ণ ও বর্ণনাভঙ্গির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়।২৫ লেখকের সহৃদয় প্রকাশ ভঙ্গিতে কুশলতা প্রকাশ পেয়েছে। ঘটনা সংঘটনের মধ্যে চরিত্রগুলি বেশ দীপ্ত। কাহিনী বিস্তারে মানবিক আবেদন ঐশ্বর্য মণ্ডিত। লেখকের ত্রুটি-ও অনেক। তিনি অত্যন্ত রকমের ভাবালুতা প্রিয়। ইতিহাসের বিস্তারে প্রণয় কাহিনী, ভালোবাসার রমণীয় পরিণামও আরণ্য-পরিবেশে বন্দিনী নারী হৃদয়ের প্রতি নীরব প্রীতি প্রভৃতি ঘটনা সৃষ্টির নৈপুণ্য বড়ো হয়ে ওঠে। অবশ্যই ইতিহাস ধর্মকে ম্লান করে। আবার কোথায়-ও কাহিনীর প্রসন্নতা হারিয়েছে অপটু বিশ্লেষণ ও কাহিনী বন্ধনে।

তবুও বলা যায়, অপরিণত শিল্পরূপটির মধ্যে মেলে নায়েক বিদ্রোহের ভাবতরঙ্গ ও প্রভাব-বৈভব।

পাদটীকা

১. প্রবোধচন্দ্র সরকার, শালফুল (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ১৮৯৭, পৃ. ৯৮

২. তদেব, পৃ. ৯৮-৯৯

৩. তদেব, পৃ. ৯৯

৪. যোগেশচন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৪৬, পৃ. ২৪৮-২৪৯

৫. সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, 'গেরিলা কৌশল'। দ্র. ভারতের কৃষকবিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,
যোগেশচন্দ্র বসু জানিয়েছেন,—"নায়কগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে যুদ্ধ করিত না, তাহারা জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিত আর মধ্যে মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া ইংরাজ-সৈন্যের উপর পতিত হইত এবং তাহাদিগকে ভীষণরূপে আক্রমণ করিত।" দ্র, মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃ. ২৪৯

৬. মেদিনীপুরের ইতিহাস, পৃ. ২৪৯

৭. তদেব, পৃ, ২৫০

৮. তদেব, পৃ, ২৫১

৯. শালফুল, পৃ. ১০৩-১০৪। এবং দ্রষ্টব্য তরুণদেব ভট্টাচার্য, মেদিনীপুর, পৃ. ১৮৪

১০ শালফুল, পৃ. ১০৫

* ও' ম্যালি সাহেব সমসাময়িক বিবরণ থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। তা এরূপ : **"Although within 60 miles of Calcutta, upto 1816, owing to peculiar local obstacles, the authority of Government had never been firmly established in this tracts (Bagri). The leaders of the Chuars continued to act as if they had been independent of any Government and endeavoured to maintain their predominance by the most atrocious acts of rapine."**

দ্র. L.S S. O' Malley, *History of Bengal, Bihar and Orissa under British Rule*, 1925, P, 300

১১. লেখক ইংরেজ সরকারের একজন কর্মচারী ছিলেন। কমিউনিস্ট নেতা শ্রীসরোজ রায়ের কাছে একথা জেনেছিলেন শ্রীসুকুমার মিত্র মহাশয়। দ্র. ঊনবিংশ শতকের বাংলাসাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র, ১৩৬৬, পৃ. ৪৫

১২. দ্র, "শালফুল' উপন্যাসটির ভূমিকাংশ।

১৩. তদেব

১৪. তদেব, পৃ. ৮-১১

* বন্ধনীর মধ্যের অংশ বর্তমান লেখকের।

১৫ কথিত আছে। সমসের জঙ্গ বিষ্ণুপুর রাজার নিকট হতে বাহুবলে বগড়ী পরগণা ছিনিয়ে রাজ্যস্থাপন করেন অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে। ইনি ছত্রসিংহের ঊর্ধ্বতন তিনপুরুষ। তরুণদেব ভট্টাচার্য সমসেরের বগড়ী অধিকারের সালটি উল্লেখ করেছেন ১৭২০ খ্রীস্টাব্দ। সমসেরের পৌত্র যাদবচন্দ্রের সময় মেদিনীপুরে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদবচন্দ্রের পুত্র ছত্রসিংহের সময় বিখ্যাত নায়েক বিদ্রোহ সুরু হয়।

১৬. শালফুল, পৃ. ১৫

১৭. তদেব, পৃ. ১৬-১৭

১৮. তদেব, পৃ. ১৮-১৯

১৯. তদেব, পৃ. ১৯

২০ তদেব, পৃ. ৩৪

২১. তদেব, পৃ. ৩৫

২২. তদেব, পৃ. ৪২

২৩. তদেব, পৃ. ১২৫

২৪. তদেব, পৃ. ১২৫

২৫. মথুরানাথ ও অচলসিংহের কথোপকথনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবীচৌধুরাণী'র ষোড়শ পরিচ্ছেদের অংশবিশেষের সংগে মিল লক্ষিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ

(১৮০২-১৮৩৩)

ক. ইতিহাস পর্ব

১. *ছপাতির নেতৃত্ব*

২. *টিপুর কর্তৃত্ব*

৩. *গুমানুসরকার ও উজির সরকারের প্রতিবাদীমন*

৪. *জানকুপাথর ও দোবরাজ পাথরের জান-লড়াই*

খ. সাহিত্য পর্ব

বিচ্ছিন্ন কবিতা ও ছড়ার চিত্রকল্প

৬ ॥ অধ্যায় ঃ ময়মনসিংহের পাগলপন্থী বিদ্রোহ

ক. ইতিহাস পর্ব

১. ছপাতির নেতৃত্ব…

ময়মনসিংহের সুসঙ্গ-সেরপুর অঞ্চলে গারো উপজাতিদের পক্ষে নীচতার দুঃসহকে বিস্ফারিত করে, নিপীড়িত মানবতার মহিমাকে সুগভীর মনন-দীপ্তিতে উৎসারিত করার প্রয়াসে সংগ্রাম দ্বন্দ্বসংক্ষোভে এক মর্মযন্ত্রণায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন গারো নেতা ছপাতি।

সুসঙ্গের শংকরপুর নিবাসী ছপাতি গারো উপজাতিদের স্বতন্ত্র মর্যদায় প্রতিষ্ঠাতে কৃতসংকল্প। ইংরেজ ও জমিদারেরা যে শোষণ, উৎপীড়ন-অত্যাচার এই উপজাতিদের ওপর করতেন ; তার অশুভ ছায়া স্পর্শ হতে মুক্তির অনুভূতি গারো অধিবাসীদের অনেক দিনের। পার্বত্য নেতা ছপাতি এদেরকে সংগঠিত করেছেন।

উপজাতিদের গুরু করমশা ফকির।১ সত্যনিষ্ঠা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের পবিত্র দীক্ষা দিয়েছেন তিনি। উদারতা ও পরমপবিত্রতায় এই বীজমন্ত্রের অনুরণনে এক গভীর উপলব্ধির সঞ্চারণ যার মধ্যে হয়, সে তো পাগল। মুক্তির নবতম আস্বাদ-ও মেলে বটে। আর, মানুষের মধ্যে এর জাগরণ হয় আভ্যাসিক পৌনঃপুনিকতায়। এই গুরুকে যাঁরা মেনে চলেন, তাঁরা পাগলপন্থী হিসাবে চিহ্নিত হলেন। পাগলপন্থীদের তিনি অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলছেন। উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের নোতুন কথা শুনিয়েছেন। কারণ, শোষকের অপবিত্র ছায়ায় জীবনের মূলসূত্র অনুশীলিত হবার নয়। সত্য সাধিত হবার-ও নয়। অতএব চাই স্বাধীন রাজ্য,—গারোরাজ্য।

কড়ৈবাড়ির জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর বিবাদ সেরপুরের জমিদারের সংগে। উভয়েই পার্বত্য অধিবাসীদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে চান। এই বিবাদের মীমাংসায় এলেন ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি জনএলিয়ট। স্থির হলো, পার্বত্য উপজাতি ইংরেজ সরকারের অধীনে থাকবেন। কিন্তু তা হবার নয়। ছপাতি এর বিরোধিতা করলেন। স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার জন্য তিনি অক্লান্ত সৈনিকের মতো কাজ-ও করলেন। সুসঙ্গ জমিদার লক্ষ করলেন ছপাতির বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ সংকেত। ইতিমধ্যে ইংরেজগণ-ও জেনেছেন কেন সম্ভব হয় না পার্বত্যভূমির রাজস্ব আদায়। সুতরাং সুরু হলো বিভেদনীতির অংগার ছড়ানো। ভুল বোঝানো হলো গারো অধিবাসীদের। ফলত, ছপাতির শ্রমউৎসর্গ ব্যর্থ হলো। পলায়ন করতে তিনি বাধ্য হলেন। কিন্তু যে পবিত্র-দীপশিখাটি তাঁর অন্তরে জ্বলে উঠেছে, তা নেভার নয়। তিনি জনজীবনের আড়ালে সুগোপনে চেষ্টা করে চললেন মহৎ কর্তব্যটি।২

একবার তিনি ময়মনসিংহের জেলা কালেক্টর মি. গ্রোস সাহেবকে বুঝিয়ে ফেলেছিলেন গারো উপজাতিদের মর্মবেদনা। "ছপাতির প্রগাঢ়বুদ্ধি কৌশল ও অভিনব রাজ্য বিস্তার কল্পনার আলোচনা করিয়া···গ্রোস সাহেব বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন।"৩ এসব ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বরের ঘটনা। ছপাতি অবশ্য আশ্বাস পেয়েছিলেন গ্রোস সাহেবের। কিন্তু রেভিনিউবোর্ড গ্রোস সাহেবের সুপারিশ মেনে নিলেন না।৪ কারণ এতে জমিদারগণ অসন্তোষ প্রকাশ করবেন। ফলকথা, ছপাতির গারো-রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ভংগ হলো।

২. টিপুর কর্তৃত্ব···

ছপাতির নেতৃত্ব ব্যর্থ হলো বটে কিন্তু সুসঙ্গপরগণার লেটিয়াকান্দা নিবাসী৫ টিপুগারোর কুশলী কর্তৃত্বে আবার পাগলপন্থীদের মধ্যে নবউদ্যম ও সাহস সঞ্চার হলো। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে, পাগল ধর্মের প্রচারকের দেহান্ত হয়। এরপর টিপু সময়ের নিরিখে, ধর্মমতে বক্তব্যের ভাবিক প্রয়োজনে সংযোজন করলেন: "সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের সৃষ্টি, সুতরাং কেহ কাহারও অধীনে নহে।"৬ মানবতার মহিমান্বিত প্রকাশ, গভীরপাঠ এর থেকে কি হতে পারে!

সাম্য-বাণীর মৌলতত্ত্বকথা আর কোথায় মেলে! সকল প্রাণের আপনসুরটি যেন টিপুর তত্ত্বকথায় বন্দিত হয়। নন্দিত হয় প্রাণের স্পর্শে। ফলত, সকল গারো-পাগল টিপুকেই গুরু বলে ভাবলো। সত্য বলে-ও মানলো। সুরু হলো নোতুন দীক্ষা। নোতুন শিক্ষা।

অপরদিকে জমিদারদের শোষণ-উৎপীড়ন দিনের পর দিন বেড়েই যায়। পার্বত্য প্রজাদের ওপর ক্রমেই বিভিন্ন কর আরোপিত হয়। খাজনা, আবোয়াব, ম্যাথট প্রভৃতি বহুবিধ করের নামে জমিদারগণ নির্মম অত্যাচার চালান।৭ আরো আছে। ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মযুদ্ধ জনিত কারণে ইংরেজদের সাহায্য করার উপরোধে পার্বত্য উপজাতিদের ওপর বিভিন্ন কর বৃদ্ধি করে জমিদারগণ বা আয়ের চেষ্টা করলেন। কিন্তু প্রজাদের অক্ষমতার ধ্বনি তীব্র, তীক্ষ্ণ হলো। এহেন মুহূর্তে ধর্ম প্রচারক টিপু "সময় বুঝিয়া বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। এবং স্বীয় অভিনব সাম্যমতের প্রচার দ্বারা সেরপুরে ভীষণ বিপ্লব জাগাইয়া তোলে।"৮ ফলকথা, "সহস্র সহস্র উৎপীড়িত প্রজা এই সাম্যমতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে ও জমিদারের প্রাপ্য খাজনা দেওয়া বন্ধ করিয়া দেয়।"৯ জমিদারগণ-ও খাজনা আদায়ে তৎপর হলেন। পাইক বরকন্দাজ প্রেরণ করলেন। ফলে স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধ হলো। এর মধ্যে গড়দরিপা১০ নামক স্থানে একটি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটে। এর ফলে ইংরেজ সাহায্য পুষ্ট জমিদার পরাজিত হলেন। জমিদার পালিয়ে গেলেন কালীগঞ্জে। আশ্রয় নিলেন জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেবের কাছারি বাড়িতে।

গড়দরিপার যুদ্ধে জয়লাভ করে বিদ্রোহীরা সেরপুর আক্রমণ করে। এবং সহজেই সেরপুর দখল করে নেয়। সেরপুরকে কেন্দ্র করে টিপুর গারো রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস চলে। কিছুটা সার্থক হলেন। শাসন ও বিচার বিভাগ স্থাপন করলেন, এতে টিপুর গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে।

টিপুর এই সাহসিক রাজ্যপাটের অস্তিত্ব প্রায় দুবৎসরকাল স্থায়ী হয়েছিল।১১ অবশ্য এর মধ্যে ইংরেজদের সংগে বহু খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেছে। ইংরেজের পক্ষে বৃহৎ আয়োজনের প্রয়োজন হলো। ফলে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে রঙপুর হতে এক প্রকাণ্ড সামরিক বাহিনীকে আনা হয়। ফলত,

এক সম্মুখ সমরে বিদ্রোহীবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। এমনকি, একদিন অতর্কিত আক্রমণে গড়দরিপার সুরক্ষিত চৌহদ্দি থেকে টিপুকে কৌশলে বন্দী করলেন মাত্র একজন দারোগাও দশজন বরকন্দাজ (১৮২৭)।

এই নিরলস একনিষ্ঠ স্বাধীনতাকর্মী, মুক্তিকামী মানুষটির পতনে গারো উপজাতির মনোবল ভেঙে গেল। ইংরেজদের বিচারে টিপুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে পাগলপন্থীদের দ্বিতীয় দীক্ষা-গুরুর দেহান্ত হওয়ার ফলে গারো-অধিবাসীদের জন্ম স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন হয়ে ওঠে দূরান্তিক কল্পনা।

৩. জানুসরকার ও উজির সরকারের প্রতিবাদীমন...

ছপাতির নেতৃত্ব ও টিপুর কর্তৃত্বে গারোরাজ্য স্থাপনের প্রয়াস অবদমিত হলে-ও এবং গারো অধিবাসীদের মধ্যে বাস্তবের প্রত্যক্ষতা, দুঃখ ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রত্যাশা খণ্ডিত হবার নয়। তাই আবার দেখি নব উদ্যমে শক্তি সঞ্চয় করে টিপুর দুই শিষ্য জানুসরকার ও উজির সরকার গারো অধিবাসীদের নেতৃত্ব দিলেন। ইংরেজ ও সামন্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদী চরিত্রসুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতির প্রতি তাঁদের নিঃসীম মমত্ববোধ ও সুতীব্র অনুরাগ গতিব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। এই দু'জনের কুশলী আক্রমণে জমিদারগণ অত্যন্ত অসহায় বোধ করলেন। জমিদারদের আবেদনে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তাঁদের সহায়তা দিলেন। সেরপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডানবার সাহেব জানুসরকারকে বন্দী-ও করলেন বটে কিন্তু ব্যাপক প্রজা বিদ্রোহের আশংকায় জানুসরকারকে মুক্তি দিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন।

গারো নেতাদের প্রতিশোধাত্মক-পাদার জমিজারদের আয়ত্তাধীনে সবকিছুই ধ্বংসের মুখে পড়ে। ইংরেজ সরকার সামরিক শক্তি দিয়ে এঁদের প্রতিরোধের চেষ্টা করল বটে। তবু-ও সেই মুহূর্তে ইংরেজ শক্তি এই দুই নেতার বিরোধের নিরন্তর উদ্যমটিকে অবদমন করতে পারলেন না।১২

৪. জানকুপাথর ও দোবরাজপাথরের জান লড়াই…

এই পর্বে জমিদার ও ইংরেজ শোষকগণের বিরুদ্ধে যাঁরা অগ্নিসংগ্রামে নামলেন তাঁরা হলেন জানকুপাথর* ও দোবরাজপাথর। তাঁদের কঠিন অন্তরাবেগ, বিপ্লবী মনোভাব জমিদারদের দুর্গ প্রাসাদে ফাটল ধরায়। লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত মানুষদের জন্য তাঁদের কঠিন শপথ। এক্ষেত্রে, টিপু তাঁদের সম্মুখে জাগ্রত মূর্তি। শক্তির উৎস-ও বটে। জানকুপাথর ও দোবরাজ পাথরের মিলিত বাহিনী সেরপুরে সাঁড়াশী আক্রমণ চালায়। লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে জমিদারদের বাসভূমি, কাছারি প্রভৃতি ধ্বংস করতে থাকে। সেরপুরে একভাগ কড়ৈবাড়ী ও অন্যভাগ নালিতাবাড়ী দখলে নিয়োজিত হলেন যথাক্রমে জানকু ও দোবরাজপাথর। সর্বত্রই তাঁরা সন্ত্রাস সৃষ্টি করলেন।

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে এই সংগঠিত সংগ্রাম এমন আশ্চর্য ভাব-সাজে রূপায়িত হয়ে উঠতে পারে; তা ইংরেজগণ কল্পনাও করেননি। তাহলে অন্তত সামরিক পরিচর্যার সময়ও সুযোগ পেতেন। যাইহোক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডানবার সাহেব সহযোগী ম্যাজিস্ট্রেট গেরেট সাহেবকে পাঠালেন। কিন্তু গেরেট সাহেব সেরপুরে পৌঁছনোমাত্রই বিদ্রোহীরা তাঁর বাংলো আক্রমণ করল। গেরেট সেই মুহূর্তে পলায়ন করলেও পরে সামরিক সাজে সজ্জিত হয়ে নালিতাবাড়ীর দিকে অগ্রসর হলেন; দোবরাজের পশ্চাদ্ধাবন করলেন। দোবরাজ পাহাড়ের বুকে আশ্রয় নিলেন।

গেরেট সাহেব এই সুযোগে নালিতাবাড়ী দখল করেন। স্থানীয় জমিদার আবার তাঁর কাছারি স্থাপন করলেন। বিজয়োৎসবের হুল্লোড় চলল। সরকারী বাহিনী, জমিদার ও তাঁর কর্মচারিগণ যখন আনন্দে উন্মত্ত, এমন সময় এক অতর্কিত আক্রমণ চালালেন দোবরাজপাথর। ফলে নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটে গেল। এতে অনেকেই আহত ও নিহত হয়।

এই নিষ্ঠুর পর্যায়ে শাসকগণ আরো নিষ্ঠুর হয়ে উঠলেন। তাঁরা বিদ্রোহ দমনে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিলেন। জামালপুর থেকে একটি সামরিক বাহিনী এল। ক্যাপটেন সিল্ ও ইয়ংহাসব্যাণ্ডের অধীনে সামরিক বাহিনীকে সুসংবদ্ধ করা হলো। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ওরা মে, গারো পাহাড়ের নিম্নদেশে

মধুপুর নামকস্থানে ইংরেজদের শিবির স্থাপিত হলো। ৪ঠা মে, জানকুর প্রাণকেন্দ্র জলঙ্গীর ওপর ইংরেজদের সশস্ত্র অভিযান সুরু হয়। যে অতর্কিত আক্রমণের 'স্ট্র্যাটেজি' বিদ্রোহী নেতারা রচনা করেছিলেন সেই কৌশলই প্রয়োগ করেছিলেন সেনানায়কগণ। এর ফলে বিদ্রোহী বাহিনী ছত্রভংগ হলো। এবারও বিদ্রোহীরা পাহাড়ের গোপন আশ্রয়ে গা ঢাকা দেয়।

৭ই মে, লেফ্‌টেনান্ট ইয়ংহাসব্যাণ্ড বিদ্রোহীবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হলেন। নালিতাবাড়ীর এই অভিযানে ইংরেজদের পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হলো। আবার ৮ই মে, ক্যাপটেন সিল্ ও আক্রান্ত হলেন। ইংরেজদের সামরিক মহড়া ব্যর্থ হলো। এহেন মুহূর্তে ইংরেজগণ উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা বিদ্রোহীদের দমন করতে না পেরে পাহাড়ী এলাকায় অগ্নিসংযোগের আদেশ দিলেন। এবং ঘোষণা করলেন, যারা গারো নেতাদের পথে চলবে তাদের অগ্নিযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এতে কাজ হলো। বিপদের প্রত্যক্ষ সংকেত উপলব্ধি করে ১০ই মে, পাঁচজন সর্দার ও বহু বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করে। ১৩ই মে, কালুভদ্র ও পণ্ডিতমণ্ডল নামে দুজন গারো সর্দার ও তাঁদের অনেক অনুচর ধরা পড়ে। এই সংকটঘন মুহূর্তে জানকুপাথর দোবরাজের সংগে মিলিত হবার উদ্দেশ্যে সেই যে গেলেন তারপর আর তাঁদের সন্ধান মেলেনি। ইতিহাস এক্ষেত্রে নীরব।

একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্রের উল্লেখ করা যাক। পত্রটি১৩ লিখেছিলেন ময়মনসিংহ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ডানবার সাহেব। তিনি এটি লিখেছিলেন জামালপুরের সেনাধ্যক্ষকে। পত্রটি লেখা হয়েছিল ২৭.৫.১৮৩৩ তারিখে। এতে ছিল ডানবার সাহেবের কাতরানুভূতি। পত্রটি বিশ্লেষণ করলে যে আংকিক চিত্রটি পরিস্ফুট হয় তা হলো এই ;

১. জেলার শান্তি বিঘ্নিত,
২. বিদ্রোহীরা স্বাধীনতাকামী ;
৩. সেরপুর ও গারো পাহাড়ের মধ্যবর্তিনী বিস্তীর্ণ অংশ বিদ্রোহীদের দখলে ;
৪. পাগলপন্থী বিদ্রোহীরা সংগঠিত, ক্রমবর্ধিত ;
৫. মূলবাহিনীর সংখ্যা চার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে ;
৬. বিদ্রোহীরা বল্লম, তরবারি ও তীরধনুক প্রভৃতিতে সজ্জিত।

উনিশ শতকের গোড়াতেই ময়মনসিংহের পাহাড়ী এলাকায় গারো, হাজং প্রভৃতি মানুষদের মধ্যে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র উদ্‌যাপন সুরু হয়। তারা তাদের নবজাগ্রত চিন্তাধারাকে অগ্রগামী করে তুলেছিল মহান আদর্শে। এ যেন মহা অভ্যুত্থানের প্রস্তুতিপর্ব। পরবর্তী বাংলা সেই অভ্যুত্থানকে বরণ করে নিয়েছে জীবন সত্য ও বৈচিত্র্যকে স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত করে।

একটি কথা মনে রাখলে যথেষ্ট হবে। "ইহাদের সুদীর্ঘ সংগ্রাম একদিকে যেমন আঞ্চলিক, ও বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান—অন্যদিকে আবার তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মানবমুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত সম আদর্শে উদ্বুদ্ধ।......আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর ইতিহাসে ইহা নিঃসন্দেহেই একটি গৌরবময় অধ্যায়।"১৪

বিচ্ছিন্ন কবিতা ও ছড়ার চিত্রকল্প...

ময়মনসিংহের পাগলপন্থীদের বিদ্রোহ সাহিত্যের কোনো শাখায় লিপিবদ্ধ হয়েছে বলে জানা যায়নি। কেবলমাত্র দু'একটি কবিতা ও ছড়াতে এই বিদ্রোহের ভাব-প্রভাব বিধৃত। অবশ্য এ সবই অসম্পূর্ণ। এর থেকে সংগ্রাম-রত মানুষের জীবনবোধ, চেতনাপ্রবাহ ও তীব্র আকুতির চিত্র রূপায়ণ সম্ভব নয়। বিদ্রোহী মানুষের বিশালতা, উদ্দামতা, মানবচিত্তের রহস্যময়তার আশ্চর্য প্রকাশ; যদিও স্বচ্ছ প্রাঞ্জল হয়ে উঠতে পারেনি এই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত কবিতা ও ছড়ায়। তবুও সাহিত্যের ইতিহাসে খণ্ড-বিচ্ছিন্ন এই দুই একটি পংক্তিতে অতীতের প্রাণময় ঘটনার কিছু-কিঞ্চিৎ চিত্র-কল্প পরিস্ফুট।

উদাহরণ—১ "বকসু আদালত করে দীপচান ফৌজদার।
কালেক্টরের সরবরাকার গুমানু সরকার॥"১৫

অন্যপাঠ, "বকসু জজিয়তি করে দীপচান কালেক্টর,
নথীপত্র পেশ করে গুমানু সরকার।"১৬

ইতিহাসের পটভূমিকায় আমরা জেনেছি যে, টিপু সেরপুরের জমিদার ও ইংরেজদের বিতাড়িত করে গারোদের জন্য স্বতন্ত্র রাজ্যস্থাপন করেছেন। টিপুর এই উদ্যোগের মধ্যে পার্বত্য-উপজাতিদের গূঢ়েষা কিছুটা সার্থক রূপ পেল। টিপু শুধুমাত্র রাজ্যস্থাপন করলেন না, তাঁর আবেগবাসনার স্বপ্নময়রূপকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য গতিশীল শাসনব্যবস্থার প্রয়াসী হলেন। টিপুর এই অভিনব শাসন ও বিচারবিভাগীয় চিত্র অংকিত করতে গিয়ে সেরপুরের তৎকালীন পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ "পাগলাইধুব" রচনা করেছেন।১৭ এতেই জানা যায় বকসু নামে কোনো ব্যক্তি জজ ও দীপচান (দীপচন্দ্র) নামে একজন কালেক্টরের কাজে নিযুক্ত হলেন। আর গুমানুসরকারের হাতে দায়িত্ব ছিল নথিপত্র পেশকরার।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো এই যে, "পাগলাই ধুম" কবিতাটি পাওয়া যায়নি। কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার মহাশয়ের নিকট হতে এর অংশ বিশেষ সংগ্রহ করেছেন। যদি কবিতাটি সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যেত, তাহলে বিদ্রোহীমানসের পরিচয় জানা সম্ভব হতো।

কবিতাটির প্রথম ছত্র ছিল এরূপ ;

"সন ১২৩১ সনে পাগল হইল প্রজা।"১৮

উদাহরণ—২

"হাকিমহোকের এছা কিয়া,
হাম্‌বুলে তুম্‌ রিসফক্‌ত১ খায়া।"১৯

সেরপুরের পণ্ডিতপ্রবর রামনাথ বিদ্যাভূষণের অপর একটি ছড়াতে ইতিহাসের একটি রহস্যময় দিকের ইংগিত মেলে। প্রবাদ আছে, সেরপুরের জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডেম্পিয়ার সাহেব টিপুর নিকট থেকে বহু পরিমাণে অর্থ নিয়ে টিপুর রাজ্যপাটে বাধা দেননি। অর্থাৎ ঘুষ নিয়ে নিজ কর্তব্য পথ হতে সরে দাঁড়িয়েছিলেন।২০ আর এরজন্য টিপু সাময়িক অবকাশ পেয়েছিলেন রাজ্যস্থাপনের। এতে ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে বলে মনে হয়না। কবি কল্পনাও হতে পারে। কারণ টিপুর স্বল্পকালীন রাজনৈতিক জীবনচর্যায় এর অবকাশ কম। এবং আকাঙ্খার মহৎ রূপায়ণ ও রাজ্যপাটের সমূহ স্থিতির জন্য ক্ষণিক স্খলন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন কবিতা ও ছড়ার মধ্যে সংঘাত পরিপূর্ণ জীবনের ইতিহাস মেলেনা বটে কিন্তু এ-দুই একটি শব্দচিত্রে অতীত পরিবেশকে জাগর করে।

১. রিসফক্‌ত=(হিন্দীশব্দ) ঘুষ।

পাদটীকা

১. "The sect of the Pagal panthis was founded by one *darbesh* or mendicant called KaramShah, a Pathan by caste, who settled in the Susangpargana in about 1775. He gained an overpowering influence over the aboriginal tribes of Hajongs and Garos inhabiting the region below the Garohills to whom his doctrines of truthfulness, equality and fraternity has a tremendous appeal." দ্র. Dr. S. B. Chaudhuri, *Civil Disturbances During the British Rule in India (1765-1857)*, 1955, P. 105

২. কেদানাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস, ১৩১২, পৃ. ১৪২-১৪৩। এবং দ্রষ্টব্য, J. M. Ghose. The Pagal Panthis in Mymensigh (An article) *Bengal Past and Present*, volume, 28, Pp, 42-43,

৩, ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ. ১৪৩

৪. তদেব, পৃ, ১৪৪-১৪৫। এবং দ্রষ্টব্য: F. A. Sachse, *Bengal District Gazetteers : Mymensigh*, 1917, Pp. 32-33

৫, হরচন্দ্র চৌধুরী, সেরপুরের বিবরণ, ১৮৭২, পৃ. ১০৬। টিপু প্রচার করেছিলেন, মানুষের মধ্যে উঁচু, নীচু ভেদ করা অন্যায়। *Bengal* P.P, P. 46

৬. হরচন্দ্র চৌধুরী, তদেব, পৃ. ১০৭

৭. "It was admitted that oppression and the leveying of illegal imposts denominated Kharcha, mathots and Abwabs on the part of the zeminders were the original causes of the disturbances which occurred on 1825." History of disturbances submitted by J. Dunbar, Magistrate of Mymensigh to the Commissioner, dated 5. 9. 1833. প্রসংগ—ময়মনসিংহের ইতিহাস। পৃ. ১৪৯

৮. কেদারনাথ মজুমদার, তদেব, পৃ. ১৪৯। দ্র, টিপু "was a daring and ambitious chief who had both political and religious motives. While preaching the sublime doctrines of equality and fraternity to bring about a brotherhood of the *Pagals* or *bhai-sahibs*, he consolidated his hold over the Garos and Hajongs of 'Gird-Garo' (Land of the Garos) who were very mach embittered by the exactions of the zamindars of the Sherpur pargana." Dr. Chaudhuri, Ibid, P. 106.

৯. ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ. ১৫০

১০. 'Garjaripa' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে Bengal P. P. 28th Vol, P, 47 'Garjaripa' শব্দটি ব্যবহার করেছেন Dr. Chaudhuri, 'Gar Daripa' উল্লিখিত হয়েছে Mymensigh D. G.-তে।
'গড়দরিপা' এই নামের উল্লেখ করেছেন ময়মনসিংহের ইতিহাসকার কেদারনাথ মজুমদার।

১১. কেদারনাথ মজুমদার লিখেছেন "টিপুর এই রাজ্য শাসন দুই বৎসর অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল।" তদেব, পৃ, ১৫১
Dr. Chaudhuri বলেছেন, "the power of the 'Royal Court of King Tipu Pagal' was very short lived"—এতে শাসনের স্থায়িত্বকাল জানা যায়নি। Ibid, P, 107

১২. ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ. ১৫৪

* সাধারণতঃ পাহাড়ী এলাকার প্রধানদের নামের পদবীতে 'পাথর' ব্যবহৃত হয়।

১৩. *Bengal Past and Present*, Pp, 49-50

১৪. প্রমথনাথ গুপ্ত, মুক্তিযুদ্ধে আদিবাসী,

১৫. কেদারনাথ মজুমদার, তদেব, পৃ, ১৫০

১৬, প্রমথনাথ গুপ্ত, তদেব, পৃ. ৩১

১৭. ময়মনসিংহের ইতিহাস, পৃ, ১৫১

১৮. তদেব, পৃ. ১৫১

১৯. তদেব, পৃ. ১৫২

২০. তদেব, পৃ. ১৫২

লক্ষণীয়,

"গারগণের অধিষ্ঠিত উপশৈল শ্রেণী ভিন্ন সমগ্র পরগণায় বঙ্গভাষায় কথোপকথনাদি চলিয়া থাকে।"

হরচন্দ্র চৌধুরী, সেরপুরের বিবরণ, ১৮৭২, পৃ, ৯৮

॥ সংযোজন ॥

কথিত হয়। করম শা ফকির অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ইনি জল কিংবা আগুনের ওপর দিয়ে নগ্ন পায়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে বেড়াতে পারতেন। মানুষের রোগমুক্ত করার অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা ছিল। দুরারোগ্য রোগীকে রোগমুক্তির পর তাঁর বাড়িতে সেবাকাজের জন্য কিছুকাল থাকতে হতো।

করম শা ফকিরের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী সাধারণের মধ্যে 'মা সাহেবা' বলে

পূজিতা হতেন। ইনিও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারিণী ছিলেন। তাঁর একহাতে থাকত কাঠের বন্দুক ও অপর হাতে থাকত তরবারি। শোনা যায়, ব্রিটিশদের গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। দ্র, *Bengal Past and Present*, Vol, 28, Pp, 43-45

গল্প আছে। টিপুর মৃত্যুর বছর ১৮৫২। মৃত্যুর দিনই বিরাট ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে যায়। টিপুর শিষ্যরা এই গুরুর দেহান্তকালকে অমঙ্গলের সূচনা বলে মনে করেন। তাঁদের বিশ্বাস তিনি আবার ফিরে আসবেন।

টিপুকে ঘিরে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটি ঘটনা জানিয়েছেন তৎকালীন এক জেলকর্মীর নাতি। ঘটনাটি হলো এই : টিপু বন্দী অবস্থায় যখন তখন অদৃশ্য হতেন আবার 'রোল-কল'-এর সময় তাঁকে হাজির হতে দেখা যেত। এটি যামিনীমোহন ঘোষ মহাশয় ঐ জেলকর্মীর নাতির নিকট হতেই জেনেছেন।

Ibid, Pp. 52-53

সপ্তম অধ্যায়

তিতুমীরের বিদ্রোহ

(১৮৩১)

ক. ইতিহাস পর্ব

…প্রাগুক্তমুখ…

১. ওহাবী আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণ

২. তিতুমীরের পরিচয়

৩. [illegible] ষড়যন্ত্র

৪. বিদ্রোহ-কথন

খ. সাহিত্য পর্ব

১. তিতুমীর ও গাথা গান

২. সাজনের গান

৩. হক-গীতি

৪. সাজন-সারি

৫. তিতুমীর ও বাংলা নাটক

৬. তিতুমীর ও প্রবাদ

৭. সাময়িক সাহিত্য

৭॥ অধ্যায় ঃ তিতুমীরের বিদ্রোহ

ক. ইতিহাস পর্ব

...প্রাক্‌মুখ...

উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে বাঙলাদেশে ওহাবী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়লো। গতায়ু শতাব্দীতে আবদুল ওহাব নামে একজন আরব দেশীয় যোদ্ধা এই আন্দোলনের জনক।১ এই আন্দোলনের মূল কথা মুসলিম জনসমাজ থেকে কুসংস্কার দূর করতে হবে। প্রচলিত ধর্মে ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক। বর্তমান ধর্ম পাপকে তীব্র করে, দুর্নীতিকে মূর্তিমান করে। অতএব একে ভেঙে ফেলে মানবিক সংবেদনা দিয়ে এর পবিত্রতা সংরক্ষণে চিন্তা বিলাসী হয়েছিলেন আবদুল ওহাব।

উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলির সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী (১৭৮৬-১৮৩১) মক্কায় গেলেন। এখানেই তিনি ওহাবী আন্দোলনের সংগে পরিচিত হলেন। এর আগেই স্বদেশে দিল্লীর পণ্ডিত আবদুল আজিজের কাছে তিনি দীক্ষা নিয়েছেন, ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধনের। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আবদুল আজিজ ছিলেন শাহ ওয়ালি উল্লাহের শিষ্য। যিনি বিশুদ্ধ মুসলিম ধর্ম প্রতিষ্ঠাতে কৃত সংকল্প ছিলেন। এই দিক থেকে আবদুল ওহাব ও শাহওয়ালি উল্লাহের মধ্যে মিল আছে। শাহ ওয়ালি উল্লাহের মৃত্যু হয় ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে এবং আবদুল ওহাবের ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে।২ অনুমান করা যেতে পারে, সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ভারতবর্ষে যে ওহাবী-ধর্ম প্রচারে নামলেন; তা আবদুল আজিজ ও আবদুল ওহাব মতবাদের একটি সংমিশ্রণ।

মক্কায় অবস্থানকালে সৈয়দ আহ্‌মদের সংগে বাংলাদেশের প্রবাদ পুরুষ মীর নিসার আলি ওরফে তিতুমীরের সাক্ষাৎ হয়। তিতুমীর সৈয়দ আহ্‌মদের কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে দেশে ফিরলেন। সৈয়দ আহ্‌মদের হৃদয়ানুভূতি তিতুমীরকে স্পর্শ করেছিল। সৈয়দ আহ্‌মদ নিজেও ভারতবর্ষের বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করে এই নোতুন আন্দোলনের কথা মুসলিম সমাজকে অবহিত করলেন। প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ দূরদেশ আরবে শুরু হয়েছে; এদেশে-ও তার প্রয়োজন, এই মত প্রচার করলেন। তাঁর মূল আবেদন ছিল, জমিদার, নীলকর ও ইংরেজ শাসকদের উৎপীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। সৈয়দ আহ্‌মদের আহ্বানে যারা সাড়া দিয়েছিলেন, তারা ওহাবীপন্থী নামে পরিচিত হলেন। ওহাবীপন্থিগণ শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তারা উৎপীড়কের সন্ধান করেছেন। সে সন্ধান জাতি ধর্ম নির্বিশেষেই হয়েছে। তাই ওহাবীরা পাঞ্জাবে মুসলিম পীড়নকারী শিখদের ওপর বিদ্রোহ প্রকাশ করেছে, তেমনই বাংলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে; আবার পেশোয়ার অত্যাচারী মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে-ও বিদ্রোহ জানিয়েছে। ওহাবীপন্থিগণ স্পষ্টত-ই মনে রেখেছে, ভারতবর্ষ 'দার-উল-হরব' অর্থাৎ শত্রুর দেশ। ইংরেজ তাদের শত্রু। অতএব শত্রুর বিলয় তাদের লক্ষ্য।

সুতরাং শত্রুর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষিত হলো। ক্রমান্বয়ে বিহারের পাটনা ও বাংলাদেশের বারাসত, ফরিদপুর ও উত্তর বাংলায় আঘাতসংঘাত, বিদ্রোহ-বিপ্লব তরংগায়িত হলো। বাঙলাদেশের নায়ক তিতুমীর ওহাবী বিদ্রোহকে শোষণ মুক্তির বাণীবাহী করে তুললেন স্বাধীন ও মুক্তবুদ্ধিতে।

১. ওহাবী আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণ...

তিতুমীরের বিদ্রোহের ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমরা ওহাবী আন্দোলনের অর্থনৈতিক কারণটিকে পর্যালোচনা করে নিতে পারি। রাজনৈতিক আন্দোলনের পশ্চাদ্‌ভূমিতে থাকে অর্থনৈতিক কারণ। অর্থনৈতিক সংকটে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। ঐতিহাসিক হান্টার সাহেব এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি আরোপ করেছেন। তা হলো, সামরিক কর্ম, রাজস্বসংগ্রহ ও শাসন বিভাগের চাকরি।৩

মুসলমানদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে ইংরেজ কোম্পানীকে অনেক শক্তি ক্ষয় করতে হয়েছে। তাই সামরিক কর্মে মুসলমানদের অন্তত বিশ্বাস করতে পারেননি কোম্পানী। যদি-বা কখন-ও উদার হয়েছেন, কিন্তু নীতির ক্ষেত্রে মনে রেখেছেন ; "The Supreme command of any regiment must always be vested in an Englishman."৪

রাজস্বসংগ্রহের ক্ষেত্রে অবশ্য মুসলমানেরা আগেই বঞ্চিত হয়েছেন। রাজস্ব সংগ্রহ নীতিতে মুসলমানেরাই উচ্চপদ পেতেন। মোঘল আমলে রাজস্ব ব্যাপারে সম্রাটের নিকট তারা দায়ী থাকতেন। অবশ্য, কৃষকদের সংগে সরাসরি যোগাযোগ ও রাজস্ব আদায়ের কাজ হিন্দু নাজির বা বেলিফ-রাই করতেন। সংগৃহীত রাজস্বথেকে হিন্দু কর্মচারীরা তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ পেতেন। কিন্তু এটা সত্য, মুসলমান কর্মচারীরাই কর্তৃত্ব করতেন ভূমিকর বলবৎ করতেন ; প্রয়োজনে তরবারি কিংবা লুঠপাট। এমন করেই অনেকে বিত্তস্ফীত হয়েছেন। ইংরেজ দেওয়ানি লাভ করার পর এই ব্যবস্থার বিশেষ হেরফের হলোনা বটে। কিন্তু কর্ণওয়ালিস ও জনশোর মোঘল পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করলেন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান কর্মচারীর স্থলে জেলায় জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হলেন। এই বন্দোবস্তের ফলে আশ্চর্য ঘটনাটি হলো, জমি ও কৃষকদের সংগে প্রত্যক্ষ যোগ থাকায় হিন্দু কর্মচারীদের অনেকেই জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি পেলেন। ইংরেজের এই দুষ্কৃতি লক্ষ করে মুসলমান সমাজের বৃহদংশ স্বভাবতই ইংরেজের ওপর রুষ্ট হলেন।

সামরিক ও রাজস্ব ব্যাপারে মুসলমানদের ভূমিকা নগণ্য হয়ে যাওয়ায় তারা শাসন বিভাগ থেকেও সরে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ বৃত্তির পথ রুদ্ধ ছিল। হান্টার বলেছেন; "the Muhammadans are now shut out equally from Government employ and from the higher occupations of non-official life."৫ হান্টার সাহেব একথা-ও উল্লেখ করেছেন ; ইংরেজের রাজনৈতিক রাজ্য সুরু হবার অনেক পরে-ও মুসলমানদের মধ্যে সাহস, রাজনৈতিক সচেতনতা ও শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান বোধির অভাব ছিলনা।৬

তাছাড়া উনিশশতকের দুইদশক আগে-ও আদালত বা সরকারী ভাষা ছিল ফারসী। তার বদলে এসেছে পুরোপুরি ইংরেজী ভাষা। এতে মৌলবীরা কাজ হারালেন। ভাষার অধিকার হারিয়ে আরো হীনবল হলেন মুসলমান সম্প্রদায়। ফলত, তারা ক্রমশ বিদ্রোহক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন।

তাহলে দেখ্ছি, মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক অবনতির কারণেই তারা অসহযোগী ও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। সুতরাং অর্থনৈতিক কারণটিকে পাশ কাটিয়ে ওহাবীদের ধর্মীয় ভাবটি বড়ো করে দেখা ঠিক নয়। শিল্প বিকাশের পূর্বে সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম যে ভাবে ধর্মীয় ধ্বনি নিয়ে সুরু হয়েছে এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।৭ কিন্তু আন্দোলনের ব্যপ্তিতে ধীরে ধীরে ধর্মীয়ভাবটি হারিয়ে এর উত্তরণ ঘটেছে মানবিক আবেদনে। সে পবিত্র আবেদন ছিল শোষণ-উৎপীড়ন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে জয়োচ্চারণ। তাই জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সংগ্রাম ধর্মীয় নেতারা রাজনৈতিক সংগ্রামে পরিণত করতে পেরেছিলেন। বিহারে এনায়েত আলি ও উলায়েত আলি এবং বাঙলায় তিতুমীরের সংগ্রাম এবং শরিয়তুল্লা ও দুদুমিঞার নেতৃত্বে ফরিদপুরের সংগ্রাম এই রাজনৈতিক বিশিষ্টতার প্রমাণ দেয়। তবু-ও একটি কথা বলার থাকে। ধর্মীয় সংগঠন সমূহ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেই রাজনৈতিক সংগ্রামে নেমেছে। তাই একটি সম্প্রদায়ের ভিত্তভম-বোধ সার্বিক হয়ে উঠেনি। ওহাবী আন্দোলন যখন ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ নেয়, তখন হিন্দু সম্প্রদায় এই রাজনৈতিক পালাবদলে সমর্থন, সহানুভূতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু ওহাবীরা হিন্দুদের নিয়ে এগুতে পারেননি, দলেও টানতে পারেনি। এ সব আন্দোলনের উদ্যোক্তা যেমন মুসলমান সম্প্রদায় তেমনি রূপকার-ও তারাই ছিলেন। ডক্টর রমেশ চন্দ্র মজুমদার যথার্থ-ই বলেছেন; এসব আন্দোলন ছিল "of the Muslims, by the Muslims and for the Muslims."।৮

জনৈক লেখক বলেছেন, ধর্মীয় বিশেষত্ব নিয়েই ওহাবীরা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তরবারি ধরেছিলেন! এর ফলে ওহাবীপন্থিগণ "gained wide publicity"৯ তেমনি ফরাজীদের ধর্মীয় আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হলেও ওহাবীদের সংগে মিলে একক আন্দোলন গড়ে

ওঠেনি। এটা হলে সম্ভবত তারা কাঙ্ক্ষিত পরিণাম লাভ করতো। যাইহোক যে ওহাবী আন্দোলনটি আরবে সৃষ্টি, ভারতে তার স্থিতি। বাঙলা ও বিহারে যার দুর্বার গতি ও প্রলয়ঙ্কর রূপ ছিল তার অনন্ত ধারাটিকে অস্বীকার করবার উপায় নেই।১০

২. তিতুমীরের পরিচয়…

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার বাদুড়িয়া* থানার অন্তর্গত হায়দার পুর গ্রামের অংশ বিশেষ চাঁদপুরে মীরনিসার আলির জন্ম হয়।১১ পরে ইনি তিতুমীর নামে পরিচিত হয়েছিলেন।১২ নিসার আলির পিতার নাম মীর হাসান আলি, মাতার নাম ছিল আবেদা রোকাইয়া খাতুন। বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শরীরচর্চা-ও করেছিলেন। হায়দারপুর মাদ্রাসা প্রধান হাফিজ নিয়ামত উল্লাহের সান্নিধ্যে এসে তিনি নানাপ্রকার অস্ত্র চালনার কৌশল ও রাজনীতি শিক্ষা পেয়েছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি পরিপার্শ্ব সম্পর্কে কুতূহলী ছিলেন। অসাধারণ তাঁর সামাজিক মূল্যবোধ ও স্বধর্মেনিষ্ঠা। যৌবনে সেসব প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করলেন; আদর্শগত লড়াই।

প্রথমে তাঁর কর্মজীবন সুরু হয় নদীয়ার কোনো এক জমিদারের লাঠিয়াল হিসাবে। একসময় জমিদারের প্ররোচনায় দাঙ্গায় লিপ্ত হয়ে পড়েন। এতে তাঁর কারাদণ্ড হয়। কারাভোগের পর তিনি মক্কায় গেলেন। সেখানেই সৈয়দ আহ্‌মদ ব্রেলভীর সংগে সাক্ষাৎ হয়। এতদিন তিনি যে মানস প্রবণতায় আচ্ছন্ন ছিলেন; তা আহ্‌মদের সংস্পর্শে আলোকোৎসারের সুযোগ এলো। তিনি ইসলাম ধর্মের সংস্কার ও বিদেশী উৎখাতের মন্ত্র-দীক্ষা নিলেন।

এর পরে তিনি ফিরে এলেন নিজের গ্রামে। গ্রামবাসীকে শোনালেন নোতুন মন্ত্র। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। সম্ভ্রান্ত মুসলমান সমাজ কর্ণপাত করলেন না তাকে। কিন্তু চাষা, জোলা, পটুয়া আর জালিয়া প্রভৃতি দলে দলে এসে ভিড় জমায় তাঁর দলে। তিনি তাদের কাছে মুক্তিদূত হিসাবেই কল্পিত হলেন।১৩

তিতু দলীয় লোকের সংগ্রামী মনের পরিচয় নেবার জন্ত একটি সভা আহবান করলেন। এই সভাটি কলিকাতার শামসুন নিসা খানমের বাগান বাড়ীতে১৪ তিন দিন ধরে অনুষ্ঠিত হলো। এতে তিনি দীপ্তকণ্ঠে বললেন : "আমি মনে করি, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও স্বাধীনতার সংগ্রামে আমাদের সহিত যোগদান করিতে পারে। একটু চেষ্টা করিলে এই পথে আমরা সাফল্য লাভ করিতে পারি, ...কারণ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ জাতির উপর নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা সন্তুষ্ট নহে। আমরা মুসলমানদিগকে পাকা মুসলমান করিয়া নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানদিগকে একতাবদ্ধকরতঃ বিলাতী ও দেশী নীলকরদিগকে শায়েস্তা করতে পারি।"১৪ক

কলিকাতার সভা শেষ করে তিনি জনসভা সুরু করলেন, প্রথমে চাঁদপুর, হারদারপুর, ও সর্পরাজপুর (সরফরাজপুর)। এই সব জনসভাতে তিনি বললেন, ইসলামধর্মে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। হিন্দুদের সংগে একতাবদ্ধ হয়ে নীলকরদের অত্যাচার দমন ও ইংরেজ বিতাড়ন করতে হবে।

৩. জমিদারদের ষড়যন্ত্র·

তিতুমীরের পরিকল্পিত কার্যসূচীর কথা অবগত হয়ে পুঁড়ার প্রভাবশালী জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায়, গোবরা-গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় এবং গোবর ডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে চিঠি চালাচালি সুরু হয়। পরে এ নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্র সুরু হলো। কৃষ্ণদেব রায় তাঁর বিশ্বস্ত পাইক মতি উল্লাহকে তিতুর সংবাদের জন্ত নিয়োগ করলেন।১৫ শুধু তাই নয়, কৃষ্ণদেব রায় তিতুর বিরুদ্ধে 'নালিশী আরজী' সংগ্রহ করার নির্দেশ দিলেন। সংগৃহীত হলোও তা। বলাবাহুল্য, তিতুর বিরুদ্ধে যাঁরা 'নালিশী আরজী' পেশ করলেন, তারা মতি উল্লাহেরই আত্মীয় বান্ধব। টিপ সই যুক্ত 'আরজী'র মর্মার্থ হলো এই : "চাঁদপুরের অধিবাসী তিতুমীর তাহার অহাবী ধর্ম প্রচারার্থে আমাদের সর্পরাজপুর গ্রামে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছে এবং আমাদিগকে অহাবী ধর্মমতে দীক্ষিত করিবার জন্ত নানাপ্রকার জুলুম জবরদস্তি করিতেছে। ...হুজুরের কাছে তাহার বিহিত ব্যবস্থার জন্ত আমাদের এই নালিশ।"১৬

এই দরখাস্ত পেয়ে কৃষ্ণদেব রায় হুকুম জারী করলেন;১৭—

"১। যাহারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ওহাবী হইবে, দাড়ি রাখিবে, গোঁফ ছাটিবে, তাহাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা ও ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হইবে।

২। মসজিদ প্রস্তুত করিলে প্রত্যেক কাঁচা মসজিদের জন্য পাঁচ শত টাকা ও প্রত্যেক পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা জমিদার সরকারে নজর দিতে হইবে।

৩। পিতা-পিতামহ বা আত্মীয়স্বজন সন্তানের যে নাম রাখিবে, সে নাম পরিবর্তন করিয়া ওহাবী মতে আরবী নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের জন্য খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে।

৪। গো-হত্যা করিলে হত্যাকারীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া দেওয়া হইবে, যেন সে ব্যক্তি আর গো-হত্যা করিতে না পারে।

৫। যে ব্যক্তি ওহাবী তিতুমীরকে নিজ বাড়ীতে স্থান দিবে তাহাকে তাহার ভিটা হইতে উচ্ছেদ করা হইবে।"

আমাদের বক্তব্য, প্রতাপশালী জমিদারের আদেশ-ও প্রতাপশালী ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু আদেশের প্রতিবাদ জানালেন হজরত আলি১৮। সেটি প্রতিবাদ লিপি মাত্র নয়, মর্মোৎসারী আবেদন-ও বটে।

তিতুমীরের আবেদন-পত্রের নকল১৯

"বঃ জনাব বাবু কৃষ্ণদেব রায় জমিদার মহাশয় সমীপে—

পুঁড়ার জমিদার বাড়ী।

মহাশয়!

আমি আপনার প্রজা না হইলেও আপনার স্বদেশবাসী। আমি লোক পরম্পরায় জানিতে পারিলাম যে, আপনি আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আমাকে ওহাবী বলিয়া আপনি মুসলমানদিগের নিকট হেয় করিবার চেষ্টা

করিতেছেন। আপনি কেন এরূপ করিতেছেন তাহা বুঝিতে পারা মুশকিল। আমি আপনার কোন ক্ষতি করি নাই। যদি কেহ আমার বিরুদ্ধে আপনার নিকট কোন মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে উত্তেজিত করিয়া থাকে, তাহা হইলে আপনার উচিত ছিল সত্যের সন্ধান করিয়া হুকুম জারী করা। আমি দীন ইসলাম জারী করিতেছি। মুসলমানদিগকে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দিতেছি। ইহাতে আপনার অসন্তোষের কি কারণ থাকিতে পারে? যাহার ধর্ম সেই বুঝে। আপনি ইসলাম ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। অহাবী ধর্ম নামে দুনিয়ায় কোন ধর্ম নাই। আল্লাহ্‌র মনঃপুত ধর্মই ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ হইতেছে শান্তি। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ব্যতীত আর কোন ধর্মই জগতে শান্তি আনয়ন করিতে পারে না। ইসলামী ধরণের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ঈদুল আজহার কোরবানী করা ও আকীকা কোরবানী করা মুসলমানদিগের উপর আল্লাহ্‌র ও আল্লাহ্‌র রসুলের আদেশ। মসজিদ প্রস্তুত করিয়া আল্লাহ্‌র উপাসনা করা ও আল্লাহ্‌র হুকুম। আপনি ইসলাস ধর্মের আদেশ, বিধি-নিষেধের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না। আমি আশাকরি, আপনি আপনার অন্যায় হুকুম প্রত্যাহার করিবেন।

ফকত—
হাকির ও না-চিজ—
সৈয়দ নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।"

এক

কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের পত্র পেয়ে আরও রুষ্ট, উত্তেজিত হলেন। উদ্ধত তিতুমীরকে দমন করার জন্য সমগোষ্ঠী, সমভাবীদের একজোট হওয়ার আবশ্যকতা বোধ করেন। এর জন্য তিনি কলিকাতায় লাটুবাবুর বাসভবনে একটি ষড়যন্ত্রসভা আহবান করলেন। সভাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন;

১. লাটুবাবু (কালকাতা)
২. কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (গোবরডাঙ্গা);
৩. দেবনাথ রায় (গোবরা-গোবিন্দপুর);

৪. নূরনগরের জমিদারের ম্যানেজার ;
৫. টাকীর জমিদারের সদর নায়েব ;
৬. রাণাঘাট জমিদারের ম্যানেজার ;
৭. কৃষ্ণদেব রায় (পুঁড়া) ;
৮. রাম রাম চক্রবর্তী (বসির হাট থানার দারোগা) ;
৯. দুর্গাচরণ চৌধুরী (বদুর আটী) প্রভৃতি।

সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়।২০

"১। তিতুমীর এবং তাহার দলের লোকদিগকে যে কোন উপায়েই হউক, দমন করিতে হইবে; তাহা না হইলে জমিদারদিগের মর্য্যাদা থাকিবেনা।

২। পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের দ্বারা তিতুকে শাসন ও দমন করিতে হইলে পার্শ্ববর্তী জমিদারেরা যাহাতে ধনজন ও পরামর্শ দ্বারা কৃষ্ণদেবকে সাহায্য করেন, সে চেষ্টাও করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে, তিতুকে দমন না করিলে হিন্দুজাতির পতন অনিবার্য।

৩। প্রয়োজন হইলে কৃষ্ণদেব রায়ের সাহায্যার্থে বাংলার সমস্ত হিন্দু জমিদারদিগকেও কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে দ্বিধা করিলে চলিবে না।

৪। যে কোন উপায়েই হোক, ইংরাজ নীলকরদিগকে ও দলে লইয়া তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, তিতু ইংরাজদিগের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

৫। মোল্লাআটী নীলকুঠির ম্যানেজার মিঃ ডেভীস কালীপ্রসন্ন বাবুর বন্ধু ; মিঃ ডেভীসকে দলে টানিয়া লইবার ভার কালীপ্রসন্ন বাবুর উপর ন্যস্ত করা হউক।...

৬। প্রচার দ্বারা হিন্দু জনসাধারণের মনে তিতু ও তাহার দলের জাস

জন্মাইয়া দিতে হইবে। প্রচার করিতে হইবে, তিতু অত্যাচারী : হিন্দুর সম্মান-সম্ভ্রম নষ্টকারী, হিন্দুর জাতি-নাশকারী, হিন্দু নারীর সম্ভ্রম নষ্টকারী।

৭। হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে আরও প্রচার করিতে হইবে যে, তিতু গো-মাংস দ্বারা হিন্দুর দেবালয়াদি পবিত্র স্থানগুলি অপবিত্র করিয়াছে এবং হিন্দুর মুখে কাঁচা গো-মাংস গুঁজিয়া দিয়া তাহাদের জাতিনাশ করিতেছে।

৮। নানাভাবে ও নানাদিক দিয়া প্রধান প্রধান ইংরেজ রাজপুরুষদিগের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হইবে যে, পলাশীর ও গিরিয়ার প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তিতু দলবদ্ধ হইয়াছে। তিতু নিজেকে বাদশা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

৯। হুগলী গ্রামের (নারিকেল বেড়িয়ার নিকটবর্তী) নীলকুঠির এজেন্ট মিঃ পাইরন ও উক্ত নীলকুঠির এবং আরও কতকগুলি নীলকুঠির ম্যানেজার লাটুবাবুর বন্ধু। ইহাদিগকে এবং কলিকাতার ও হুগলীর পাদ্রীদিগের দলে আনিবার ভার লাটুবাবুর উপর অর্পণ করা হউক। আরও স্থির হইল যে, লাটুবাবুর চারিশত হাবশী যোদ্ধা প্রয়োজনেরসময় যাহাতে পাওয়া যায়, এই সভা সেজন্য লাটুবাবুর নিকট আবেদন জানাইতেছে।

১০। এই সভা বশির হাটের দারোগা রামরাম চক্রবর্তীর সর্বপ্রকার সাহায্য পাওয়ার জন্য তাহার নিকট আবেদন জানাইতেছে।”

দুই

এর পরের ঘটনা। কৃষ্ণদেব রায় সহযোগী জমিদারদের নিকট হতে লাঠিয়াল, ঢাল তরবারি ও সড়কিওয়ালা আনালেন। একদিন সর্পরাজপুরে অতর্কিত আক্রমণ চালালেন। এতে তিতুর পক্ষীয় লোকের অনেক ক্ষতি হলো। মুসলমানদের নামাজ গৃহ ভস্মীভূত করা হলো। তিতুমীর এ সম্পর্কে কলিঙ্গার পুলিশ ফাঁড়িতে জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন। এর

কয়েকদিন পরে কৃষ্ণদেব রায় নীলচাষদ্রোহী, জমিদারদ্রোহী, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী দ্রোহী "তিতুমীর নামক ভীষণ প্রকৃতির অহাবীর" নামে একই ফাঁড়িতে নালিশ জানালেন।২১

কিন্তু সর্পরাজপুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। এ সম্পর্কে ৭ই জুলাই, ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির হয়ে কৃষ্ণদেব রায় বললেন, "আমি দাঙ্গা হাঙ্গামার কিছুই জানিনা। আমি কলকাতায় ছিলাম। এক্ষণে ঘটনা ও মোকদ্দমা সম্বন্ধে অবগত হইয়া আদালতে হাজির হইয়াছি এবং দরখাস্ত পেশ করিতেছি।"২২ ম্যাজিস্ট্রেট ট থানার দারোগা রামরাম চক্রবর্তীকে তদন্ত রিপোর্ট দেবার আদেশ করেন। তিনি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে লিখলেন; সব দোষই তিতুমীরের। ঘরজ্বালানী, লুণ্ঠন, দাঙ্গা এবং খুন জখমের মোকদ্দমা যোগ-সাজশী ও ভিত্তিহীন। তার নিজের দলের লোকেরাই নামাজঘর পুড়িয়েছে। অতএব মোকদ্দমা অচল ও ডিস্‌মিসের যোগ্য।২৩ সুতরাং মোকদ্দমা খারিজ হলো।

ফলকথা কৃষ্ণদেব রায় আরো অত্যাচারী হয়ে উঠলেন। এ সম্পর্কে হার্বার্ট' নামে একজন পদস্থ ইংরেজ কর্মচারী লিখেছিলেন, এই ঘটনার পর তিতুমীরের শিষ্যদের ওপর জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের পক্ষ হতে নানাপ্রকার অত্যাচার হয়েছিল। কৃষ্ণদেব রায়, দেবনাথ রায় ও কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জমিদারগণ তিতুমীরের মতাবলম্বী মুসলমান প্রজাদের জব্দ করার জন্য খাজনা আদায়ের অজুহাতে গ্রেফতার করে সদর কাছারীতে এনে তাদের ওপর নানারকম অত্যাচার করতেন। দেওয়ানি ও ফৌজদারী আদালতে বহু মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করে ডিক্রি হাসিল করে ভিটাচ্যুত করেছিলেন।২৪

কিন্তু সহ্যের-ও সীমা আছে। জমিদারদের ন্যায়নীতি বিবর্জিত কর্মকাণ্ড, কোম্পানীর আইনের নামে প্রহসন তিতুমীরকে আরো বিদ্রোহক্ষুব্ধ করে তোলে।

৪. বিদ্রোহ কখন…

সংকটের পরিপ্রেক্ষিতায় আত্মগত ধর্মময় জগৎ থেকে তিতুমীর বেরিয়ে

এলেন প্রতিবাদের পরিমণ্ডলে। এই সময় থেকেই তাঁর 'এ্যাটিচুড' বা ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য তাঁকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তিতুমীর একটা কথা স্পষ্ট-ই বুঝেছিলেন যে এ-সব জমিদারদের শক্তি বৃদ্ধিতে রয়েছে ইংরেজ। তাই তাঁর ঘোষণা ছিল "কোম্পানীর লীলা সাঙ্গ হইয়াছে।"২৫ এ সময় থেকে তিনি জমিদারদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি মুসলমান শাসকের প্রতিনিধিরূপে নিজেকে ঘোষণা করলেন। এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সংগে সংগে নীলকর সাহেব ও জমিদারগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মোল্লাআটির* নীলকুঠির ম্যানেজার ডেভিস সাহেবকে উত্তেজিত করে তোলেন তিতুর বিরুদ্ধে। ডেভিস সাহেব বহুসংখ্যক লাঠিয়াল, [illegible] নিয়ে নারিকেল বেড়িয়ায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু তিতুমীর ডেভিসের প[illegible]কে এমনভাবে বেষ্টন করে ফেলেন যে, ডেভিস বিপর্যস্ত হলেন। এতে বহুলোক হতাহত হয়। ডেভিস সাহেব কোনোমতে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

এর পরে তিতুমীর গোবরা-গোবিন্দপুর আক্রমণ করলেন।২৬ লাউ-ঘাটিতে দুই দলের প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো। তিতুমীরের ভাগ্নে গোলাম মাসুম যে চক্রব্যূহ রচনা করলেন, তা থেকে দেবনাথ রায় বেরুতে পারলেন না। তাঁর বাহিনী ছত্রভঙ্গ হলো। দুই পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়।২৭

উক্ত ঘটনার পর চুতনার জমিদার মনোহর রায় পুঁড়ার জমিদার ও নীলকর কৃষ্ণদেব রায়কে তিরস্কার করে পত্র লিখলেন। এতে তিনি উল্লেখ করলেন, জমিদারদের ক্রমবর্ধিতলোভ, তিতু ও তাঁর দলের ওপর অন্যায় আচরণ ও তাদের ধর্মকর্মে বাধাদান এবং ইংরেজ নীলকরদের সংগে মিলিত হয়ে দেশের অনিষ্টসাধন প্রভৃতি কারণেই এমন অশুভ ঘটনা ঘটলো। সুতরাং এসব বন্ধ না হলে তিনি তিতুমীরকেই সাহায্য করবেন।২৮

লাউঘাটির যুদ্ধ জয়ের ফলে তিতুমীরের শক্তি ও সাহস বৃদ্ধি পেল। তিনি তাঁর অনুচরদের নিয়ে সর্বদাই সশস্ত্রে প্রস্তুত থাকতেন। জমিদার ও নীলকরদের দমন করার অভিযান সুরু হয়। এর থেকে বর্ধিষ্ণু অত্যাচারী মুসলমানগণ-ও বাদ গেলেন না। তিনি এদের নিকট রাজস্ব দাবি করলেন।

ফলত দুই পক্ষের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। নীলকর জমিদারদের প্ররোচনায় হুগলী গ্রামের এজেন্ট [illegible] নীলকুঠি ম্যানেজার স্টারস সাহেবকে অভিযোগ করলেন যে, নীলচাষদ্রোহী, কোম্পানীদ্রোহী তিতু-মীরের অত্যাচারে তারা নিরাপদ বোধ করছেন না। এই সংবাদ পেয়ে স্টারস সাহেব বাঙলার তদানীন্তন ছোটলাটকে ব্যবস্থা নিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন। ছোটলাটের একটি নির্দেশে যশোহর জেলার বাগাণ্ডির নিমক-পোক্তানে বিরাট সেনাবাহিনীর কেন্দ্র স্থাপিত হয়। আরেকটি নির্দেশে বারাসতের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার নিমকপোক্তান হতে সৈন্য পরিচালনা করে বাদুড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হন। আবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নির্দেশ মতোই বশিরহাট থানার দারোগা, জমাদার ও বরকন্দাজ বাহিনী এসে যুক্ত হলো। শুধু তাই নয়, সেরপুরের নীলকুঠি ম্যানেজার বেঞ্জামিন ও তাঁর লাঠিয়াল বাহিনী আলেকজাণ্ডারের সংগে মিলিত হন।২৯

অপরদিকে বিদ্রোহীরা রণসাজে সজ্জিত। এতে নেতৃত্ব দিলেন তিতুর অনুচর ভাগ্নে গোলাম মাসুম। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হলো। তিতুমীর রাজনৈতিক বন্ধন ও পরবশ থেকে মুক্তি চেয়েছেন। তাই এক্ষেত্রে তিনি দুর্বার। অবারণীয় তাঁর বিদ্রোহোত্তম। ফলকথা, জয় তাঁরই হলো। আলেকজাণ্ডার পালালেন বটে তবে নিতান্তই মরণাপন্ন অবস্থায়।

এক

বলাবাহুল্য, বাংলার ছোটলাটের উদ্যোগ ও ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারের সৈন্যাপত্য ব্যর্থ হওয়ায় তিতুমীরের বৈপ্লবিক এষণা তীব্ররূপ নেয়। অসীম অতৃপ্তি যা তাঁকে পেয়ে বসেছিল; তা তিনি মুহূর্তে দূর করতে চাইলেন। বীর্যকণ্ঠে নিজেকে তিনি স্বাধীন বাদশাহ বলেই ঘোষণা করলেন।৩০ মৈজুদ্দিন বিশ্বাস নামে (মতান্তরে মৈজুদ্দিন) এক জোলা তাঁর প্রধানমন্ত্রী হলেন। আর সেনাপতি হলেন তিতুরই ভাগ্নে গোলাম মাসুম। ক্রমে ক্রমে বেশ কিছু গ্রামের হিন্দু মুসলমান তিতুমীরকে বাদশাহ হিসাবেই মেনে নেয়।

তিতুমীর এ-ও বুঝলেন যে, এই চ্যালেঞ্জের মূল্য তাঁকে দিতে হবে। তিনি বাঙালীর স্নিগ্ধ আকুলতা জীবনের মর্মস্পর্শী দৃষ্টি, আত্ম নির্বিষ্টতা

নিয়ে দেখেছেন ; তাই বিদ্রোহের সারথ্য তাঁকে দিতেই হবে। তিনি ভাবলেন, জীবন সংগ্রামে নেমে, শত্রুর সংগে মোকাবিলা করতে হলে সুরক্ষিত দুর্গের-ও প্রয়োজন। অতএব তৈরী হলো কেল্লা, বাঁশের কেল্লা। মর্মস্পর্শী প্রতিবাদের অনশ্বর স্বাক্ষর। এই কেল্লার বিশিষ্টতা সম্পর্কে বিহারিলাল সরকার লিখেছেন : "কেল্লার রচনা কৌশলময় ;—দৃশ্য সৌন্দর্য ময়। কেল্লার ভিতর যথারীতি অনেক প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কোন প্রকোষ্ঠে আহারীয় দ্রব্য স্তরে স্তরে বিন্যস্ত ছিল,—কোন প্রকোষ্ঠে তরবারি, বর্শা, সড়কী, বাঁশের ছোট বড় লাঠি সংগৃহীত ও সজ্জিত ছিল,—কোন প্রকোষ্ঠে স্তূপাকারে বেল ও ইষ্টকখণ্ড সংগৃহীত হইয়াছিল। এই কেল্লার কৌশল-কায়দা তিতুর বুদ্ধি ও শিল্প চাতুর্য্যের পরিচায়ক।"৩১

আমাদের অনুমান, তিতুমীরের আত্ম-ঘোষণ ও আলেকজাণ্ডারের পতনের কাহিনী শুনে গভর্ণর জেনারেল বেন্টিঙ্ক বিচলিত হলেন। তিনি তিতুমীর ও ওহাবী দমনের ব্যাপক আয়োজনের নির্দেশ দিলেন। কর্তৃপক্ষ লেফ্‌টেনান্ট স্টুয়ার্টকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করে একশত ঘোড়-সওয়ার গোরা-সৈন্য, তিনশত পদাতিক দেশীয় সেনাবাহিনী, দুটি কামান ও এক সহস্র কুলি প্রেরণ করলেন নারিকেল বেড়িয়ায়।

দুই

১৮৩১ এর ১৪ই নভেম্বর। সকাল ন'টা যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। সেনাপতি স্টুয়ার্ট কেল্লার সুমুখে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলেন এবং স্বীয় পকেট থেকে একখানি কাগজ বের করে তরবারির অগ্রভাগে বিদ্ধ করে বজ্র-ঘোষণ করলেন : "মহাশয়! আমি ভারতবর্ষের মহামান্য গভর্ণর জেনারেল বেন্টিং-এর প্রেরিত সেনাপতি। ...আপনার দলবলসহ আপনাকে গ্রেফতার করিবার জন্য এই আদেশনামাসহ আমাকে এই সৈন্যদলের সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। আপনি আপনার দলবলসহ স্বেচ্ছায় আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন কিনা, আমি তাহা জানিতে চাহিতেছি।"৩২

কিন্তু তিতুমীর যে কঠিনব্রত উদ্‌যাপন সুরু করেছেন তাতে আত্ম-সমর্পণের প্রশ্ন নেই। তাই ১৮৩১-এর ১৪ই নভেম্বর থেকে ১৯ তারিখ পর্যন্ত

প্রায় রোজই তিনি মেজর স্কট, লেফটেনান্ট শেক্স্পীয়র, ক্যাপটেন সাদারল্যাণ্ড প্রভৃতি সমরনায়কদের একেক জনের সংগে লড়াই করলেন। প্রাণমূল্য নির্জিত হবে জেনে-ও কৌতুক প্রসঙ্গে ইংরেজ বীরদের কামানের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন। বলাবাহুল্য কামানের বজ্র নির্ঘোষে বাঁশের কেল্লা উড়ে গেল। ফলকথা, তিতুমীর জীবনব্যাপী যে সংগ্রামের দীপশিখাটি জ্বালিয়েছিলেন; তা নিভে গেল এক পলকে। কামানের গোলায় বহু লোক প্রাণ আহুতি দিল। আর, "কেহ বৃক্ষের উপর, কেহ গৃহস্থের অন্দরে, কেহ পাটের গুদামে কেহবা শস্যক্ষেত্রে আশ্রয় লইল। অতঃপর ইংরেজ সৈন্যগণ গৃহে, প্রাঙ্গণে, বৃক্ষে, গর্তে মাঠে যেখানে যাহাকে পাইল গ্রেপ্তার করিল।"৩৩ সবশেষে "বাঁশের কেল্লার মধ্যে পাওয়া গেল তিতুমীরের মৃতদেহ। উনিশদিনের বাদশাহ্ বাঙালী বীর তিতুমীর এমনি করেই ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে লড়াই করে প্রাণ দিলেন।"৩৪ সেদিনটি ছিল শনবারের সকাল, তারিখ ১৯. ১১. ১৮৩১।

এতে মোট আটশত বন্দী হয়। এদের বিচার হয় আলিপুর আদালতে। বিচারের রায়ে কিছু বিদ্রোহীর দীপান্তর ৩৫ ও বেশিরভাগের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেওয়া হয় কেল্লার ভগ্ন স্তূপেই। তিতুমীরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি অধ্যায়ের যবনিকা নেমে এল বটে। তবে তাঁর সংগ্রামী চেতনা পরবর্তী বাংলাকে এষণা-প্রেরণা জুগিয়েছিল সন্দেহ নেই।

খ. সাহিত্য পর্ব

১. তিতুমীর ও গাথাগান...

বাঙলা সাহিত্যে তিতুমীরের স্থান নির্ধারিত হয়নি। তিতুমীরের সংগ্রামী মানস, বলিষ্ঠমনন, দীপ্ত চেতনা ও দেশ হিতৈষণা স্বীকৃত হয়নি। মাত্র কয়েকটি গাথাগান৩৬ পাওয়া গেছে। এতে তিতুর জীবনীর কিছু-কিঞ্চিৎ আভাস মেলে বটে।৩৭ কিন্তু এসবে তিতুর প্রশংসা নেই। বিদেশী বিতাড়নের পবিত্র আকাঙ্ক্ষার মধ্যে দেশনায়কের যে প্রাণপ্রতীতি, বীর্য-উৎসাহ ও স্বদেশপ্রীতির ভাবনা স্ফুরিত; তার ইংগিত মাত্র নেই। এ সব গাথাচিত্রে তাঁকে হিন্দুবিদ্বেষী হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। আমরা বলতে পারি, গাথা রচয়িতাদের মধ্যে "বেশীর ভাগই জমিদারদের সাহায্যপুষ্ট হিন্দু-গ্রাম্য কবিদের রচনা স্বভাবতঃই তিতু বিদ্বেষী।"৩৮ আবার মুসলমান কবি-দের রচনাতে-ও তিতুর হিন্দুপীড়ন ও সাম্প্রদায়িক বিবরণই বেশি।৩৯

তিতুমীরের বিদ্রোহকাহিনী ও তাঁর জীবনী নিয়ে দুটি মুদ্রিতগ্রন্থ দেখেছি। প্রথম গ্রন্থকারের নাম বিহারিলাল সরকার* ও অপর জনের নাম আবদুল গফুর সিদ্দিকী। বলাবাহুল্য, দুই গ্রন্থকার পরস্পর বিরোধী মনোভাব পোষণ করেছেন। বিহারিলাল সরকারের 'তিতুমীর বা নারকেল বেড়িয়ার লড়াই' গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় ১৩০৪ সালে। এবং আবদুল গফুর সিদ্দিকীর 'শহীদ তিতুমীর' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় ১৩৬৮ সালে। উভয়েই প্রথমে সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটি ঐতিহাসিক তথ্য ও তত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য; লেখক পূর্বোক্ত গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, তথ্য সংগ্রহ করেছেন। যুক্তি বিচারে তৌলন কর্মটি প্রশংসার্হ। কিন্তু একথা-ও ঠিক। বিহারিলাল

* লেখকের ব্যবহৃত বানানই রক্ষিত হলো।

সরকার ও আবদুল গফুর সিদ্দিকী দুজনেই একদেশদর্শী। সুতরাং উভয়ের দৃষ্টিভংগি বিশেষ দোষে দুষ্ট। আবদুল গফুর সিদ্দিকী যদি নিরপেক্ষ হতে পারতেন, তবে তাঁর রচনাটি অনন্য হতে পারতো। কেননা তথ্যসংগ্রহের একটি বিশেষ সুযোগ তাঁর ছিল। তিতুমীরের ভাগ্নে সেনাপতি গোলাম মাসুম আবদুল গফুর সিদ্দিকীর নিকটতম না হলেও আত্মীয়।৪০

বিহারিলাল রচিত 'তিতুমীর' জীবনীগ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দিই। এতে তিতুমীর সম্পর্কে কিছু প্রশংসা-ও করা হয়েছে। যেমন, "তিতুমীর বহুগুণ-সম্পন্ন। স্বধর্মে তাহার যেরূপ আসক্তি-অনুরক্তি ছিল, আত্ম ধর্ম্মাচারে তাহার যেরূপ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল, স্বধর্ম্মপ্রচার-প্রসারে তাহার যেরূপ আন্তরিকতা-ঐকান্তিকতা ছিল, স্বধর্ম্মরক্ষাকল্পে তাহার যেরূপ একাগ্রতা-নিষ্ঠামত্তা ছিল, আজকাল মুসলমান সম্প্রদায়ে তাহা বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয়না। তিতুমীর উদ্যোগী সাহসী পুরুষ,—তিতুমীর শক্তিশালী উৎসাহী পুরুষ।"৪১

আরো একটি।

"মুসলমানের গৌরব উদ্ধার তিতুর আজন্ম আকাঙ্ক্ষা। তিতুর উদ্দেশ্য ভাল; তিতুর স্বজাতি প্রীতি ও প্রশংসার্হ।...তিতু একান্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ পুরুষ; তাই উদ্দেশ্য সিদ্ধির যে পথকে প্রকৃষ্ট ভাবিয়াছিল, সেই পথের পথিক হইবার জন্য যৌবনকাল হইতে আপনার দেহমনকে প্রস্তুত করিয়াছিল।...ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া ধর্ম্ম, সৈয়দ আহম্মদের ইহাই প্রধানতম মত।...তিতু এই গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এই মন্ত্র হৃদয়ে পোষণ করিয়া, বাঙ্গালার ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিতু বাল্যে যাহা চাহিয়াছিল, যৌবনে যাহা পোষণ করিয়াছিল; প্রৌঢ়ে তাহাই পাইল।"৪২

পুনশ্চ,

তিতু আপন ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিল। সে প্রচারে পীড়ন-তাড়ন ছিল না। লোকে তাহার বাগ্মিতাসে মুগ্ধ হইয়া, তাহার প্রচারে স্তম্ভিত হইয়া, তাহার মতকে সত্য ভাবিয়া তাহাকে পরিত্রাতা মনে করিয়া, তাহার মতাবলম্বী হইয়াছিল এবং তাহার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। তিতু প্রথমতঃ শোণিতের বিনিময়ে প্রচার সিদ্ধি করিতে চাহে নাই। জমিদার কৃষ্ণদেব জরিমানার ব্যবস্থায় তাহার শান্ত প্রচারে হস্তক্ষেপ করিল।"৪৩

বিহারিলাল সরকারের গ্রন্থে তিতুমীরের প্রশংসা এই পর্যন্তই। আর সমস্ত অংশেই নিন্দাবাদ করা হয়েছে। এমনকি, তাঁর সংগৃহীত গাথা-গান-গুলিতে-ও তিতু-প্রশস্তি নেই। এসবে তিতুকে হিন্দুপীড়ন-তাড়নের প্রতিমূর্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইতিহাসপর্বে তাঁর রাজনৈতিক সচেতনতা ও কর্মিষ্ঠতার কথা জেনেছি। এখানে আমরা পরস্পর বিরোধী কয়েকটি গাথা-গানের উদ্ধৃতি দিই।

॥ ১ নং গান ॥৪৪

উত্তরে এক গ্রাম ছিল নামে নারিকেল বেড়ে,
তাতে হাজার দুই নেড়ে।
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি, আজকে গাঁয়ের হাট,
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাটে॥
তিতুমীর বলে আল্লা, বানাইলাম বাঁশের কেল্লা,
তাতে আমার নাই হেল্লা,
যেমন মাঠ ছিল, তেমনই হ'লো মাঠ,
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট॥

॥ ২ নং গান ॥৪৫

নারিকেলবেড়ে গাঁয়েতে একজন ছিল তিতুমীর।
সরা-সরিয়ৎ তিনি করলেন জাহির॥
পীর-পয়গম্বর, কুতুব-অলি কিছুই তিনি মান্‌তেন্ না,
এবার সার্‌লে ইংরেজের মামু জানে নাক্‌লে না।
সদাই বলে হায় আল্লা, বুঝি প্রাণ যায়, একি হ'লো দায়॥
এবার মারেগুলি, ভাজলে খুলি হজরৎ গুলি খেলে না,—
এবার সার্‌লে ইংরেজের মামু জানে নাক্‌লে না॥
সদাই বলে আল্লা-নবি, আমার হ'লো কি,
জোর করে সব ধরে আনলাম গৃহস্থের বৌ ঝি।
তার প্রতিফল হাতে হাতে জারিজুরি খাটলো না॥
এবার সার্‌লে ইংরেজের মামু১ জানে নাক্‌লে না॥

---

১. ইংরেজের মামু = গোরা সৈন্য।

॥ ৩ নং গান ॥৪৬

জোলানী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা বাট।
হাজাম বাড়ী গিয়া শীঘ্র গোঁপ দাড়ি কাট॥
তিতুমীরের গলা ধরি নসরদ্দি কয়,
তোমার বুদ্ধিতে মামা ঠেকিলাম একি দায়।
এসেছে রাজাগোরা, উর্দ্দিপরা ব্যাঙের টোপ মাথায়॥
এরা মারছে গুলি, ভাঙছে খুলি, হুজরোৎ গুলি মানলে না।
সার্লে ইংরাজের মামু, এবার আর জানে রাখলে না॥

এইসব গানের রচয়িতাদের নাম জানা যায়নি। তবে অনুমান করা যেতে পারে, কোনো হিন্দু কবির এই শ্লেষ রচনা। আবার মুসলমান কবি সাজন-গাজির গানে-ও তিতু বিদ্বেষ স্পষ্টকিত।

২. সাজনের গান···

॥ ১ নং গান ॥৪৭

পড়িলো মএদানে লোক লাঠির আঘাতে।
ব্রাহ্মণ ছিলো সে হো হিন্দুদের জেতে ॥
এবে তবে সনো সেই ব্রাহ্মণের বানি।
পিয়াছা[১] আছিল সেই চাহিলেক পানি ॥
গাভাগোস্ত সরাভালা এনে কহে তারে।
ভোক্তি কোরে খাও ঠাকুর ফকিরের ঘরে ॥
নাচার হইলো বামন পোড়ে কাবু ভলে।
লা এলাহা এল্লেল্লাহা কল্‌মা মুখে বলে ॥
বাওন বলে ধোরে তোলো গায় নাহি বল।
পিয়াছেতে ছাতি কাটে একটু দেও জল ॥
বিপাকে পড়িয়া গোস্ত করিল ভক্ষণ।
সাজন বলে ছিলো তার অদেষ্টে লিখন ॥

---

১. পিয়াছা = পিপাসা

। ২ নং গান ।৪৮

মুসলমান কবি সাজন গাজি তিতুকে অত্যাচারী হিসেবে আঁকলেন। তাই, কৌতুক প্রিয় কবির গানে তিতুর এই ভীষণমূর্তি।

বামনের মেয়ে এনে, নেকা দেয় কতো জোনে,
সাঁকা ভাঙ্গি হাতে দিল চুড়ি।
বামনগোনেরে ধোরে, কল্‌মা ২ পড়ায় জোরে,
চুল কেলে মুখে রাখে দাড়ি ।।
গাভাগোস্ত তারা খাইয়া, কাপড পরে ওন্দারা দিয়া,
কাছা খুলে সবে গেলো বাড়ি *
গালপাট্টি রাখিয়া দাড়ি, সবে যায় নিজ বাড়ি,
দেখে তারে কহেন ব্রাহ্মনি
মাথায় দেখিনা কেস,২ ধোরেছো মুছল্লি-বেশ,
বুঝি তোদের গেছে হিন্দুয়ানি *
কিভাব হৈয়াছে রায্য,৩ কহ দেখি ভট্রাচার্য্য,
চুল ফেলে মুখে কেন দাড়ি।
পৈতা কোথায় থুলে, ফেলিয়াছ কাছা খুলে,
জায়গা পাবে না আমার বাড়ি ॥
খেয়োছো বাপের কলা, কেন হৈলে সরাওলা,
ঘরকন্না সব দিলে ছেড়ে।
কোরেছো ইমান দড়ো, পাঁচঅক্ত নামাজ পড়ো,
ফিরে তুমি জাও নারিকেল বেড়ে ।।
জোগের জে পৈতে৪ গলে, তা তুমি ফেলেছো জলে,
গো মাংস কি তাও এমন মিটে।
গিয়া ফকিরের কেল্লা, হৈয়াছে দেড়ে৫ মোল্লা,
ঘরে এলে কর্‌বো ঝেঁজয়া পিটে ।।

১. কলমা (আরবী)=মুসলমান ধর্মের ইষ্টমন্ত্র
২. কেস=কেশ ৩. রায্য=রাজ্য
৪. জোগের জে পৈতা=যজ্ঞের যে পৈতা ৫. দেড়ে=দাড়িয়াল

কেমন বচন শুনি, কি বলিলি ব্রাহ্মনি,
এতো দুঃখ ছিলো আমার ভালে।
ফাঁকি দে আমার তরে, কলমা পড়ায়ে জোরে
গাত্তাগোস্ত দিলো মোর গালে॥
লোক ছিল আগু পিছু, তা আমি দিলিনি কিছু
দূরে গিয়ে ফেলাম তাড়াতাড়ি।
কলমা শুনিতে পাই, তাহা আমি শিখি নাই ;
থোরে বেন্ধে রেখে দেছে দাড়ি॥
ব্রাহ্মনি কহেন ফিরে, মুছল্লিকে কি খাতিরে,
ঠাট্টা জে করিলে সোমাতুল।
বলেছিলাম ব্রাহ্মন, ঘেঁটাইও না কাল জবন,
একেবারে জাবে জাতি কুল"*

॥ ৩ নং গান ॥৪৯

যুদ্ধ বর্ণনা

লাউঘাটি ছিলো নামে সাকের সর্দার।
মমিন পৌঁছিল গিয়া পায় সমাচার*
গোরু যবে কোরেখানা তৈয়ার করিল।
আছুদা করিয়া খানা সবে খেলাইলো।*
খানা খেয়ে মমিনেরা আছুল বসিয়া॥
হরিদেব দেবরায় খবর পাইয়া*
তিন চারিসত লোক সঙ্গে লিয়া তারা॥
লড়িতে আইলো গিথি করিয়া পৈতারা*
ভুরি পেচা খেলে তারা জতো জোনে জোন
উড়া সরিপাকে খেলে খোলালিত মোন
জখোন থাকিলো তারা খাড় মার খলি॥
মেঘের বেজলি জেনো কর্ণে লাগি তালি*
শব্দ হইল জেনো সিংহের গর্জনে।

আওয়াজের ধোমকে কম্পিত কতো জোন*
ডাইন দিকে তলওয়ার বায় হাতে ঢাল।
চলে পড়ে চারিদিগে ফেরে মস্ত হাল*
এসে চারিদিখে ঘেরে মমিন সবারে।
মমিন কজহাজ করে আল্লার দরবারে
মার্ মার্ বলি তারা মারিলো তলওার।
জোরেতে মারিল চোট হেবেনজিবেল্লার*
লা এলাহা কল্‌মা পড়ি জতো দিনদারে
ভেরিজ হইয়া কোপ ধরে লাটি পরে*
সামলিল কোপ কেহ এসে ঝটপট।
বেদিনের পরে তবে ফেঁকে মারি লাটি*
লাটি খেয়ে ঢালে সেহো খাড়া হইয়া ছিলো॥
সরাওয়ালা পুনর্ব্বার লাটি জে মারিলো।
কবজা করিয়া সল লাটি আপনার।
মারিল চিকরে লাটি পড়ে হেরে তার*
মার্ মার্ ধর্ ধর্ করে জোবেদিনে॥
সরাওালা কল্‌মা পড়ে আপন জবানে*
তাড়াতাড়ি লাটি মারে জতো মমিনেতে।
কারো বা ভাঙ্গিলো ছের কারো লাগে হাতে*
কানপাটি ভাঙ্গে কারো ভেঙ্গে গেল দাঁত।
বাবা বাবা বোলে পড়ে মুখে দিয়া হাত*
সরাওয়ালা কলমাপোড়ে জোরে মারে লাটি।
কারো বা ভাঙ্গিলো হাড় কারবা কানপাটি*
ঘাএল বেদিন এক ময়দানে পড়িলো।
মমিন ধরিয়া তারে লস্করে আনিলো*
সড়োপওয়ালা ছিলো যারা জখম হইল।
লাটি খেয়ে বাজে লোক ভাগিতে লাগিল*

।। ৪ নং গান ।।৫০

তিতুর কেল্লা প্রসংগে সাজনের মন্তব্য :

এলাহি ভাবিয়া বাঁশের বানাইল কেল্লা।
ঘাস বাঁশ দিয়া তবে বানাইল ছেল্লা*
তাহার ভিতরে জমা সকলে রহিলো।
বেদিন দেখিয়া মোনে সঙ্কট জানিলো*

কিন্তু দুর্মর এই জিজ্ঞাসা থেকেই যায়, মুসলমান কবি সাজন গাজি তিতুমীরকে কেন সহানুভূতির চোখে দেখলেন না বা কালবিচার না করে কেনই বা দুঃসহ কৌতুক করলেন? এক্ষেত্রে আমাদের অনুমান, সাজন গাজি কেন, অনেক কবিদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন সেদিনের হিন্দু জমিদারগণ। ফলত, তাঁদের তোষণীয় পরিমণ্ডলে অবস্থান করতেই হতো।

তাছাড়া তিতুর ইসলামী-তরীকা অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান-ই সম্ভ্রমের চোখে দেখেননি। স্বভাবত-ই তাঁরা তিতুর প্রতি রুষ্ট ছিলেন। সেই রুষ্টতার বহি-র্প্রকাশ ছড়া বা গানে হবে; তা সহজেই অনুমেয়।

৩. হরুগীতি

আমরা আরেকটি গাথা গান উদ্ধৃত করছি। এতে তিতুর জীবনকাহিনী বর্ণিত, অবশ্যই তা' নিন্দার্থে। গাথার ভণিতা থেকে জানা যায়, হরু নামে কোনো অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা এটি। আমরা এটিকে হরুগীতি৫১ নামে আখ্যা দিলাম।

পয়ার।

শুন সবে ভক্তি-ভাবে করি নিবেদন।
হজরত আলির লড়ায়ের শুন বিবরণ।।
কৃষ্ট দেব রায় হতে, লড়ায়েতে মেতে গেল ক্ষ্যাড়া।
ফকিরের বুজরুগীতে লোক হল পুঁড়াছাড়া।।

নাই আর অন্য গতি, ব্রাহ্মণ জাতির থাকা হল ভার।
ব্রহ্মহত্যা গোবধ-আদি করে একাকার ॥
কয়েকটা জোলা মিলে তাঁত ফেলে মৌলবি সব হল।
মুকুলগিরি করি ফিরি, লাউঘাটিতে গেল ॥
সেথাতে করে মজা, তুলে ধ্বজা, লড়াই ফতে করে।
রতিকান্তের রায়ের বেটা, দেবনাথকে মারে ॥
কইতে ফাটে বুক, বড় দুখ, রায় মরে গেল।
সিংহের মরণ যেন শৃগালের হাতে হল ॥
কিন্তু যত স্বাড়াগণের ঘোড়া কেড়ে নিয়ে লয়।
ঘোড়া জোড়া ফেলে স্বাড়া পলাইয়ে যায় ॥
এই সব আজব এ।, খেলে মাথা, যত স্বাড়া মেলে।
গেরস্থ লোক পলায় সব, ঘর দুয়ার ফেলে ॥
তাদের বা দুখ কত, নারী যত, ঘর ছেড়ে যায়।
দেখলে স্বাড়া, দেয় তাড়া, বুদ্ধি হত হয় ॥
এইরূপ লোটে দেশ, অবশেষ, নারিকেল বেড়ে গিয়ে।
বলে আল্লা, বানায় কেল্লা, বাঁশের ব্যাড়া দিয়ে ॥
তিতুমির বাদসা হল, হুকুম দিল, উজিরের তরে।
মৈজদ্দি উজির হয়ে, হুকুম জারি করে ॥
যেমত সবধুলোখ্যালা, ছেলেবেলা, যত ছেলে করে।
ফকিরের বুজরুগী, তেমন বুঝহ অন্তরে ॥
ফৌজ সব ফেরে কত, দেছে যত, ইট লাটী লয়ে।
পোষাকের কথা তাদের, কাজ কিরে তাই কয়ে ॥
শেষেতে একে আর, বাঁচা ভার, শুন সমাচার।
বারঘরের কুটী লুঠে করে ছারখার ॥
সাহেব যায় পলাইয়ে, খবর নিয়ে, মেজেস্টারে গিয়ে।
গ্রেপ্তার কারণে সাহেব আইল ফৌজ নিয়ে ॥
যতসব চৌকিদার, সমাচার মেজেস্টারের পেয়ে।
মৌলুবিদের ঘেরে সব একত্র হইয়ে।
কিন্তু ঘেরা মাত্র, হাতে অস্ত্র, দাঁড়াইয়ে ছিল।
মার্ মার্ শব্দ করে, মৌলবি সব গেল ॥

মারে সেপাই যত, কব কত আহা মরি মরি।
দারগাকে মারে সব চারিদিকে ঘেরি॥
সাহেবের কপাল ভাল, জোর ছিল, দৌড়ে সে পলালো।
সেপাই মেরে, যত দেড়ের বৃদ্ধি বেড়ে গেল॥
মিশাতে পর্ববত নাড়ে, ফিরে রাড়ে, বলে চমৎকার।
নদে জেলার মাজিষ্টার, আইল তারপর॥
কিন্তু তার ঝাঁক বড়, হয়ে দড়, আন্ডু সাহেব১ এল।
মুলুক বজরা পিনেষ আদি হাতি কতকগুল॥
ধমকে পাষাণ ফাটে, সত্যবটে, মিছে কিন্তু নয়।
একদিন ছাউনি করে বারঘরেতে রয়॥
পরদিন কামান ছোটে সাহেব ওটে, দেলপুরু হয়ে।
বারাসাতের মাজিষ্টার আইল ফৌজ লয়ে॥
এইটে ভেবে মনে, ডেভিসনে নদের সাহেব বলে।
বারাসাতের ফৌজ এসেছে চলহ সকলে॥
দেখিগে নারিকেলবেড়ে, যতদেড়ে, কেতা লড়াই দ্যায়।
বুকে পিঠে মারব গোলা বাঁচবে কে কোথায়॥
ডেভিসন্ ইএশ্ বলিল, সয় হইল, হাতির উপর চড়ে।
মার মার শব্দ করে চল্লো নারিকেল বেড়ে॥
হাতি যায় দশবারটা, ঘোড়া ছটা, সাত আটজন ইংরাজ।
পিছে পিছে চল্ল সব থানার বরকন্দাজ॥
দারগা সবিস্তারে, একত্রে যাচ্ছে মহিম দিতে।
হাতীর আগে মুখল গোলক চল্লো লাঠি হাতে॥
বাদামের পাতা শিরে, চিহ্ন করে, দিল সাহেবেতে।
দেখতে পেয়ে এল ধেয়ে যতেক হেদাতে॥
তলোয়ার লাঠি হাতে, বন্দুক সাতে লয়ে কতকগুলা।
সাহেবকে তাড়ায়ে লয়ে চল্লো কাহা খোলা॥

১. আন্ডুসাহেব=ডেভিড এ্যানড্রুজ সাহেব।
ইনি একজন ধনিক নীলকর। ইছামতীর তীরে বারঘরে তাঁর কয়েকটি নীলকুঠি ছিল।

সুবল গোলকে বলে, গণ্ডগোলে কাজ কি হেথা থেকে।
মাথার পাতা ফেলে, এখন পার হও পাটনি ডেকে॥
সাহেব লোক বজরায় ওঠে, বিপদ ঘটে, বন্দুক নিল হাতে।
কাট্ কাট্ বলে গেল বজরার নিকটে॥
এসে সব হল খাড়া, যত ন্যাড়া, লড়াই করিবারে।
বজরা ভাসাসনেরে বলে ইট ফেলে মারে॥
সাহেবের বাঁচা ভার, যে-একতার কল্লে কাজে কাজে।
গোটা পাঁচ ছয় দেওড় করে, থেকে বজরার মাঝে॥
গোটা কয়েক জখম হল, টেনে নিল পিছের হেদাতেরা।
গুলিওয়ালার কাছে সাহেব জিজ্ঞাসে ত্বরা॥
ন্যাওড়ে পড়ে কিনা, যায় না জানা, বজরার ভিতর থেকে।
গুলিওয়ালা বলে সাহেব পড়লো এসে ঝুঁকে॥
এদের কেউ মরেনিকো, দন্ত ভাখ যত পাতি নেড়ে।
জানে বাঁচ যদি, সাহেব পলাও হাতি চোড়ে॥
সাহেবের হল ভয়, অতিশয়, এসব দাড়া দেখে।
ফকিরের বুজরুগী আছে, কাজ কি হেথা থেকে॥
হাতিতে হয়ে সর, মেজিষ্টার নদী পার হল।
চক্ষের নিমিষে সাহেব ঘোলামেদে গেল॥
হেদাতের হল দেশ, নেড়ের শেষ, এককালে হয়।
কিন্তু চমৃচমালাগে ইথে গবরনরের ভয়॥
কাপটেন সাহেব ডেকে, হকুম তারে গবরনর যে দিল।
কেল্লার যেয়ে ফৌজ সব বেছে বেছে নিল॥
এল সব ঘোড়ায় চড়া, হয়ে খাড়া, হ্যাকার পাশে ঝোলে।
কি শোভা করেছে তাদের পোশাকের লালে॥
যেন সব যম দূত, রজপুত আদি কতকগুলি।
সেপাই আইল সব লয়ে বন্দুকগুলি॥
ফৌজ সব এল যত, কব কত, বর্ণিতে না পারি।
নারকেলবেড়ে হল জ্যান১ যম রাজার পুরি॥

১. জ্যান=যেন

কামানের শব্দ শুনে ফকির পানে, মৌলুবী চায়।
বুজরুগী সব ফাঁকি জান গেলোরে হায়॥
ফকির বলে তখন, বাপুধন, ভয় করবে কারে।
এই দ্যাখ গোল্লা খাই হজরতের বরে॥
সেটাত মিথ্যা নয়, সত্য হয়, গোল্লা খেতে হবে।
মৌলবী কেঁদে বলে উজীর কেডা লবে॥
কাপটেন সাহেব জোরে, ফকিরেরে কহেন এক কথা।
দস্তগির হবে কি লড়ায়ে দিবে মাথা॥
ফকির বলে ভাই, লড়াই চাই, দস্তগির্ না হব।
গোল্লা মার এখন আমি ধরে ধরে খাব॥

ত্রিপদী।

বলে ফকির, কোথায় উজীর,
হুকুম জারি করে।
শুনে উজীর, হলো হাজির
ফকিরের হুজুরে॥
হুকুম তায়, কারে ভয়,
লড়াইতে সাজে।
দিয়ে সায়, উজীর যায়,
হেদাতের মাঝে॥
করে ধুম বড় জুম,
মৌলুবি সব মাতে।
কেউ ঢাল, তলওয়ার,
পিস্তল লয়ে হাতে॥
ধায় নেড়ে, কাদা পেড়ে,
বলে আয় খিরে।
হাঁকে, হাঁকে, ঝাঁকে ঝাঁকে,
ইঁট ফেলে মারে॥

ইংরেজে, সবে সাজে,
হুকুম দিল ক্যাপ্‌টেনে
হুকুম পেয়ে, সেপাই ধেয়ে,
যায় কেল্লা পানে ॥
তোপ ছাড়ে, দেড়ে পরে,
মরে ঝাঁকে ঝাঁকে।
ঘোর শব্দ, শুনি স্তব্ধ,
আল্লা বলে ডাকে ॥
কোন দেড়ে, যায় দৌড়ে,
শুরুক্ সন্তারে কাটে।
কোটা ফাটে, ধূম ওটে,
বোমের গোল্লা ছোটে ॥
কব কত, মমীন্ যত,
পলায়ে যায় ঘরে।
হক কয়, মিথ্যা নয়,
গেলা ছারে খারে ॥

আমাদের উদ্ধৃত গাথা-গানগুলিতে তিতুমীরের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত হয়েছে ; তা বোধ করি এই ;—

এক. তিতুমীরের ধর্মনৈতিকতা,

দুই. তিতুমীরের সাম্প্রদায়িক মনোভাবটি,—অর্থাৎ তিতুমীর হিন্দু বিদ্বেষী ;

তিন. প্রতিবাদী তিতুমীর, — অর্থাৎ তিতুর জমিদার ও নীলকরদের বিরোধিতা করেছেন।

বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে তিতুমীরের আন্দোলনকে ধর্মৈষণা-সঞ্জাত বলেই মনে হবে। অনেকে এমন ধারণা-ও পোষণ করেন। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলেছেন, "এই আন্দোলন ইংরেজের বিপক্ষ গিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রধানতঃ Direct Action-এর চোট পড়িয়াছিল হিন্দুর উপরে।"৫২ কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় লিখেছেন, "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নদীয়ার রাজনৈতিক গগনে একটা অশুভকর জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয় ; সেটী তিতুমীর

নামে খ্যাত জনৈক ধর্মোন্মত্ত বলদৃপ্ত মুসলমান।"৫৩ বিহারিলাল সরকার তিতুর কর্মকাণ্ডের যে তথ্যবিবৃতি দিয়েছেন তাতে স্পষ্টিকৃত হয়েছে যে, তিতুমীর শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছিলেন।

তৎকালীন নীলকর, জমিদারের উৎপীড়ন ও "সামন্ততান্ত্রিক প্রভুত্বই যে ওয়াহাবী নায়ক তিতুমীর কর্তৃক আরব্ধ মুসলমান ধর্মের সংস্কার-আন্দোলন হইতে এই ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল ;" এমন মন্তব্য করেছেন শ্রীসুপ্রকাশ রায়।৫৪ স্মিথ সাহেব তাঁর গ্রন্থে৫৫ লিখেছেন, "The mutiny, like political Jihads of the "Wahhabis" emphasizes the Muslim Community of India as a religio-political unit; but at the sametime emphasized cooperation between that community and the Hindus in face of a common enemy." অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয়সম্প্রদায় একত্রে শত্রুর মোকাবিলা করেছে। কারণ, উভয়ের মূল শত্রু ইংরেজ। তাই স্মিথ সাহেব স্পষ্টত-ই বলেছেন : "they proclaimed a jihad against the infidel, and appealed not only to the oppressed to unite against their exploiters, but to the Muslims to unite for the defence of their religion. None of these political activities, however, was anti-Hindu."৫৬

কুয়েমুদ্দিন আহ্‌মদ তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, ওহাবীদের আন্দোলন হিন্দুদের বিরুদ্ধে সুরু হয়েছিল ; এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন।৫৭ থর্নটন লিখলেন, ইংরেজ নীলকর ও জমিদারদের সীমাহীন অত্যাচার তিতুমীরকে ধর্মীয় আন্দোলনের পথে ঠেলে দিয়েছে।৫৮

ইতিহাস পর্বে আমরা লক্ষ করেছি, তিতুমীর সর্বপ্রথম জমিদারদের ওপর আঘাত দেওয়ার প্রয়াস পান নি। তাঁর ধর্মীয় ধ্যান ধারণার ওপর প্রথম কুঠারাঘাত করেছিলেন প্রতাপশালী জমিদারগণ। এর ফলেই তিনি বিদ্রোহী।

এই প্রসংগে দু একটি মন্তব্য উদ্ধার করি। ইংরেজ সরকার জে. আর. কলভিন নামে একজন পদস্থ ইংরেজকে প্রেরণ করলেন বিদ্রোহ-ভস্ম বারাসতে। উদ্দেশ্য, তথ্যানুসন্ধান।৫৯ ৪৫টি অনুচ্ছেদের সুদীর্ঘ রিপোর্টে কলভিন সাহেব তিতুমীরের বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলার পর্যালোচনা করেছেন। তিনি লিখছেন এই বিদ্রোহ বা হাঙ্গামা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমিত ছিল।

এই বিদ্রোহ কৃষক ও মুসলমান তন্তুবায়দের দ্বারা সংগঠিত। তিতুমীরের ধর্ম সংস্কার আন্দোলন আবেদন নিবেদন প্রান্তের মধ্যেই ছিল। এ নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামার কিছু হয়েছে বলে জানিনা। কতিপয় স্থানীয় জমিদার হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ লাগিয়ে লাভবান হতে চাইলেন। এক্ষেত্রে কলভিন সাহেব কয়েকজন জমিদারের নাম-ও করেছেন। তাঁরা হলেন তারাগনিয়ার রামনারায়ণ নাগ, নগরপুরের গুরুপ্রসাদ চৌধুরী, খোরগাছির মহিলা জমিদারের এজেন্ট এবং পুঁড়ার কৃষ্ণদেব রায়।

কলভিন তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন, বিদ্রোহী চাষীদের মনে উন্মাদনার সৃষ্টি হয়েছে বটে তবে "Their proceedings at the sametime it should be mentioned were not marked by any acts of gross cruelty"। মনে হয়, বিদ্রোহ ঘটনাটি সাময়িক উত্তেজনার ফল স্বরূপ। নারকেলবেড়িয়ার গ্রামে ইংরেজ বিতাড়নের চক্রান্ত অনেক দিনেরই "Tittoo Meer's sect have been long in the habit of talking of schemes against the Government". (অনুচ্ছেদ—২৬)। তিনি স্পষ্ট লিখলেন: এই বিশৃঙ্খলা, বিচ্ছিন্নতার মূল গভীর প্রোথিত। এর বিদূরণ সহজ নয়। কলভিন সাহেব কিছুটা আত্ম-বিশ্লেষণ করে যা লিখলেন, তার সারমর্ম এই: জমিদারেরা রায়তের ওপর অমিত শক্তি প্রয়োগ করে থাকেন। ইংরেজ প্রশাসনের ত্রুটির ফলেই সাধারণের অবস্থা, মনোভাব দুর্জ্ঞেয় থেকেছে। এ ক্ষেত্রে প্রভাবশালী এক পক্ষের ওপর নির্ভর করাটাই একটা ঝুঁকি। (অনুচ্ছেদ-৩৭)

বলাবাহুল্য, কলভিন সাহেবের মনোদর্শন যথার্থই। কুয়েমুদ্দিন আহ্‌মদ-ও বারাসত বিদ্রোহীদের দমন প্রসংগে প্রভাবশালী একটি পক্ষের ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। "It is also significant that the initial efforts against the insurgents were made by the planters themselves. It was due to their persistent representations that the authorities finally took steps against the rebels. Their representations themselves are proof of the fact that the Rising was directed against and affected the vital interests of the planters as a class."৮০ সুতরাং এটি অনুমেয় যে, ইংরেজ প্রশাসনের ব্যর্থতা

নিহিত ছিল একটি গোষ্ঠির প্রতি নির্ভরতায় আর সাধারণ জনসমাজ থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকা ও অবজ্ঞা করার মধ্যে।

তাই বলা যেতে পারে, তিতুমীর নিছক ধর্মৈষণার সংকীর্ণ সরণিতে চলেন নি। এবং তাঁর বিদ্রোহ হিন্দুদের বিরুদ্ধে-ও ছিল না। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের সংস্কার ও ইংরেজ বিতাড়ন—এই দুটির মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ যখন ত্বরান্বিত হয়, তখনই ধর্ম সংস্কারের মনোভাবটি শিথিল হলো। ফলত, বাঙালাদেশে তিতুমীরের ধর্মীয় আন্দোলনটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পালাবদল হলো।

৪. সাজন-সায়রি…

ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস তিতুমীরের নামে রচিত একটি গানের পুথির সন্ধান দিয়েছেন।৬১ চব্বিশ-পরগণা জেলার বাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত রামচন্দ্রপুর গ্রামের সহর আলি মণ্ডলের নিকট সেটি পাওয়া গেছে। বর্তমানে রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীপ্রভাতকুমার পাল মহাশয়ের কাছে পুথিটি আছে। এটি সাজন গাজীর গান বা 'সায়রি'। সাজনের গাওয়া গান কাঁকড়াসুতি গ্রামের পরাণ মণ্ডল শিখেছিলেন। পরাণ মণ্ডল তাঁর পুঁজি সহর আলি মণ্ডলকে দিয়ে যান। সহর আলি মণ্ডল মৌখিক প্রচার ভিত্তিক গানগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। পুথিটির ভাষা ও বানানের অশুদ্ধি আছে। এতে বাংলা ও আরবী শব্দের বাহুল্য ও আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ রয়েছে।

পুথিটির বিষয়বস্তু তিতুমীরের যুদ্ধ কাহিনী। কিন্তু পুথিটি খণ্ডিত হওয়ায় মূল কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এতেই জানা যায়, সাজন গাজী তিতুমীরের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এর জন্য তাঁকে সাত বছর মেয়াদে কারাভোগ করতে হয়। এই সময় তিনি তিতুমীরকে নিয়ে গান রচনা করেন। সাজন তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেন :—

মোরসেদের বাহুর তলে
মাচার সাজন বলে
ফজল কর আল্লি জেলপাকড়
মায়নি হালদারের পাড়ি

মেসে সোমপুর বসতি
জমা রাখি পাশ আউসে সোমপুর ॥
বড় ভাই-এর নাম মাজন্
ছোট পাগলা মেজ সাজন
ছোট ভাই গিয়েছে মরে।
সাজন বড় গোনাগার
সাত বছর মেয়াদ তার
কয়েদ হল দিনের লড়াই করে ॥

সাজন জানিয়েছেন, প্রজারা বিদ্রোহী। কারণ পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মুসলমান প্রজার দাড়ি পিছু আড়াই টাকা কর ধার্য করায় প্রজারা রুষ্ট। তাঁর গান ;—

নামাজ পড়ে দিবা-রাতি
কি তোমার করিল খেতি
কেন কল্লে দাড়ির জরিপানা।
খেপেছে যতেক দেড়ে
কেষ্টদেবের লম্ফি ছেড়ে
পুড়োয় কল্লে পীরির কারখানা ॥ [লিপি পৃষ্ঠা ১০]

সাজন তাঁর গানে ইংরেজ সহায়তা পুষ্ট জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের পীড়ন দমন মূলক কাহিনী তুলে ধরেছেন। কয়েকটি শব্দ চিত্রে তিতুমীরের বীরত্ব কাহিনী-ও বর্ণনা করেছেন। সাজন হিন্দু সম্প্রদায়ের ভূমিকায় তুষ্ট না হলেও তাদের প্রতি কটাক্ষ করেন নি। অবশ্য তার ক্রোধ ছিল ইংরেজ ও সামন্ত শ্রেণীর প্রতি। এই ক্রোধের কারণ-ও ছিল। একটি উদাহরণ স্বরূপ জমিদার কালীপ্রসন্নের কপট বিবরণটি লক্ষ করা যায়। এতে তিতুমীরকে কটাক্ষ করা হয়েছে বটে তবে তাঁর মহত্ব অনুচ্চারিত নয়।

হয়দরপুর ঘর তার নাম তিতুমীর।
মক্কা-মদিনায় গিয়ে হইল হাজির ॥…
নামাজ রোজা শেখাইল রাখতে বলত দাড়ি।
দিনের তারিখ শেখায়ে ফেরে বাড়ি বাড়ি ॥

পাপ-গোপা বদকাম তাও করে মানা।
বাংলায় জারি করে আরবের কারখানা ॥...
না বুঝে যে কেইবেব করিল বাহানা।...
কি দাড়ি আড়াই টাকা জরিপানা হয়।
সেইজন্য সরাঅওলা বড় খাপা হয় ॥
[লিপি পৃষ্ঠা ২৮]

রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সাধারণ মানুষের, তা কবির ভাষে বলে ;—

"গোলাম মাছুম হুকুম দিল লাঠি কেয়া সব হাতে নিল
ইট-পেটকেল ধরিল সব জোনাজাত ॥ [লিপি পৃষ্ঠা ১৭]

ফিরে আবার বন্দুক তাড়ে বাঘে যেমন...পড়ে
গুলী পুরতি নাহি দিল আর।
গোলাপ গিয়ে মারে লাঠি লেগে গেল দাঁত কপাটি
পিছন্দে পালায় চৌকিদার ॥ [লিপি পৃষ্ঠা ২১]

চুল ধরে মার ঝিকে তিন চার হাত ফিকে
আছাড় মারে চুর্ণ করে হাড় ॥ [লিপি পৃষ্ঠা ২২]

মৌখিক গানগুলির হয়তো রূপান্তর হয়ে থাকবে কিন্তু এতে তিতুমীরের সংগ্রামী মানস, ন্যায়পরায়ণতার প্রতি সাধারণ মানুষের আন্তর নিবিষ্টতা লক্ষ করা যায়। কবির বর্ণনা আলংকারিক নয় বটে, তবে মৌলপ্রচার ও তিতুর আদর্শ কথন বুঝতে অসুবিধে নেই। ডক্টর দাস বলেছেন: তিতুমীরের গান মূলতঃ আদর্শপরায়ণ যোদ্ধাদের বীরত্ব গাথা। এ যুদ্ধ কাল্পনিক যুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধের বর্ণনায় তাই নেই বজ্র, নেই মন্ত্রপূতঃ বারি।"৬২

৫. তিতুমীর ও বাংলা নাটক...

এক

'তিতুমীর'

১৩৮১ সালে 'অভিনয়' পত্রিকার শারদীয়া সংকলনে 'তিতুমীর' নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয়েছে। এটির রচয়িতা শ্যামাকান্ত দাস। নাটকটি ছোটো, সাতার পৃষ্ঠার।

ধর্ম অধর্ম নিয়ে বাক্-ভঙ্গি বেশি থাকলে-ও তিতুমীরের রাজনৈতিক চিন্তাধারা এতে বিঘোষণ করা হয়েছে। রাজ শক্তির বিরুদ্ধে তিতুমীরের যে লড়াই এবং স্বাধীন ভারত গড়ার যে স্বপ্ন তাঁর ছিল; তা নাটকটিতে উচ্চকিত হতে পেরেছে। নাট্যকারের ভাষ্যে তিতুমীরের বীর্যকণ্ঠ: "ভাইয়েরা একটা কথা কিন্তু মনে রাখবে আমাদের ইতিহাস লড়াইয়ের ইতিহাস। ফিরিঙ্গীরা যতদিন এদেশে থাকবে ততদিন আমাদের নিস্তার নেই।...মনে রেখো চূড়ান্ত জয়ের পূর্বে আমাদের কারও শান্তি নেই। বাঁশের কেল্লায় যে আগুন জ্বলছে একদিন লালকেল্লা সে আগুনের ঝাপটায় লগ্‌লগ্ করে জ্বলে উঠবে।"৬৩

পুঁড়ার জমিদার কৃষ্ণদেব রায় তিতুমীরের ওপর যে বৈরীভাব পোষণ করতেন, তার ইংগিত এখানে আছে। ইংরেজ ও জমিদারদের ওপর তিতুমীরের কঠোর মনোভাব, ভণ্ড মোল্লা-মৌলভীদের প্রতি তাঁর অনমনীয় নীতি নাটকে উপস্থাপিত।

নাট্যকার তিতুমীরের চরিত্র চিত্রণ করেছেন উদ্দেশ্যমূলক। তবু-ও দেশ হিতৈষী তিতুমীরের বাদশাহ হবার পরিকল্পনাকে কটাক্ষ করেছেন। এটি নাটকের উদ্দেশ্যের সংগে বেমানান।

নাম প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছু ঐতিহাসিক ভ্রম আছে বটে, যেমন কেভিত, জনসন, ভার্জিনিয়া, রবার্ট, মরগ্যান প্রভৃতি। তবে নাটকের আঙ্গিক ও উপস্থাপনা চিত্তাকর্ষক হয়েছে বলা যায়। নাটকটি বহুল প্রচার হয়নি।

দুই
'বাঁশের কেল্লা'

"বাঙলা আমার সোনার মাটি বাঙলা মোর ভাই।
মায়ের গেহে ভাই-এর স্নেহে কতই সুধা পাই।।
কোরাণে আর পুরানেতে,
রাম-রহিমে এক সুরেতে,
মায়ের দুঃখে বুক ভাসাতে কোথাও দেখি নাই।।"

এটি একটি গীত। নাটকের। নাটকটির নাম 'বাঁশেরকেল্লা'।৬৪ প্রসাদকৃষ্ণ ভট্টাচার্য এর রচয়িতা। উপরোক্ত গীতটিতে নাটকের মূলতত্ত্ব আভাসিত। কিন্তু উপস্থাপনার মধ্যে সে তত্ত্বটির আলোকোৎসার হলো না। চারিদিকে ষড়যন্ত্র, হত্যার মধ্যে নাটকটির পরিসমাপ্তি।

তিতুমীর কৃষক নেতা। দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন। ইংরেজের পক্ষে কর্ণেল সুবেদার সিং তিতুমীরকে বন্দী করার চেষ্টা করছেন। জমিদার কালীপ্রসন্ন ইংরেজের সহায়তায় ব্যস্ত। জমিদার কর্মচারী হীরালাল, ব্যবসায়ী দীনবন্ধু হাতী, মিস্কিন ফকির এসব চরিত্র কলুষ-কর্মে নিমগ্ন।

অথচ জমিদারের ভাগ্নে অনাদি ও সুবেদার পত্নী ভলি তিতুমীরের স্বদেশ-ধ্যান অনুধাবন করেছেন। জীবন দিয়ে অনাদি তিতুমীরের পার্শ্বচর হিসাবে বন্ধুতা রক্ষা করেছেন। তিতু-ভগ্নী পিয়ারা দেশপ্রেমিকা। সে ভালো-বেসেছে অনাদিকে, অনাদি-ও। কিন্তু রুস্তম নামে অপর এক যুবক ভালোবাসে পিয়ারাকে। নির্বিবাদী অনাদি দেশ ত্যাগ করে রুস্তমকে পথ করে দেয়। পরে অবশ্য রুস্তমের ফাঁসি হয়, ইংরেজের বিচারে।

মিস্কিন ফকিরের ষড়যন্ত্রে সুবেদার সিং তিতুর পুত্র বাদশাকে গুলি করে হত্যা করে। সুবেদার সিং পত্নী ভলিকে ভুল বুঝেছেন। সন্দেহের উচ্চপ্রস্রবনে বিভ্রান্ত সে।

তিতুমীর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। নারিকেলবেড়িয়ায় তৈরী হয়েছে বাঁশের কেল্লা। কালীপ্রসন্ন ইংরেজের পক্ষে। যুদ্ধে প্রাণ দিলেন তিতুমীর। প্রাণ দিয়েছেন সুবাদার সিং, মিস্কিন ফকির ও অনাদি। আরো অনেকেই।

কলিকাতা হইতে অশ্বারূঢ় ও পদাতিক সৈন্য প্রেরিত হইয়া তিতুমির যবন এককালীন নিপাত হইল।"৭২

বলাবাহুল্য, রাজভক্ত শিক্ষিত বাঙালী এসব সংবাদ পরিবেশন করেছেন। তাই তিতুমীরের সংগ্রামী চেতনার মধ্যে 'রাজবিদ্রোহি কর্ম্ম' লক্ষ করেছেন তাঁরা। বিস্ময়ের অবকাশ থাকেনা, যখন রেনেসাঁর যুগন্ধর পুরুষ রামমোহন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন ৭৩; ইংরেজ শাসনজনিত সুদিনের জন্য, তখন বাঙলারই এক গ্রামে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য জনমত তৈরী করছেন যিনি এবং বাঁশের কেল্লা তৈরী করে দেশের স্বাধীনতার জন্য যেসব মানুষ জীবন দিচ্ছেন; তাঁদের কথা প্রচারিত হয়না, আদর্শ-ও কথিত হয় না। এ আর যাইহোক, সুসাংবাদিকতাতো নয়ই, এবং নীতি নির্ভর মানসিকতার-ও পরিচয় বহন করে না।

।। তিন ।।

বান্ধব পত্রিকা ১২৮৮, নবম সংখ্যা। পৃ. ৩১৬
শ্রীজ-লিখিত প্রসিদ্ধ তিতুমীর।
(গানের দুই চারটি অন্তরা)

"নারিকেলবেড়ের তীতুমীর বুজরগি করিল।
যতসব মিঞা মোল্লা,
বানায়ে বাঁশের কেল্লা,
ফিরিঙ্গী বাদসার সনে লড়াই জুড়িল ।।
মরি হায় হায়, হায় মরি হায়রে হায়!
সবে জব্দ হলো, কেল্লা গেল, মারা পলো
তীতুমীর।
হায় মজারবুজরগি তার হইল জাহির ।।
জলুনী উঠিয়া বলে উঠরে জোলা ঝাট
হাজাম বাড়ী যেয়ে শিগ্‌গীর গোঁপ দাড়ি
কাট ।।"

॥ চার ॥

The India Gazette (November 25, 1831)

এতে 'Barraset Insurrection' নামে একটি লম্বা চিঠি বের হয়। লেখক নাম গোপন রেখেছেন। তবে এটুকু সংবাদ জানিয়েছেন যে তিনি শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের কেউ। উল্লেখ, এ রকম 'A Proprietor of East India Stock, Serampore, Nov. 21, 1831' এই চিঠিতে পাদ্রি-সাহেবের ক্ষোভ, রোষ প্রতিফলিত। ত াঁর ক্ষোভের কারণ কলকাতা থেকে 'half an hour's ride' এর মধ্যে ঘটনাস্থল, অথচ ইংরেজ শাসকের সর্বোচ্চ অধিনায়ক করছেনটা কি—কেমন ক'রে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত দেশে ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত করেছে। আর রোষের কারণ, কেমন করে 'শেখ তিতু' নামে ব্যক্তিটি দুটি জেলা জুড়ে (নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা) লুণ্ঠন ও দৌরাত্ম্য স্বরু করার সাহস পেয়েছে। ত াঁর লেখনী থেকে পড়া যাক :

"Sheik Teetoo begins by plundering a considerable portion of two districts, which he modestly calls his collection of the land revenue; and assuming the title of Commissioner, he actually sets about organizing something of a regular form of Civil Government. I am credibly informed Sir, that for some days Sheik Teetoo held his cuacherry with a regularity and despatch which some of the Company's functionaries might do well to imitate."

আমাদের উদ্ধৃত চিঠির গভীরতা পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট অনুমান সম্ভব যে, পাদ্রিসাহেবের ক্ষোভ-রোষের কারণের মধ্যে আছে ;—

এক. বাধাবিহীনভাবে তিতুমীরের সাংঘাতিক অগ্রগমন, রাজস্ব আদায় ও কমিশনারের ভূমিকা পালন।

দুই. তিতুমীরের প্রায় নিয়মিত শাসনকার্য পরিচালনা ;

তিন. তিতুমীরে কাছারি পরিচালন ক্ষমতা এমনই ; তা কোম্পানীর শাসকেরা-ও অনুকরণ করতে পারেন।

এর থেকে দুটি ইংগিত স্পষ্ট ১. শাসকদের অক্ষমতা ২. তিতুমীরের আশ্চর্য ক্ষমতা। এর ফলেই পাদ্রিসাহেবের অন্তরগহন থেকে তিতুমীরের জন্য বিষম ঘৃণা প্রদর্শিত হয়েছে। তা-ও দুটি শব্দে 'শেখ তিতু।'

এসব প্রায় মেলে না। ছড়াগুলি খণ্ডিত, সংক্ষিপ্ত। অথচ এতে ইতিহাসের ভাবসংগতি বেশ স্পষ্ট। একসময় এসব ছড়াগুলি বারাসত, গোবডাঙ্গা, বসিরহাট অঞ্চলে শিশুরা গ্রামীণ লৌকিক খেলাধুলায় গান করতো, আবৃত্তি করতো। এতে তীব্র আনন্দ ও অনুপ্রেরণা পেত বলেই মনে হয়।

ছড়াগুলি এইরকম :—

১. 'মারি ঢেলা বেনজামিন'—এই ছড়াটি শিশুরা ঘুঁটি খেলা, ঘুড়ি ওড়ানো, আমপাডা প্রভৃতিতে আবৃত্তি করতো। অর্থাৎ নির্দিষ্ট বস্তুকে আক্রমণ করা। এখানে আমরা স্মরণ করি সেরপুরের নীলকুঠির ম্যানেজার বেঞ্জামিনের ভূমিকাটি। তিনি ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডারের সহযোগী হয়ে তিতুকে দমন করতে এলে প্রতিপক্ষের আক্রমণে অর্থাৎ ইষ্টক পিষ্ট হয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অথবা,

২. 'কৃষ্ণদেবের চেলা
মারি ঢেলা।'

—অনুমান করি, কৃষ্ণদেবের চেলা বলতে ছড়াকার কৃষ্ণদেবের বিশ্বস্ত পাইক মতি উল্লাহের (মতান্তরে মতিউদ্দিন) প্রতি ইংগিত করেছেন। বলা-বাহুল্য, তার চরবৃত্তির জন্য তিতুর আক্রোশ ছিল তার ওপর।

৩. 'বাঁশের কেল্লা
ইটের ঢেলা
তার দশতল্লা'—এই ছড়াটি কাঁধ-ওঠানি (কাঁধ-চড়ানি) খেলাতে আবৃত্তি হতো। একজনের কাঁধে আরেক জন উঠতো। এইভাবে কয়েকজন মিলে ব্যূহ রচনা করতো। এতেই আনন্দ। এ ছড়াটিতে তিতুর বাঁশের কেল্লার প্রকোষ্ঠ বা স্তরবিন্যাসের ইংগিত মেলে। এবং স্তরে স্তরে বিভিন্ন অস্ত্র সাজানো থাকতো। ইষ্টকখণ্ড, বেল প্রভৃতি-ও থাকতো।

৭. সাময়িক সাহিত্য...

॥ এক ॥

আমরা 'সমাচার দর্পণ'৭১ পত্রিকা থেকে তিতুমীরের কিছু সংবাদ পেয়েছি। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের যে 'বর্ষফল' বেরিয়েছে, তাতে উল্লেখিত হয়েছে,—

"নভেম্বর, ১১। তিতুমীর নামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে রাজবিদ্রোহি কর্ম্ম আরম্ভ করে। তাহারা আপনারা মৌলবী নামে খ্যাত হয় এবং তাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাট করে এমত বোধ হইল। ঐ তিতুমীর সৈয়দ আহমুদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে ঐ সৈয়দ আহমুদ শ্রীযুত রণজিৎ সিংহের দেশে উৎপাতকরণের উদ্যোগে হত হয়।

নভেম্বর ২৭। বারাকপুর হইতে এক রেজিমেন্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও দমদমা হইতে কতক অশ্বারূঢ় তাহারদের প্রাতিকূল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও তাহার অনুচর ৮০।৯০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়।"

॥ দুই ॥

(২২ এপ্রিল ১৮৩৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৭)

"শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।... সংপ্রতি জিলা নদীয়ার অন্তঃপাতি নারিকেলবা ড়িয়া গ্রামে তিতুমির নামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছায় দলবদ্ধ হইয়া প্রথমত গোবরডাঙ্গা নিবাসি বাবু কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ধন প্রাণ আঘাতের বিষয় এবং আর ২ হিন্দুরদিগের জাতি প্রাণ ধ্বংসকরণে প্রবর্ত্ত হইলে তথাকার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এ বিষয় দাঙ্গা বোধ করিয়া ফৌজদারী নাজির মহাম্মদ পুলিষকে কএকজন চাপড়াশ সমেত নারিকেলবাড়িয়া পাঠাইয়াছিলেন। দুষ্ট জবনেরা নির্দ্দয়তারূপে ঐ অভাগা পুলিষ নাজিরকে বধ করিলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের রিপোর্ট মতে

এক সময় কালীপ্রসন্নের ভুল ভাঙলো। কিন্তু তখন বীরোত্তরের মৃত্যুলগ্ন। তবু-ও তাঁর অন্তিম বাসনা জানিয়ে গেলেন; বিদেশী দুষমনের হাত থেকে গরীব-দুঃখী দেশবাসীকে বাঁচাতে, দেশের স্বাধীনতা আনতে গাঁয়ে গাঁয়ে গড়ে তুলতে হবে "বাঁশের.কল্লা"।

পঞ্চম অংক বিশিষ্ট নাটকটি এখানেই শেষ। নাটকটির মধ্যে কয়েকটি ঐতিহাসিক নাম ব্যবহার হলেও নাটকটি ঠিক ঐতিহাসিক নয়। কাহিনী-বন্ধনে নাট্যকারের ত্রুটি লক্ষণীয়। তিতুমীরের ভাবাবেগ. দেশহিতৈষণা আরো স্পষ্টরূপ লাভ করতে পারতো কিংবা তিতুমীরের সংগ্রামী চরিত্র।

কাল্পনিক রেখাচিত্রে সুবেদার সিং ও ভলির প্রেম কাহিনী কিংবা অনাদি ও পিয়ারার কাহিনী নাটকের প্লটে দুর্বল গ্রন্থি।

আশার কথা। বাঙলা সাহিত্যে তিতুমীরকে নিয়ে নব মূল্যায়ন সুরু হয়েছে। তাঁর কৌতুহলোদ্দীপক জীবন-বেদ নিয়ে রচিত ও অভিনীত হচ্ছে বহু নাটক। যে আবেগ বিদ্রোহের দীপ-শিখা তিতুমীর জালিয়ে ছিলেন; তারই অন্তর্লীন প্রবাহ মেলে এসব নাটকে।

৬. তিতুমীর ও প্রবাদ···

তিতুমীর প্রবাদ পুরুষ। তাঁর সংগ্রামী মানস ও কর্মিষ্ঠতার জন্যই তিনি প্রবাদে পরিণত হয়েছেন। অবশ্য তাঁর নিন্দাবাদও অনেক। এর কারণ তাঁর বিদ্রোহ পরিকল্পনার মধ্যে ত্রুটিও বড় কম নয়। যেমন;—

১. তাঁর বিদ্রোহের মৌল প্রেরণা ইসলাম ধর্ম-সংস্কার সাধনের মধ্যে নিহিত ছিল বলে হিন্দু সমাজের বৃহৎ অংশের সমর্থন আদায় করতে তিনি পারেননি।
২. একটি পরিকল্পিত রাজনৈতিক কর্মসূচী না থাকায় বাদশাহী কেতাবে রাজত্ব্য-দম্ভী ঘোষণার ফল তাঁকে পেতেই হয়েছে।
৩. সংগ্রামী মানসের বৃহৎ আবেদন ও কর্মিষ্ঠতা সীমায়িত তখও নারিকেল-বেড়িয়ায় সংবদ্ধ থাকায় এর ব্যাপ্তি ঘটেনি। ফলত, তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।
৪. মারণাস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাঁর মুক্ত লড়াই দূরদর্শিতারই অভাব।
৫. তাঁর বাঁশের কেল্লা দুর্ভেদ্য দুর্গ নয়।

তাই, তিতুমীরের বিদ্রোহ-কাহিনী প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। আমরা তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি প্রবাদ উল্লেখ করতে পারি।

১. 'তিতুমীরের বাদসাই'।৬৫ অর্থাৎ অল্পদিনের প্রভুত্ব।

২. 'গোলা খা ডালা'।৬৬ এই বাক্যের মধ্যে গূঢ় ইংগিত আছে। বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার যখন বাঁশের কেল্লার সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিতুমীরকে বশ্যতা স্বীকার করতে বলেন; তখন তিতুমীর আলেকজাণ্ডার বাহিনীকে আক্রমণ চালান। ম্যাজিস্ট্রেট বিদ্রোহীদের ভীতি প্রদর্শনের জন্ম কামানের ফাঁকা আওয়াজ করেন। এতে তিতুর দলের কোনো ক্ষতি হলো না। তিতুর বাহিনী ভাবলো, হজরৎ আলি (তিতুমীর) তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা বলে গোলা খেয়ে ফেলেছেন।

আবার অন্যরকমও বলা হয়। তিতুমীরের সংগী ছিলেন, জনৈক ফকির মিস্কিন শাহ। মিস্কিন শাহ ইংরেজের বিরুদ্ধে তিতুমীরকে উত্তেজিত করেছিলেন। তিনি অলৌকিকশক্তি দিয়ে গোলা-গুলী খেয়ে ফেলতে পারতেন, এমন বিশ্বাস তিতুর দলের অনেকেই করতেন।

৩ 'সরষে খেতে পড,
আর গোলা খেয়ে মর,
মুকি আর আল্লা,
বলন্তি দিলে না।'৬৭ মুকি=মুখে
এতে যুদ্ধ, যুদ্ধের পটভূমি আর মর্মান্তিক পরিণতি ইংগিতবহ।

৪. 'হেই বন্‌বন্‌ ঘোরে লাঠি তিতুমীরের হাতে
ফট্ ফটাফট্ গুলী চলে বাঁশের কেল্লা ফতে।'৬৮
যুধ্যমান দুটি দল। লাঠি ও গুলী নিয়ে লড়াই ও তার শোচনীয় পরিণতি এতে বিধৃত।

৫. 'শালা, যেন তিতুমীরের লাঠি।' ৬৯
কথান্তর : 'তিতাই লাঠি'—তিতুমীরের কর্মজীবন সুরু হয়েছিল লাঠিয়াল হিসাবে। বোধকরি, সুখ্যাতি ও কুখ্যাতি তিনি দুই-ই অর্জন করেছিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর লাঠি প্রবাদ-বস্তু।
এ ছাড়া আরো কয়েকটি প্রবাদ ছড়ার৭০ আকারে প্রচলিত ছিল। এ সব ছড়াগুলি লৌকিক খেলাধুলার সময় ব্যবহৃত হতো। আজ আর

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ,সমাচার দর্পণ' বর্ষফল নিয়ে একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত সম্ভব। তিতুমীরের দুই জীবনীকার তিতুমীরের পতন ও মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ১৪.১১.১৮৩১ তারিখ। কিন্তু সরকারী দলিলে অন্যরকম বলা হয়েছে। ১৯. ১১. ১৮৩১ তারিখ ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার কমিশনার বারওয়েলকে তিতুমীরের মৃত্যু খবর জানিয়ে লিখলেন, "I consider that the bodies of the dead should be burnt, particularly as their leader Titoo Meer is among them and they might take his body and bury him as a martyr."৭৪ এতে কিন্তু একটি কথা স্পষ্ট। আলেকজাণ্ডার অবচেতন মনে সত্য প্রকাশ করেছেন; অর্থাৎ তিতুমীরকে শহীদ ভাববার কারণ তাঁহলে আছে!

'সমাচার দর্পণ' সাময়িক পত্র থেকে জানা যায়, তিতুমীরের মৃত্যু হয় ২৭. ১১. ১৮৩১ তারিখে। এ প্রসংগে উল্লেখ্য 'বিপ্লবী ভারত' প্রণেতা ৭৫ লিখেছেন ১৪. ১১. ১৮৩১ তারিখে, ইংরেজ শাসক তিতুমীরকে দমন করার জন্য কলিকাতা থেকে এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন বটে, তবে "বিদ্রোহীদের দুর্বার আক্রমণের সম্মুখে তাহারা দাঁড়াইতে পারেনা।" এরপর "১৭ই নভেম্বর আবার চেষ্টা হয়। বিদ্রোহীরা অসীম সাহসে রুখিয়া দাঁড়ায়।" তিনি আরও লিখলেন; "১৭ই নভেম্বর পরাজয়ের স্মৃতি মুছিতে না মুছিতে সরকারী দপ্তর বিদ্রোহ দমনে নূতন আয়োজন করে এবং যুদ্ধে বিদ্রোহীদের ভাগ্য-সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। যুদ্ধে তিতুমীর প্রাণ হারান।" ১৭ই নভেম্বরের পর তিনি কোনো তারিখ দেননি বটে, তবে এক্ষেত্রে সরকারী রিপোর্টের সাহায্যে অনুমান করা চলে যে, তারিখটি হলো ১৯. ১১. ১৮৩১। সুতরাং সমাচার দর্পণের উল্লেখিত তারিখ ২৭. ১১. ১৮৩১ ঠিক নয়।

আমরা আলোচ্য পর্বে দেখ্‌ছি, তিতুমীরের সংগ্রাম সাধনা ছিল রাজনৈতিক মুক্তির অভিমুখী। কিন্তু রাজশক্তির দুর্বার আঘাতে তাঁর বীর্য-দীপ্ত সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে। তাহলে-ও "ভবিষ্যৎকালের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি রচনার দিক হইতে এই বিদ্রোহ সার্থকতা মণ্ডিত হইয়াছে। কামানের মুখে বিদ্রোহের নায়ক তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা' শুষ্ক পত্রের মত উড়িয়া গেলেও ইহা বংশ পরম্পরায় বাঙালী জনসাধারণের চিত্তভূমিতে ভবিষ্যৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে অজয় দুর্গ রচনা করিয়া রাখিয়াছে, ইংরেজ শাসকগণ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও কোনোদিন তাহার ভিত্তি টলাইতে পারে নাই।"৭৬

পাদটীকা

১. এই মতের সমর্থন পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত গ্রন্থে :

১. W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, 3rd edition, London, 1876.

২. Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam in India*, 2nd edition, Lahore, 1947.

৩. Edward Thornton, *The History of the British Empire in India*, 5th Volume, London, 1843.

৪. বিহারিলাল সরকার, তিতুমীর বা নারকেল বেড়িয়ার লড়াই (১৩০৪)

৬. অশোক গুহ, শহীদ তিতুমীর (প্রবন্ধ) শারদীয় স্বাধীনতা, ১৩৫৫
কিন্তু আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন "নজদ্ বা নেজদের শেখ আবদুল অহাব কোন ধর্মমত প্রচার করেন নাই অথবা কোন ধর্মমতের সংস্কার করেন নাই।" শহীদ তিতুমীর, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৬৮, পৃ ৩৮

২. প্রাগুক্তগ্রন্থসমূহে প্রকাশ যে, সৈয়দ আহ্মদ ওহাবী মতে দীক্ষিত হয়ে দেশে ফিরেছিলেন। আসলে হজরত শাহ সৈয়দ আহ্মদ রেলভী ছিলেন দিল্লীর প্রাতঃস্মরণীয় আলেম ও সাধক হজরত শাহ আবদুল আজীজের শ্রেষ্ঠ খলীফা। আবদুল আজীজের মতবাদই তিনি গ্রহণ করেছিলেন।
দ্র, আবদুল গফুর সিদ্দিকী. শহীদ তিতুমীর, পৃ. ৩৮। এবং সুকুমার মিত্র, ঊনবিংশ শতকের বাংলাসাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র, ১৩৬৬, পৃ. ৫০

৩. W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, P. 159

৪. Ibid, P, 160

৫. Ibid, P, 171

৬. Ibid, P, 171

৭. Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam in India*, P. 189

৮. Dr. R. C. Mazumdar, *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol. IX, Part I, P, 901.

৭১. দ্র, ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', দ্বিতীয়খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৪, পৃ. ৬৫৮

৭২, তদেব, পৃ. ৩৭৯

৭৩. দ্র, রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী,

৭৪, প্রসংগ-বিনয় ঘোষ, তিতুমীরের ধর্ম এবং বিদ্রোহ (প্রবন্ধ) শারদীয় এক্ষণ ১৩৮০ পৃ ১ Judicial Department Records, 1831-32. Fort William, the 22nd November 1831 এবং Fort William, the 3rd April 1832-এর মধ্যে তিতুমীরের বিদ্রোহ বিষয়ক চিঠিপত্র, রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। এ ছাড়া দ্রষ্টব্য General letter for Court (Judicial) No. 6 of 4th Dec. 1833.

৭৫, তারিণীশংকর চক্রবর্তী, বিপ্লবী ভারত, ১৩৫৫, পৃ. ৩-৪

৭৬. সুপ্রকাশ রায়, তদেব, পৃ. ২৩২

।। তিতুমীর-স্মরণিকা ।।

এক. তিতুমীরকে 'পীরের' মর্যাদা দিয়েছেন ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস।
দ্র, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা।

দুই. তিতুমীর মক্কা থেকে প্রত্যাগমনের সময় একটি শঙ্খ এনেছিলেন। শঙ্খটি দর্শনীয়, আকারে সুবৃহৎ। বাদুড়িয়ার তিতুমীরের প্র-পৌত্র আবদুল কাদেরের কাছ থেকে সেটি সংগ্রহ করেছেন অধ্যাপক শান্তিময় রায়। সেটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে আছে।

'তিতুমীর বন্দর'। পূর্ব পাকিস্তান, অধুনা বাংলাদেশের খুলনার রূপসা নদীতে যে দ্বিতীয় নৌঘাঁটিটি তৈরী করেছিলেন তৎকালীন সরকার তার নামকরণের ব্যবস্থা হয়েছিল, 'তিতুমীর বন্দর'। দৈনিক পয়গাম. । প্রসংগ—এম. আবদুর রহমান, শহীদ বীর তিতুমীর,

সুবৃদ্ধ সাহিত্যিক মনোজ বসু তাঁর একটি গ্রন্থের নাম রেখেছেন, 'বাঁশের কেল্লা।' সম্ভবত, তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা শব্দটিতে তিনি প্রভাবিত হয়েছেন।

একটি সাক্ষাৎকার। ১. ৬. ১৯৮০ তারিখ

৬২।১।১ মিয়াজান ওস্তাগার লেন, কলকাতা ১৬ ঠিকানায় থাকেন বৃদ্ধ আবদুর রাজ্জাক খাঁ। একদা রাজ্যসভার সদস্য-ও ছিলেন। তাঁর তিতুমীর সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই। তিতুমীরের কথা বলতে গর্ব অনুভব করেন। এর একটু মূল আছে।

বেলভী মক্কায় গিয়েছিলেন সতের জন শিষ্য নিয়ে। সংগে তিতুমীর। আর ছিলেন ফরাজী নেতা হাজী শরিয়তুল্লা এবং খাঁ সাহেবের দাদামশায় (মায়ের বাবা) হাজী মকীজউদ্দিন খাঁ (হাকিমপুর গ্রাম, থানা বরুণনগর) এবং প্রপিতামহ হাজী নজীর উদ্দিন খাঁ। পিতৃ-মাতৃকুল পরিচয় প্রসংগে তিতুমীরকে জড়িয়ে আনন্দবোধ করেন তিনি।

তিনি যা বলেছেন, কথাগুলি সাজিয়ে দিই:

১, বারাসত (তিতুমীর) ও ফরিদপুরে (ফরাজী) যেসব বিদ্রোহ হয়েছে তা ছিল Permanent Settlement-এর বিরুদ্ধে। ব্যাপক অর্থে ইংরেজের বিরুদ্ধে।

২. তিতুমীর বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আদৌ কেল্লা তৈরি করেননি। হাজী মকীজ উদ্দিন ও নজীর উদ্দিনের লোকেরা বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি আস্তানা তৈরী করেছিলেন সংগঠনের প্রয়োজনে।

৩. ওহাবী কোনো ধর্মীয় সংকীর্ণ নীতি নয়।

৪. তিতুমীরের বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করার অপরাধে প্রপিতামহকে বারাসত জেলে গুলি করে মারা হয়। ইনি মুর্শিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন। আর মাতামহ মক্কায় পালিয়ে যান।

৩৬. অনেকেই বলেছেন ছড়া, কিন্তু এর প্রকৃতি বিবেচনা করলে বোঝা যাবে এর রূপ গাথার মতোই। 'গাথা' অর্থে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দ কোষ' গ্রন্থে জানিয়েছেন :

"১. গান. যশোগীত. গুণকথা, গুণবর্ণনা।

২. বিষয় বিশেষের বর্ণনাত্মক কথা।"

'গাথা' সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে 'সাহিত্যপর্বে' আলোচনা করা হয়েছে।

৩৭. "সাহিত্যে তিতুর জীবনী অল্পমাত্র স্থান পাইয়াছে। সাধারণ কেবল দুই একটি ছড়ার তাহার জীবনীর আভাসমাত্র পাইয়া থাকে।" দ্র, তিতুমীর, পৃ. ৮

৩৮. সুকুমার মিত্র, ঊনবিংশ শতকের বাংলাসাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র, ১৩৬৬ পৃ. ৫২

৩৯. তদেব, পৃ. ৫৩

৪০. শেখ গোলাম মাসুম ছিলেন 'শহীদ তিতুমীর' গ্রন্থ প্রণেতার বড়ো চাচা আল্লারাখা সুফি খোদদাদ সিদ্দিকী রাজীর শ্যালকপুত্র।
প্রসংগ—শহীদ তিতুমীর, পৃ. ৭১

৪১. 'তিতুমীর' উপক্রমণিকা, পৃ. ৩
তু. "বাল্যকাল হইতে তিতু নিজ ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল। নিজ ধর্ম্মে যেমন অনুরাগ ছিল নিজ সম্প্রদায়ের উপর ততোধিক মমতা ছিল।"
দ্র, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ, ১৩০৪ পৃ. ৭৪১

৪২. বিহারিলাল সরকার, তদেব, পৃ. ২১-২২

৪৩. তদেব, পৃ. ৪৭

৪৪. তদেব, পৃ. ৪

৪৫. তদেব, পৃ. ৪-৫

৪৬. দ্র, নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত, বিশ্বকোষ, সপ্তমভাগ, ১৩০৪, পৃ. ৭৪৩

৪৭. তিতুমীর, পৃ. ৫৯

৪৮. তদেব, পৃ. ৫৭-৫৮

৪৯. তদেব পৃ. ৫৩-৫৫

৫০. তদেব, পৃ. ৭০

৫১. তদেব, পৃ. ৮-১৩

৫২. ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম. ১ম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯' পৃ. ৮৯

৫৩. কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী. দ্বিতীয় সংস্করণ. ১৩১৯, পৃ. ৭৩

৫৪. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম,

৫৫. Wilfred Cantwell Smith, *Modern Islam in India*, 2nd edition 1947, P. 193

৫৬. Ibid, P. 192

৫৭. Qeyamuddin Ahmad, *The Wahabi Movement in India*

৫৮ Edward Thornton, *The History of the British Empire in India*, Volume. V, 1843. Pp, 186-187

৫৯. A report on 'Titumir and disturbances in Baraset' was furnished by J. R. Colvin. to E. R Barwell, dated 8th March, 1832
দ্র, Judicial Department No 5 of 3rd April, 1832 এই প্রসংগে দ্রষ্টব্য General letter for court (Judicial) No. 6 of 4th Dec 1833

৬০. *The wahabi Movement in India*, P. 34

৬১. পুঁথিটির জন্য দ্রষ্টব্য ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা,

৬২. তদেব. পৃ. ১৮৯

৬৩. অভিনয় পত্রিকা, পৃ, ১১৮৩

* অসিত চৌধুরীর কাছ থেকে জেনেছি, নাটকটির শিল্পগত ত্রুটিজনিত কারণে দর্শকদের ভালো লাগেনি। তাই এর অভিনয় অন্তত ছ'টি রজনীর বেশি হবেনা, বন্ধ হয়, একথা তিনি বলেছেন।

৬৪ প্রসংগ—বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, পৃ. ১৮২-১৮৬। নাটকটির কোনো সংস্করণ পাওয়া যাচ্ছে না।

৬৫. নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ, পৃ. ৭৪৪

৬৬. তদেব, পৃ. ৭৪৪

৬৭. বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, পৃ. ১৯১

৬৮. তদেব, পৃ. ১৯১

৬৯. তদেব, পৃ. ১৯২

৭০. বারাসত নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের কাছে ছড়াগুলি শোনা। তিনি জানিয়েছেন, তাঁর পিতার ছেলেবেলায় এমনসব ছড়া কাট্‌তো খেলুড়ে-শিশুরা।

১০. দ্র, "Wahabism started from Arabia as a puritan upsurge and has been aptly described as Anabaptist in faith, Red republican in politics. A contemporary of Rammohan impotted it into India, and Patna became a leading centre of the new cult." দ্র, Amit Sen, *Notes on the Bengal Renaissance* ; Bombay, 1946, P, 41.

* সেই সময় বাদুড়িয়া নদীয়া জেলার অন্তর্গত ছিল। দ্র, কুমুদনাথ মল্লিক, নদীয়া কাহিনী, ১৩১৯, পৃ, ৭৩

১১. ড গিরীন্দ্রনাথ দাস, তিতুমীরের জন্ম তারিখ নির্দেশ করেছেন ১৪, ৩. ১৭৭২। দ্র, বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা, পৃ. ১৭৮। কিন্তু আবদুল গফুর সিদ্দিকী (শহীদ তিতুমীর' গ্রন্থ, পৃ. ১) তিতুমীরের জন্মসাল নির্দেশ করেছেন ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দ। এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্য ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সংহতি সমিতির উদ্যোগে তিতুমীরের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকী পালিত হয় সুতরাং এর থেকে বলা চলে, তিতুমীরের জন্মসাল ১৭৮২ না হওয়াই সম্ভব। কুমুদ নাথ মল্লিক মহাশয়-ও ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের কথা উল্লেখ করেছেন। তদেব, পৃ. ৭৩

১২. তিতুমীরের নামের পেছনে একটি কারণ আছে। নিসার আলির বয়েস যখন পাঁচ-ছয়, তখন তাঁর ভীষণ অসুখ হয়। গৃহে গাছ-গাছড়ার ঔষধ প্রস্তুত করে তাঁকে সেবন করানো হতো। সেবনীয় ঔষধটি ছিল মহাতিক্ত। তাতে শিশু নিসার আপত্তি ছিল না। "দৌহিত্রের এই অবস্থা দর্শন করিয়া জয়নব খাতুন আদর করিয়া নিসার আলীকে 'তিতামিঞা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নিসার আলী সেই তিতামিঞা হইতে তিতুমীর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।"
দ্র, শহীদ তিতুমীর, পৃ. ১৫

১৩. অশোক গুহ, শহীদ তিতুমীর, (প্রবন্ধ) শারদীয় স্বাধীনতা, ১৩৫৩, পৃ. ১১৪

১৪. বর্তমান কলিকাতায় যে স্থানে রাজাবাজার ট্রাম ডিপো, ঐ স্থানের নাম ছিল বিবিবাগান। বিবিবাগানের মালিক ছিলেন শামসুন নিসা খানম। এখানেই তিতুমীরের প্রথম পরামর্শ সভার অধিবেশন বসেছিল।
সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী তিনবার কলিকাতায় এসেছিলেন। কলিকাতায় উক্ত বাগান বাড়ীতেই অবস্থান করতেন। আবদুল গফুর সিদ্দিকী, তদেব, পৃ, ৪২

১৪ক. তদেব, পৃ-৩৬

১৫. তদেব, পৃ. ৩৬-৩৭

১৬. তদেব, পৃ. ৪৮

১৭. তদেব, পৃ, ৪৯

১৮. মুসলমান ভক্তেরা তিতুমীরের নাম উচ্চারণ করতেন না। তাঁরা তিতুমীরকে হজরত আলি বলেই সম্বোধন করতেন। তদেব, পৃ. ৪৯

১৯. প্রসংগ—শহীদ তিতুমীর. পৃ. ৫০

২০. তদেব, পৃ, ৫৩-৫৪

২১. তদেব, পৃ, ৬০

২২. তদেব, পৃ. ৬০। বহারিলাল সরকার, তিতুমীর, পৃ. ৩৭

২৩. প্রসংগ—শহীদ তিতুমীর, পৃ. ৬৪

২৪. তদেব, পৃ. ৬৪

২৫. তিতুমীর, পৃ, ৪৮

* স্মরণ করা যেতে পারে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে মোল্লা আটীর নীলকুঠির অত্যাচারের কাহিনী ই চিত্রিত করেছেন।

২৬. আবদুল গফুর সিদ্দিকী লিখেছেন, গোবরা গোবিন্দপুরের জমিদার দেবনাথ রায় তিতুমীরকে প্রথম আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর সংগে ছিল এক সহস্র সৈন্য। কিন্তু বিহারিলাল সরকার লিখেছেন পাঁচশত সৈন্য নিয়ে তিতুমীর দেবনাথ রায়কেই আক্রমণ করেছিলেন।

২৭. তিতুমীর, পৃ. ৫৩

২৮. শহীদ তিতুমীর, পৃ ৭৮। বিহারিলাল সরকার লিখেছেন, "মনোহর রায় শক্তি সামর্থ্য এবং অর্থ সাহায্য তিতুর অনেক উপকার করিয়াছিলেন।" তিতুমীর, পৃ. ৮০

২৯. শহীদ তিতুমীর, পৃ. ৮৭

৩০. তিতুমীর, পৃ. ৭০

৩১. তদেব, পৃ. ৭০-৭১

৩২. শহীদ তিতুমীর, পৃ. ৯৪। দ্র, তিতুমীর, পৃ. ৯১

৩৩. তিতুমীর, পৃ. ৯৮

৩৪. অশোক গুহ, শহীদ তিতুমীর (প্রবন্ধ) শারদীয় স্বাধীনতা, পৃ. ১১৯

৩৫. "বলিতে গেলে ইহারাই বাঙ্গালার প্রথম সন্ত্রাসবাদী এবং ইহাদের মধ্য হইতেই প্রথম রাজনৈতিক আসামী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।"
দ্র, ড. সুশীল কুমার গুপ্ত, ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালার নবজাগরণ, ১৩৬৬ পৃ, ২৫৩

দ্রষ্টব্য প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর, কারাদণ্ডের কথা হুকনলি সাহেব তাঁর 'The *Wahhabis in India*' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। কিন্তু বিহারিলাল সরকার বলেছেন ৩৫০ জন আসামীভুক্ত হয়েছিল। বিচারে ১৪০ জনের কারাদণ্ড হয়। এবং মাসুমের ফাঁসি হয়। প্রসংগ, তিতুমীর, পৃ. ৯৯

অষ্টম অধ্যায়

ফরাজী বিদ্রোহ

(১৮৩৮-১৮৫৭)

ক. ইতিহাস পর্ব.

১. শরিয়তুল্লার জীবন-ভাষ্য

২. দুদুমিঞার সাংগঠনিক নেতৃত্ব

খ. সাহিত্য পর্ব.

১. ফরাজী ও জীবনচরিত

২. সাময়িক সাহিত্য

৮ ॥ অধ্যায় ঃ ফরাজী বিদ্রোহ

ক. ইতিহাস পর্ব

১. শরিয়তুল্লার জীবন-ভাষ্য··

ওহাবীদের ন্যায় ইসলাম ধর্মের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে সুরু হয়েছে ফরাজী বিদ্রোহ। যদি-ও ফরাজীমতের প্রবর্তক শরিয়তুল্লা বাঙলায় এ ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন ওহাবী আন্দোলনের বেশ কিছু পূর্বে। কিন্তু এর ব্যাপ্তি ও বহুল প্রচার হয়েছে ওহাবীনেতা তিতুমীরের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পর।

বাঙলাদেশের ফরিদপুরে এই আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত। পরে ঢাকা খুলনা ও চব্বিশ পরগণা জেলাতে-ও এর বিস্তার ঘটে। 'ফরাজী' শব্দটির অর্থ হলো আল্লার আদেশ। তাই, ইসলাম ধর্মের মৌলবাণী সাধারণের কাছে সহজ সত্য করে দেবার ব্রত নিয়েছিলেন ফরাজী সম্প্রদায়। এরই প্রথম উদ্‌যোক্তা হলেন শারয়তুল্লা। জীবনব্যাপী তিনি সংগ্রাম করলেন ধর্ম সংস্কার সাধনের। উৎপীড়ন. অনাচার বিনষ্টির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এমনকি, ধর্মের নামে যে শোষণ তা-ও বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই, মৌলবীদের স্বার্থ সিদ্ধিতে প্রথম কুঠারাঘাত করলেন। জুম্মানামাজ, ঈদ, মহরম উৎসব বাতিল করে দিলেন। আর, 'পীর', 'মুরিদ' অর্থাৎ গুরু, শিষ্য নিয়ে যে বহু-বচন ছিল তার-ও বিরোধিতা জানিয়ে বললেন, মানুষে মানুষে গুরু শিষ্য সম্পর্ক থাকতে পারে না; যা পারে তা হলো 'ওস্তাদ' ও 'সাগরেদ'-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক।[১]

ফল কথা, শরিয়তুল্লা অনেকেরই বিরাগভাজন হলেন। রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে বিষনজরে দেখলেন। আর, তিনি যেসব জমিদার ও নীলকর অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালিয়েছেন; তাদের রোষান্বিত দৃষ্টি থেকে তিনি নিস্তার পেলেন না। তাই তিনি পালিয়ে ফিরেছেন ঢাকা থেকে ফরিদপুর, আবার কখনও বা সেখান থেকে অন্যত্র।২

এই যুগন্ধর পুরুষটির পরিচয় প্রসংগে ডঃ জেমস ওয়াইজ লিখলেন যে, শরিয়তুল্লা ফরিদপুর জেলার বন্দরখোলা নামক স্থানে একজোলা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। আঠারো বৎসর বয়েসে তিনি মক্কায় গেলেন। সেখানে তিনি ওহাবী মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে কুড়ি বৎসর পর স্বদেশে ফিরলেন। জেলাভি-মুখে এসে ডাকাতদলের হাতে পড়ে তিনি সর্বস্বান্ত হলেন। সঞ্চয়ের ঝুলিতে ছিল কিছু পুথি ও আরবদেশের চিহ্নস্বরূপ কিছু মূল্যবান দ্রব্যাদি। এসব হাতছাড়া হওয়াতে জীবনধারণের মৌল প্রেরণা অসংবৃত্ত হয়ে ওঠে। তার চেয়ে বরং ওদের দলে থাকলে ওদেরকে পবিত্র পথে ফিরিয়ে আনার সফলতা অর্জন করা যায়। এ কথা ভাবলেন। চেষ্টা করলেন। সফল-ও হলেন তিনি। এই সফলতার কারণ হিসাবে ডক্টর জেমস ওয়াইজ লিখেছেন; **"The simplicity of his religious convictions awakened the consciences of these wickedmen, who ultimately became his most zealous followers."**৩

শরিয়তুল্লার ধর্মৈষণা ও সুমিত-সংযত ব্যক্তিত্বের স্পর্শে ফরিদপুরের জনমানস সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছেন। নোতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছেন। এর ফলেই **"His influence became unbounded and no one hesitated to carry out his orders."**৩ক

২. দুদুমিঞার সাংগঠনিক নেতৃত্ব...

শরিয়তুল্লার স্বপ্ন রূপ দেবার চেষ্টা করলেন তাঁর পুত্র মহম্মদ মহসীন ওরফে দুদুমিঞা। সাধারণ মানুষ দীপ্ত আবেগে সমধিক উচ্চারণ করেছেন তাঁর নাম। ফরাজী সম্প্রদায়ের কাছে তিনি পুজো পেয়েছেন ভক্তি-চন্দনে।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুরপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তরুণ বয়সেই তিনি মক্কায় গেলেন। দেশে ফিরে তিনি পিতার অসম্পূর্ণ কাজ শুরু করলেন।

তিনি প্রত্যক্ষ করলেন, সর্বত্রই চলছে শোষণ, নিপীড়ন। এর মূলে রয়েছে ইংরেজ শাসন। তাই তাঁর অন্তঃস্বভাবে স্ফূর্তি হয়েছে ইংরেজ শাসনের উৎখাত ও স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস। শুরু হলো তাঁর বৈপ্লবিক সংগ্রাম। এরজন্য তিনি ফরিদপুরের বিভিন্ন স্থানে সফর করলেন। জনসাধারণের কাছে নীলকর ও জমিদারদের হরেক শোষণের সূত্র বিশ্লেষণ করলেন। তিনি বোঝালেন মানবাধিকার ও সমতার ক্ষেত্রে উঁচু নীচু ভেদ নাই। জীবনধারণ ও স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সকলেই সমান, কোনো পার্থক্য থাকা উচিত নয়।৪

বিভিন্ন প্রচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি বাঙালীর সংগ্রামী চেতনাকে তীব্র করে তোলেন। তাঁর ক্রমান্বিত প্রয়াসে দলের শক্তি বৃদ্ধি পেল। ফলত, দুদুমিঞা সর্বত্রই নিপীড়িত অসহায় মানুষের কাছে বন্দিত হতে লাগলেন।

দুদুমিঞা তাঁর অনুচরদের জন্য অনেক কিছু করলেন। ধর্মের জটিল সমস্যার সমাধান করেছেন। জমিজমা বিরোধের নিষ্পত্তি করেছেন। বিচার কার্যও সম্পন্ন করেছেন। অত্যাচারী জমিদারদের বিরুদ্ধে কেউ সাহায্য চাইলে তা-ও তিনি করেছেন। এমনকি, জমিদারের সংগে প্রজার মামলা উপস্থিত হলে তিনি সেই প্রজাকে মামলার জন্য অর্থের যোগান দিতেন। কখনও-বা লাঠিয়াল পাঠিয়ে জমিদারদের শায়েস্তা করতেন। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে হিন্দু জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে এক প্রবল প্রতিরোধ-শিবির গড়ে তোলেন।

এই প্রতিরোধ শিবিরে পঞ্চাশ হাজার হিন্দু-মুসলমান সামিল হলেন। দুদুমিঞা সীমায়িত ভূখণ্ডে শাসনবিধি রচনা করলেন। পূর্বংবগকে কয়েকটি এলাকায় বিভক্ত করে প্রতি এলাকায় একজন করে খলিফা নিযুক্ত করলেন। এদের কাজ ছিল ফরাজীমতাবলম্বীদের প্রতি দৃষ্টি রাখা, যাতে কোনো ফরাজী কোথাও-ও নিপীড়িত না হন। এদের সম্পর্কে দুদুমিঞাকে সংবাদ সরবরাহ করা তাদের অন্যতম কাজ ছিল। এই খলিফাগণ ফরাজীদের কাছ থেকে অর্থসংগ্রহ করতেন, বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজের তাগিদে। জমিদার যখন অবৈধ কর বসাতেন, প্রজাকর আদায় করতেন তখন তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতেন দুদুমিঞা। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে এর ব্যয় মেটানো হতো।৫

এক

বিপরীত বৃত্তক্রান্তিতে ইংরেজনীলকরগণ শোষণ পীড়ন চালাতে লাগলেন। দেশীয় জমিদারেরা এর পেছনে রইলেন। অথচ ফরাজী সংগঠন ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে। তারা ১৮৩৮-এ প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সকল প্রকার অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে ফরাজীদের এই বিদ্রোহকে 'সংগত' আখ্যা দিয়েছেন ডক্টর জেমস ওয়াইজ।৬

এই সময় দুদুমিঞার একটি প্রচার গণসমর্থন পেল। ঐতিহাসিক প্রচার। ভূমি সে তো আল্লারই দান। সুতরাং বংশ পরম্পরায় দখল করে রাখা এবং কর ধার্য করার অধিকার ব্যক্তি বিশেষের নেই।৭ এর ফলে ফরাজীপন্থি-গণ জমিদার নীলকরদের কর দেওয়া বন্ধ করল। যে বিদ্রোহাগ্নি ছড়িয়ে পড়ল তাকে আয়ত্ত আনা স্থানীয় প্রশাসকের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। তাই ঢাকা থেকে বিরাট সামরিকবাহিনী এল। ঢাকা, ফরিদপুর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে রক্তবন্যা বয়ে গেল। উভয়পক্ষেরই হতাহত হলো অনেক। এ সময় দুদুমিঞা লুণ্ঠনের অভিযোগে ধৃত হলেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি মুক্তি পেলেন। এরপর ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে-ও হত্যার দায়ে তিনি বন্দী হলেন বটে। কিন্তু এবারও তাঁকে একই কারণে মুক্তি দেওয়া হয়।

এরপর তিনি এক নোতুন পরিকল্পনা নিলেন। সরাসরি জনশাসন শুরু করলেন। তাঁর জন্মস্থান বাহাদুরপুর গ্রামেই তিনি তাঁর পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেন। প্রজা পরিপালকের ভূমিকা নিলেন। এরজন্য তিনি ঘোষণা করলেন ;

এক. কর দেওয়া হবে না। জমিদার, নীলকরকে আর কর দেওয়া নয়।

দুই. আইনের শাসন তাঁরাই গড়বেন। তাই, বিবাদ-বিসম্বাদের ক্ষেত্রে ইংরেজ আদালতকে বর্জন করতে হবে। বিচার হবে ফরাজীদের স্বতন্ত্র আদালতে। এর অন্যথা যে করবে তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে ; একথা-ও জানালেন।

এই ঘোষিত নীতি যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা, কিংবা ফরাজীপন্থী কেউ অত্যাচারিত হচ্ছে কিনা সংবাদ নেওয়ার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন দুদুমিঞা।৮

উদ্দেশ্য স্পষ্ট। গ্রাম্যসমাজের যে সর্বগ্রাসী শোষক-উপশোষক শ্রেণী ব্রিটিশ রাজদণ্ডাশ্রিত; সেই শ্রেণীর বিরুদ্ধেই ফরাজীদের বিদ্রোহ ও সংগ্রাম। দুদুমিঞা তারই নায়কত্ব করেছেন। ৫. ১২. ১৮৪৬ তারিখে ফরাজীরা ফরিদপুর-পাঁচচরের নীলকুঠির কুখ্যাত নীলকর ডানলপ সাহেবের কুঠি আক্রমণ ও ভস্মীভূত করে। এবং কুঠির গোমস্তা কালীলালকে হত্যা করে। এরপর তারা রাজনারায়ণ সাহার দোকান লুণ্ঠন করে এবং পাঁচচরের অনেক 'বাবু' পরিবারের গৃহ ভস্মীভূত করে।৯ এর ফলে, লুণ্ঠন, হত্যা অপরাধে আবার দুদুমিঞাকে ধরা হয়। বিচারে তিনি ও তাঁর ৬২ জন অনুচর দণ্ডিত হলেন বিভিন্ন মেয়াদে। কিন্তু উচ্চ আদালতে আপীলের ফলে তিনি মুক্তি পেলেন।

আবার, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁকে ধরা হয়। তিনি অভিযুক্ত হলেন সিপাহী বিদ্রোহে ফরাজীদের প্ররোচিত করা ও অংশ গ্রহণের দায়ে। এই সময় ফরিদপুর ও কয়েকটি জেলার জনমানসে দুদুমিঞার জনপ্রিয়তার কথা উল্লেখ করেছেন ডক্টর জেমস ওয়াইজ। এক ডাকে তিনি পঞ্চাশ হাজার সমর্থক জমায়েত করতে পারতেন। দুদুমিঞার বিপুল প্রভাব সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: "His (দুদুমিঞা) name is a household word throughout the districts of Faridpur, Pabna, Bakarganj, Dacca and Noakhali ."১০

বহু বিচিত্র কর্মের এই নিরলস কর্মী যুগের জীবনযন্ত্রণাকে ধারণ করে মহত্তর পরিণামের সংকেত রচনা করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ২৪. ৯. ১৮৬০ তারিখে।১০ক

দুই

ধর্মের নামে সুরু হয়েছে এক আন্দোলন—ফরাজী। কিন্তু রাতারাতি এর গুণগত পরিবর্তন হলো, শোষিত, নিপীড়িত জনমানসের রাজনৈতিক আন্দোলনে। শরিয়তুল্লা যে আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন শোষণ, উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। দুদুমিঞা সেই আন্দোলনকে তীব্র, তীক্ষ্ণ করে সমকালীন জীবনভাবনার বাতাবরণে সমৃদ্ধ করে তুলতে পেরেছিলেন বটে।

তবু-ও বলার থাকে। তাঁর সংগ্রাম কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি। বোধ-করি, দৃঢ় সচেতন সংগঠন, দূরদর্শিতা, বলিষ্ঠ পদক্ষেপের অভাব ও বিলম্বিত প্রয়াসই এর মূল কারণ। আরো একটি কথা। দুদুমিঞার ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ছায়ায়-ও কোনো যোগ্য নেতার আবির্ভাব হয়নি। ফলকথা, দুদুমিঞার মৃত্যুর সংগেই ফরাজী আন্দোলনের সূত্র ছিন্ন ভিন্ন হলো। দুদুমিঞার তিনজন পুত্র সন্তান ছিল। তাঁরা-ও নেতৃত্ব দিতে পারেননি। দুদুমিঞার এক পুত্রের নাম নোয়ামিঞা। তাঁর সাংগঠনিক পরিচালনা কত দুর্বল ছিল তা বারান্তরে বলছি। এখানে এইমাত্র বলি, দুদুমিঞা গ্রামের সীমাবিত প্রাংগণে জন-শাসন প্রতিষ্ঠার যে 'এক্সপেরিমেণ্ট' করলেন, হোক সে একান্ত স্থানিক; তবু-ও তা প্রশংসার্হ।

আলোচনার ধারাসূত্র থেকে আমরা বলতে পারি, ইংরেজ নীলকর ও জমিদারদের শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দুদুমিঞা ও তাঁর ফরাজী সংগঠন যে বিদ্রোহ জানিয়েছেন তা স্বাধীনতার পরবর্তী ইতিহাসকে কালাতিক্রান্তী অভিজ্ঞতায় রূপবদ্ধ করে তুলেছিল। তার কারণ, ঐতিহাসিকের ভাষায়,—
The new movement undoubtedly gave a touch of vigour and resilience to the dormant spirit of the peasantry."১১

খ. সাহিত্যপর্ব

১. ফরাজী ও জীবনচরিত...

নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন' তৃতীয়ভাগে ফরাজীদের সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করেছেন। এতে জানা যায়, দুদুমিঞার পুত্র নোয়ামিঞা পিতার সংগঠনকে জীইয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। আমরা আগেই জেনেছি দুদুমিঞা ফরাজীদের জন্য এক স্বতন্ত্র বিচারব্যবস্থার চালু করেছিলেন। এটি জনশাসনের অঙ্গ হিসাবেই উদ্ভতি নেওয়া হয়েছে। এর দ্বিবিধ উদ্দেশ্য ছিল। এক. ইংরেজ বিচারালয়কে অস্বীকার করে আন্দোলন প্রকাশ করা। দুই. ইংরেজদের অন্যায় বিচার থেকে অব্যাহতি লাভ। ফরাজীরা যে স্বাধীন জীবনচর্যার পক্ষপাতী ছিলেন ; তা এতে স্পষ্টরূপ পেয়েছে বলেই মনে হয়।

নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন "নোয়ামিঞা" স্বনামখ্যাত দুদুমিয়ার পুত্র এবং 'ফরাজি' মুসলমানদের অধিনায়ক।" নবীনচন্দ্র ফরাজীদের পরিচয় প্রসংগে লিখলেন, "ফরিদপুর অঞ্চলের প্রজা অধিকাংশই 'ফরাজি' মুসলমান। নোয়ামিয়ার মুখের কথা তাহাদের পক্ষে বেদ। এ অঞ্চলে নোয়ামিয়া ইংরাজের রাজ্যের উপর এক প্রকার আপনার রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামে তাহার এক সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও পেয়াদা নিয়োজিত ছিল, এবং ইহাদের দ্বারা সে ফরাজিদিগকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত রাখিত।"১২

তিনি জানিয়েছেন, "গ্রামের কোনও বিবাদ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ভিন্ন দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইতে পারিত না। অগ্রে তাহার কাছে বিচার হইত এবং সে অনুমতি দিলে ইংরাজ পুলিসে কি বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত হইত। ইহার ফলে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যে পক্ষ অবলম্বন করিত সে পক্ষ মিথ্যা হইলেও প্রমাণিত হইত।"১৩

এই সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের পরিচয় প্রসংগে নবীনচন্দ্র তির্যক ভঙ্গিতে বলেছেন : এরা "ঠিক যেন আয়নার ছবি। ধরিবার যো নাই। ধরিবে কি, তাহাদের ও তাহাদের পেয়াদাদের নাম পর্য্যন্ত গ্রামের কেহ প্রাণান্তে প্রকাশ করিবে না। যাহাদের সর্ব্বনাশ করিত, তাহারা পর্য্যন্ত নোয়ামিয়ার ভয়ে ইহাদের নাম প্রকাশ করিত না।"১৪

এক

॥ উপাখ্যান ॥

এরপর নবীনচন্দ্র সেন একটি 'উপাখ্যান'১৫ শুনিয়েছেন। তখন তিনি ফরিদপুরের মাদারিপুর সাবডিভিসনের দায়িত্ব নিয়ে সবে এসেছেন। উপাখ্যানটি অবশ্য বুদ্ধি-কৌশলে নোয়ামিঞার দৌরাত্ম্য দমন। তিনি আমাদের একটি ঘটনা শোনালেন।

একটি সভার আয়োজন হলো। এতে আমন্ত্রণ জানানো হলো নোয়ামিঞাকে। আরো একজনকে ডাকা হলো। তিনি হলেন নোয়ামিঞার বিরোধী এক মৌলবী। উভয়েই অনুরুদ্ধ হলেন ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অভিমত প্রদানে। দুজনেই স্বপক্ষ অবলম্বন করলেন। ফলত, এক সময় বক্তব্য তুমুল বাদানুবাদে পরিণত হলো।আসর তখন সরগরম। লোকে লোকারণ্য। সাতটি ঘণ্টা অতিবাহিত। তর্কের শেষ নেই। সিদ্ধান্ত-ও আর হয় না। নবীনচন্দ্র সেন তখন সভাভঙ্গের আদেশ দিলেন। এবং আশ্বাস দিলেন আরেকদিন সভা বসবে। এবপর দুজনকে ভিন্নমুখী রাস্তায় যেতে বললেন।

পরের দিন জনরব উঠল "নোয়ামিয়া হারিয়াছে।" এই শুনে বিষণ্ণ নোয়ামিঞা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এসে জানালেন, হারজিৎ-এর মধ্যস্থতা যখন হয়নি। তখন এই জনরব কে বা কারা তুলেছে তা তিনি জানেন না বটে। কিন্তু এতে তাঁর 'ইজ্জৎ' নষ্ট হচ্ছে। অতএব "এ জনরব মিথ্যা বলিয়া পুলিসের দ্বারা রাষ্ট্র না করাইলে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইবে।"১৬

বলাবাহুল্য, নবীনচন্দ্রের কারসাজিতে এই 'জনরব' ওঠে। এর কৃতিত্ব-ও তিনি দাবি করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল নোয়ামিঞাকে বেকায়দায় ফেলে গোপন তথ্য জেনে নেওয়া। যাইহোক, নবীনচন্দ্র নোয়ামিঞার অনুরোধ মেনে নিতে চাইলেন তিনটি শর্তে।১৭

১. গোপনে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও পেয়াদাদের নামের তালিকা দিতে হবে।
২. সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও পেয়াদাদের ধর্মমত কাজ করার নির্দে'শ দিতে হবে।
৩. যারা জুম্মানামাজ পালন করে, তাদের বাধা না দেওয়া।

এই শর্ত আরোপের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নবীনচন্দ্র সেন নোয়ামিঞাকে বোঝালেন ; এসব তিনি করতে চাইছেন কারণ, বিচারের প্রার্থীদের এই সব সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ও পেয়াদাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

নোয়ামিঞা এই শর্তগুলি মেনে নিলেন কোরান স্পর্শ করে। এর ফলে ফরাজীদের দৌরাত্ম্য কমল। নবীনচন্দ্র সেন এ সম্পর্কে লিখলেন, "আমি যে দুই বৎসর মাদারিপুরে ছিলাম, তিনি (নোয়ামিঞা) এ প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। আমার মাদারিপুর সুশাসনের ইহাই একটি নিগূঢ় তত্ত্ব। যে ডেপুটিরা বিশ্বাস করে যে কেবল বেতপিটিলে ও মেয়াদ দিলে শাসন হয়, এ উপাখ্যান পাঠ করিয়া মত পরিবর্ত্তন করিবেন কি ?"১৮

দুই.

॥ লোক বিশ্বাস ঃ আল্লার ঢিল ॥

"আল্লার ঢিল" ফরাজীপন্থীরা এটি প্রচার করতেন। যখন কোনো উৎপীড়ককে তারা হত্যা করতো কিংবা কোনো কিছুর ধ্বংস করতো ; তখন তারা প্রচার করতো, তা 'আল্লার ঢিলে'১৯ করেছে। একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়। পালঙ থানার এক ব্রাহ্মণ জমিদার পরিবারের তৃতীয় পুত্র এতই অত্যাচারী ছিল যে, তার নাম দেওয়া হয়েছিল 'কংসাবতার'।

ঐ পরিবারের তিনপুত্র তাদের খুড়তুতো ভাইকে ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু হতভাগ্য ভাই নোয়ামিঞার শরণাপন্ন হলেন। তার অংশের সম্পত্তির পত্তনি দিতে চাইলেন নোয়ামিঞাকে। ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্টার জেক্রি সাহেব-ও কংসাবতারের বিরোধী ছিলেন। তবু-ও প্রচলিত আইনে অত্যাচারী তিনি ভাইয়ের বিরুদ্ধাচরণ করা গেল না কিন্তু এদের শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে নোয়ামিঞার দল একদিন রাতে তাদের অত্যাচারী গোমস্তা ও পেয়াদাকে নৌকাতে হত্যা করল, এবং প্রচার করল যে, এ কর্ম'টি আল্লার ঢিলে করেছে। বলাবাহুল্য, নোয়ামিঞার ফরাজী সংগঠন এসব নিষ্ঠুর কর্ম'

এমন নীরবে সমাধা করতো এবং এর কুশলী-প্রচার এতই ব্যাপ্ত হতো যে, লোকসাধারণের মধ্যে 'আল্লার চিল' সম্পর্কে এক গভীর বিশ্বাসের সৃষ্টি হয়।

নবীনচন্দ্রের জীবনচরিতে ফরাজীদের সম্পর্কে এইটুকু-ত সংবাদ। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়, নবীনচন্দ্র সেন কোন্ ফরাজীদের দেখেছেন! আমরা আগেই লক্ষ করেছি, দুদুমিঞার মৃত্যুর সংগে সংগে বিদ্রোহাগ্নি নির্বাপিত হয়েছে। অর্থাৎ যে বিদ্রোহ প্রায় অপ্রতিরোধ্য ছিল। সুতরাং নবীনচন্দ্র সেন যে ফরাজী সংগঠনকে কৌশলে দমন করেছেন, তা ছিল ক্ষয়িষ্ণু এক প্রতিষ্ঠান মাত্র। নোয়ামিঞা যার দুর্বল প্রতিমূর্তি। নবীনচন্দ্র সেন ফরাজীদের দমন ও সুশাসনের নামে আত্মতৃপ্তি পেলে-ও আসলে ফরাজী চরিত্র ও কাঠামো ছিল ভিন্ন ধাতের। তার সংগে নবীনচন্দ্র সেনের পরিচয় ছিল না। তাঁর পরিচয় হয়েছে নিভন্ত আগুনের সহনীয় উত্তাপের সংগে। আর নোয়ামিঞা যদি ফরাজী সংগঠনের পরিচালনার চেষ্টা করে থাকেন তা অপপ্রচেষ্টা ছিল, বলাইবাহুল্য। কারণ, দুদুমিঞার তিন পুত্রের মধ্যে কেউ-ই "as yet exhibited any of the energy and abilities of their father."২০

২. সাময়িক সাহিত্য···

সাময়িক পত্রে প্রকাশিত সম্পাদকীয় নিবন্ধ কিংবা ব্যক্তি বিশেষের সরকারের কাছে নালিশীপত্র সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্রোহ ও সংগ্রাম ভিত্তিক এসব রচনা সাময়িক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কারণ এসব দিয়ে দেশ কাল পরিধির যাচাই সম্ভব। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক পরিমণ্ডলের বিচার বিশ্লেষণ-ও সম্ভব।

ফরাজীদের সম্পর্কিত একটি নালিশী পত্র 'সমাচার দর্পণ'-এ২১ প্রকাশিত হয়। তারিখ ২২ এপ্রিল ১৩৮৭। ১১ বৈশাখ ১২৪৪।

শ্রীযুক্ত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।··· ইদানীং জিলা ফরিদপুরের অন্তঃপাতি শিবচর থানার সরহদ্দে বাহাদুর গ্রামে সরিতুল্লা নামক এক জবন বাদশাহি লওনেচ্ছুক হইয়া ন্যূনাধিক ১২০০ জোলা ও মোসলমান দলবদ্ধ করিয়া নূতন এক সরা জারী করিয়া নিজ মতাবলম্বি লোকদিগের মুখে দাড়ি কাছাখোলা কটিদেশে চর্ম্মের রজ্জু বৈন্দ করিয়া তৎচতুর্দ্দিগস্থ হিন্দুদিগের

বাটী চড়াও হইয়া দেবদেবীর পূজার প্রতি অশেষ প্রকার আঘাত জন্মাই-তেছে এবং এই জিলা ঢাকার অন্তঃপাতি মালকতগঞ্জ থানার সরহদ্দে রাজ-নগর নিবাসি দেওয়ান মৃত্যুঞ্জয় রায়ের স্থাপিত দ্বাদশ শিবলিঙ্গ ভাঙ্গিয়া নদীতে বিসর্জ্জন দিয়াছে এবং ঐ থানার সরহদ্দে পোড়াগাছা গ্রামে একজন ভদ্রলোকের বাটীতে রাত্রিযোগে চড়াও হইয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহার গৃহে অগ্নি দিয়া অবশিষ্ট যে ছিল ভস্মরাশি করিলে একজন জবন ধৃত হইয়া ঢাকার দণ্ডয়ায় অর্পিত হইয়াছে।...আর শ্রুত হওয়া গেল সরিতুল্লার দলভুক্ত দুষ্ট জবনেরা ঐ ফরিদপুরের অন্তঃপাতি পাটকান্দা গ্রামের বাবু তারিণীচরণ মজুমদারের প্রতি নানাপ্রকার দৌরাত্ম্য অর্থাৎ তাঁহার বাটীতে দেবদেবী পূজার আঘাত জন্মাইয়া গো হত্যা ইত্যাদি কুকর্ম্ম উপস্থিত করিলে মজুমদার বাবু জবনদিগের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ অনুচিত বোধ করিয়া ঐ সকল দৌরাত্ম্য ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে জ্ঞাপন করলেন ঐ সাহেব বিচার-পূর্ব্বক কএকজন জবনকে কারাগারে বদ্ধ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিতেছেন। হে সম্পাদক মহাশয় দুষ্ট জবনেরা মফঃসলে এসকল অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে ক্ষান্ত না হইয়া বরং বিচারগৃহে আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। শ্রুত হওয়া গেল ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের হুজুরে যে সকল আমলাও মোক্তারকারেরা নিযুক্ত আছে তাহারা সকলেই সরিতুল্লা জবনের মতাবলম্বি তাহারদিগের রীতি এই যদি কাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করিতে হয় তবে কেহ ফরিয়াদী কেহ বা সাক্ষী হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করে সুতরাং ১২০০০ হাজার লোক দলবদ্ধ ইহাতে ফরিয়াদী সাক্ষির ক্রটি কি আছে। শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম ফরিদপুরের বর্ত্তমান মাজিস্ট্রেট ধর্ম্মাবতার শ্রীযুত রাবর্ট গ্রট সাহেব এমত প্রকার কএক মোকদ্দমা অগ্রাহ্য করিয়া জবনেরদিগকে শাস্তি দিয়াছেন কিন্তু জবনদল ভঙ্গের কিছু উপায় উদ্যোগ করিয়াছেন কিনা শ্রুত হই নাই...। আমি বোধ করি সরিতুল্লা যবন যে প্রকার দলবদ্ধ হইয়া উত্তর ২ প্রবল হইতেছে অল্প দিনের মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম লোপ হইয়া অকালে প্রলয় হইবেক। সরিতুল্লার জোটপাটের শত অংশের এক অংশ তিতুমির করিয়া ছিল না। অতএব আমরা শ্রীলশ্রীযুতের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও দেশরক্ষার নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তির দলভঙ্গের বিহিত আজ্ঞা করুন। ইতি সন ১২৪৩ সাল তারিখ ২৪ চৈত্র। জিলা ঢাকা নিবাসি দুঃখিতাপিগণস্য।

এই পত্রটি পাঠ করলে বেশ স্পষ্ট হয় এটি ফরাজীদের সম্পর্কে বিদ্বেষপ্রসূত লেখা! এতে যে কটি বক্তব্য আভাসিত, তা সূত্রবদ্ধ করা যায় এই ভাবে ;—

১. ফরাজীরা হিন্দুদের সর্বস্ব হরণ ও দেবতাদির ওপর আঘাত করতো।
২. ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আমলা ও মোক্তারেরা সরিয়তুল্লা মতাবলম্বী।
৩. ১২০০০ লোক দলবদ্ধ। অর্থাৎ এরা ফরাজী হিসাবে চিহ্নিত।
৪. হিন্দুধর্ম্ম রক্ষার জন্যই শ্রীলশ্রীযুক্তের নিকট অর্থাৎ ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হিন্দুদেরই আবেদন।

শরিয়তুল্লার আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে আমরা যা জেনেছি, তা থেকে এটি বলা যায়, প্রথম সূত্রটি গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়টি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আমলা ও মোক্তারেরা সবাই মুসলমান না হওয়াই সম্ভব। যদি তাই হয় তবে ধরে নেওয়া যায় ফরাজীরা হিন্দুদের অনেকেরই সমর্থন পেয়েছেন। তৃতীয়টিতে যে সংখ্যাতত্ত্ব জানানো হয়েছে এর অনেকবেশি ফরাজী সমর্থক তাঁর ছিল। তবু এই সংখ্যা মেনে নিলে-ও বলতে হয় এত মানুষ যাঁর পেছনে তাঁকে হিংস্র, উন্মত্ত হিসাবে চিত্রিত করা ঠিক নয়। মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি নির্ভেদজ্ঞান ও মহত্ত কথন যদি ইসলামের আদর্শ হয় তবে সেই ধর্মের প্রচারক হয়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্প্রীতির সম্পর্ককে তিনি অবজ্ঞা করেন কেমন করে! তাই তাঁর কাছে মানুষের সম্পর্কদলিত হতে পারে না। একথা হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রেই সমান প্রযোজ্য। ব্যতিক্রম-ও ছিল। শুধু অন্যায়, অসাম্যের ক্ষেত্রেই তিনি নিয়ন্ত্রক হয়েছেন, সংগ্রামী হয়েছেন।

আরো একটি কথা। ধর্মের আবরণে ফরাজী আন্দোলনকে রূপ দেওয়া হলে-ও এবং জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজাদের বিরোধকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলে-ও আসল সমস্যাটা কিন্তু অন্যত্র। সরকারী রিপোর্টে সে কথা স্বীকার করা হয়েছে যে ফরাজী মতবাদে ধর্মগত সমস্যার চেয়ে কৃষি কেন্দ্রিক সমস্যা বেশি। এই সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধিতে রয়েছে কৃষকশ্রেণী। আর সেকারণেই ইংরেজ কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক উদ্বেগে অস্থির।২২

বিবরণদাতাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, সামাজিক মর্যাদায় আঘাত লাগলেই সরকারী শাসকচক্রের কাছে এঁরা কাতর আবেদন জানিয়েছেন। বলা-বাহুল্য ইংরেজ স্বার্থবাদীদের প্রতি করুণার দৃষ্টি ছড়িয়েছেন নিজেদের বৃহত্তর

স্বার্থেই। স্বার্থের প্রসংগেই সিপাহী বিদ্রোহের সময় গরিবুল্লা নামক জনৈক ব্যক্তির ফরাজী বিবরণ শোনা যাক। তিনি কর্তৃপক্ষকে লিখে জানালেন, বৈঁচা ও মাহেন্দিগঞ্জ থানার অন্তর্গত ফরাজীরা হিন্দুস্তানীদের সংগে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঢাকা ও বাখরগঞ্জ জেলা থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উৎখাত করবে।২৩

মালিকান্দার বাঙালী খ্রীস্টান অধিবাসীরা বেনামীতে ঢাকার কর্তৃপক্ষকে জানালেন। গরিব হোসেন চৌধুরী নামে একজন জমিদার (দুদুমিঞার আত্মীয়) ২৫০০০ লোক সংগ্রহ করেছেন। ইংরেজ সরকার উচ্ছেদ করা-ই তাঁর উদ্দেশ্য। এবং নিজের বাড়িতে বন্দুক প্রস্তুত করছেন। পত্রে বলা হলো, দিল্লীরাজের বন্ধু এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে বিষম ক্ষতি হবে।২৪

এর থেকে অনুমান করা চলে গরিবুল্লার ইংরেজ রাজের ছত্র ছায়ায় নিশ্চিন্ত আশ্রয় লাভই তাঁর স্বার্থ। আবার মালিকান্দার খ্রীস্টান অধিবাসী-দের স্বার্থ ফরাজীদের উত্তরণে সাধিত হবার নয় বরংচ উল্টোটাই। ইতিহাসের ট্রাজেডি সেখানেই।

পাদটীকা

১. L. S. S. O' Malley, *Bengal District Gazeteers : Faridpur*, 1925, P. 38
২. Ibid, P, 39
৩. Dr. James Wise, '*The Muhammadans of Eastern Bengal*' (Article) Published in part III of the Journal of the Asiatic Society of Bengal for 1894. প্রসংগ,—Faridpur D G. P. 38
৩(ক) Ibid, P, 39
৪. Ibid, P, 40
৫. Ibid,
৬. Ibid, P, 41
৭. Ibid,
৮. Ibid, Pp, 40-41 এবং দ্র. Dr. S. B. Chaudhuri, *The Civil Disturbances During the British Rule in India (1765-1857)* 1955, P, 113.

৯. W. Ridsdale, *Trial* etc. (Military Orphan Press, Calcutta, 1848, P, 84) প্রসংগ,—Dr. Chaudhuri, Ibid, P 114 এবং Faridpur D. G. P, 42

১০. Faridpur D. G., P, 39

১০ (ক) Ibid, P, 42

১১. Dr. Chaudhuri. Ibid, P, 113

১২. নবীনচন্দ্র সেন, আমার জীবন, তৃতীয় ভাগ, ১৩১৭, পৃ. ১৪৯

১৩. তদেব, পৃ. ১৪৯

১৪. তদেব, পৃ. ১৫০

১৫. তদেব, পৃ. ১৪৯-১৫০

১৬. তদেব, পৃ. ১৫৩

১৭. তদেব, পৃ. ১৫৪

১৮. তদেব

১৯. তদেব. পৃ. ১৪২-১৪৪। আসলে 'চল' শব্দটির মধ্য দিয়ে লৌকিক সংস্কার ধর্মের আবরণে প্রকাশ পেয়েছে মাত্র।

২০. Faridpur D. G. P. 42

২১. ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮৪ পৃ. ৩৭৯-৮০

২২. Abhay Charan Das, *The Indian Ryot*, 1881 Pp, 564-66

২৩. *Proceedings of the Judicial Department*, 10th Sept, 1857

২৪. Ibid, 6th January, 1857

নবম অধ্যায়

সাঁওতাল বিদ্রোহ

(১৮৫৫-১৮৫৭)

ইংরাজের আতঙ্ক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"১৮৫৫ খৃস্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গভর্মেন্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরাজ সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না। তাহারা কী চায়, কেন বাহির হইয়াছে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। এদিকে পথের মধ্যে পুলিশ তাহাদের সহিত লাগিল, আহারও ফুরাইয়া গেল—পেটের জ্বালায় লুট-পাট আরম্ভ হইল। অবশেষে গভর্মেন্টের ফৌজ আসিয়া তাহাদিগকে দলকে-দলগুলি করিয়া ভূমিসাৎ করিতে লাগিল।...

উপরি-উক্ত সাঁওতাল উপদ্রবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং বীরভূমের রাঙামাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরাজ রাজ হতভাগ্য বন্যদিগের দুঃখ নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন, তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে।...

মনে একবার ভয় ঢুকিলে বিচারও থাকে না, দয়াও থাকে না. আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রে আছে—শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা। কেবল ভূষণ কেন, তাহা স্বাভাবিক বলিলেও নিতান্ত অত্যুক্তি হয় না। যেখানে মনে মনে আত্মশক্তির অভাব-আশঙ্কা হয় সেখানে মানুষ, হয় অগত্যা ক্ষমা করে, নয় লেশমাত্র ক্ষমা করে না—নিষ্ঠুরভাবে অন্যকে ভয় দেখাইতে চেষ্টা করে। অনেক সময় হিংস্র পশু যে অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করে, সকলেই জানেন, ভয়ই তাহার মূল কারণ, হিংস্রতা নহে।..."

রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, জন্মশত-
বার্ষিক সংস্করণ. ১৩৬৮, পৃ ৮৩৮-৮৩৯

৯ ॥ অধ্যায় ঃ সাঁওতাল বিদ্রোহ

ক. ইতিহাস পর্ব

প্রাক্‌কথন...

আঠারো শতকের শেষভাগে ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে সাঁওতালগণ বাঁকুড়া, বীরভূম, মানভূম ছোটোনাগপুর, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দামিন-ই-কো (বর্তমান রাজমহল) এসে ভীড় জমায়। শ্রমকিণাঙ্ক হাতে তারা জঙ্গল কেটে, পাথর সরিয়ে চাষবাস সুরু করে। সেই সঙ্গে সুরু হয় এদের অনাড়ম্বর জীবনচর্যা।

১৮৩২-৩৩ খ্রীস্টাব্দে দামিন-ই-কো-এর সীমানা নির্দ্ধারিত হলো। তখন এর আয়তন ছিল ১৩৬৬·০১ বর্গমাইল। তার মধ্যে ৫০০ বর্গমাইলে কোন পাহাড় ছিল না। সুতরাং ৫০০ বর্গমাইলের মধ্যে ২৫৪ বর্গমাইল নিবিড় বন পরিষ্কার করে তারা কৃষিকাজ সুরু করেছিল। তাদের ক্রমোন্নতি লক্ষণীয়। যেখানে ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে ৪০টি সাঁওতাল গ্রামে ৩০০০ জন বাসিন্দা ছিল; সেখানে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে ১,৪৭৩টি গ্রামের পত্তন হয় ও তাতে বাসিন্দা ছিল ৮২,৭৯৫ জন।১

ইংরেজ সরকার জেমস্ পোন্‌টেট্* নামে একজন ইংরেজকে দামিন-ই-কো অঞ্চলের সুপারিন্‌টেনডেন্ট নিযুক্ত করলেন। ত^ঁার কাজ ছিল রাজস্ব আদায়। ত^ঁার অধীনে চারজন নায়েব সাজোয়াল বা দারোগা ছিলেন, "who used to visit it inorder to collect rent and settle disputes about lands."২ ফৌজদারী ব্যাপারে দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর। তখন থানা ছিল ভাগলপুর, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে।

---

* সাঁওতালরা ডাকতো পান্‌টিন সাহেব।

ফলে, প্রয়োজন দেখা দিলে সাঁওতাল অধিবাসীদের ভাগলপুর বা বীরভূমে যেতে হতো। কিন্তু দূরত্বের কারণে সেখানে সবসময় তাদের যাওয়া হয়ে উঠতো না।৩

তবু-ও তারা দামিন-ই-কোতেই স্বপ্ন দেখতে থাকে। অনেক শ্রম স্বীকার করে এখানে এসেছে তারা। ভেবেছে, পূর্বপুরুষদের রীতিনীতি, আচার-পদ্ধতি, পূজা-পার্বণ পালন করে এখানে বেশ সুখেই থাকবে। এবং সর্ব-সুখের জন্য দায়ী থাকবে গ্রামমাঝি, আর থাকবে পারাণিক, পারগাণাও দেশমাঝি। সুতরাং অসুবিধা হবে না ভেবেই এখানে দলে দলে চলে এসেছে।৪

দামিন-ই-কো-তে সাঁওতালেরা প্রথমে বেশ সুখেই ছিল। কিন্তু "সাঁওতাল-দের ভাগ্যে এই সুখ বেশী দিন সইল না। তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা দেখে ব্যবসায়ী জমিদার ও মহাজনদের দৃষ্টি তাদের ওপর পড়ল।"৫ শোষণ-উৎপীড়ন বাড়ল। ফলে তাদের সুখ অন্তর্হিত হলো।

১. অর্থনৈতিক প্রসংগ...

সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রসংগে এর অর্থনৈতিক দিকটিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ "economic grievances"৬ বা অর্থনৈতিক বিক্ষোভ-ও বলেছেন। শোষণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখব যে, বাঙালী মহাজন* এবং সর্বোপরি ইংরেজগণ সরল প্রকৃতির সাঁওতালদের ওপর যে, শোষণ-উৎপীড়ন সুরু করেছিল তা বর্বরতারই নামান্তর। দারিদ্র্যপীড়িত সাঁওতালগণ একসময় রক্তের শেষ বিন্দুটি দিয়ে শোষকের চাহিদা পূরণ করে এসেছে। কিন্তু ক্ষুধার্ত সাঁওতালগণ নিরুপায় হয়ে যখন জীবন জটিলতাকে উপলব্ধি করতে শিখল, তখনই শোষণের বিরুদ্ধে উপেয়-পথটি বিদ্রোহ বলেই ভেবেছে।

* "The mehazuns have committed *heramis* (Treachary), *pap* (sinful crimes) and all have acted unjustly."

দ্র, Bengal Judicial Proceedings, No-158 14. 2. 1856 ও. ক.

আশ্চর্যের বিষয়, দুর্গম বনাঞ্চলে মেহনতী সাঁওতালগণ যখন শস্য উৎপাদন করল, স্থায়ীবাসের নিম্নতম আস্তানা গড়ে তুলল, তখনই পাকুড় রাজা দামিন-ই-কো থেকে কর চাইলেন। বাঙলা বিহার থেকে মহাজনরা এলেন। তারা ব্যবসায়ের মূলঘাঁটি গড়ে তোলে বারহেত ও হিরণপুরে। এই মহাজনেরা সাঁওতাল অঞ্চলের ইজারা নিয়ে ও সুদের কারবার দিয়ে জাঁকিয়ে বসে। বর্ষার সমাগম হলে এদের মনে তখন আনন্দের প্লাবন বয়ে যায়। হয়তো কিছু খাদ্যশস্য, কিছু অর্থ সাঁওতালদের ঋণ দিয়েছে। সহজ প্রাণের অল্পে খুশি মানুষগুলি এদের কূট-আন্তরিকতা বুঝতে পারত না। এরা বুঝতে পারত না, কিছু কিঞ্চিৎ ঋণের বিনিময়ে কখন তাদের মাথায় ঋণের জগদ্দল পাথর চেপে গেল। এমনকি, সারা জীবনের দাসত্ব-বণ্ড কখন যে দিয়ে ফেলেছে তা-ও না।

এই প্রসংগে হাণ্টারের স্বীকারোক্তি স্মর্তব্য। তিনি লিখেছেন,— অসহায় মানুষগুলোর কোনো সম্বল ছিল না। না জমি, না ফসল। ফলে ঋণ কোনোমতেই শোধ হতো না। পিতার মৃত্যুতে পুত্র মহাজনের নিকট ঋণ নিল। পরদিন থেকে সমগ্র পরিবারটিকে মহাজনের বাড়ীতে কায়িকশ্রম দিতে যেতেই হতো। ঋণের সুদ ছিল শতকরা তেত্রিশ টাকা। ফলে কয়েক বছরে ঋণের বোঝা স্ফীত হয়ে উঠত। শোধের প্রশ্ন ছিল না। তাই, অধমর্ণ সাঁওতালটি মরেও বংশধরের ওপর ঋণের পাহাড় চাপিতে যেত।৭ এমন হতো যে কোন সাঁওতাল যদি মহাজনের দাসবৃত্তি করতে অস্বীকার করত, বা অপরের কাজ করতে যেত তখন প্রভু তার খাবারতো বন্ধ করতই তার ওপর জেলের ভয় দেখাত। হাণ্টার লিখেছেন এইভাবেই "brought the ignorant creature to his knees, by artfully exaggerating the terrors of the Jail."৮

শুধু কি তাই, সাঁওতালগণ উৎপন্ন সামগ্রী নিয়ে বাজারে যেত বিক্রয় উদ্দেশ্যে। মহাজনরা সে সব সামগ্রী কিনে নেবার জন্য অপেক্ষা করেই থাকত। মজার বিষয় হলো এই, মহাজনরা সাঁওতালদের আনীত শস্য কিনত বড়ো বাটখারা 'কেনারাম' দিয়ে। আর, যখন কিছু বিক্রী করত তখন ছোটো বাটখারা 'বেচারাম' ব্যবহার করত। সাঁওতালরা এর নাম দিয়েছিল বড়োবউ ও ছোটো বউ। তাছাড়া অসময়ে ঋণ দিয়েছে, এই অজুহাতে

মহাজনরা ফসল কাটার সময় গরু ও ঘোড়ার গাড়ী নিয়ে হাজির হতেন ঋণগ্রস্ত সাঁওতাল বাড়ীতে। এমনকি, পাথরের টুকরোতে সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে নিয়ে আসতেন। এ দিয়ে বোঝানো হতো সিঁদুর ছোঁয়ান পাথরই ঠিক ওজনের প্রতীক।৯ কৃষকের সকল শস্য নিলেও তার ঋণ মুক্তি হতো না। তার লাঙল, বলদ এমনকি নিজের সমগ্র পরিবারের দাসত্ব-বৃত্তিতে-ও ঋণ পরিশোধিত হতো না। 'ক্যালকাটা রিভিউ'১০ জানিয়েছে :

শুধু জমিদারই নয়, তার গোমস্তা, সরবরাহকার, পিয়ন ও মহাজন পুলিস, রাজস্ব আদায়কারী নায়েব সাজোয়াল এবং আদালতের কর্মচারিগণ একত্রে সকলেই সাঁওতালদের ওপর শোষণ নির্যাতন করেছিল। সম্পত্তি হরণ, অপমান, প্রহার নানাপ্রকার উৎপীড়নতো ছিলই। ঋণের সুদ ধরা হতো শতকরা ৫০ টাকা পর্যন্ত। আরো আছে। সাঁওতালদের পরিশ্রমের ফসল নষ্ট করার জন্য গাধা ঘোড়া জমিতে নামিয়ে দেওয়া হতো। নানাপ্রকার মুচলেকা ও দাসত্বের বণ্ড লিখিয়ে নেওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার।

যারা এই দাসত্ব স্বীকার না করত, তারা আইনের অনুশাসনে সর্বস্বান্ত হতো। আবার এই দাসত্ব থেকে অব্যাহতির জন্য কেউ পালিয়ে যেত তখন দুরাচারী শোষক পাইক পেয়াদা পাঠিয়ে সেই পলাতকের ব্যবহার্য সকল জিনিষই কেড়ে নিত। এমনকি, স্ত্রীলোকের সম্মান মর্যাদার চিহ্ন স্বরূপ লৌহ অলংকারাদিও কেড়ে নেওয়া হতো। সংবাদ প্রভাকর১১ লিখেছে : "দুরাচারী স্ত্রীলোকদিগের আভরণ ও পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত লইয়া গিয়াছে, জননীর ক্রোড়-হইতে শিশুসন্তানকে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্মুখেই বিনষ্ট করিয়াছে।"

সুতরাং মানবতার সকল অধিকারকে অস্বীকার করে হীনপ্রবৃত্তি নিয়ে জমিদার, মহাজন এবং ইংরেজ শাসকগণ অন্যায় অত্যাচার উৎপীড়ন করলেন সরলমতি আদিবাসী মানুষদের ওপর। জীবনে বাঁচার মৌল তাদিগকে যারা ঘৃণার চোখে দেখেছে, যাদের হিংস্র মনোভাব ও দুর্নিবার লোভ অসহায় মানুষদের জীবন বিষময় করে তুলেছে; তাদের প্রতি ইতিহাসের নিষ্ঠুর শাস্তি নেমেই আসে।

এই আদিবাসী জনসমাজ কখনই কৃপা চায়নি। দেহে তাদের অটুট শক্তি। পরিশ্রমে তারা পিছপা ছিলনা। এরা কষ্টসহিষ্ণু ও বটে। খেতখামারে, রেললাইনে যেখানেই কাজের ডাক এসেছে, সেখানেই অন্তর গরজে ছুটে

গেছে। সাঁওতালেরা একসময় ইংরেজদের জানিয়েছিল : কাজে তাদের আনন্দ। তারা চাষার জাত। তাদের শুধু খাওয়া ও থাকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাটুকু করলে তাদের (ইংরেজদের) কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।১২ কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। ইংরেজরা এই ব্যবস্থাটুকু করতে পারেননি। উপরন্তু তাদের ওপর চলেছিল অমানুষিক নির্যাতন।

এটি অনুমেয়, সাঁওতালেরা প্রথমে ইংরেজ বিদ্বেষী ছিল না। কিন্তু সরকারী প্রশাসন তাদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। একজন ইংরেজ লেখক তদগত হয়ে বলেছেন : "it proves that the hostile feeling of the tribe arose, not from an animus against Europeans in general, but merely against Government and the Police."১৩

এক্ষেত্রে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার-ও জানিয়েছেন১৪,—"it was primarily, perhaps mainly due to economic causes, and there was no anti British feeling at the beginning of the outbreak." অতএব, "they turned against the Government when they found that instead of remedying their grievances, the officers were more anxious to protect their oppressors from their wrathful vengeance."

২. বিদ্রোহের বিস্তার···

বাঙালী মহাজন ও কুশীদজীবীদের শোষণ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সাঁওতাল-দের গণসংগ্রাম সুরু হলো। যে অর্থনৈতিক বিড়ম্বনা তাদের জীবনে সুরু হয়েছিল, তা হতে মুক্তি ছিল আসল লক্ষ্য। বীরসিংমাঝি নামে একজন সাঁওতাল সর্দার একটি ডাকাতের দল গঠন করে। মহাজনদের বিরুদ্ধে তার আবেদন ছিল প্রত্যক্ষ ও গভীর। সুরু হলো লুণ্ঠন। বাঙালী মহাজনদের এরা বলে দিকু। এদের প্রতি প্রতিশোধের অন্তহীন পালা উদগ্র হয়েছে।

বাঙালী মহাজনেরা পাকুড় জমিদারের কাছে আবেদন জানায়। জমিদারের নায়েব সে আবেদনে সাড়া দিলেন। তিনি বীরসিংমাঝি ও তার অনুচরদের কাছারি বাড়ীতে আটক রেখে অপমান করেন। এর ফলে বীরসিং আরো উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। এই সময় গোক্কো নামে এক ধনী সাঁওতালকে

মহাজনেরা অপমান করে। সাঁওতাল অধিবাসীরা এ অপমানকে অসহনীয় বলেই মনে করেছে। গোকোর আত্মগত উপলব্ধি ও শপথ লক্ষণীয়। তিনি চ্যালেঞ্জ জানালেন,—দেখি শয়তান দারোগা মহেশলাল শান্তিকামী সাঁওতাল-দের বেঁধে নেওয়ার মতো দড়ি কোথায় পায়।১৫

সাঁওতালদের অসহিষ্ণু প্রাণাবেগ সকল অবরোধ চূর্ণ করে প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংস্থানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। উত্তপ্ত-প্রবাহে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন হলো মাত্র। এই অবস্থা প্রসংগে ক্যালকাটা-রিভিউ পত্রিকার স্বচ্ছ-বক্তব্য লক্ষণীয়: "Their endurance had reached its maximum; and while the spirits of the people were in this condition, it needed but a spark to kindle the fire."১৬

॥ এক ॥

ইংরেজ, জমিদার ও বাঙালী মহাজন সাঁওতালদের ওপর যে অত্যাচার-উৎপীড়ন করলেন তার প্রতিবাদস্বরূপ মুক্ত লড়াইয়ের ডাক দিলেন এক সাঁওতাল পরিবারের চারবীর সন্তান। সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব। তারা সংগ্রামের নেতৃত্ব দিলেন। সিদু ও কানুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সাঁওতাল জাগরণ চরম পর্যায়ে ওঠে। ধর্মের এক অভিনব বাতাবরণে একটি কাহিনী বিবৃত করে গণমানসকে নাড়া দিলেন যুদ্ধের অনম্ভূত এক স্বাদে। তাঁদের আত্মবিবৃতিটি হলো এই;—

দেবতা "প্রথমে আবির্ভূত হলেন আকাশ থেকে নেমে আসা মেঘের আকারে, তারপর একটি অগ্নিশিখার রূপে তৃতীয়বার তাঁর আবির্ভাব ঘটল আবৃত মস্তক এবং এক মূর্তির রূপ ধরে, মুখখানি তাঁর ঘন কুয়াশায় ঢাকা; চতুর্থবার তাঁর প্রকাশ ঘটল পূর্ণ সূর্যালোকে এক ছায়ামূর্তিরূপে, কোন পার্থিব ছায়া সেখানে পড়েনা; পঞ্চমবারে তাঁর অভ্যুদয় হ'ল ভূগর্ভ থেকে হঠাৎ উত্থিত এক পর্বতের মত; ষষ্ঠবার তিনি এলেন এক শালতরুর মত, কোন গাছ সেখানে জন্মায়নি; এবং সর্বশেষে তিনি দেখা দিলেন

সাঁওতালের মত পোষাক পরে এক শেতাঙ্গের মূর্তি ধরে, কোমরে তাঁর একখণ্ড বস্ত্র।"১৭

অন্যত্র১৮

রাত্রিকাল। সিদু ও কানু গৃহে বসে চিন্তায় মগ্ন। এমন সময় ঠাকুর তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি শ্বেতকায় হলে-ও সাঁওতালী পোষাকে সজ্জিত ছিলেন। তাঁর প্রতি হাতে দশটি করে আঙুল। হাতে ছিল একটি সাদা রঙের বই। তাতে কি যেন লিখেছিলেন। বইটি ও বিশ টুকরো কাগজ দুই ভাইকে দিয়ে তিনি শূন্যে মিলিয়ে গেলেন। কিছু পরে দুজন মানুষ তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তাঁরা ঠাকুরের নির্দেশ ব্যাখ্যা করে অন্তর্হিত হলেন। এরকম এক সপ্তাহ ধরে রোজই ঠাকুর দেখা দিয়েছিলেন।

এ হয়তো তাঁদের কল্পনা। কিন্তু মূর্ত। সিদু ও কানু সাঁওতাল জনসমাজে তাঁদের কল্পনার দ্যুতি ছড়িয়ে দিলেন। কল্পনা বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। গণমানসে তাই সাড়া জাগে। ক্যালকাটা রিভিউ লিখেছে—"possibly their own imagination may have represented them to themselves as real, no doubt they succeeded to a certain extent in inducing a belief of their truth."১৯

এর পর সিদু ও কানু দৈববাণীর প্রচারের দিন ধার্য করলেন ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জুন। এরজন্য সকল গৃহে শালবৃক্ষের শাখা প্রেরণ করে সাঁওতাল জনসমাজকে কুতূহলী করে তোলেন। এক্ষেত্রে একজন লেখকের বক্তব্য উদ্ধার করি। "When the Salbranches, their signal for war,...was passed by willing hands from village to village the whole of this peaceful, industrious race rose as one man to contend not only for their rights,—for they had long since given up all hope of getting those,—but for bare existence, as they had no faith in a government which seen only through the Police, and in their quarrels with the mahajuns they had every reason to consider tyrannical, unjust and extortionate"২০

এর থেকে সিদ্ধান্ত চলে, শালবৃক্ষ শাখা প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের সংকেত দেওয়া কারণ ; ১. পরিশ্রমী, শান্তিকামী মানুষেরা বঞ্চিত অধিকার ফিরে পেতে একত্র হলো ; ২. নির্যাতিত সাঁওতাল জনসমাজ সরকারের অস্তিত্ব পুলিশী ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছে। তারা এই ব্যবস্থার অবসান চাইল ; ৩. মহাজনদের পীড়ন তাড়ন থেকে মুক্তি পেতেই তারা গণসম্মিলনে অংশ নেয়।

এর পর চরমপত্র দেওয়া সুরু হলো। তাতেই দুর্যোগের প্রত্যক্ষ সংকেত। সাঁওতাল নেতা কির্তা, ভাদু ও সুন্নোমাঝি ভাগলপুরের কমিশনার, কালেক্টর ম্যাজিস্ট্রেট, বীরভূমের কালেক্টর-ম্যাজিস্ট্রেট, দীঘি ও টিকরি থানার দারোগা ও স্থানীয় জমিদারদের চরমপত্র প্রেরণ করলেন। এতে তাদের দেশ ছাড়ার কথা বলা হয়েছে। পনেরো দিনের মধ্যে তাদের জবাব-ও চাওয়া হলো। এই পত্রে তাদের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠার দীপ্ত ঘোষণা ছিল।২১

হাণ্টার সাহেবের মতে ৩০শে জুন তারিখেই বিদ্রোহীরা কলিকাতাভিমুখে গণপদযাত্রা২২ আরম্ভ করে। বড়োলাটের নিকট দরবার করার উদ্দেশ্যে ছিল এই যাত্রা। কিন্তু পথে রসদে টান পড়ে। ফলত, তারা বিপজ্জনক পথ অবলম্বন করল। প্রতিহিংসাবশত তারা লুণ্ঠন, হত্যা সুরু করল। এ সময়েই অত্যাচারী মাণিক চৌধুরী, গোরাচাঁদ সেন, সার্থক রক্ষিত এবং হীরু দত্ত নির্দয়ভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়। ৭. ৭. ১৮৫৫ তারিখে দীঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্তকে-ও হত্যা করা হয়। বিদ্রোহীরা মোট উনিশজন ব্যক্তিকে হত্যা করে হিংস্র, উন্মত্ততার পরিচয় রাখল।২৩ এবং ১২.৭. ১৮৫৫ তারিখে পাকুড় রাজবাড়ি অতর্কিত আক্রমণ করে বিদ্রোহীরা ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে। তারপর অম্বর জমিদারবাড়ি হানা দিয়ে-ও সেই একই কাজ করল।

॥ দুই ॥

সাঁওতালদের সুতীব্র বেদনা প্রতিহিংসার আগুনে তেজোদীপ্ত হয়েছে। অত্যাচার ও আঘাতের বিরোধিতায় তারা উদ্দাম। বলাবাহুল্য, সিদ্ধু ও কানু সাঁওতালদের জীবন যন্ত্রণার তিক্ততমবোধকে দুর্বার করে তুলেছেন। তাই ভাগনাদিহির প্রান্তরে তাঁদের অমর সিদ্ধান্ত ইতিহাসকে নোতুন পথে চালিত করেছে। একটি পত্রিকার ভাষ্য :

"ভারতীয় ইতিহাস মে ৮ অগস্ট ১৯৪২ কা জো মহত্ব হৈ, ওহী মহত্ব ৩০ জুন ১৮৫৫ কা হ্যায়। ৮ অগস্ট ১৯৪২ কো প্রসিদ্ধ 'ভারত ছোড়ো' প্রস্তাব স্বীকৃত হুয়া থা। ঠিক উসী প্রকার বিহার রাজকে সন্তাল পরগণা জিলেকে অন্তর্গত্ রাজমহল ক্ষেত্রকে ভাগনাডি গাঁওমে ৩০শে জুন ১৮৫৫ কো দশ হাজার সন্তালোকে বিচ্ সন্তাল নেতা সিদোনে এক প্রস্তাব দ্বারা য়েহ্ ঘোষিত কিয়া থা কি অংরেজ উন্‌কি ভূমিকো ছোড় দে।"২৪

ফলকথা বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। সরকার বাহিনী-ও সশস্ত্র তৈরী থাকে। প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তৎপর হয় বটে কিন্তু তাতে বিদ্রোহ উত্তাপ বেড়ে যায়। সাঁওতালদের দুর্মর ক্রোধের মধ্যে মৌলচেতনা—স্বাধীনতার চেতনা স্পষ্ট। তাদের অন্তরে রয়েছে সিদু ও কানুর ভাবপ্রেরণা ও আদর্শের দীপ্তি। ফলত, যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে, অন্তত শোষণমুক্তির পরিপ্রেক্ষিকায়।

ভাগলপুরের কমিশনার সেনাপতি বারোজকে প্রেরণ করলেন সাঁওতাল দমনে। জেলার সরকারী ও বেসরকারী মহলকে সাহায্য ও সহযোগিতার আবেদন জানালেন কমিশনার। তাতে কাজ হয়েছে। ছোটনাগপুর, সিংভূম, মুঙ্গের প্রভৃতি স্থান থেকে ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ অনেক সৈন্য ও হাতির যোগান দিলেন। আর দেশীয় জমিদারগণ সাহায্যের হাতবাড়িয়েই ছিলেন; তাঁরা-ও এগিয়ে এলেন। হাণ্টার সাহেব এঁদেরকে 'দেশভক্ত' বলেছেন। হাণ্টার লিখেছেন২৫—সাঁওতালদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সমরায়োজনে দেশীয় জমিদার ও মহাজনেরা সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র ও রসদ সংগ্রহ করে দিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব দিলেন বহু হাতি। এমনকি যুদ্ধের ব্যয়-বহনের ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন তিনি। নীলকর সাহেবরাও দিলেন প্রচুর অর্থ। মোটকথা বিদ্রোহ দমনের উদ্যোগ আয়োজন সমাপ্ত। বিদ্রোহ দমনের জন্য বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন স্পেশাল কমিশনার নিযুক্ত হলেন।

তবু-ও ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুলাই ভাগলপুরের পীরপাইন্তির মাঠে সেনাপতি বারোজের পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধে একজন ইউরোপীয় সেনানায়ক ও কয়েকজন দেশীয় অফিসার ও পঁচিশজন সিপাহী নিহত হয়।২৬ এই পরাজয়ের পর ভাগলপুরের কমিশনার সমগ্র জেলাটির জন্য মার্শাল-ল জারীর সুপারিশ করলেন বড়লাট ডালহৌসীকে। এছাড়া বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলেন।২৭ প্রধান নায়কদের গ্রেপ্তারের

জন্য দশ হাজার ও তাদের দেওয়ানদের জন্য পাঁচ হাজার এবং অপ্রধান নায়কদের (minor chiefs) প্রত্যেকের জন্য এক হাজার টাকা করে পুরস্কার ঘোষিত হলো।*

অথচ বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি স্তিমিত হয় না। বরংচ পরিব্যাপ্ত হলো। বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে জমায়েত হতে থাকে কোথায়-ও তিন হাজার কোথায়-ও বা সাত হাজার। বীরভূম জেলার উত্তর পশ্চিমাংশ তাদের দখলে এল। স্থানীয় শাসকগণ পালিয়ে গেলেন। খণ্ড যুদ্ধ কয়েকটি হলো বটে। তাতে ইংরেজ পক্ষের পরাজয়ের সংবাদই বেশি। জেলা কর্তৃপক্ষ বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিতে থাকেন।২৮ কিন্তু মানব মনের গূঢ়গহন সত্তা-বোধে তখন স্বপ্নভংগের বেদনা। তাই আত্মসমর্পণের প্রশ্ন ওঠে না।

।। তিন ।।

সিদু ও কানু বিদ্রোহের যে 'বহ্নিকণা' সৃষ্টি করলেন তা সাঁওতালবাসীদের 'চিত্তে দাবানল' সৃষ্টি করল। ফলত, বিদ্রোহাগ্নি দীপ্ত তেজে ছড়িয়ে পড়ে। বিহার অঞ্চলেই তা রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। এসব অঞ্চলে গোকো মাঝি ও ত্রিভুবন সাঁওতালের নেতৃত্বে উৎপীড়ক মহাজন ও ইংরেজ নিধন ও লুণ্ঠন সুরু হয়। গোদ্দা অঞ্চলের অত্যাচারী নীলকর-জমিদার ফিজ্‌প্যাট্রিকের ওপর গোকো তীব্র আক্রমণ চালান। কয়েক সহস্র সাঁওতাল এতে অংশ-গ্রহণ করে।২৯ তারা অম্বর পরগণার অন্তর্গত লক্ষ্মণপুর, লিটিপাড়া লুণ্ঠন করে এবং লিটিপাড়ার ঈশ্রী ভগৎ ও তিলক ভগৎকে হত্যা করে। সাঁওতাল গণমানসে যে 'হুল'৩০ আরম্ভ হয়েছে তারই প্রকাশ ঘটে হিংসাশ্রয়ী কর্মকাণ্ডের মধ্যে। অবশ্য বিদ্রোহীদের দলপুষ্ট হয়েছে বিক্ষুব্ধ হিন্দু মুসলমানের সম্মিলনে।৩১

* সমাচার সুধাবর্ষণে (১২ই শ্রাবণ, ১২৬২ সাল) তথ্যটি এরকম : "গভর্ণমেন্ট এরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়াছেন যে ব্যক্তি সাঁওতালদিগের রাজার মস্তক কাটিয়া দিবেক তাহাকে পাঁচসহস্র টাকা পারিতোষিক দিবেন, আর যিনি তাহার অনুচরের শিরশ্ছেদন করিয়া আনিবেক তাহাকেও প্রত্যেক মস্তকের হিসাবে ১০০০ টাকা প্রদান করণে সম্মত হইয়াছেন।"

একসময় পাকুড়ের ধনী মহাজন দীন দয়ালের ওপর প্রতিশোধের পালা নেমে আসে। একদিন দীনদয়ালের পুকুর-স্নান সময়ে সাঁওতালগণ হঠাৎ-ই উপস্থিত হলো সেখানে। উন্মত্ত সাঁওতাল নেতা দীনদয়ালের অংগ প্রত্যঙ্গ কাটতে থাকে এবং চীৎকার করে বলে,—এই হাতেই তুমি ক্ষুধার্ত দরিদ্রের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে।৩২ এরপর বিদ্রোহীরা দীনদয়ালের মাথা কেটে ফেলে অন্তরের জ্বালা মেটায়।

ঘটনা আরো ঘটে। বিদ্রোহীরা লুণ্ঠন আর অগ্নিকাণ্ডের তাণ্ডবলীলা দেখাতে দেখাতে বিহার ছেড়ে মুর্শিদাবাদে এল। তারা প্রথম বাধা পায় কদম সাইরের কুখ্যাত নীলকুঠি আক্রমণকালে। ঘোরতর যুদ্ধ হলো বটে কিন্তু আক্রমণ ব্যর্থ হয়। এরপর তারা মহেশপুর রাজবাড়ী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে।

১৫. ৭. ১৮৫৫ তারিখে বিদ্রোহী সাঁওতালদের সংগে ইংরেজের প্রচণ্ড লড়াই বাঁধে। এতে সিদু, কানু ও ভৈরব নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বটে তবে তাঁরা জয়ী হতে পারেননি। এতে তাঁরা তিনজনই অল্পবিস্তর আহত হয়েছেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিদ্রোহের গতি সাময়িকভাবে হ্রাস পেল। এই সময় ত্রিভুবন সাঁওতাল ও মানসিং মাঝি সিদু-কানুর চিন্তাধারাকে উজ্জীবিত রাখলেন। বিদ্রোহের উত্তপ্ত প্রবাহকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন।

কিছুদিন পর আবার বিদ্রোহীরা নোতুন উদ্যোগে এগিয়ে চলে। বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীরা উন্মত্ত হয়ে ওঠে। এর ভীষণ প্রকৃতি সম্পর্কে সংবাদ-ভাষ্য এরকম: বিদ্রোহ ক্রমেই নোতুন নোতুন অঞ্চলে বিস্তৃত হচ্ছে, ভয়ানক আকার ধারণ করছে। প্রশাসন অচলাবস্থা। বিদ্রোহ জনিত কারণে দেশীয় প্রজাদের কাছে সরকারের প্রতিপত্তি অত্যন্ত কমেছে। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ শাসনিক যন্ত্রকে এতটা দুর্বল মনে হয়নি।৩৩

কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এই বিদ্রোহ দমনের আয়োজন-ও ব্যাপকভাবে করা হলো। সারাদেশ থেকে সৈন্য ধাবিত হলো সাঁওতাল ভূমিতে। আনা হলো মারণাস্ত্র কামান, অশ্বারোহী, পদাতিক ও হস্তীবাহিনী। ইংরেজ সেনাপতিগণ রণসাজে সজ্জিত হলেন। সেনাপতি বারোজ, ক্যাপটেন শেরওয়েল, লেফ্‌টেনান্ট বার্ন, মেজর সাকবার্গ, সেনাপতি তৈজমেইন;

তা ছাড়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিদ্রোহ দমনের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। এর ফলে বারহেত পুনরধিকার হলো। বিদ্রোহীরা ২০শে জুলাই তারিখে বীরভূমের মিথিজানপুর ও নারায়ণপুর লুণ্ঠন করে। ২৩শে জুলাই গুণপুর আক্রমণকালে সেনাপতি তৈলমেইন বিদ্রোহীদের গতিরোধ করতে গিয়ে নিহত হলেন।

৩. সরকারী ঘোষণা ও সন্তালীয় ঘোষণা…

বিদ্রোহীদের উদ্দামগতি লক্ষ করে বাঙলা সরকারের নির্দেশে স্পেশাল কমিশনার ১৭. ৮, ১৮৫৫ তারিখে একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন। বিজ্ঞপ্তিটি বাঙলায়* প্রচার করা হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হলো,—

··রাজবিদ্রোহ কর্ম্ম করিয়া অত্র দেশ লুট ও উজার করিতেছে—আর সৈন্যের সহিত আপত্য করিতেছে—উহারদিগের মধ্যে এমত অনেক ব্যক্তী আছে জে আপনাদিগের নির্ব্বুদ্ধি ও দুষ্কর্ম জ্ঞান করিয়া মার্জ্জনা ও পূর্ব্ব-কারাবস্থা পুনরায় পাইবার প্রার্থী আছে—এ বিষয় ইস্তাহার দেওয়া যাইতেছে যে গভর্ণমেন্ট সর্ব্বদা আপনার প্রজার সুখ…তাহারা মন্দলোকের পরামর্শে কুপথগামী হয় ইচ্ছুক নয় এ নিমিত্ত কেবল এই সকল ব্যক্তী জাহারা প্রধান-মন্ত্রী ও সরদার কিম্বা কোন খুন করিতে প্রাধান্যরূপে অধিক থাকা প্রকার হইবেক তদ্ভিন্নিরিক্ত সকল সাঁওতালগণ জাহারা ১০ দশ দিনের মধ্যে কোন হাকিমের সম্মুখে হাজীর হইয়া আজ্ঞাবাহী হইবেক তাহাদিগের দোশ মার্জ্জনা করা জাইবেক—জখন তাহাদের আজ্ঞাবাহী যুক্ত প্রকাশ হইবে তখন তাবত নালিশ সাঁওতালদিগের যাহা প্রমাণযোগ্য হইবেক তাহা সুন্দররূপে তদারক করা যাইবেক কিন্তু যদ্যপি সকল রাজদ্রোহি এই ইস্তাহার জারির পর বিপরিত আচরণ করে তাহার সক্ত ও নিদারুণ সাজা পাইবেক। ইতি সন ১৮৫৫ সাল—তাঃ ১৭ই আগষ্ট—মোতাক সন ১২৬২ সাল—২ ভাদ্র।৩৪

* তৎকালীন বাংলা গদ্যের নমুনাটি লক্ষণীয়। বিশেষ করে সরকারী ব্যবহারে এমন সহজ সরল অনাড়ম্বর ভাষাভঙ্গির সাহিত্যমূল্য কিছুমাত্র কম নয়।

।। এক ।।

কিন্তু আত্মসমর্পণ তাদের মজ্জায় নেই। তারা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল তা। এ সময় কিছুদিন বিদ্রোহীরা শান্ত ছিল। ফলত, ২৪শে আগস্ট লেফ্‌টেনান্ট গভর্নরকে লিখে পাঠান সাত সপ্তাহ যাবৎ চারিদিকে শান্তি বিরাজ করছে। গ্রামবাসীরা গ্রামে ফিরে স্বাভাবিকভাবে চাষ করছে।৩৫

কিন্তু শাসকশ্রেণীর এহেন অনুমান কতটা ভুল ছিল তা প্রমাণিত হলো সাঁওতালদের দুটি পরওয়ানা থেকে। এ দুটি সরকারী বিজ্ঞপ্তির প্রতিবাদ স্বরূপ তা মনে করা যেতে পারে। সাঁওতালী ঘোষণা দুটির অনুবাদ 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় ৫. ২ ১৮৫৬ তারিখে প্রকাশিত হয়।৩৬ এখানে উদ্ধৃত হলো।

"সন্তালীর ঘোষণা"

সন্তালেরা সুজারামপুরস্থ মেং জি গ্রান্টসাহেবের কুঠীতে এবং ভাগলপুরের আদালতে যে দুই পরওয়ানা পত্র পাঠাইয়াছে নিম্নে তাহার অনুবাদ গ্রহণ করা গেল।

১

"শিবশাহ ভগতসুবার আজ্ঞানুসারে সুজারামপুরের কুঠীওয়ালা মেং গ্রান্ট সাহেবের উপর।

'সংবাদ লও, এই আজ্ঞা প্রাপ্তি পরে তুমি আপন দ্রব্যাদি লইয়া কুঠী ত্যাগ করিবে, যদি তুমি প্রতিবাদ কিম্বা কোন ওজর কর তাহা শ্রবণ করা যাইবেক না অতএব এতদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বুধবারে আমার-দিগের সেনারা তোমার কুঠীতে উপস্থিত হইবেক, কোন রাইয়তের হানি হইবেক না, বরঞ্চ তাহারদিগকে রক্ষা করা যাইবেক, তারিখ ১২৬২ সাল ৩০ পৌষ'।

দ্বিতীয় পরওয়ানা কমিশনর জজ ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টর সাহেব প্রভৃতি গভর্ণমেন্টের চিহ্নিত ভৃত্যদের উপর।

২

'শিবশাহ ভগতসুবা সম্ভাবিত রাজার আজ্ঞা

রামজিও লাল দেশ জয় করিয়াছেন তন্নিমিত্ত আমি লিখিতেছি, তুমি আমাকে জানাইবে যে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টরেরা যুদ্ধ করণে মনস্থ করিয়াছে কিনা? যদি আমারদিগের সুবারা আক্রমণ করে তবে রাইয়ত-দিগের ক্ষতি হইবেক এবং যদি ইংরাজ সেনারা আইসে তথাচ রাইয়তেরা ক্লেশ পাইবে, অতএব ইহা যুক্তিসিদ্ধ যে কেবল কিশোরীয়া সুবার সহিত ইংরাজেরা যুদ্ধ করুন, তাহা হইলে রায়তদিগের কোন হানি হইবেক না, এই পরওয়ানার কর্ম্ম ডাকযোগে ঐ সকল লোকদিগকে জ্ঞাত কর যাহারদিগের নিমিত্ত ইহা লেখা হইল।

'সেরেস্তাদারকে লেখা যায়।

তারিখ ১২৬২ সাল ২৯ পৌষ পূর্ণিমা, সোমবার'

এই প্রসংগে ইংরেজ সরকারের বিপদ আশঙ্কা করে পত্রিকার মন্তব্য লক্ষণীয়, "এই পরওয়ানা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ বন্য সন্তালদিগের সাহস বিবেচনা করুন, তাহারা প্রজা নাশ দেশ লুণ্ঠন না করিয়া এ প্রকার প্রজা রক্ষার প্রতিজ্ঞা করিতেছে,...বোধহয় কোন বিজ্ঞ লোকে তাহারদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকিবেন প্রজাদিগকে হস্তগত করিতে পারিলে অনায়াসে তাহারদিগের মঙ্গল হইতে পারিবেক.. গভর্ণমেণ্টের উপর এরূপ পরওয়ানা জারী করিতেছে তখন অনুমান হইতেছে কোম্পানি বাহাদুরকে বিশেষ ক্লেশ না দিয়া ক্ষান্ত হইবেক না, লেপ্টেনেণ্ট মহাশয় সন্তালদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন দেখাযাউক যদি তিনি তাহারদিগের মস্তকে পদ্মহস্ত বুলাইয়া বশীভূত করিতে পারিবেন।"

এই পর্বে, বিদ্রোহীদের গতিপ্রকৃতি ছিল দুরন্ত দুর্বার। ফলে ইংরেজ শাসন প্রায় অচল হয়ে ওঠে। বীরভূমের ওপারবান্ধা ও লাঙুলিয়া থানার ত্রিশটির অধিক গ্রাম লুণ্ঠন ও ভস্মীভূত করা হয়। বীরভূম, ভাগলপুরে বিদ্রোহী-দের তৎপরতায় ইংরেজ শাসনের সাময়িক অবসান ঘটে। মহাজন ও নীলকরেরা পলায়ন করে। মোটামুটিভাবে বিদ্রোহী জনগোষ্ঠীর মশস্ত্র

প্রতিরোধ সংগ্রাম ও গেরিলা রণকৌশলে* ইংরেজ সরকার বিপর্যস্ত হয়। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এহেন মুহূর্তে সামরিক শাসন জারী করলেন (১০ই নভেম্বর, ১৮৫৫)। এতে বলা হলো, অস্ত্রহাতে কোনোব্যক্তি দেখলে তাকে সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেওয়া হবে। বলাবাহুল্য, 'অসভ্য, বর্বর, বন্য' সাঁওতালদের "মস্তকে পদ্মহস্ত বুলাইয়া" দিয়েছিলেন সভ্য ইংরেজ ; মৃত্যুর চরমদণ্ডে।

।। দুই ।।

ইংরেজ শাসকগণ অমোঘ অস্ত্রটি প্রয়োগ করে বিদ্রোহ দমন করলেন। সহজ সরল আদিবাসীদের প্রাণের মূল্য নির্জিত করেই। সামরিক আইনের ওষধিতে শাসকগণ কঠিন বাতাবরণ সৃষ্টি করলেন। শাসকগণ লুণ্ঠন, অত্যাচার, হত্যা এ-সবই করলেন। বিদ্রোহী নেতারা প্রতিরোধ, প্রতিবাদ করলেন বটে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন। সরকারী জুলুম অত্যাচারে অসহ্য হয়ে একদল ভীতসন্ত্রস্ত সাঁওতাল সিদুর গোপন-তথ্য জানিয়ে দেয়। এরই ফলে সিদু ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ধৃত হলেন। ইংরেজ সরকার ভয়ানক এই ব্যাক্তিত্বটিকে গুলি করে হত্যা করেন। চাঁদ ও ভৈরব ভাগলপুরের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। কানু-ও ১৮৫৬-তে ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে বীরভূমের ওপারবান্ধা নামক স্থানে ধরা পড়লেন। তাঁকে-ও গুলি করে হত্যা করা হয়।৩৭

সাঁওতাল উপজাতির পক্ষে জীবন মুক্তির লড়াইয়ে চারবীর সেনানী প্রাণ বিসর্জন দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন। ইতিহাস এই

* অরণ্যের আড়াল-আবডালে, পর্বত-গুহার ভেতরে-বাইরে থেকে যে লড়াই তাকে আমরা গেরিলা রণকৌশল বলতে পারি। এমনই লড়াইয়ের একটি দৃষ্টান্ত 'সংবাদ প্রভাকর' (১৪ জুলাই, ১৮৫৫) থেকে নেওয়া যায় : "পর্ব্বতের উপর ভয়ানক শালবন আছে তাহারা তথায় গোপন হইলে রাজ-সেনারা তাহাদের কিছুই করিতে পারিবে না, সাঁওতাল জাতি অতি ভয়ানক, তাহারা যাহা পায় তাহাই আহার করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে, তীরের যুদ্ধে তাহারা বিলক্ষণ নিপুণ।"

দাসত্ব মুক্তি লড়াইয়ের কথা॥ গভীরভাবে স্মরণ করে। তাঁদের স্বাধীন সাঁওতাল-রাজস্থাপনের দীপ্ত আকাঙ্ক্ষার মধ্যে সীমাতিক্রমণের প্রয়াস ও একটি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্তর্মুখীন ধ্যানতন্ময়তাকে স্পষ্ট করে চেনা যায়। এইটেই বিদ্রোহের নীট্‌ ফল।

ঐতিহাসিকদের সিদ্ধান্ত থেকে পাঠ নেওয়া যাক। সাঁওতাল বিদ্রোহ "কৃষক শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে, আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ নির্দেশ করিয়াছে।"৩৮ অথবা এটি: "সাঁওতালদের এ সংগ্রাম ভারতের শোষিত মানুষের বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে গেছে। এখান থেকেই শোষিত মানুষের বিপ্লবের আরম্ভ—তার প্রথম পদক্ষেপ।"৩৯

পুনশ্চ, "So ended the freedom fight of the Santals...when inferior and disorganised numbers clashed with superior forces, sophisticated weapons and lasting resources. Sufferings and tears chasten the morale nations।"৪০

এই হলো স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় লড়াকু মানুষদের ইতিহাস যাঁরা লড়াই করেছেন আত্মগর্বে, অথচ তাঁদের ক্ষোভ পরম ঈশ্বরের প্রতি-ই সমর্পিত হয়েছে। "ঈশ্বর মহান। কিন্তু তিনি থাকেন দূরে—বহুদূরে। —আমাদের রক্ষা করার কেউ নেই।" ৪০ক

বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া ঃ প্রস্তাবনা

বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সাঁওতাল গণসংগ্রামের প্রভাব-প্রসার দুর্লক্ষ্য নয়। এর কারণ, সংগ্রামী মানসের বলিষ্ঠ চেতনা—দেশ হিতৈষণা নোতুন পথপ্রবাহে রূপবদ্ধ হয়েছে। জনজাগরণের দিব্যদাহ ইতিপূর্বে লক্ষ করা গেছে সত্য, কিন্তু একটি জাতির পক্ষে সম্মিলিত প্রয়াস তাতে ছিলনা বললেই হয়। এর প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ সাঁওতাল জাগরণে ছিল, তা বলাই বাহুল্য।

এতে কয়েকটি জিনিস রূপভেদে একেবারেই নোতুন যেমন; ১. গণসভা, ২. গণসিদ্ধান্ত, ৩. গণপ্রতিবাদ, ৪. গণপদযাত্রা, ৫. গণযুদ্ধ। এমনকি, মৃত্যুর ক্ষেত্রে-ও তাদের সুরু হয়েছিল গণমৃত্যু। এই গণমৃত্যুর কারণ সম্পর্কে হান্টার সাহেবের বক্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য : "they did not understand yielding. As long as national drums beat, the whole party would stand, and allow themselves to be shot down... when their drums ceased, they would move off for about a quarter of a mile, then their drums began again and they calmly stood till we came up and poured a few volleys into them."৪১

অর্থাৎ তাদের স্বাদেশিকতা, জাতীয় চেতনা রণদামামার সমসুরেই বাঁধা। সুতরাং মৃত্যু প্রশ্ন সেখানে গৌণ। এহেন 'স্পিরিট'কে শ্বেত প্রশাসন পীড়ন দমন করেছে নিজেদের স্বার্থসংরক্ষণের হেতু নিয়ে। তাই বিদ্রোহের বিচার-প্রসার, রূপায়ণ-চিত্রায়ণ এদের হাতে অন্যরকম হওয়াই স্বাভাবিক।

তাই অবাক হবার কিছু থাকে না যখন 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' প্রশাসনকে পরামর্শ দেয়, "to...restore the prestige of the British authority. the mass of Santals should not remain unpunished"৪২ শুধু তাই নয়। 'ক্যালকাটা রিভিউ' (১৮৫৬) দুঃখ প্রকাশ করল এই বলে যে, বিদ্রোহীদের নিধনযজ্ঞে সামরিক শক্তির প্রয়োগে বিলম্ব হয়েছে বেশ।৪৩ এমনকি, শিক্ষিত ভারতীয়রা একে তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন। কিন্তু পরবর্তী বাঙলা এই বিদ্রোহকে সংবেদনশীল মনোভাব নিয়ে দেখেছে। এর মধ্যে খুঁজেছে বিদ্রোহের মহাপ্লাবন। স্বাধীন সত্তার চৈতন্য। এই দেখা কালের সীমায়তিতে বন্দী নয়। তাই স্বাধীনোত্তর বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এর প্রতিফলন সুগভীর ও দূরাবগাহী। আমাদের বিচার সেখানে-ও অগ্রসর। সূত্রবদ্ধ করা যায় এইভাবে।

১. বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া—উপন্যাসে...

এক...ভাগনাদিহির মাঠে...

সাঁওতাল বিদ্রোহকে ঘিরে 'ভাগনাদিহির মাঠে' নামে একটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। লেখক পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী। দ্বাদশ পরিচ্ছেদের এই উপন্যাসটির ভূমিকাংশ বাদ দিলে পৃষ্ঠা সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৮। লেখকের আত্মতৃপ্তি হলো এই; "সাঁওতাল বিদ্রোহের চমকপ্রদ ঘটনাবলী অবলম্বন করে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধরনে একটা কিছু দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছি।

...বইয়ের উল্লিখিত চরিত্রগুলি বা তাদের বর্ণনা যাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সীমানা ছাড়িয়ে না যায় তার জন্য ঐতিহাসিক কাঠামোকে আমি সম্পূর্ণ বাস্তব রেখেছি। লেফটেনাণ্ট জোন্‌সের চরিত্র কল্পিত হলেও অবাস্তব নয় এবং সমসাময়িক ঘটনাবলীর সঙ্গে তার কোনো অমিল নেই।"৪৪

লেখক উপন্যাসের আরম্ভ করেছেন ভাগনাদিহি গ্রামের অবস্থান প্রসংগ দিয়ে। তিনি জানিয়েছেন: "বারহাইত-এর পাশ দিয়ে গিয়েছে গোমানী নদী আর দক্ষিণ দিক কিছুটা দূরে দলদলি পাহাড়ের মাঝখানে বড় রকমের সাঁওতাল বস্তি ভাগনাদিহি। এখানে দুশো ঘরের বেশি সাঁওতালের বাস।" (পৃ. ৪)

প্রথম পরিচ্ছেদে আমরা দেখি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাঁওতাল অধিবাসীদের দেহ সৌন্দর্য লেখকের দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি তাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যার কথা আমাদের শোনান।

ভাগনাদিহির বংশানুক্রমিক যোড়শ পরিবারের সিদু ও কানু ক্রোধে ফুঁসছে। এখানে তারা অন্যান্য এলাকার পরগণাইতদের সংগে কথা বলেন, মত বিনিময় করেন। লছিমপুর পরগণাইত বীরসিং মাঝি উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, "সিধু, তুর খবর আওর হামার খবর এক, পন্টেট সায়েবটা দশগুণ খাজনা বঢ়াতে চায়।" সিদুর মনে তখন দুর্বার অস্বস্তি—"সায়েব লোক আদমি পিছু খাজনা ঠিক করে লিতে চায় আওড় সোমাজটোতুড়ে আদালতের বিচার কায়েম কোরতে চায়। উয়ারা হেইটা কোরলে পোর ভি হামারার জমি-জেরাত, ঘর-সন্সার বরবাদ হোবে, ফিরভি হামারাদের পথে দাঁড়াতে হোবে।" (পৃ. ৬)

পারস্পরিক আলোচনার মধ্যে সাঁওতালদের অসন্তোষ ধ্বনিত হয়। সিদু তার স্ত্রী লখিয়ার সংগে ঘনিষ্ঠ আলাপনে-ও আসন্ন বিপদের কথা বলেন। এই পরিচ্ছেদে লেখক সুনিবিড় করে এঁকেছেন সিদুকে; সিদুর পরিবার প্রীতি, স্বজাতি প্রাণতাকে। কানুর স্ত্রী মনিয়া ও তাদের দুইপুত্র ভজা ও নন্দুর হাসি উচ্ছলতা উপন্যাসে সমান গুরুত্ব পেয়েছে। অবশ্য তারা সবাই কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখ্ছি সাঁওতালরা ধীরে ধীরে সংগঠিত হচ্ছে। সাহেব, মহাজনদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা জোটবদ্ধ হচ্ছে। তাই মহাজনদের ওজন বাটখারা 'কেনারাম' ও বেচারাম' তাদের কাছে অচল হয়। সাঁওতালরা এর নাম দিয়েছে 'বড়-বৌ' ও 'ছোট-বৌ'। কানু মহাজন দিগম্বরকে শাসিয়ে বলেন কোম্পানীর ছাপমারা আসল বাটখারা দিয়েই জিনিসপত্র ওজন করতে হবে। সুরু হয় তাদের অনন্য-প্রতিবাদ। অসাঁওতালীদের সংগেই তাদের বিরোধ। অথচ সিদু সকলকেই বলেছেন, "গরীব দিকুদের সাথে হামাদের কুনো ঝগড়া নেই।" (পৃ. ২২)

ঘটনা আরো ঘটে। 'মাঘ-সিমের' পরব। মংরার মনে আনন্দ। আনন্দ আরেক কারণে-ও। গত বছর বসন্তের বাহা-উৎসবে* সিদুর মেয়ে সুখিয়াকে সে ভালেবেসেছে। এখন তারা একে অপরের ঘনিষ্ঠ। ঐপরবে তীরন্দাজী খেলা হয়। অনেক জোয়ান উপস্থিত। তার স্বপ্ন সকলকে পরাস্ত করার। সিদু ও কানুর তারিফ আর সুখিয়ার সুখদৃষ্টি তাকে বিভোর করে। মংরা একসময় কুশলী তীর নিক্ষেপ করে সকলকে অভিভূত করে দেয়। আনন্দের শিহরণ বয়ে যায় সুখিয়ার সুখচাহনিতে! উৎসব আঙিনার অন্যপ্রান্তে, বয়স্যদের মধ্যে সুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা। সেখানে-ও অসন্তোষের বায়ু বয়।

দেশকাল, সমাজ নিয়ে আরম্ভ হয়েছে চিন্তাভাবনা। লড়াই করার তাগিদ অনুভব করে সকলেই। বীরসিং নরমপন্থী নয়। সে শোষকদের লুণ্ঠন করার কথা ভাবে। সিদুর তাতে আপত্তি। কিন্তু "অতি সাবধানী সুন্নু মোড়লের ও মনে হল যে এই সঙ্ঘবদ্ধ আনন্দের সম্বল নিয়ে নিশ্চয়ই লড়াই করা যায়।" (পৃ. ৬৩)

উপন্যাসের ষষ্ঠ-সপ্তম পরিচ্ছেদে আমরা সিদু ও কানুর রণমূর্তির সংগে পরিচিত হই। সিদু সংগ্রামী অভিজ্ঞতা সুদৃঢ় করতে পাটনায় গেলেন ওহাবী নেতাদের সংগে পরিচিত হতে। তিনি জেনেছেন বাংলাদেশের নীলসংগ্রাম, তিতুমীরের সংগ্রাম, ও ফরিদপুরের ফরাজী আন্দোলনকে। গ্রামের সুবৃদ্ধ ভাদু মোড়ল বড় বোঙার স্বপ্নের কথা বিবৃত করে সাঁওতালদের প্রেরণা দেন, যুদ্ধের আহ্বান জানান।৪৫

১৮৫৫-এর ৩০শে জুন। ভাগনাদিহির প্রান্তরে জমায়েত বিশ হাজার সাঁওতালের কণ্ঠ গর্জে ওঠে। সিদুর বক্তৃতা সকলকে কাঁপন ধরায়। "এই মুলুক হামারার মুলুক। সাঁওতাল, মেহনতি বাঙালী, বিহারী আওর মোমিন জোলাদের মধ্যে কোনও ফারাক…আমরা আসতে দিবকলেই। সোব

* 'বাহা-উৎসব'—"শালফুল যখন ফোটে তখন থেকে সুরু হয়। গোটা চৈত্র মাস জুড়ে এই পরব চলে…এই পর্বটির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে হিন্দুদের বৈশাখী পূর্ণিমায় পালিত শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোল উৎসব।"

দ্র, ড. অমলেন্দু মিত্র, রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর,

দুশমনদের হেই মুলুক থেকে খেদাব। বড় বোঙার হুকুম জরুরত মাফিক জানদিব আওর জানালিতে ভি হোবে। সায়েবরা বরবাদ, জিমিদার মহাজন বরবাদ, নীলকর বরবাদ।"৪৬

অষ্টম ও নবম পরিচ্ছেদে এসে আমরা দেখলাম, বিদ্রোহীদের দমনের জন্য সামরিক জল্পনা সুরু হয়েছে। রিচার্ডসন, পনটেট সাহেব, কমিশনার ব্রাউন সাহেব সকলেই বিচলিত। বিদ্রোহীরা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেনাপতি বারোজ বিপদাপন্ন। মহেশ দারোগা হত। দামিন-ই-কো এলাকা ছিন্ন ভিন্ন। সামরিক শাসন বা মার্শাল-ল' দাবীর কথা ভাবলেন কমিশনার সাহেব। ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব, বড়লাট ডালহৌসী বিদ্রোহীদের তৎপরতায় শঙ্কিত হলেন। হ্যালিডে সাহেব সমরাভিযানের নির্দেশ দিলেন। সাঁওতালদের অন্যান্য জেলার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কথা বলা হলো। ধ্বংসের তৎপরতা দিয়ে বিদ্রোহ দমনের আয়োজন হলো সারা।

পাঁচুগোপাল ভাদুড়ীর একটি কুশলী সৃষ্টি হলো কল্পিত সৈনিক জোন্‌স। যাকে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে বিবেকবর্জিত কাজের সমালোচনা করেছেন কখনও স্বগতোক্তি বা ডায়েরি লিখিয়ে। আসলে, লেখকের কবিমন এখানে দুর্বার হয়। জোন্‌সের অন্তরাল সহানুভূতির মধ্যে লেখককে চেনা যায়।

শেষ পরিচ্ছেদে এসে আমরা দেখলাম বিদ্রোহী নায়ক সিধু ও কানুকে হত্যা করা হয়েছে। সিধু আগে কানু পরে। প্রাণ হারিয়েছে সিধুর মেয়ে, এবং মংরার স্ত্রী সুখিয়া-এবং আরো অনেকেই। জোন্‌সের ডায়েরিতে মৃত্যুর পূর্বে কানুর অভিভাষণ: "হামী দুষী? তুরা আমার বিচার কুরবি? হেই চারপাশের জমিন কার মেহনতে পয়দা হয়েছে? জুয়াচুরি করে হামারার জমিনকে ছিনিয়ে লিছে?...তুরা ইংরেজরা, তুরা জিমিদারেরা তুরা সাহুকরেরা, তুরা নীলকরেরা, তোরা সোবাই বেইমান। হামরা মেহনত করিয়ে খাই,—হামরা সান্তাল, দিকু, বিহারী একসাথ মিলত করিয়েছি; হামরা নিজেদের হক আওর ইজ্জৎ নিয়ে লড়েছি আওর এখুন ভি লড়াই চোলবে।..শেষমেষ মেহনতী মনিষ,—সান্তাল, দিকু, বিহারীর জিত

হোবেই। আওর ডেখুন ভ্‌দের বিচার হোবে, ভ্‌দের সাজা হবে। ...সেদিন হামারার লড়াই শেষ হোবে।"৪৭

কাল্পনিক ডায়েরির ভাষা হলে-ও, এসব তাদের অন্তরেরই কথা। এ হলো লেখকের ঘনপিনদ্ধ চিন্তার ঐতিহাসিক-প্রচ্ছদ। উপন্যাসের মধ্যে লেখকের সহানুভূতি, আন্তরিকতা সুস্পষ্ট। ফলে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল জীবনাদর্শ এবং এই আদর্শের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। উপন্যাসটিতে সাঁওতালদের সামাজিক ইতিহাস, আনন্দ বেদনার ইংগিত টুকু বাদ দিলে ইতিহাসের তথ্যাবরণই বেশি। অবশ্য ঔপন্যাসিকের কৃতিত্ব এই মাত্র যে, তিনি আমাদের বিপ্লবের প্রত্যক্ষ পটভূমিতে টেনে নিয়ে যেতে পেরেছেন॥

দুই...আরণ্যক...

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'আরণ্যক' উপন্যাসে সাঁওতাল বিদ্রোহের এক বীর নায়কের কিছু কথা শুনিয়েছেন। তিনি হলেন সাঁওতালরাজা দোবরুপান্না বীরবর্দী। এই বিদ্রোহী নায়কের প্রতি কথা সাহিত্যিকের অকুণ্ঠ আগ্রহদীপ্তি। কারণ তাঁর মন বিদ্রোহ তরংগের উৎস সন্ধানে দুর্বার হয়েছে। তিনি অরণ্যরাজার সংগে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন: "মুঘল বাদশাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে...রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২* সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বর্তমান রাজা। নাম দোবরুপান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরীব। কিন্তু এদেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।"

লেখক রাজসন্দর্শনে এসে বিদ্রোহী বীর দোবরুপান্নাকে প্রত্যক্ষ করলেন। তীব্র দারিদ্র্যের মধ্যে রাজা প্রচ্ছন্নগর্ব নিয়ে বেঁচে আছেন। রাজার অতীত

* সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল ১৮৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দে। ১৮৬২ সালটি লেখকের অনবধানবশত হয়েছে বলেই মনে হয়।

কথন "আমাদের বংশ সূর্য্যবংশ। এই পাহাড় জংগল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবনে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়েস অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।"৪৯

দোবরুপান্নার সহজ প্রকৃতি, রাজ-ঔদার্য, বীরত্ব কাহিনী তাঁর আতিথেয়তা লেখক গভীর অনুভূতি দিয়ে প্রকাশ করেছেন। লেখক রাজ-সন্দর্শনে গিয়ে যে আনন্দানুভব করেছেন তার সরল বিবৃতি দিয়েছেন। রাজ-প্রসংগে রাজার নাতির মেয়ে ভানুমতী বিভূতির কবি-মনকে অধিকার করে। রাজকন্যা ভানুমতীর অনায়াস সারল্য, মুক্তমন, নিষ্কলুষচরিত্র সর্বোপরি কল্যাণময়ী নারীর অপরূপ সান্নিধ্য লেখককে কয়েকবারই দোবরুপান্নার রাজধানী চকমকিটোলায় টেনে নিয়ে যায়। কবির মনে হয়েছে প্রান্তর যেমন উদার অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনই সংকোচহীন, সরল, বাধাহীন। "অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার।" আবার লেখকের সহানুভূতির সংগে আমাদের সহানুভূতি একীভূত হয় তখনই, যখন অনার্যরাজা, সাঁওতাল বিদ্রোহী দোবরুপান্নার মৃত্যু হয়। তাই লেখক পরম দুঃখে রাজসমাধির ওপর ফুল ছড়িয়ে দেন তখন অলৌকিক পরিবেশ যেন—"ভানুমতী ও রাজা দোবরুর সমস্ত অবহেলিত অত্যাচারিত, প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষগণ আমার কাজে তৃপ্তিলাভ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু! সাধু! কারণ আর্য-জাতির বংশধরের এই বোধহয় প্রথম সম্মান অনার্য্য রাজ-সমাধির উদ্দেশ্যে।"৫০

আমাদের মনে হয়, ইংরেজদের বাদ দিলেও হিন্দুজাতির মধ্যে যাঁরা আর্য বলে তৃপ্তি পেয়েছেন আর সাঁওতালদের অনার্য বলে শুধু ঘৃণাই নয় উৎপীড়ন অত্যাচার করেছেন যার পরিণাম সাঁওতালরা ১৮৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহী হয়েছে। লেখক একজন অখ্যাত বিদ্রোহীনেতার কবরে ফুল নিবেদন করে হিন্দুজাতির পক্ষে কলঙ্কিত অধ্যায়ের জন্য কিছুমাত্র অনুশোচনা ও দোষ-স্খালনের চেষ্টা করলেন। সুতরাং আরণ্য পটভূমিকায় কথাসাহিত্যিক 'আরণ্য'কে মনুষত্বের মহিমাকেই প্রকাশ করেছেন সরলভাবে।

তিন...অরণ্য বহ্নি...

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে একটি উপন্যাস লিখেছেন; নাম 'অরণ্য বহ্নি'।৫১ লেখক জানিয়েছেন তিনি চরণপুরের (বীরভূম) প্রতিমা কারিগর নয়ন পালের কাছ থেকে পট-ছড়ায় সাঁওতাল হাঙ্গামার কাহিনী শুনেছেন। নব্বই বছরের বৃদ্ধ নয়ন পাল এ কাহিনী শুনেছেন তাঁর পিতার কাছ থেকে। তিনি প্রত্যক্ষ দর্শী ছিলেন। এই হাঙ্গামার কাহিনী নিয়ে তিনি পট এঁকেও গেছেন। নয়ন পাল পুরনো সেসব কাহিনীর চলচ্চিত্রায়ণ ঘটালেন পট ও ছড়ার মাধ্যমে। এ এক সরস উত্তরাধিকার।

নয়ন পালের বিশ্বাস, সাঁওতালদের হাঙ্গামা নিয়ে অনেক নিন্দাবাদ অতিরঞ্জিত। তাদের জাতীয় চরিত্র কলুষিত করা হয়েছে। আসল ঘটনা অন্যরকম। ছড়াকার সেসব কথা বলেছেন। ঔপন্যাসিক তারই তথ্যরস পরিবেশন করেছেন।

উপন্যাসের পটভূমি পাঁচকাটিয়া, বারহেত, 'বাগানাডিহি' ও লিটিপাড়া প্রভৃতি স্থান। এতে আছে সাঁওতালদের সামাজিক জীবনের বিস্তার। দৈনন্দিন জীবনচর্যা। সুখদুঃখের বহু কথন। পারিবারিক সমস্যা। সিহু কানুর বিবাহ। অন্য নারী রুকনী ও টুকনীর সংগে সিহু কানুর প্রেম পর্যায়। প্রথমে তাদের না পাওয়ার বেদনা। সিহু-কানুর বোন মানকীর পলায়ন, ধর্মান্তরিতা হওয়ার জ্বালা প্রভৃতি। তাদের পিতা চুনারমুর্মু গ্রামের মাঝি। দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি তাঁর মানমর্যাদা সম্পর্কে-ও অতি সাবধানী।

সাহেব, মহাজনদের অকথ্য শোষণ-নির্যাতন, মহেশ দারোগার জুলুম-অত্যাচার, ইংরেজ পুরুষদের উদ্ধত আচরণ-বিচরণ, নারী হরণ প্রভৃতি সাঁওতালদের হিংস্র করে তোলে। মহাজনদের কাছে ঋণের দায়ে বংশ পরম্পরায় দাসবৃত্তি, জমি জায়গা সম্পত্তি হারানোর যে তথ্য-বিবৃতি উপন্যাসে মেলে তা ইতিহাসের ধারানুযায়ী এ ক্ষেত্রে লেখক হান্টার সাহেবের গ্রন্থ ও সংবাদপ্রভাকরের পাতায় চোখ রেখেছিলেন।

নয়ন পাল পট দেখিয়ে লিটিপাড়ার দুর্জন মহাজন কেনারাম ভগতকে চেনান যার কাছে দাদন নিয়ে চির জীবনের গোলাম হয়ে গেছে সাঁওতাল-

দের অনেকেই "দাদন দেনার মুনিষ হলো কেনা মুনিষ। দশটাকা ধার নিলে এক মুনিষ জনমকার মত বিকিয়ে যেত ;...এই শোধ দিতে সাঁওতালরা মহাজনের বাড়ি খাটতো। পেট ভাতা। মজুরি নগদা নাই। তার মানে আজীবন টাকা শোধ হত না ; মরলেও না তার ছেলে পুলে-দের শোধ দিতে হত। পালাবার জো ছিলনা ; তখন জঙ্গিপুরে 'মুনসুবি' আদালত, সেখানে নালিশ করে ডিগ্রি করে, পরওয়ানা এনে গ্রেপ্তার করে জেল খাটাতো" (পৃ ২৪)

এসব কারণে সিদুর মনে কঠিন শপথ জাগে। সাঁওতালদের দেবস্থান জহরসর্ণার কাছে সে শক্তি প্রার্থনা করে। সিদু ও কানুর অভিব্যক্তি, দীপ্ত তেজ সম্পর্কে নয়ন পাল কালকেতু বিরূপাক্ষের ঐশী শক্তির সংগে তুলনা করেছেন। তিনি বলেন,—"যখন পাপ বাড়ে, পাপীর দাপ বাড়ে—ধর্ম্ম যায়—মানুষের ঘরে জীবনে অধর্ম্মের একাকার হয়, তখন মা কখুনও নিজে আসেন, কখুনও তাঁর ওই কালকেতু বিরূপাক্ষকে পাঠান।" (পৃ. ২২.)

নয়ন পাল পট দেখিয়ে গানগেয়ে বলে চলেন রামচন্দ্র পুরের ত্রিভুবন ভট্টাচার্য তাঁর ঠাকুরদাদার গুরু। ভট্টাচার্য মহাশয় সাঁওতালদের ওপর সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি-ও বুঝেছিলেন সাঁওতালদের ওপর নানান-দিক হতে অত্যাচার, অবিচার করা হয়েছিল। সাঁওতাল রমণীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছিল (তার মধ্যে সিদু কানুর প্রেমিকাদ্বয় রুকনী ও টুকনী এবং বোন মানকী-ও আছে)। তাই, নয়ন-পালের ভাষায়—"সাঁওতালেরা ফেঁসে হায় (যেন) অজগর গরজায়"।

ত্রিভুবন ভট্টাচার্যের মনে জ্বালা। তাঁর মেয়ে শ্যামাময়ী বাল্যকালেই বিধবা হয়েছে। কিন্তু লোকনিন্দার জ্বালায় সে গৃহত্যাগ করে তিন পাহাড়ের ধারে ঠাকুর ঘর বানিয়ে পুজো করত। মা কালীর পুজো। লোকে ডাকত মা-ভৈরবী। একদিন লুপলাইনের ঠিকাদার কোম্পানীর কর্মচারী ডিউই—ডেভিল ডিউই (সবাই তাকে তাই ডাকতো) তার ওপর পাশবিক অত্যাচার করল। তারপর আর কেউ তার সন্ধান পেলনা। সন্ধান অবশ্য পেয়েছিল সিদু কানু। ভৈরবীকে আরেক মূর্তিতে তারা আবিষ্কার করে। তারা দেখল কালী আর বোঙ্গা যেন একই রূপ। তারা আরো কঠিন হয়ে ওঠে : যারা "আমাদের ধরম নিছে, আমাদের মেয়া নিছে, আমাদের ধান নিছে গরু

নিছে কাঁড়া নিছে, জনম নিছে, চাকর করে রাখছে—আমরা কাটব।" কারণ, "সিধু বললে ই আমাদের দেশবটে। ই দেশটো আমাদের। ই আমাদের দেশ, আমরা নিব···সিধুর সঙ্গে সঙ্গে কান্থ একসঙ্গে বলে উঠল,—হঁ, ইটো আমাদের দেশবটে। আমাদের দেশ।"৫২

অতএব যুদ্ধ চাই। ঠাকুরের নির্দেশ-ও তাই। অন্যায়, অসাম্য বঞ্চনা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, স্বাধীনদেশ গড়তে হবে; ঠাকুরের এসব নির্দেশ সাঁওতাল জনসমাজে তারা প্রচার করল। যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। নয়ন পাল গেয়ে চলেন,—

"দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত রাবণ সে বীরমন্ত
থর থর কাঁপে ত্রস্ত দুই হস্ত
নরবানরের বাহিনী সম্মুখে।
চণ্ডিকার বরাভয় দুর্বলে করিল অজয়
সাঁওতালের তীর জয় করিলেক বারুদ বন্দুকে।"

(পৃ. ১৪২)

সিদু ও কানু সুভোবাবু (রাজা) হয়েছে। তারা হুল (বিদ্রোহ) ঘোষণা করেছে। নয়ন পালের গান :

"রাজমহল জঙ্গিপুরে উঠে হুল হুলা
সিদু বলে দাদা কানু—এইবার দেলা!
দেলায়া বাগনাডিহি হয়েছে লগন—"

ইতিমধ্যে সিদু ও কানু রুকনী টুকনীকে প্রেমের দাহনে শুদ্ধি করে নিয়েছে। বোঙ্গার নামে দুইভাই দুজনকে গ্রহণ করে। কানু আগে। সিদুর ইচ্ছাছিল রুকনীকে সাগাই করার কিন্তু রুকনী এই মুহূর্তে অন্যরকম ভাবে—

"সুভোবাবু দাদা শুন, কহিল রুকনী—
আমি রব চাকরানী সঙ্গের সঙ্গিনী।
পুরুষের বেশ ধরি রব সাথে সাথে—
যুদ্ধশেষে সাদী হবে আনন্দ তাহাতে।
যুদ্ধ শেষে রণক্ষেত্রে পাতিব বাসর—
গড়িব মনের সুখে অতঃপর ঘর।" (পৃ. ১৬৪)

সে সাধ তার মেটেনি। অবশ্য কিছুটা পেয়েছিল সঙ্গ-যাপনের। সিপাহীর বেশে, ছদ্মবেশে ব্রিটিশ ফৌজের সংবাদ এনে দিয়েছে সুভোবাবুকে। এর জন্যই তারা পিয়ালাপুর যুদ্ধে জিতেছে। তখন তারা সারারাত আনন্দোৎসবে মেতে ছিল। কিন্তু রুকনী সিঁদুর পরেনি। বলেছিল—হবে সুভোবাবু, সে হবে। নয়ন পাল বলেন, ত্রিভুবন ভট্টাচার্য বলেছেন, এই মহিলা হলো সিদুর শক্তি :

"সাধকের শক্তি যারা তারা নয় বধূ।
তারা হয় জীবনের মনোরমা শুধু।" (পৃ. ১৯১.)

এরপর সংগ্রামপুরের লড়াই। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রনিয়ে লড়াইয়ে নেমেছে ইংরেজ। এখানে ন্যায়নীতির ধার নেই। এই যুদ্ধে কানু ইংরেজের গুলিতে নিহত হন। সিদু-ও আহত হন। রুকনী তাকে বনের ঝুপড়িতে লুকিয়ে রাখে। একসময় দুজনেই ধরা পড়ে। সিদুর ফাঁসি হয়। রুকনী ইংরেজের নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এল বটে তবে সুমুখে তার অনন্ত শূন্যতা। গ্রামের লোকেরা তাকে ভালো চোখে দেখল না। কিন্তু সিদুর স্ত্রী ফুল তাকে আশ্রয় দিল। একদিন সে যজ্ঞে আহুতি দিল তার নিজের জীবন। এইভাবে সে মুক্তি নিল।

তারাশংকর রুকনীকে কাহিনীর নায়িকা গড়েছেন। তার আবেগ বেদনা, অন্তর্চেতনা চিত্রণ করলেন নিপুণ তুলিতে। রুকনী-টুকনীর প্রণয়. মানকীর জীবন যন্ত্রণা—এসব কাল্পনিক চরিত্র চিত্রার্পিত হলে-ও ইংরেজ পুরুষদের অত্যাচার, নারীহরণ ইত্যাদি ইতিহাসে অসংগতি নেই। পট-সংস্কৃতিতে বিদ্রোহের কাহিনী স্বচ্ছ ও গভীর হয়ে ওঠে। তাই, তারাশংকর দেশকালের বিশিষ্ট প্রেক্ষাপটে রচনা করতে পারলেন এমন একটি উপন্যাস। তিনি মহৎ শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টিতে নির্যাতিত মানুষদের দেখেছেন। তাই তাদের বেদনাহনিম জীবনবেদ রচনা করলেন। এসব কথা ও কাহিনীতে সাধারণের 'মনতুষ্টি' হয় যথার্থ।

চার...জঙ্গলে...

সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় একটি উপন্যাস লিখেছেন নাম 'জঙ্গলে' ৫৩। গ্রন্থটি সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য স্মরণীয়। "আমরা যাহাদিগকে "অসভ্য জাতি" বলিয়া থাকি তাহাদের মধ্যে-ও আমাদের উপস্থিত "সভ্য জাতি"র অনেকের অপেক্ষা মহত্ত্ব ও মনুষ্যত্ব দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া যাঁহাদের ধারণা আছে তাঁহারা এই পুস্তিকা পাঠে তৃপ্তি লাভ করিলে আমার চেষ্টা সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করিব।"৫৪

চম্পাই মাঝি তার পুত্র হারমাকে অনেক বুঝিয়েছেন পাহাড়িয়াদের সংগে বিবাদ না করার জন্য। হারমা সে কথা শুনতেই চায় না। দুর্ধর্ষ পাহাড়িয়াদের সংগে তার আপোষ হয় না। পন্টেট (পাল্টিন) সাহেবকে তার শত্রু মনে হয়না বটে কিন্তু ইংরেজ সরকার বলে কিছু আছে তা সে মানতেই চায় না।

শ্যাম পরগণাইত হারমাকে দায়িত্ব দিলেন। পীপড়ায় 'মাঝি'র দায়িত্ব। হারমা এখন অন্য মানুষ। গ্রামের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর দেয়। কোনো-রকম ব্যাভিচার তার সহ্যের বাইরে। ভীষণ মদ খাওয়া সে বরদাস্ত করেনা। এই নিয়ে আমড়াগাছিয়ার গভূ মাঝির সংগে তার বনিবনা হয় না। সে উল্টো প্রকৃতির লোক।

দিনকালের পরিবর্তন হয়। সময় গড়িয়ে যায়। হারমার কন্যা পুনিয়ার ঝাঁঝি গ্রামে বিয়ে হয়েছে। পুত্র ছোট চম্পাই এখন বড়ো হয়েছে। মুরুলী কন্যা কাঞ্চনীর সংগে তার মন দেওয়া নেওয়া চলছে।

কেনারাম ভগত দেশে হরেক রকম অত্যাচার চালায়। আদালতের পরোয়ানা নিয়ে অনেকেরই সম্পত্তি ক্রোক করে নিয়েছে সে। মহেশ দারোগা কেনারামের সহায়। পলটিন সাহেবের নামে মহেশ দারোগার কাছে প্রশ্রয় মেলে না। হারমার নামে মামলা ওঠে। কেনারাম ফরিয়াদি। নাজেহাল হয় হারমা। ধৈর্যের-ও শেষ আছে। অবশেষে "সাঁওতালরা সরকারের সিপাহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার জন্য স্থির করিল: জঙ্গলে তীরন্দাজরা সম্মুখ সমরের জন্য কুড়ালি লইয়া থাকিবে।" (পৃ. ২০৭) সিদু ও কানু নেতৃত্ব দিল। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে পড়ে "পাহাড় হইতে প্রবল-বেগে তুষারপাতের মত সাঁওতাল সৈন্যদল অগ্রগামী ছোট দলকে সিপাহিদের

প্রধান দলকে ছুটাইল—কান্থ ও সিদ্ধ সর্বাগ্রে।" (পৃ ২২২) কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সিদু কানুর দল। ইংরেজের গুলিতে কানু ভূপতিত হলো। সিদ্ধ আহত হয়েই ধরা পড়ে। ইংরেজরা তাকে-ও হত্যা করে। এইভাবে জঙ্গল নায়কদের হত্যা করে ইংরেজরা বিদ্রোহের অবসান ঘটালো বটে তবে 'জঙ্গল' সঁাওতাল রাজাদের বীরত্বের পরম সাক্ষী হয়েই থাকে।

সতীশচন্দ্র জঙ্গলের পরিবেশে সঁাওতালদের জীবনচর্যার ছবি এঁকেছেন। সহজ সরল করেই এঁকেছেন। বিদ্রোহের আভাস দিয়েছেন বটে কিন্তু পূর্ণতর চিত্র আঁকেননি। অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন, "পুস্তিকাখানির বিষয় ইংরাজি ১৮৫৪-৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের কিয়দংশ।"৫৫

সাঁওতাল বিদ্রোহের ওপর আরেকটি উপন্যাস—'দামিন-ই-কো'র ইতিকথা' প্রকাশিত হয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'অনীক'-এ ৫৬। লেখক স্বর্ণমিত্র এর ভূমিকায় বলেছেন. "উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে নিপীড়িত জনতার সশস্ত্র বিদ্রোহের ইতিহাসে প্রচণ্ড উজ্জল একটি নাম: সাঁওতাল বিদ্রোহ। প্রায় পঞ্চাশ হাজার সাঁওতাল তীর-ধনুক-টাজি-তরোয়াল মাত্র সম্বল কোরে এবং সকল সম্প্রদায়ের নিপীড়িত মানুষের সমর্থনের ওপর নির্ভর কোরে সশস্ত্র বিদ্রোহের যে রক্তরাঙা পথ রচনা কোরে দিয়ে গেছে, সেই পথই ভারতীয় জনতার মুক্তির পথ। আর সে কারণেই কোটি কোটি ভারতীয় জনতার মনে আজও সাঁওতাল বিদ্রোহ এতো উজ্বল, এতো মহান।

"দামিন-ই-কো'র ইতিকথা" সেই অগ্নি ঝরা লড়াইয়ের দিনগুলিরই উপন্যাস রূপ।"

এটি ঠিক উপন্যাস হয়নি কাহিনীর গঠন-শৈলি-ও উন্নত নয়। ইতিহাসের তথ্য নির্ভর কাহিনী মাত্র।

এ ছাড়া ইংরেজিতে একটি উপন্যাস রচিত হয়েছে। কারস্টেয়ার্সে'র লেখা *Harma's Village* ৫৭। পখুরিয়া—বেনগারিয়ার 'সন্তাল মিশন অব দি নর্দার্ন চার্চে'স' এর প্রকাশক। কথোপকথন ভঙ্গিতে লেখা, বিদ্রোহের বিবরণ। ঘুগিয়া বুড়ো ও ছোট্‌রে দেশ মাঝির সাঁওতালী ভাষার কথনলিপি নাটকীয় ভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে উপন্যাসে। এতে দেশ মাঝিদের

যারা বিদ্রোহ অন্যায় ঘোষিত হয়েছে। বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য পরায়ণ'বলা হয়েছে। সুবাদের নিন্দা ও সাহেবদের গুণগান করা হয়েছে।

মোটকথা একটি নীতিবাদ প্রচার করা হয়েছে। স্পষ্ট-ই বোঝা যায়, এসব মিশনারিদের কৌশল মাত্র। যাতে আর কেউ কোনোদিন বিদ্রোহী হবার সাহস না পায়।

২. বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া—নাটকে···

এক···মরে ও যারা মরেনা···

সাঁওতাল বিদ্রোহকে নিয়ে একটি ঐতিহাসিক নাটক৫৮ রচনা করেছেন আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটক রচনায় ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে তিনি জানালেন,—আড়তদার মজুতদার "ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যে তারা চাষীদের উপর নানারকম জুলুম শুরু করে দিলে। চাষীরা সরকারের বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরে রুখে দাঁড়াল। তারা ইংরাজ, জমিদার, আড়তদারদের রক্তে বাংলা বিহারের মাটি রাঙিয়ে উড়িয়ে দিল রক্ত-নিশান। ইতিহাস বলে সাঁওতাল বিদ্রোহ, কিন্তু আসলে ওটা কৃষি বিপ্লব। বিশ্বের প্রথম কৃষি-বিপ্লব হয়েছিল আমাদের ভারতে। কৃষকরাই জাতিরপ্রাণ—এই কথার উপরেই আমার এই নাটক রচনা।"৫৯

লেখকের বক্তব্যে অতিশয়োক্তি থাকলেও বোধকরি এই বিদ্রোহ অভিনবত্বের জন্য চিরকাল স্মরণীয় থাকবে। পাশ্চাত্য শক্তির স্বার্থ ও দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের স্বার্থ সমসূত্রে করে দেখা সমীচীন নয়। তবে শোষণের ক্ষেত্রে দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের ভূমিকা বড়ো কম নয়। ফলকথা, এতেই এসেছে অর্থনৈতিক বিপর্যয়। এ বিপর্যয় হতে মুক্তিকামী মানুষ, যাদের একান্ত নির্ভরতা কৃষির ওপর ছিল; তারাই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সুতরাং কৃষকরাই এ বিদ্রোহের শক্তি।

এই নাটকের নায়ক কানু। স্বভাবতই তার উপস্থিতি একটু বেশি। কিন্তু সিধু তার শক্তি। তার ভূমিকাটি-ও বিরাট। কানুর স্ত্রী ঝুমকি ও সিধুর প্রেমিকা ছিবনী তারাশংকরের উপন্যাসের রুকনী ও টুকনীকে মনে করিয়ে দেয়। এখানে কানু সাঁওতালদের ভগোবাবু (রাজা) বলে মানিত। জ্যেষ্ঠ

বলে তার দাবীই অগ্রগণ্য। এতে সিদুর অবশ্য ক্ষোভ নেই। সে যোগ্য সেনাপতি।

সিদু-কানুর পিতা পরগণাইত চুনার মাঝির মনেও দুর্বার অসন্তোষ। "ই-আমার জমিন, আমার জান থাকতে খাজনা আমি দিব নাই। আমি কিষাণ, হালধরে চাষ করি, সোনার ফসল ফলাই, তাই ই-জমির মালিক জমিদার লয়, এংরেজ লয়, ইর একমাত্র মালিকানা আমার।" (পৃ. ৫০)

এই অসন্তোষের বিস্তার সারা নাটক জুড়ে। কারণ, জমির মালিকানা অবশ্য স্বীকার করে না মহাজন মৃগলাল ভগত। সে ভাবে সাঁওতালদের জমিজমা, শস্য সম্পদের মালিক সে। কিংবা জমিদার মহিম রায় সে-ও ভাবে সাঁওতাল মূলুকের খাজনা তারই পাপ্য। তা না পেলে সাঁওতালদের জমিজমা কেড়ে নিতে পারে। তাই মহাজন ভগত যখন সিদু-কানুকে ডাকাত সাব্যস্ত করে পুলিশ কমিশনারের কাছে বিচার চায়; তখন সিদু বলে—"ডাকাত আমি নই ভগত ডাকাত তুরা। আমাদের বুকে বসে তুরা দিনরাত ডাকাতি করছিস?···তু বিচার কর সাব, কিনো দশ টাকা ধার নিলে উর কাছে আমাদের জন্মভোর খাটতে হয়। কিনো দশ পালি ধান নিলে, তিরিশ পালি দিয়াও শোধ হয় না?" (পৃ. ৫৮) তারা-ও বিচার চায়, জমিদার মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, আদালতের বিচার-প্রহসনের বিরুদ্ধে, দারোগা, নায়েব কর্মচারীদের বিরুদ্ধে।

কিন্তু ঘটনা বিপরীত। বিচার তাদের পক্ষে হয় না। তাই বিচার-দণ্ড তারা নিজেদের হাতেই তুলে নেয়। আবার রেল কর্মচারী নিকেলসনের কামনার বাপ্পে যখন সাঁওতাল রমণী বলি হয়—তখন সিদু তার চরম দণ্ড,—মৃত্যুদণ্ড দেবার আগে বলে: "মরবার আগে তু শুনে যা এংরেজ, আমরা কিষাণ, মুর্খ্য মানুষের পায়ের তলায় পড়ে থাকি। কিন্তুক যি আমাদের পায়ে মাড়াতে যাবে তার পা দুখানা আমরা ভেঙে দিব। যি আমাদের মিয়াদের গায়ে হাত দিতে যাবে, তাকেই তুর মত এই টাঙীর কোপে মরতে হবেক।" (পৃ. ৭০)

নাটকের পার্শ্ব চরিত্রগুলির মধ্যে মহাজন ভগতের পুত্র রামলালের ভূমিকা অগ্রগণ্য। মানবিক গুণগুলি তার মধ্যে যথেষ্ট। পিতার চরিত্রের সঙ্গে তার বিস্তর ফারাক। সে সাঁওতালদের সমব্যথী। সাঁওতাল রমণীর সতীত্ব

রক্ষায় নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়েছে। তার এই মহতী কর্মের মধ্যেই নাটকের Climax ধরা পড়ে। কানুর পত্নী ঝুমকিকে বিপদের চরম মুহূর্তে সে সান্ত্বনা দিয়ে বলে "শয়তান ইংরেজের হাত থেকে আমি তোকে বাঁচাতে পারলাম না মা। কিন্তু তোর নারীত্বের চরম অসম্মান থেকে আমি তোকে রক্ষা করব। তোদের বিপদে সাহায্য করবার জন তোর স্বামী আমাকে এই অস্ত্র দিয়েছিলেন, এই অস্ত্রে আত্ম রক্ষা করে তুই তোর মর্যাদা রক্ষা কর মা।" (পৃ. ১২৮)

নাটকের মধ্যে দীনেশ দারোগার নিষ্ঠুর ভূমিকা, কর্ণেল জেমসের সৈনাপত্য, খ্রীস্টান সাঁওতাল চূড়ামাঝির বিশ্বাসঘাতকতা, সিদু ও ঝুমকিকে কেন্দ্র করে কানুর অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভুবন ভট্টাচার্যের ঔদার্য নাটকের গতি দিয়েছে। সব মিলিয়ে নাটকে লক্ষিত হবে কাল্পনিক চরিত্রের মিছিলে ইতিহাসের দিব্য কাহিনী।

দুই...সাঁওতাল বিদ্রোহ...

নাট্যকার মন্মথ রায় 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে একটি নাটক রচনা করেছেন। ৬০ এতে নাট্যকারের ভাবিক-আভাসটুকু লক্ষনীয়ঃ "সারল্যের ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হিন্দু মহাজন নির্লজ্জভাবে দাসত্বের শৃঙ্খল পরিয়েছে নিরীহ সাঁওতালদের পায়ে।...নিরক্ষর সাঁওতালদের সরলতার সুযোগ নিয়ে লুণ্ঠনের যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করেছে জমিদার মহাজন গোষ্ঠী. সে নাগ পাশ হতে মুক্তি আছে কি তাদের? আমরা" অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করছি আধুনিক সভ্যতার আবরণে সার্থান্ধ মানুষের অমানুষিক বর্বরতার এক করুণ ইতিহাস।" ৬১

এতে মহাজন ও রেল-ঠিকাদার নিমাই চৌধুরীর শোষণ-অত্যাচার কথিত হয়। সে ঠিকাদারী কাজ নিয়মিত রাখার জন্য সাঁওতাল রমণী ইংরেজদের কাছে ডালি পাঠায়। অথচ তারই পুত্র মাণিক চৌধুরীর সেসব কাজে সায় নেই। (পৃ ২৪) সে সাঁওতালদের কথা ভাবে।

নাটকের গতি অবশ্য তরতর করে এগিয়ে যায় মাণিক যখন সাঁওতাল রমণী টিয়ার কাছে আত্ম সমর্পণ করে। এই তার কথন চিত্র—.

"মাণিক ।। আমরা এতকাল তোদের মন ভেঙেছি—তোদের ঘর ভেঙেছি। দেবতা তার শোধ নিচ্ছে। আমি বামুনের ছেলে, তোদের ছায়া মাড়ালেও আমাদের পাপ হয়। অথচ কি আশ্চর্য! আমি তোকেই ভালোবেসে ফেলেছি। সাঁওতাল জাতটাই আমার ভাল লাগছে।...

টিয়া ।। তু কি পাগলা হলি সাহেব ?

মাণিক ।। কখনও কখনও তাও মনে হয়েছে টিয়া। তোদের ঠকাতে—ভাতে মারতে আমিও কিছু কম করিনি। যত আঘাত হেনেছি, ততই কাবু হয়ে পড়েছি আমি। সারারাত ঘুমুতে পারিনা আমি। রাত জেগে বসে কেবলই ভেবেছি এর প্রতিকার কি ?
শেষে প্রতিকার কি তা খুজে পেয়েছি। সাঁওতালী ভাষায় রাতের পর রাত বসে বসে এই সাদা পুঁথিটি আমি লিখে রেখেছি। পরগনার সাঁওতাল এক জায়গায় জড়ো হও আজ, যে দরখাস্ত আমি লিখে দিয়েছি সেই দরখাস্ত দাখিল কর সাহেব সরকারের কাছে। কলকাতায় বিচার হবে—আমি বলছি বিচার হবে।" (পৃ ৪২)

সাঁওতালদের প্রতি তার নিবিড় টান, গভীর তার সহানুভূতি। শুধুমাত্র সাঁওতাল রমণী টিয়ার প্রতি আসক্তির কারণেই নয়, অন্যবিধ কারণ-ও বটে। সেকথার জট খুলে যায় কানুর হাতে ছুরিকাঘাতী মৃত্যুপথ যাত্রী নিমাই চৌধুরীর শেষ জবানীতে—"ও আমার ছেলে বটে, কিন্তু —সাঁওতালীর পেটে ওর জন্ম—ও সাঁওতাল।" আরও বলে—"মরতে বসে মিথ্যে বলবোনা মাণিক। তোকে, বামুন বলে চালিয়েছি। বামুনের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছি। সে পাপের প্রতিফল—পেলাম আজ হাতে হাতে।" (পৃ ৫১)

এখানেই নাটকের চরম উৎকর্ষ ধরা পড়ে। কারণ, সাঁওতাল দরদী মাণিক নিজেকে নোতুন করে আবিষ্কার করে। তাই তার হাতে বন্দুক গর্জে ওঠে ঘুষখোর মহেশ দারোগাকে হত্যা করতে। মাণিকের এই কাজের মধ্যে সিধু ৬২ ও প্রণয়িনী টিয়ার মাণিককে দেবদূত বলে মনে হয়। তাদের মনে হয় বোংগা ঠাকুর তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। লড়াইয়ের জন্য ঠাকুর পুঁথি দিয়ে গেছেন। তবু-ও টিয়ার মনে সংশয়। তাই সিধু তাকে বলে—"ঠিকাদারকে (মাণিক চৌধুরী) তু ভালবাসিস্। ঠিকাদার যা বলবে তা

তুর মনে ধরবে। তাই ঠিকাদার হয়ে তুর কাছে এলেন ঠাকুর'। তা যদি না হবে ঠিকাদার কুথা পাবে এ পঁথি? জমিদার-মহাজনের সঙ্গে হামরা যে লড়াই করবে—তার এই হাতিয়ার।" (পৃ ৪৩)

নাটকের কুশীলবদের মধ্যে আছে দীঘি থানার ছোট দারোগা রামশরণ, সাঁওতাল ক্রীতদাস ভৈরব প্রভৃতি। রামশরণের চরিত্রটি ভালো করে এঁকেছেন লেখক। সে ন্যায়-বিবেকমান মানুষদের একজন। তাই রামশরণ নিমাই চৌধুরী ও জমিদারের নায়েব ধর্মরাজকে শাসিয়ে বলেন,—"জমিদার আর মহাজন আপনারা মশাই এই নিরীহ মানুষগুলোর উপর এতকাল যে torture করেছেন—তার ফলেই আজ এই rebellion. yes I believe it." (পৃ ৪৬) অথচ, বড় দারোগা মহেশ, সে ঘুষের তলবী পেয়ে ছুটে আসে মহাজনদের স্বার্থ রক্ষার্থে। কিন্তু অনিবার্য তার মৃত্যু পরিণতির মধ্যে দুর্জনের পরাজয় ঘটে।

আরেকটি চরিত্র রাধা। স্বামীসঙ্গ-সুখ না পেয়ে ঘর-বন্দী ভৈরব সাঁওতালকে সে ভালোবাসে। প্রেম নিবেদন করে। কু-চক্রী বেড়াজাল থেকে মুক্তি খোঁজে সে। মাণিক এসব কথা জানতে পেরে টিয়ার প্রতি প্রণয়াসক্তি হওয়া সত্ত্বেও স্ত্রী রাধাকে ক্ষমা করতে চায়নি। রাধার, প্রতি সহানুশীল হতে পারেনি। উভয়ের মিলন অবশ্য হয়েছে সাঁওতালদের এক সংঘটন মুহূর্তে।

নাট্যকার সাঁওতালদের নির্মম অভিযান, বাজার গ্রাম লুঠ, জমিদার মহাজন ও ইংরেজ নিধন প্রভৃতির তৎপরতা জীবন্ত করে চিত্রিত করেছেন। এসব তথ্যের জন্ত হাণ্টার সাহেবের 'Annals of Rural Bengal'—গ্রন্থখানির ওপর তিনি নির্ভর করেছেন। এ ক্ষেত্রে নাট্যকারের ইতিহাস প্রবণতা লক্ষণীয়। কিন্তু সার্থক মানুষের ছবি ও ইংরেজের দানবীয় রূপটির নিপুণ চলচ্চিত্রায়ণ তাঁর নাটকে অনুপস্থিত।

৩. বিদ্রোহে প্রতিক্রিয়া—কবিতা ও ছড়ায়

এক...অথ বিদ্রোহী সাঁওতালগণের কবিতা...

শুন ভাই, বলি ভাই, সভাজনের কাছে
শুভবাবুর ১ হুকুম পেয়ে, সাঁওতাল ঝুকেছে
বেটারা কোক ছাড়িল—বেটারা কোক ছাড়িল, জড় হইল, হাজার হাজার
কখন এসে কখন লোটে থাকা হল্য ভার।
হলো সব তুভ্যাবনা—হলো সব তুভ্যাবনা. রাড়কান্দনা, সবাই ভাবে বসে
ঘড়াঘটি মাটিতে পোতে কখন ফিরে এসে।
বলে ভাই রাখিব কোথা—বলে ভাই রাখিব কোথা, জেথা সেথা, এই কথা বুনি
রাখেত মোলুক সদা মুলুক ভাবতেছে কোম্পানী।
বেটাদের সক্তি শোনে—বেটাদের সক্তি শোনে, প্রজাগণে, কইছে ধিরে ধিরে
জিনিষ ছেড়ে পালাও না ভাই সভাই থেক ঘরে
আমাদের আছে গোরা—আমাদের আছে গোরা, সঙ্গিন চড়া, জামা জোড়া গায়
বন্দুকেতে গোলিপোরা তুড়ুক সয়ার তায়।
বেটারা থাকে কোথা—বেটারা থাকে কোথা, সর্ত্ত কথা, বুঝায় তোমাদেরে
কেহ বলে দেখে এলাম মোরাক্ষির ধারে।
আছে সব জড় হয়ে—আছে সব জড় হয়ে, পূর্ব্বমুয়ে. তির মারিছে গাছে
কতশত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে।
তিরের ফলি বানাইতে—তিরের ফলি বানাইতে, বরাত মতে, জখন জেমন
কয় হাতে হাতে যোগাইছে ফলা গাছে টানা হয়।
বেটাদের পোসাক চড়া—বেটাদের পোসাক চড়া, কপ্নীপরা লইতে বেড়া বুকে
তাড়ের উপর পুজা করে কোক ছাড়িছে মুখে।
আগেতে লাগড়া পিটে—আগেতে লাগড়া পিটে, কাটে ছেটে, মদে তাসে ভরা
প্রথমে বাঁধকুলি২ দিয়ে পল্যাগা জে ভেরা।
দেখে সব লোক পালায়েছে—দেখে সব লোক পালায়েছে, টোকা পেছে,
নয়ে নটাইখান
কেহ বলে রান্দা রইল বড়মাছের থাল।

---

১. শুভবাবু='সুবাদার' শব্দের অপভ্রংশ। এখানে সিদু।
২. বাঁধকুলি=সিউড়ির উত্তরে বাঁধকুলি গ্রাম

বলে ভাই পালা পালা—বলে ভাই পালাপালা, একি জালা, করে কলরব
বেচারামকে কেটে বেটারা রক্ত মুখ সব।
আর কি হাকিম মানে—আর কি হাকিম মানে, বনে বনে, রাস্তা পেলে সোজা
সাদিপুরে লোটাল গিয়ে কাপড়ের বুজা
যথা উচিত বুচকা বেন্দে—যথা উচিত বুচকা বেন্দে, নিলকান্দে, জত মনে ছিল
রাতারাতি হাতাহাতি কাপিষটাকে গেল
সকলি এমনী ধারা—সকলি এমনীধারা, দেয়লাগড়া, অহর্নিশী পিটে খাবার
বেলায় সাঁওতালদের মেয়ে ছেলে জুটে।
বলে ভাই রাজা হব—বলে ভাই রাজা.হব, টাকা পাব, করিয়া মন্ত্রণা
দুদিন বাদে পুড়াইল গিয়ে নাজুলের থানা
ঐ কথা শুনে—ঐ কথা শুনে, সিফাইগণে, বন্দুক নিল হাতে
দারগা মুন্সির সঙ্গে দেখা হইল পথে।
মনেতে ভয় পেয়ে—মনেতে ভয় পেয়ে, পশ্চিম মুয়ে, অম্নি গেল ফিরে
পড়ের-পুরে মোকাম কৈল গয়ারামের ঘরে।
জত সব চেলের গোলা—জত সব চেলের গোলা, ভাঙ্গিতালা, সকল বার
করিল মরাপেটে চড়া দিয়া খিটন যে লইল।
তখন সিফাইঘেরা—তখন সিফাইঘেরা, সাজিল চড়া, কাপ্তান সহিত
নদির উপান্তে আশি হইল উপনিত।
জতসব সিফাইগণে—জতসব সিফাইগণে, ভাবে মনে, হবে স্যার স্যার
দেখে শুনে মৌরাক্ষি উভয়ে না হয় পার।
ভিরবর্ধা স্বয়ার আছে—ভির বর্ধা স্বয়ার আছে, আপন সাজে, রন নাইখ বাজে
নদির ধারে সাঁওতালরা লাগড়া বাজায় নাচে।
সেখানে সার্দ্দি১ কার—সেখানে সার্দ্দিকার, পারাপার দুকুল বহে বাণ
হাতেতে কিরিচ ধ'রে দেখিছে কাপ্তান।
দেখিয়া বহুত সেনা—দেখিয়া বহুত সেনা, কি মন্ত্রণা, করে দুইজনে
বন্দুক স্বয়ার রাখ কহে সিপাইগণে
দণ্ডচ্যার হয় পরে—দণ্ডচ্যার হয় পরে, কয় হল্যদারে. বুক্ষেদারের প্রিতি
লিল'র করিতে দুরপীনে আন সিত্র'পতি

১. সার্দ্দি=সাধ্য

বলে উঠিল গজে—বলে উঠিল গজে, হাউদা মাঝে, নয়নে হুরণীন
ঝাড়ে ঝোড়ে আছে সাঁওতাল কোষ১ দুই তিন।
কিছুদূর পিছে হাট—কিছুদূর পিছে হাট, বলে ঝাট, সাহেব গেল চল্যে
পবন বেগে ধায় সাঁওতাল পালায় পালায় বলে।
করিয়া বহু দক্ষ—করিয়া বহু দক্ষ, দিল ঝম্প, পড়িল নদির জলে
সাতারিয়া পার হইল হাজার সাঁওতালে।
বলে সব মার মার—বলে সব মার মার, ধর ধর, এই মাত্র রব
আজি সিহুড়ি জেলা লোটব গিয়ে করে পরাভব।
ভাব সব জেহালখানা—ভাব সব জেহালখানা, দিব থানা. মুক্ত করিব চোরে
শুভবাবু রাজা হবেন জ্যজ সাহেবকে মেরে।
আমারা ঘুচিব মাঝি—আমরা ঘুচিব মাঝি, কাজের কাজি, মহুর করব বশ্যে
কৃষ্ণ শৌন্তর২ দোকান ভেঙ্গে সয়াপ খাব র্কশে।
বলে সিব্র্ত্তর—বলে সিব্র্ত্তর, আগুধর, আর বিলুষ কেনে
কর্ম্মপাকে পল্য সাঁওতাল সিফাএর মাঝখানে।
বেটারা তুচ্ছ্যজাতি—বেটারা তুচ্ছ্যজাতি, নাইথ বুর্দ্ধি৩ কিবা জানে টৈর
আচম্বিতে হুকুম হাঁকে বলিয়া ফয়ের।
আলি হুকুম পেয়ে—আলি হুকুম পেয়ে, সিকাইজেয়ে, বন্দুক হাতে তোলে
পঞ্চাষ পঞ্চাষ গোলি মারে এককালে!
জেমন তারা খসে—জেমন তারা খসে, আশেপাসে, তেমনি গোলি ছুটে
পিষ্টেতে বাজিয়া কারু পার হইল পেটে।
অন্য সাঁওতাল জত—অন্য সাঁওতাল জত, কতশত, পলাইয়া গেল
কুড়ি আঠ নয়৪ সাঁওতাল তারা শেই দিনেতে মোল।
তখন পালায় সাঁওতাল—তখন পালায় সাঁওতাল, করিয়া বিকল,
পিছে নাহি চায় সলাখ পাহাড়ে জেয়ে শুভকে জানায়।
শুনে সব দুঃক মনে—শুনে সব দুঃক মনে, পরদিন' কৈল একাকার
দমিন৫ হইতে আনায় সাঁওাল দ্বাদশ হাজার।

১. কোষ=ক্রোশ ২. কৃষ্ণ সৌন্তর=কৃষ্ণ সাহা ৩. বুর্দ্ধি=বুদ্ধি
৪. কুড়ি আট নয়=আঙ্কিক হিসেব, ২০৮৯ ৫. দমিন=দামিনের অপর নাম ছিল। ইংরেজ সরকার পাহাড়িয়া ও সাঁওতালদের জব্দ করার জন্য দামিনের শাসনভার নিয়েছিলেন।

নাহিক মৃত্যু ভয়—নাহিক মৃত্যু ভয়, সদায়য়, ধেনুকেতে চড়া
লগর মোকামে জেয়ে বাজায় নাগেড়া।
শুনে সব লোক পলাইল—শুনে সব লোক পালাইল, বিসম্য হল্য, তামলি
পুদ্যার ১ সতগোপ গোওলা পালায় কান্দে ২ নয়ে ভার।
পালায় সব বুড়াবুড়ি—পালায় বুড়াবুড়ি, দৌড়াদৌড়ি হাতে লয়ে লড়ি
মস্যলমান ফকির পালায় মুখে পাকা ডাড়ি
মুখেতে বলে আল্যা—মুখেতে বলে আলা, বিষমল্যা, এঁকি বেটাদের ভির
এ বিপদে রক্ষা করহে সর্ত্তপির৩।
বলে প্রাণ জায়—বলে প্রাণ জায়, হায় হায়, কি বিপদ হইল
কালু সেখের মা কেন্দে বলে আমার মরিগ৪ কোথা গেল।
জত সব মাথায় ঝুড়ি—জত সব মাথায় ঝুড়ি, কেঁথা ধুকুড়ি, উর্দ্দ্ মুখে ধায়
ইজট৫ লেগে পোড়ে কেহ গড়াগড়ি জায়!
ঐ সাঁওতাল—ঐ সাঁওতাল, এল সাঁওতাল, কাটিলেরে সাঁওতালে
আজি রক্ষা নাই ভাই কি আছে কপালে।
তখন হরষ্য মোনে—তখন হরষ্য মোনে, সাঁওতালগণে, রাজবাড়ী সোন্দায়৬
মানুষকাটা পড়িল সেইদিন কুড়ি দুই আড়ায়।
পরে সাঁওতালগণ—পরে সাঁওতালগণ, হ্রিষ্ট মোন, দেয় টাঙ্গিতে সান
লাওজোড়ে নায়া বেটাকে দিল বলিদান।
গেল কুমড়্যাবাদে—গেল কুমড়্যাবাদে, সকল ফদে, হইল একাকার
ঘরে অগ্নি দিয়ে বেটারা কল্যো ছারখার।
পোড়াইলে ধানের গোলা—পোড়াইলে ধানের গোলা, তিলজুল্যা, সরিসা
আদি জত গরু মহিষ ছাগল ফেঁড়া৭ পুড়িল কত শত।
পূর্ব্বে হনুমান—পূর্ব্বে হনুমান, লঙ্কাখান, জেমতে পোড়ায়
ঘরাঘরি অগ্নি দিয়ে সাঁওতাল বেড়ায়।

১. পুদ্যার=পোদ্দার জাতি
২. কান্দে=কাঁধে
৩. সর্ত্তপির=সত্যপীর
৪. মুরিগ=মুর্গী
৫. ইজট=হোঁচট
৬. সোন্দায়=প্রবেশ করে
৭. ফেঁড়া=ভেড়া

ঐ গ্রাম নিবাস—ঐ গ্রাম নিবাস, সাধুদাশ, তার সঙ্গে জনাচারি
সিহুড়ি আসি জজ্যের কাছে বলেছ বিনয় করি।
আরত্য প্রাণ বাঁচেনা—আরত্য প্রাণ বাঁচেনা, কি যন্তনা, কহ্যেন হুজুর বস্তে
ঘর কর্ণ্যা পুড়ায়ে আমার ভাইকে কাটলে সেযে।
সিগ্র উপায় কর—সিগ্র উপায় কর, স'াওতালয়ায়, রাখ প্রজাগণ
টাঙ্গির চোটে মোলুক কেটে পত্তিত কল্যো বোন।
সাহেব ওস্তামনে১—সাহেব ওস্তামনে, সিপাইগণে, বলয়ে বচন
অতি সিগ্র জাও তোমরা কর গিয়ে রণ।
কথা শুনে তখন—কথা শুনে তখন, জত সিফাইগণ, বন্দুক হাতে নিল
রাতারাতি সিফাইগণ কুমড়াবাদকে গেল।
যুদ্ধি জেই মত্তে—যুদ্ধ যেই মত্তে, বিস্তারিতে, হবে বহুতক্ষণ
আকাশের চাঁদ ধরয়ে বামন।
বেটারা ধেনুক ধরে—বেটারা ধেনুক ধরে, ভিরমারে, করে মার২
সঙ্গেতে কুকুর আছে হাজারে হাজার।
সাহেব হুকুম দিলে—সাহেব হুকুম দিলে, ফয়ের বলে, যুন সিফাইগণ
হাজারে হাজার স'াওতাল মারে ততক্ষণ।
অমনি ভগড়্যা হয়ে—অমনি ভগড়্যা হয়ে, পূর্ব্বমুয়ে, পালাইয়া জায়
পাটজোড় মোকামে আসি নাগড়া বাজায়।
লাগড়ার সব্দ শুনে—লাগড়ার সব্দ শুনে, সর্ব্বজনে, পালায় সর্ত্তরে,
জনা দষ ব্যাগিড়ে গোয়াল সেই দিনেতে মারে।
লোকের কি জন্তনা—লোকের কি জন্তনা, কি লঞ্ছনা, কল্যেয়ে স'াওতালে
কত গর্ত্তবতি রাস্তায় পুসুবিল ছেলে।
এমনি সর্ব্বত্তরে২—এবনি সর্ব্বত্তরে, লোটকরে, বেড়ায় স'াওতাল
মনিস্য কা কথা দেবতা পালান গোপাল।
ভাগুবোন ছেড়ে—ভাগুবোন ছেড়ে, পালান দোড়ে, পুস্করির মাথায়
বিরসিংহপুরের কালিয়াএর বাল্হারি জাই।
১২৬২ বারষ বাসঠীসাল—বারষ বাসঠীসাল, বরসাকাল, বানের বড় বিদ্ধি
আকারপুরে মানুষ কেটে কল্যো গাদাগাদী।

১. ওস্তামনে=খোলস বলে   ২. সর্ব্বত্তরে=সবত্তরে

কাটিলে বিষ্ণুপুরে—কাটিলে বিষ্ণুপুরে, হারা তাঁতিরে, প্রিয়েবুলার মাঠে
বিপিন গোপকে তিরিয়ে মারেল পখুরের ঘাটে।
লোটীলে কুলকুড়ি—লোটীলে কুলকুড়ি, দৌড়াদৌড়ি, লাগড়া দেয় সেশে
দেবু রায়কে তেড়ে ধল্যে আখবাড়িতে এশে।
পুড়াতে দেয় বাড়ি—পুড়াতে দেয়বাড়ি, উলঙ্গ করিয়ে
জাগু মাঝি চেনাপ১ ছিল তেয় দিল ছাড়িয়ে।
ধল্যোচন্যাঘাঠে—ধল্যোচন্যা মাঠে, পখুর কাটে, দাশী গোওালেনি
কাটের ভিতরে মাগি হারাল্য পরানি।
জত সব সাঁওতালগণে—জত সব সাঁওতালগণে. কাটের মোনে জতমাটী ছিল
ওখড়িয়া সকলমাটী চাপাইয়া দিল।
পরে ধেনুক ধরে—পরে ধেনুক ধরে, তার উপড়ে, নাচিতে লাগিল
ফুল্যাই পুরের ডাক্তালেতে সেকাই দেখিতে গেল।
অগ্নি কোক ছাড়িয়ে—অগ্নিকোক ছাড়িয়ে, পশ্চিম মুয়ে পলাইয়া গেল
আলান চকের নন্ত্র দাশের গরু ঘেরি লিল।
তখন নন্ত্র দাস—তখন নন্ত্র দাস, করে হুত্যাষ, মাথায় ঘা মারে
বলে গোধন ছাড়াইতে পারি তবেই আসিব ফিরে।
তখন বস্ত্র ছাড়ি—তখন বস্ত্র ছাড়ি, কপ্নি পরি, সাঁওতাল সাজিল
চুন মুখান পাতে ভরি কড়চে গোজিল।
হাতে ধনুর্বান—হাতে ধনুর্বান, টাঙিখান, কান্দেতে লাগিয়ে
সাঁওতাল বুলি জানি এই সাহষ করিয়ে।
সাঁওতালের সঙ্গে—সাঁওতালের সঙ্গে, নানারঙ্গে, কথায় ভুলিয়ে
অলখওা ছলনা করি আনিল ছাড়িয়ে।
রাইকৃষ্ণদাশেভনে—রাইকৃষ্ণ দাসে ভনে, সংক্ষেপনে কিছু লেখা হল্য
বিস্তার লিখিতে হল্যে অনেক বাহুল্য।
কাএস্ত২ কোলে জন্ম মোর রাইকৃষ্ণ দাশ
কুলকুড়ি গ্রামে মোর হয়জে নিবাষ।
জেলা বিরভুম তাহে লোনি পরগণা
লাটরাম তাহে নাক্তুলের থানা।

১. চেনাপ=চেনাজানা ২. কাএস্ত=কায়স্থ

আমি ভাবি মোনে—আমি ভাবি মোনে, সাঁওতালগণে রাখিলে মুক্যাতি[১]
জে কিছু লিখিলাম আমি সকলি ত সত্তি।
কথা মিথ্যা নয়—কথা মিথ্যা নয়, সর্ব্ব হয়, এই জে বিবরণ
হরি হরি বল দিন গেল অকারণ।
১২৬২ বারষ বাশট্টী সাল—বারষ বাশট্টী সাল, এই গোলমাল, বড় ভাবনা মনে
কুলকুড়ি লোট হয় ২৩ শাবনে।৬৩

দুই...সাঁওতাল হাঙ্গামার কবিতা...

কবিতার প্রারম্ভে কবি তাঁর বাসভূমি রাজমহলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করেন,—

ভাগলপুরের অধীনে রাজমহল।
সে রাজমহল থাম্য,
স্থান অতি মনোরম্য,
চৌদিকে পরিবেষ্টিত পর্ব্বতমণ্ডল॥
কিবা শোভা মনোলোভা বর্ণনে না জায়।
তার উপত্যকা ভূমে,
সাঁওতাল জাতি নামে,
বাস করে অন্ন করে কৃষি করে খায়॥
অসভ্য বর্ব্বর অতি বুদ্ধি নাই ঘটে।
হলে কোন গণ্ডগোল,
সেই বোলে দিয়ে বোল,
ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া সেই পথে ছুটে॥

বিদ্রোহের প্রতি কবির দৃষ্টি বিমুখ। তথাচ কবি সাঁওতালদের মর্ম যন্ত্রণা কিছু-কিঞ্চিত এঁকেছেন।

রৌদ্রে শীতে জলে তাতে কষ্ট করি চাষ।
কি দোষে সাঁওতাল জাতি
দুখে থাকে দিবারাতি,
উদর পুরিয়া অন্ন নাহি বার মাস॥

১. মুক্যাতি=সুখ্যাতি

বুদ্ধি বলে বাঙ্গালী ও যত হিন্দুস্থানী।
আমাদের দেশে আসি,
আমাদের মধ্যে বসি,
আমাদেরি লয়ে সব হইয়াছে ধনি ॥
বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী
দেশ মধ্যে সব ধনী
আগে দণ্ড দেওয়া চাই তাদেরি বিশেষ ॥

সাঁওতালদের রাগ-দ্বেষ তাদের ওপর নেই যারা—

হাল ধরে চাষ করে বাবুগিরি নাই।
এরা যদি করে দোষ
কভু না করিব রোষ।
সাজা না পাইবে তারা সবে শুন ভাই ॥

দেশমধ্যে সাঁওতালদের যারা সুখ কেড়ে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের জন্য সিদু ও কানু দুই ভাই এক কৌশল অবলম্বনকরেন,—

এই দুই সহোদরে যুক্তি করি মনে
নিজ সম গুনধর,
জোটাই যে সহচর,
আরম্ভিল বুজরুকি আপন মনে।· ·
…হইত ঘণ্টার ধ্বনি তুলসীর তলে।
কোথা থেকে কে বাজায়,
কেহ না দেখিতে পায়।
হইল আশ্চর্যান্বিত সাঁওতাল সকলে ॥
দর্শন সাঁওতালগণ জিজ্ঞাসা করিলে।
বলিত শিদ ঠাকুর
মোদের দুঃখ গেল দূর।
আসিয়াছে পরমেশ তুলসীর তলে ॥

সিদু ও কানুর মুখে অলৌকিক ঘণ্টা ধ্বনির ব্যাখ্যা শুনে সাঁওতালগণ সিদু ও কানুর নেতৃত্ব মেনে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। কবির বর্ণানুযায়ী দিনলিপি

হলো ১৮ই আষাঢ়, ১২৬২ সাল। দলবদ্ধ হয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহীরা পাঁচ কোথিয়ার বটবৃক্ষ তল সমবেত হলো।

বাঙ্গালা সন বার শত বাষট্টি সালে।
আঠারোই আষাঢ়েতে
চলে পাঁচ কেঠে বট বৃক্ষ তলে ॥
সেই বটবৃক্ষ রাক্ষসীদেবীর স্থান।
তথায় সাঁওতাল সব,
করে মহাবীর রব,
দেবীরে প্রণাম করে সঙ্গীত গান॥

এরপর সুরু হয় তাদের আবরণীয় বিদ্রোহোদ্যম। মহাজনরা বিদ্রোহী নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্ত মদ নিয়ে যায়, মহেশ দারোগা মিষ্ট বাক্যে তাদের তুষ্ট করার চেষ্টা করে। কিন্তু তা হবার নয়। কবির চোখে—"বর্বর সাঁওতাল নানা কটু কথা কয়।" এরপর সাঁওতালদের লুণ্ঠন ক্রিয়া সুরু হয়। বারহেতের বাজার লুঠ সম্পর্কে কবির বক্তব্য :

লুটিল বাড়েৎ বাজার কত হাজার পেয়েছে সব টাকা।
এ সকল বলতে পারে হিসাব করে নাইকো কারো লেখা ॥

মহেশপুর লুণ্ঠন সম্পর্কে তিনি বলেন—

পৌছিল সাঁওতাল সবে, উচ্চরবে, মহেশপুর গিয়ে।
লুটিল দুষ্টচয়, রাজালয়ে, ধনরত্ন নিল।
নিল নিল সব রেশমী-বসন, স্বর্ণভূষণ যেথানে যা ছিল ॥

কিন্তু কবির ইংরেজদের মহাবলে আস্থা অনেক। তাই কবির আনন্দ-বিস্ময় ;

"দৈবেতে মহামান্য, রাজার সৈন্য মহেশপুর এলো।
করিল মহাধুম গুড়ুমগুম, বন্দুক ছুটিল ॥

অবশ্য, কবির দ্বিধা নেই যে, সাঁওতালরা বীর জাতি। যুদ্ধে তাদা পরাঙ্মুখ নয়। বিদ্রোহীদের সেই সাহসিক-পরিক্রমার কথা তিনি বলেন নিশঙ্ক চিত্তেই—

করিয়া দরশন সাঁওতালগণ ধরলো ধনুর্বাণ।
পড়ি যে রহিল অঙ্গ, অবসন্ন, ক্ষুধায় কাতর প্রাণ ॥
তথাপি সাহস করে, সমর করে, রাজার সেনার সাথে।
মরে, সব উচ্চরবে, মহাহবে. (মহারবে ?) বন্দুকের গুলিতে ॥৬৩

এরপর, সিধু ও কানুর পতন-মৃত্যুতে, বিদ্রোহীদের অভ্যুত্থানের ,ব্যর্থতার পরিশেষে কবি "সদাচারের উপদেশ দান' করে "ভারতগগনে ইংরাজ শারদ-পূর্ণ শশীর" মহিমা কীর্তন করে ইংরেজের জয় ঘোষণা করলেন।

কবিতাটির রচয়িতা "রাজমহল মহাকুমার পাঁচকেথিয়া বাজার চৌধুরী ধনকৃষ্ণ রুজ।" এটি উনিশ শতকের শেষের দিকে রচনা বলে অনুমান করেছেন সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।৬৫

তিন...সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া...

কৃষ্ণদাসের 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া'টি দীনেশচন্দ্র সেন 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা', দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশ করেন। এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 'এই ক্ষুদ্র ছড়াটিতেতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও ইহার কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া পালাটিকে গীতিকায় সন্নিবিষ্ট করিলাম। পালাটি পশ্চিম-বঙ্গে বিরচিত হইলেও তাড়াতাড়িতে পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় সন্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে।" সে যাইহোক, আমাদের বিচার্য এর ঐতিহাসিকতা। বিদ্রোহী মানুষদের যথার্থ পরিচয়ে কবি বলেন :

"শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে
শুভবাবুর হুকুম পেয়ে সাঁওতাল ঝুকেছে॥
বেটারা কুক১ ছাড়িল, জড় হৈল, হাজারে হাজার।
কখন আসে কখন লুটে থাকা হ'লো ভার॥

বিদ্রোহীদের সংগে বাঙালীদের অনেকেই যোগ দিয়েছে। কবির ভাষ্যে তা মেলে :

আছে সব জড় হয়ে পূর্বমুয়ে তীর মারিছে গাছে।
কতশত কর্ম্মকার সঙ্গেতে এনেছে॥
তীরের ফলা বনাইতে, দিবারাত মতে যখন যেমন কয়।
হাতে হাতে জোগায় ফাল পাছে টানা হয়॥*

১. কুক=চীৎকার, হাঁকডাক

* 'বিদ্রোহী প্রদেশের যাবতীয় কামারেরা দিনরাত্রি বন্দুক নির্ম্মাণ করিতেছে; বোধ হয় সন্তালেরাই তাহা প্রস্তুত করাইতেছে।"
সম্বাদভাস্কর, ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৬

বিদ্রোহের বিস্তার প্রসংগে কবি বলেন ;

আগেতে নাগরা পিটে, কাটে ছিটে, মহে মাসে ভরা।
প্রথমে বাঁশকুলী দিয়ে পল্ল গাঁয়ে ডেরা ॥
দেখে সব, লোক পালাইছে, টোকা পেছে, লয়ে লাটাইখান।
কেহ বলে, বাঙ্কা রইস, বড় মাছের খান ॥
বলে ভাই পালা পালা, একি জ্বালা, করে কলরব।
বেচারামকে কেটে বেটাদের রক্তমুখো সব ॥
আর কি হাকিম মানে, বনে বনে রাস্তা পেয়ে সোজা।
সাদিপুরে, লুটে গিয়ে, কাপড়ের বোঝা ॥

সকলই এমনি ধারা, দেয় নাগরা, অহর্নিশ পিটে।
খাবার বেলায় সাঁওতালদের ছেলে মেয়ে জুটে ॥
লে ভাই, রাজা হব, টাকা পাব, করিয়ে মন্ত্রণা।
দুই দিন বাদে পুড়াইল, লাঙুলের থানা ॥
ঐ কথা শুনে, সিকাইগণে, বন্দুক নিল হাতে।
দরগা মন্সীর সঙ্গে দেখা হইল পথে ॥

বিদ্রোহীদের প্রতি কবির বিদ্রূপ ;

বলে সব মার মার, ধর ধর, এই মাত্র রব।
আজ সিউড়ী জেলা লুটবো গিয়ে, করবো পরাভব ॥
যাও সব জোহালখানা, দিব থানা, মুক্ত করবো চোরে।
শুভবাবু রাজা হ'বে জজ সাহেবকে মেরে ॥
আমরা খুচ্‌বো মাঝি, কাজের কাজি, মহুরি কর্‌বো ব'সে।
কৃষ্ণসাহার দোকান ভেঙ্গে সরাপ খাব বসে ॥

মৃত্যুভয়হীন সাঁওতালদের পরিচয় দিয়েছেন কবি :

তখন যত সাঁওতাল করে বিকলি পিছে নাহি চায়।
সলখে পাহাড়ে যেয়ে সভাইরে জানায় ॥
শুনে সব দুখ্‌খ মনে, পরদিনে হৈল একাকার।
জঙ্গী[১] হইতে আনায় সাঁওতাল বাদশ হাজার ॥

১. জঙ্গী > জঙ্গী=রাজমহলের অপর পরিচয়।

নাহিক মৃত্যু ভয়, সদা রয়, ধনুকেতে চরা।
নগর মোকামে আসি বাজায় নাগরা ॥
করি ভণিতা ;—
রায়কৃষ্ণ দাস ভণে, সাঁওতালগণে রাখিল সুখ্যাতি।
যে কিছু কহিলাম আমি সকলি তাহা সত্যি ॥
কথ্যা মিথ্যা নয়, সত্য হয়, শুন সকল ভাই।
হরি হরি বল সবে দিন ব'য়ে যায় ॥ ৬৬

'অথ বিদ্রোহী সাঁওতালগণের কবিতা' ও 'সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া'—একই ব্যক্তির রচনা। অথচ দুটিরই পাঠ-আলাদা। কোথায়-ও শব্দের ও অর্থের মিল আছে বটে তবে সর্বত্র নয়। একটি কথা মনে রাখা ভালো। দুটি কবিতারই সংগ্রাহক 'বীরভূমের ইতিহাস' গ্রন্থ প্রণেতা গৌরীহর মিত্র মহাশয়। প্রথমটি তিনি তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়টি দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে পাঠিয়েছিলেন। দীনেশ সেন কবিতাটির বানান কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে থাকলে-ও কবিতা দুটির পরিবর্তিত পাঠ মনে রেখেই উদ্ধৃত হলো স্বতন্ত্রভাবে।

চার...স াঁওতাল বিদ্রোহের ছড়া...

পাহিলে দাক্ষিণ জঙ্গল থা বাঘ ভল্লুক কা বাসা,
সাঁওতাল লোক সাফা কিয়া সাবিক দেশ এইসা।
এক বিঘা জমি নেহি থা দামিন কোলমে,
লাখ বিঘা জমি হুয়া দেখ নজর।
আট আনাকে দরসে পঞ্চাশ হাজার শাল,
এইসা প্রজা অবিচার মে হোগা বেহাল।
গোলাদার বাঙ্গালী দামিনের মহাজন,
তাদের কাছে কর্জ নেয় সাঁওতাল প্রজাগণ।
শ্রাবণ মাসে এক টাকা নিলে ;
আট মাসে তার একুশ টাকা হলো।
বারটাকায় চুরাশি টাকা একুন করিয়া,
গরুবাছুর সব তাদের লয় ডাকাইয়া।

দারোগার কাছে যদি নালিশ করিবে,
সেও বলে শালার বেটা টাকা দিতে হবে।
এইরূপে ধন মোদের সকল হরে নিলো
এইজন্য দামিনীতে হাঙ্গামা হইলো।৬৭

পাঁচ...স'াওতালদের লড়াই...

দশটি হাজার সাঁওতাল ঐ পথ কাঁপিয়ে হ'াটে;
চ'লছে তারা শপথ নিতে ভাগ না ডিহির মাঠে।
রণসাজেই চ'ললো সেজে তীর-ধনুকে তারা,
বাজায় মাদল, সাথে বাজে কাড়া আর নাকড়া।
ভাগ্‌না ডিহির মাঠে গিয়ে কিসের শপথ নেবে?
শোষণ-পেষণ সইবে না আর, না হয় জীবন দেবে।
একশো পঁচিশ বছোর আগে, দিন তিরিশে জুন;
লাখো চোখে উঠলো জ্বলে ঘৃণার সে আগুন।
বললো তারা জেনে রাখো—ইংরাজ সরকার
নেবোই নেবো কেড়ে মোরা আপন অধিকার।
শপথ নিয়ে চ'ললো মিছিল কলিকাতার পানে;
নারী-পুরুষ ঘর ছেড়ে সব নামলো অভিযানে।
সিদো-কানূহ দু ভাইয়েতে সবার আগে চলে;
শোষক-পোষা সরকার তাই আতঙ্কেতে টলে।
পিছু হ'টে, বাজার-সেনা ঠিক পরাজয় মানে;
সাঁওতালী-বীর এগিয়ে চলে—ভয় কী, নাহি জানে।
বিদেশী-রাজ বাঁচাতে তাই দ্বিগুণ সেনা আসে,
দেশী রাজা দাঁড়ায় এসে বিদেশীদের পাশে।
ইংরাজেরা চালায় গুলি রাজা চালায় হাতি,
সাঁওতালদের সামনে নামে বিপদ রাতারাতি।
বীরের মতন লড়েই তারা মানলো পরাজয়;
তাদের লড়াই চাষীর বুকে সাহস হয়ে রয়।
সেদিন থেকেই চ'লছে লড়াই, চরম লড়াই আজ;
থামবে লড়াই কায়েম হ'লে সর্বহারার রাজ।৬৮

একটি বৃহৎ গাথা এখানে উদ্ধৃত হয়েছে। এতে সাঁওতালদের অবিনীত ক্রোধ-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। কিন্তু বাঙালী মহাজন ও ইংরেজ শাসকদের ওপর সাঁওতালদের দুর্বার আক্রোশ কেন যে ছড়িয়ে পড়েছিল; এখানে তা বলা হয়নি। কবি রাইকৃষ্ণ দাস অবজ্ঞাত আদিবাসীর রোষ, বেঝকে কথা করতে পারেননি। তিনি কেন, সেদিনের শিক্ষিত মানুষ মাত্রই সাঁওতাল জাগরণকে ভীতির চোখে দেখেছেন। তাই সাঁওতালদের দমন নীতির মধ্যেই তাদের নিরাপত্তা খুঁজেছেন।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে "বর্বর সাঁওতাল"দের প্রতি কবি কিছু কিঞ্চিৎ কৃপা দেখিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে শ্রমার্ত মানুষের প্রতি বাঙালী, হিন্দুস্থানী মহাজন অনেক অন্যায় অবিচার করেছেন। তার ফলেই এই বিদ্রোহ। কিন্তু কবির ইংরেজের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন থাকায় সাঁওতালদের সদাচারের উপদেশ দান করে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। তৃতীয়টিতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা নেই। সাঁওতালদের বীরত্ব যেমন বলা হয়েছে তেমনি তাদের কটাক্ষ-ও করা হয়েছে।

কেবলমাত্র আমাদের উদ্ধৃত ছড়া দুটিতে সাঁওতালদের চিত্ত ধাতুর বিক্ষেপণের কারণ, সংক্ষেপ হলেও যথার্থ বিবৃত হয়েছে। এসবের মধ্যে শোষিত সাঁওতালদের পটভূমি দৃশ্যান্বিত। ছড়াকারদের এমন অনুধ্যানের পক্ষে বলা যায়, অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে এসব রচিত বলেই ইংরেজ তোষণ নীতি এখানে অনুপস্থিত। তাই এঁদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছেন বিদ্রোহী সাঁওতাল-জনতা।

৪. বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া—সংগীতে…

সাঁওতাল সংস্কৃতিতে নৃত্য-গীত অঙ্গীকারবদ্ধ। এরা সুখে-ও গায়, দুঃখে-ও গায়। সরল জীবনচর্যার মতই সাঙ্গীতিক ভাবরসের উৎসার হয়। তাই এদের মনের অভিব্যক্তি সুর লহরে উদ্বেল হয়। এক কণ্ঠ থেকে আরেক কণ্ঠের ক্রমান্বিত বিনিময়ে কিংবা অনেক কণ্ঠের সমিল বন্ধনে রসভাব বন্দী হয়। এই হয় গান,—যে কোনো পটে ও পরিবেশে।

এখানে বিদ্রোহের কয়েকটি গানের সংকলন [৩৯] করছি তাতে বিদ্রোহী মানসের আবেগ-বিদ্রোহ, দীপ্ত আহ্বান ও হৃদয়ের স্পন্দন শোনা যাবে।

১.

'দেলায়া বিরিদ্ পে দেলায়া তিঙ্গুন পে,
জানাম দিশম লৌগিৎতে হো,
দেলায়া পায়ারঃক্' তাবোন পে।'

অর্থাৎ— ওঠো জাগো,
এস, জন্মভূমির জন্য
আমরা এগিয়ে যাই।

২.

'সিঞবির্ সেন্দরাক সেনক্'আ,
রমঝম তালা ঞিদা;
কালকাটা দরবার ক সেনক্' আ,
সিঞে সিঞ সিঞে ঞিদা।'

অর্থাৎ— সিঞ জঙ্গল শিকারে যায়
সরগরম মাঝরাত;
কলকাতা দরবারে যায়,
সারাদিন সারারাত।

৩.

'দে বয়হা হিজুঃক্পে দেলা বয়হা নাতেন পে,
হায়রে হায়রে! ভগত কেনারাম;
ঘোড়া উপর পালান্ উপর সাওয়ারালাং কেনারাম
কুলি কুলি যাইছে টাপ টাপ।'

অর্থাৎ এস ভাই এস ভন
হায় হায়! ভগত কেনারাম;
ঘোড়ার পিঠে জিনের উপর সওয়ারী কেনারাম
রাস্তায় রাস্তায় টগবগিয়ে যায়।

৪.

'পারগানা ইঞদাহ্ নাওকেদে পারগানা ইঞ দাঁড়ে কেদে,
হায়রে হায়রে! মিছাপুর মেলা ;
কেনারাম দারোগা পেয়াদা সুপার তে,
হায়রে হায়রে! মিছাপুর মেলা।'

অর্থাৎ পারগণার কাছে প্রার্থনা উৎসর্গ করলাম
হায় হায়! মিছাপুর মেলায়
কেনারাম দারোগা পেয়াদার জন্য
হায় হয়! মিছাপুর মেলায়।

৫.

'কাটজীবা দরোগা কুরমুটাহা পেয়াদা,
জিউরীরে দো সুকগে দো বাং।
দারোগা ঘোড়া উপর টাপ টাপ—৩
কোমর পেটে পিতর পাটা পেয়াদা ঝাক ঝাক—৪
জিউরীরে দো সুকগে দো বাং।'

অর্থাৎ নির্দয় দারোগা প্রতিহিংসা পরায়ণ পেয়াদা,
মনে প্রাণে সুখ নেই,
দারোগা ঘোড়ার উপর টাপ টাপ যায়—৩
কোমরে পেতলের বেল্ট, পেয়াদাদের উজ্জ্বল পোষাক-৪
মনে প্রাণে সুখ নেই।

৬.

'বাকো লুতুরা ক্'থান বাকো হেভাওয়া ক্'থান,
হায়রে হায়রে। ভগত কেনারা···ম
নোয়ারাবোন নুসৌসারোন বাংগেকো ভেডেগান,
দংক্'বোন দানাংবোন বাংগেকো রেবেন,
ভবে দো বোন হুল গেয়া হো।'

অর্থাৎ কেউ না শুনলে কেউ না গ্রাহ্য করলে,
হায় হায়। ভগত কেনারা···ম,

আমরা নিজেরাই বাঁচব কেউ পাশে দাঁড়ায় না,
আমাদের সাহায্য আশ্রয় দিতে কেউ রাজী নয়
তবে আমরা বিদ্রোহ করব।

৭.

'নেরা নিয়া হুরু নিয়া
ডিঁভা নিয়া ভিটা নিয়া,
হায়রে হায়রে ! মাপাক' গপচ্' দো।
হুরিচ্ নাঁভাড গাই-কাডা, নাচেল লৌগিং পাচেল লৌগিং
সেদায় লেকা বেতাবেতেং এ্রাম রুওয়াড় লৌগিং
তবে দো বোন হুল গেয়া হো।'

অর্থাৎ

স্ত্রী-পুত্রের জন্য
জমিজায়গা বাস্তুভিটার জন্য
হায় হায় ! এ মারামারি এ কাটাকাটি
গো-মহিষ, লাঙ্গল, ধন-সম্পত্তির জন্য
পূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব।

৮.

'নুসৌসাবোন, নওয়ারাবোন চেলে হঁ বাকো ভেঙেগান,
খাটি গেবোন হুল গেয়া হো,
খাটি গেবোন হুল গেয়া হো,
দিশম দিশম দেশ মোঁঞজহি পারগানা
নাতো নাতো মাপাঞজি কো
দঃক্' বোন দানাংবোন বাংগেকো তেঙ্গোন
তবে দো বোন হুল গেয়া হো।'

অর্থাৎ

আমরা নিজেরাই বাঁচব, কেউ আমাদের পাশে দাঁড়াবেনা
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব,
আমরা সত্যিই বিদ্রোহ করব,
গ্রামের মাঝি ও পরগানারা
গ্রামের মোড়লরা

আমাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে, কেউ পাশে দাঁড়াবে না তবে আমরা নিশ্চয় বিদ্রোহ করব।

'ধানজুড়ি হে
ঢোল বাজে হে
ঢাক বাজে হে
সিদো কানহু, চাঁদ ভায়রো
হুলে হু…লে
হুলে হু…লে
হুলে হু…লে
হুপুচ্' হুপুচ্' দেলাং জা দেলাং জা,
হুপুচ্', হুপুচ্' দেলাং জা দেলাং জা
হুপুচ্' হুপুচ্', দেলাং জা দেলাং জা।'

অর্থাৎ শুন হে ধানজুড়িবাসী
ঢোল বাজছে
ঢাক বাজছে
সিদো কানহু, চাঁদ ভায়রো
বিদ্রোহ বি…দ্রোহ
বিদ্রোহ বি…দ্রোহ
বিদ্রোহ বি·· দ্রোহ
চল্ চল্ শীঘ্রি চল্
চল্ চল্ শীঘ্রি চল্ শীঘ্রি চল্
চল্ চল্ শীঘ্রি চল্ শীঘ্রি চল্।

১০

সিদো কানহু খুড়খুড়ি ভিতরে,
চাঁদ ভায়রো ঘোড়া উপরে,
দেখ সে রে! চাঁদরে! ভায়রোরে!
ঘোড়া ভায়রোরে মুলিলে মুজিল।'

অর্থাৎ সিদু কানু পাল্কিতে চড়ে
চাঁদ ভৈরব ঘোড়ায়,
দেখনা চেয়ে চাঁদ ভৈরবে।
ভৈরব যায় ঘোড়ায় ধেয়ে বিদ্রোহীদের পাশে।

১১.

'সিদু কানু হুল দয়,
মায়াম গাডা আতুয়েন,
ইংরাজ সরকার আবো দিশম,
মেতাবোন কো সাঁওতাল বিদিন।'

অর্থাৎ সিদু কানু বিদ্রোহ করেছে
রক্তের নদী বয়ে গেল,
ইংরাজ সরকার বলে আমাদের দেশ,
আমাদের বলে সাঁওতাল নাস্তিক।

১২.

'চেদাঃক্' দরে সিদু হো
মায়ামতে দমনুমেন ?
চেদাঃক্' দরে কানহু হো
হুল হুলেম মেমেন ?
জৌত ভাই ক লৌগিৎ
মায়ামতে দঞনুমেন,
বেপারীয়া কোম্বড়ো হায়রে
দিশম দক হুহী।

অর্থাৎ হে সিদু কেন তুমি রক্তে স্নান করলে ?
হে কানহু কেন তুমি বলছ 'হুল' 'হুল' ?
জাতভাইদের জন্য আমি রক্তে স্নান করেছি,
দস্যু ব্যবসায়ীরা আমাদের দেশ লুণ্ঠন করেছে।

১৩.

আমরা প্রজা, সাহেব রাজা, দুঃখ দেবার যম
তাদের ভয়ে হটবো মোরা এমনি নরাধম ?
মোরা শুধু ভুগবো ?
না, না মোরা রুখবো।৭০

১৪.

ও শিধো, শিধো ভাই, তোর কিসের তরে রক্ত ঝরে
কি কথা রইল গাঁথা, ও কানুহু, তোর হুল হুল স্বরে,
দেশের লেগে অঙ্গে মোদের রক্তে রাঙা বেশ
জান না কি দস্যু বণিক লুটলো সোনার দেশ।৭১

১৫

কেনারাম বেচারাম
পীপড়াজুড়ির জমির লোভে
লিটিপাড়ার মাঝিকে বেঁধে
সাহেবের কাছে নিয়ে এলে
আমড়াপাড়ার পুলিশ
জঙ্গিপুরের দারোগা শোনো
সিদো আর কানুহু ক
মিছামিছি বাঁধলে কেন ?
আমড়াপাড়ার ভকত
কেনারাম ভগত শোনো
সিদো আর কানুহুকে
মিছামিছি বাঁধলে কেন ?
পাকুড়থানা আমড়াপাড়া
পিরথি সিংএর আপিসে
মিছেই হাকিম বাঁধলো তারে
কড়া দড়ির ফাঁসে।
সিদো, তুমি কেন রক্তে ভেসছ
কানুহু তোমার বুলি শুধু হুল হুল
হকের জন্য হুলের রক্ত বইছে
দীকুরা তাদের ভিটে মাটি গরু
খেয়েছে।৭২

১৬

কেনারামের কারবার
বলি কত বার বার
পরগণারা শুনেও তা শুনে না।
পেয়াদাটা বেজায় পাজি
দারোগাটা সাক্ষাৎ যম
বলি কত কেহ তো শুনে না।
কেহ না শুনিলে তবে
হবে হুল হুল হবে
ছেলে পুলে বেঁচে যাবে
হুল ছাড়া কেহ তো রবে না
হুল হলে সব পাব
কেনারামে শিখাইব
দারোগারে পেয়াদারে ডরি না
এবার সবাই মাস্তি হলে
রুম হবে হুল হলে
কেড়ে নিব নিজ বলে
ঘর গরু ছেলে পুলে
এস সবাই মাস্তি হলে
রুম হবে হুল হলে।৭৩

১৭.

বাঁকুড়ার হুলের গান প্রচলিত আছে। যেমন,

সিদো আর কানুহ পালকিতে
চাঁদ আর ভেরো ঘোড়ার পিঠে
ভৈরোকে কেন শুকনা দেখায় ঘোড়ার পিঠে।

এ দিকেতে সন্তভুঁই ও দিকেতে শিকার ভুঁই, বাবু নিলু সিং
ওগো বাবু নাহ্ন সিং যদু জমাদার
তোমাদের যেতে দিব না শিকার ভুঁই পেরিয়ে
ওগো বাবু নাহ্ন সিং, যদু জমাদার।৭৪

১৮.

বণিক দস্যুরা
আমাদের ভূমিহরণ করেছে।
সাহেবদের শাসন ভীষণ কষ্টদায়ক
আমরা যাব কি আমরা থাকব ?
থাকা, পরা, খাওয়া
সবই গোলমালে
আমরা যাব কি আমরা থাকব ?৭৫

১৯.

সর‍্যালক পাহাড়ে
দতো মাঝির কন্যা
দিয়াছে গলায় দড়ি আম গাছের ডালেরে,
গোপীকান্দার বাংলোতে
ডেপুটির আদালতে
সে আমাদের বিচার করবে।৭৬

॥ একটি লোক গীতি ॥

অজিত কুমার মিত্রের 'গাথা গীতিকায় চিরন্তনী বাঙলা'-তে একটি লোক-গীতি সংযোজিত হয়েছে।৭৭ এটি সাঁওতাল বিদ্রোহের আভাস দেয়। বিদ্রোহীদের জমায়েত ও আগমন, লুণ্ঠন, পতন-মৃত্যু প্রভৃতির খণ্ড চিত্র এতে মেলে বটে। তবে অজ্ঞাত কবির এই রচনায় দক্ষ শিল্পীর ছাপ নেই। তাঁর কৃতিত্ব, তিনি বাস্তব চিত্র অঁাকতে পেরেছেন। যেমন,

১২৬২তে১ উত্তরেতে উৎপাত জন্মিল।
আমীর মুলুক থেকে সাঁওতাল জুটিল॥
বেটাদের একান বড় মাঝি দঢ় যেখানে ছিলো।
আড়াইশ' গ্রামের সাঁওতাল একত্র হইল॥
করলে পরামর্শ মনে হর্ষ মুলুক মারবার তরে।
ইংরেজ মারিয়ে আমরা রাজ্য লিব২ কেড়ে॥

বিদ্রোহীদের জমায়েত:

পাঁচ পিঠের পাহাড়ে সব একত্র হইল
সাজ সাজ ডাক সাঁওতাল সেথান হতে দিলো
কথা ধার্য্য করে পাহাড় ঘেরে প'াচ পিঠের গ্রামে
মারুত বান্ধিব আমরা সুভবাবুর নামে॥
সুভরা তিন ভাই শুনতে পাই শুন সবে ক্রমে।
সিধু কানু দুই ভাই কাণ্ড মাঝির নামে॥
করলে হুকুম জারি আমাদের জাতি ওরে।
ডাল ঘুরিয়ে নেওতা দোব সবার ঘরে ঘরে॥

লুণ্ঠনচিত্র:

বেটাদের হাসি খুসি বসি বসি করে মন্ত্রণা
ভাই এসে পোড়াইলে লাজুলের বাজা৩॥
ঢুকলো বাঁশকুলি, কুলি কুলি বাজিয়ে নাকাড়া।
বাঁশরা, মুলুক, তালবেড়ের লোক হলো ভাগোড়া॥

১. ১২৬২ সাল, ইংরেজি ১৮৫৫তে সাঁওতাল বিদ্রোহ চলছিল।
. লিব>লিব, বীরভূমের উচ্চারণ রীতি লক্ষণীয়।
৩. বাজা—বাজার?

পাঠান্তর : বাঁশকুলি কুলি কুলি বাজায়ে নাকড়া।
উদাসিনী কামবাসিনী হইল ভাগোড়া॥

লুটলে রামপুর, কাঠিপুর আর বেদনারায়ণপুর।
পাহার রাজার মাটি লুটলি কত দূর॥
পরের পুরের১ ঘরে ঘরে কাটিল বিস্তর।
ভাণ্ডিবনের গোপাল ঠাকুর মনে পেয়েছে ডর॥

সাঁওতালদের উদ্ধত অভিযান :

ঘর বাড়ী কুড়ি কুড়ি ভাঙ্গলে দালান কোঠা।
কুমডোবাদের লোকগুলোকে করলে কুমডো কাটা॥
দু'জনা রাজপুত যেযেব দুত ঢাল কাঁধে করে।
তাই সাহেবরা পলাই ছুটে মুরগী কাঁধে করে॥
আল্লারাখ জান মেহেরবাণ সিন্নী দোব কোথা।
ফুলবাগানে কাটলে এসে তৌসিল দারের মাথা॥
বেটাদের একবুলি কুলি কুলি দেয় না ঘরেব কাঠি।
সাতহাজার সাঁওতালে লুটলে মহেশপুবের মাটি॥
রাজা প্রাণ ভয়ে রাণী লয়ে পলায় দক্ষিণে।
সাঁওতালের হাতে পুত্র ত জিল পরাণে॥
ওহে হরি মরি ধিক আমাদের প্রাণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা গেলেন বদ্দমান২॥

বিদ্রোহের পরিণাম :

রক্তে ভাসলো নদী হাদি গাদি শুন সভে ভাই
ধনুক ধরিয়া আমরা ইংরেজ মেরে যাই॥
ইংরেজ পিছু হলো তোপ গাড়িল তোপে দিল টানা।
আড়াইশ' গ্রামের সাঁওতাল নাইক একজনা॥
পাঁচশ' হাতি তুরগ গাঁথি আনিল বিস্তর।
নি সাঁওতাল৩ করবো আজ পৃথিবী ভিতর॥

---

১. পরেরপুর — পরিহারপুর, সাঁওতাল পরগণার একটি গ্রাম
২. বদ্দমান — বর্ধমান শহর
৩. নি স'াওতাল > নি স'াওতাল অর্থাৎ স'াওতালহীন

সাঁওতাল কাটা গেল ভালই হলো করে গো বিবুলি।
সাঁওতালদের মেয়েগুলো বেড়ায় কুলি কুলি॥

—এসব সঙ্গীতে সাঁওতালদের সংগ্রামীমানস ধ্বনিত হয়। ইংরেজের শাসন-শোষণ, জমিদার মহাজনদের পীড়ন-তাড়নের বিরুদ্ধে সিদু কানু চাঁদ ভৈরবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ বিপ্লব তরংগায়িত হয়েছিল; তা যদিও ট্রাজিক-ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল তবুও সাঁওতাল গণমানস এর মধ্যে অন্বেষণ করে সুখ-বেদনাও মহত্তম প্রয়াস। গানগুলি বিদ্রোহের স্মৃতি বহন করে চলেছে। অন্যভাবে বলা যায়, সাঁওতালদের সাঙ্গীতিক অন্তঃস্বভাবে বিদ্রোহের ছায়া সুস্পষ্ট।

এখানে উল্লেখ্য, বেশ কিছু সাঁওতালীগান ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে ডব্লু. জি. আর্চার সাহেব 'ম্যান ইন ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন।৭৮ তার দুই একটি ঃ ১. Kenaram Becharam
Longed for land in Piparjuri
They bound the Litipara manjhi
And took him to the Sahib's door.

২ The Sub-inspector of Amrapara
The Daroga of Jangipur
Sido and Kanhu
For nothing they were bound.

৫. বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া—সাময়িক সাহিত্য...

এক...সমাচার সুধাবর্ষণ...

॥ সংকলন ॥৭৯

সংখ্যা ৪০৬ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৩ শ্রাবণ বুধবার ইংরাজী ১৮ জুলাই ১৮৫৫

রাজমহল হইতে কোন সংবাদদাতা যে পত্র লিখিয়াছেন আমরা তাহার স্থূলমর্ম নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম এতৎপাঠে পাঠক মহাশয়েরা চমৎকৃত হইবেন, এই কাণ্ডকে প্রকৃত ভিতুমিরের কাণ্ড বলিতে হইবেক।...

समाचार सुधावर्षण

সমাচার সুধাবর্ষণ

'সমাচার সুধাবর্ষণ'—বাংলা ও হিন্দী দ্বিভাষিক প্রাত্যহিক পত্র
॥ বাংলা সংবাদের কিয়দংশ আলোকচিত্রে গৃহীত হলো ॥

অবগত হইলাম যে জিলা ভাগলপুরের অধীন মোং রাজমহলের পশ্চিম অনুমান ৬।৭ ক্রোশ অন্তর ভগ্না ডিহি নামক পাহাড়ে প্রায় দশবারো হাজার পাহাড়িয়া লোক একত্র হইয়াছে, যাহারা ঐ অত্যাচারিদলের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়াছে তাহারা দুই সহদর, এক দিবস নিদ্রান্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক এরূপ ব্যক্ত করে যে পরমেশ্বর স্বপ্নে আমারদিগের সাক্ষাৎ হইয়া এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন যে এইদেশ তোমারদিগকে প্রদান করিলাম, তোমরা পর্ব্বতীয় লোকদিগের সাহায্যে ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিয়া স্বচ্ছন্দে পরম-সুখে রাজত্ব কর, এই বিষয় কোন ধনাঢ্য যবন শ্রবণ করিয়া উক্ত দেবতার স্থান দর্শনার্থ গমন করাতে তাহারা তাঁহাকে ধৃত করত বন্ধন করিয়া রাখে, এবং ঐ অধ্যক্ষদিগের দলবল ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে ঐ যবন বন্ধনাবস্থায় অতিশয় কাতর হইয়া মিনতি প্রকাশ করাতে ঐ রাজ্যলোভি বুজরুক ভ্রাতাদ্বয় তাহাকে ক্ষমা করিয়া আপনারদিগের দলভুক্ত করে ও তিনি তাহারদিগের ধীনে লেখকের পদে নিযুক্ত হয়েন।

ঐ সম্ভ্রান্ত যবন এই প্রকার পদ প্রাপ্ত হইলে গোপনীয় পত্রদ্বারা দুইজন দারোগাকে তদ্বিশেষ বিজ্ঞাপন করিলে দারোগা প্রায় ১৫।১৬ জন বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে উক্ত দলাধ্যক্ষ ভ্রাতৃদ্বয়কে ধৃত করণার্থ গমন করিলে অধ্যক্ষেরা সহচরগণকে অনুমতি করিলেন যে আমাদিগকে ধরিতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর এতদনুমতি শ্রবণে সহচরেরা তৎক্ষণাৎ দারোগাকে বন্ধনকরত বরকন্দাজদিগকে নির্দ্দয়রূপে হত করে, এবং অধ্যক্ষ-দ্বয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বহস্তে দারোগার শিরশ্ছেদন করিয়া অধিকার লুঠ করিবার অনুমতি করিলে তাহারা নানা অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ইংরাজদিগের অধিকার মধ্যে বিস্তর অত্যাচার করিয়াছে দ্রব্যাদি ও অন্ন লুঠ করে নাই, প্রজাসকল প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতেছে চারিদিগে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে ভাগলপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব ও রেইলওয়ের কর্ম্মচারিরা দ্রব্যাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করণে বাধ্য হইয়াছে অরঙ্গাবাদের ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ দুরাত্মাদিগের অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতাছেন, মুরশিদাবাদ হইতে একদল রাজসৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, ...পূর্ব্বদেশে তিতুমিয়া ও দুদুমিঁয়া যে প্রকার ইংরাজ অধিকার গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে বহু লোক একত্র করিয়াছিল রাজমহলের যবন ভ্রাতারাও তদ্রূপ করিয়াছে।

সংখ্যা ৪২৭ সন ১২৬২ সাল তারিখ ২৯ শ্রাবণ সোমবার ইংরাজী ১৩ আগষ্ট ১৮৫৫

পয়ার।

অসম্ভব সমাচার শুন সর্ব্বজন।
জন্মিয়াছে সন্তাল নৃপতি একজন॥
অষ্টম বর্ষয়া কন্যা পরিণীতা নয়।
বিধাতা নির্ব্বন্ধে পূর্ণ গর্ভ হয়॥
সেই গর্ভ হইতে জন্মিল এক শিশু।
রূপে গুণে অবিকল য প্রকার যীশু।
ভূমিষ্ঠ হইলে এই দৈবী বাণী হয়।
শুনরে সন্তালকুল হইয়া নির্ভয়॥
ঈশ্বরাংশে অবতার জন্মিলেন যিনি।
পৃথিবীর সর্ব্বভার হরিবেন ইনি।
মেলচ্ছাক্রান্তা হইয়া ধরণী পান ভয়।
ব্রহ্মহত্যা গো হত্যায় কম্প কলেবর।
তোমরা সকলে মেলি ভক্তি করি মনে।
অভিষিক্ত কর এ শিশুকে সিংহাসনে।
ইহাঁকে পূজিয়া কর অস্ত্রাদি ধারণ।
দলেবলে বচন কর ম্লেলচ্ছাদি মারণ।
পৃথিবীর পূর্ব্বখণ্ড পাবে অধিকার
তার পরে ক্রমে ২ খণ্ডাবে ভূভার॥
এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া সন্তাল।
দলবদ্ধ হয় পরে বিক্রমে বিশাল॥
করিয়াছে সেই নবজাত পুত্রে রাজা।
সর্ব্বদা তাহাকে পূজে দিয়া মাংস ভাজা
কালীপূজা করিয়া হরিণ বলি দিয়া।
দিতে হয় তারে সেই মাংস ভাজা নিয়া
হরিণের মাংস বিনা কিছু নাহি খায়
জননীর দুগ্ধ নাই দুগ্ধ নাহি চায়॥

সেই শিশু আজ্ঞাবহ সন্তাল প্রবাহ।
করিতেছে নানা স্থানে পড়িয়া দিগ্‌দাহ
এইরূপ জনরব হইয়াছে তথা।
অতএব লিখিলাম অসম্ভব কথা॥
সম্ভব হইতেই বা আশ্চর্য কি তার॥
ঈশ্বরীয় ঘটনায় সব শোভা পায়।
পঙ্গু যদি লঙ্ঘে গিরি কপি করে গান।
সলিলে পাষাণ ভাসে আছে উপাখ্যান
এ সব সম্ভব যদি তবে বল আর।
আশ্চর্য্য কি রাজা হবে বালিকা কুমার
গেল বুঝি ধর্ম্মপাল ভূপালের কাল।
হইবে অসভ্য জাতি নৃপতি সন্তান।

সংখ্যা ৪২৯ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৩১ শ্রাবণ বুধবার, ইংরাজী ১৫ আগষ্ট, ১৮৫৫

সন্তালীয় গোলযোগ।

"বাঘে ছুঁইলে আঠারো ঘ."

সন্তালীয় বিদ্রোহিতায় ইহাই ঘটিয়াছে, আমরা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলাম বিদ্রোহী প্রদেশে অধিক সেনা প্রেরিত হইলেই সন্তালেরা ভয় পাইয়া পলায়ন করিবে আর দেশ লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইবেক না, তাহারদিগকে দমনার্থে কয়েকদল সেনা এবং ৩।৪ টা তোপ প্রেরিত হইয়াছে এবং কয়েকবার তাহারা পরাভব পাইয়াছে কিন্তু ইহাতে ও ভগ্নোদ্যম হয়নাই ৪ আগষ্ট দিবসীয় রাজমহলের পত্রে জ্ঞাত করে পাকুড়, কদমশাহা এবং মহেশপুর গ্রামের নিকট পুনরায় দৌরাত্ম্যারম্ভ করিয়াছে, ক্ষুদ্র ২ দলে দেশে ব্যাপ্ত হইয়া গ্রাম দাহ লুঠ ও প্রাণনাশ করিতেছে, ৩ তারিখে ৩১ সংখ্যক দলের লেপ্টেনেন্ত সিটওয়েল সাহেবের প্রতি তিনবার গুলী মারিয়াছিল কিন্তু কোন হানি হয় নাই, ৪ দিবসে একজন কৃষককে হত এবং মেষ্টর বেসিকহ সাহেবের একজন ভৃত্যকে আহত করিয়াছে, ৯ দিবস প্রভাতে দুই সংখ্যক গ্রিনিডিয়ার দলের এক কোম্পানি সেনা বাষ্পীয় শকটারোহণে রাণীগঞ্জ গিয়াছে, তথা

যাইতেছে, রাণীগঞ্জাবধি রাজমহল পর্য্যন্ত স্থানে ২ সেনা থাকিবেক, এ উৎপাত কবে যাইবেক, সন্তালকুলের সর্ব্বনাশ হউক।

সংখ্যা ৪৩৫ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৭ ভাদ্র বুধবার,
ইংরাজী ২২ আগষ্ট ১৮৫৫।

রাণীগঞ্জ।

রাণীগঞ্জ হইতে যে সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে ব্যক্ত করে কয়েক দিবস পূর্ব্বে ৩০০ সিপাহী ও কতিপয় আশ্বারোহীর সহিত ৫০০০ হাজার সন্তাল দিগের এক যুদ্ধ হইয়াছে, জয় পরাজয় জানা যায় নাই শুনা যাইতেছে সন্তালেরা অস্ত্রত্যাগ করিতে সম্মত হইয়া মেং এলিয়ট সাহেবের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন নাই কেননা তিনি বিবেচনা করেন সন্তালেরা এত প্রচুর অর্থ ও খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়াছে যে তদ্দারা তাহার দিগের দুই বর্ষ চলিতে পারে সুতরাং এখন অপরাধের দণ্ড না দিয়া ক্ষমা করিলে তাহারা পুনরায় অত্যাচার করিবে।

সংখ্যা ৪৩৬ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৮ ভাদ্র শুক্রবার ২৩ আগষ্ট, ১৮৫৫

পাটনা।

সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রে শাহাবাদ নগরবাসি বিখ্যাত কুমার সিংহের নিকট ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ৪০০০ সহস্র সেনা চাহিয়াছিলেন তাহাতে কুমার সিংহ কহেন যদি গবর্ণমেণ্ট আমার রাজস্ব গ্রহণে ক্ষান্ত হন তবে আমি চারি সহস্রের পরিবর্ত্তে পাঁচসহস্র সেনা দিতে প্রস্তুত আছি, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে সম্মত হন নাই, কুমারসিংহ এইক্ষণে অনুদ্দেশ হইয়াছেন অনেকে কহে তিনি তীর্থ ভ্রমণে গমন করিয়াছেন কিন্তু সংবাদদাতা কোন বিশ্বস্থ লোক মুখে শুনিয়াছেন কুমার সিংহ সন্তাল দিগের সহিত যোগদিতে গিয়াছেন, এ সংবাদ হইতে পারে কেননা পাটনা নগরে যে বিদ্রোহিতা উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে কুমারসিংহ লিপ্ত ছিলেন, জনশ্রুতি উঠিয়াছে পাটনা ও তদিস্তত স্থানে মহরমের সময় কোন গোলযোগ হইবেক, বেহার সুবার জবনেরাও বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করিতেছে এতএব গবর্ণমেণ্ট সাবধান থাকিবেন মহরমের কাল নিকট হইতেছে।

সংখ্যা ৪৪১ সন ১২৬২ সাল তারিখ ১৬ কার্ত্তিক শুক্রবার
ইংরাজী ১ নবেম্বর ১৮৫৫

লোকেরা কথায় ২ প্রসঙ্গভেদে দুইটী কথা বলিয়া থাকেন, সন্তাল দলের গোলমালের কথায় ২ আমারদিগের সেই দুইটী কথা স্মরণ হইল প্রথম কথা এই যে "ঘরে ছুঁছার কীর্ত্তন বাহিরে কোঁচার পত্তন" দ্বিতীয় কথা এই "ধরিতে না পার ইন্দুর, করিতে যাও বাঘ বন্দি," এইক্ষণে উক্ত দুই বাক্যই আমারদিগের রাজে্যশ্বরকে লক্ষ করিয়াছে, ঘরের মধ্যে বনজন্ত সন্তালেরা প্রজানাশ গ্রামদাহ প্রজা দিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, রাজকুল তাহারদিগের কিছুই করিতে পারেন না, অথচ বাহিরে গোলাগুলী সৈন্য দেখাইয়া বীরত্ব প্রকাশ করিতেছেন এবং মূষিকতুল্য সন্তালগণকে অদ্যাপি ও ধৃত করিতে পারিলেন না অথচ রুষীয় রাজ্যেশ্বরকে বন্ধন করিতে গিয়াছেন, এতদ্দেশীয় কোন স্বাধীন রাজ্যেশ্বর যদি সামান্য বন্যজাতির হস্তে এ প্রকার পরাস্ত হইতেন তবে লজ্জায় মুখ দেখাইতে পারিতেন না, ব্রিটীস জাতির লজ্জা নাই এই কারণ তাঁহারদিগের আহার পরিপাক পাইতেছে,

...ব্রিটীস গবর্ণমেন্ট মনে করিয়াছিলেন এ রাজ্য সুশাসিত হইয়াছে এই কারণ রাজ্য মধ্যে উপযুক্ত স্থানে সৈন্য স্থাপন করেন নাই, হিন্দু জাতির ন্যায় শান্ত জাতি কোথায় পাইবেন, হিন্দু জাতি রাজবিরুদ্ধাচারী নহেন বরং রাজকুলের মঙ্গল চেষ্টা করেন কিন্তু হিন্দু ভিন্ন ভারতবর্ষীয় অন্য কোন জাতিকে ব্রিটীস গবর্ণমেন্ট সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই।

সংখ্যা ৪৪২ সন ১২৬২ সাল তারিখ ১৬ ভাদ্র শুক্রবার
ইংরাজী ৩১ আগষ্ট ১৮৫৫

অসম্ভব কল্পনাও করা যুক্তি নয়।
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে ব্রিটিসের জয়।
ভারতের বড় বড় রাজা ছিল যারা।
সংগ্রামে হারিয়া দেখ কোথা গেল তারা
রাজপরিবারগণ সবে অন্নদাস।

চারিদিগে ব্রিটিসের বিক্রম প্রকাশ।
মারহাট্টা রাজপুত যুদ্ধে মহাবল।
ক্রমে ক্রমে বীর্য্যহীন হইল সকল।
শীকজাতি বদ্ধ হলো অধীনতা জালে
কি করিতে পারে বল অসভ্য সাঁওতালে।

উত্তর।

পশুসম সাঁওতাল কথা মিথ্যানয়।
কিন্তু তারা বাহুবলে দেশ করে জয়।
অস্ত্রাঘাতে কতলোক করেছে সংহার
লটীয়াছে কতধন সংখ্যা নাহিতার।

অনলেতে বহুদেশ করে ভস্মময়॥
বাঙ্গালার মধ্যে যেন লঙ্কাকাণ্ড হয়।

সাহেবেরা বিবিলয়ে করে পলায়ন।
স্বপত্নী সহিত কত হয়েছে নিধন॥
বিক্রমে বিশাল যদি শ্বেত কান্তিগণ।
তবে কেন অত্যাচার না হয় বারণ।

সংখ্যা ৪৪৩ সন ১২৬২সাল তারিখ ১৭ ভাদ্র শনিবার
ইংরাজী ১ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫

সাঁওতালদিগের অত্যাচার এ পর্য্যন্ত কিছুই শেষ হয় নাই, অথচ ইংরাজী পত্র সম্পাদকগণ তাহারদিগের প্রতি কিরূপ দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য তাহার আন্দোলন করিতেছেন কেহ বলিতেছেন যে ব্রিটীস গবর্ণমেণ্ট পেগুরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু তথায় প্রজা নাই প্রজাহীন রাজ্যেই রাজত্ব করিতেছেন অতএব সাঁওতাল দিগকে পেগুদেশে প্রেরণ করাই উচিত তাহাতে তাহাদিগেকে দেশান্তরিত করিয়া শাশন করা হইবেক, অথচ পেগুদেশে প্রজাবৃদ্ধি হইবেক, আবার কেহ২ বলিতেছে যে সাঁওতালদিগের পদে শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া রেইলওয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেই সমুচিত শাসন করা হইবেক, তাহাদিগকে ধৃত করিবার বিষয়ে আবার কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে শীতঋতু আরম্ভ হইলে পর্ব্বতীয় বনসকল যখন শুষ্ক হইবেক

তখন সেই বনে অনল সংলগ্ন করিলে তাহা ভস্মসাৎ হইয়া যাইবেক এবং সেনাদিগের দ্বারা দুরাত্মারা অনায়াসে ধরা পড়িবেক, এইরূপ ভিন্নপ্রকার কল্পনা করিতেছেন, ফলতঃ গবর্ণমেন্ট কি করিবেন তাহা কিছুই প্রকাশ নাই, অত্যাচারি দলের অধ্যক্ষগণ প্রকাশ্যরূপে ফাঁসি কাষ্ঠে অথবা তোপের দ্বারা নিহত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই।

সংখ্যা ৪৪৪ সন ১২৬২ সাল তারিখ ২০ কার্ত্তিক সোমবার
ইংরাজী ৫ নবেম্বর ১৮৫৫

সন্তালীয়সমাচার

সন্তালেরা পশুবৎ অসভ্য ও নির্ব্বোধ বটে এবং তাহাদিগের যুদ্ধ দ্রব্যাদি কিছুই নাই ইহা সকলি সত্য, তথাচ এই সামান্য বিদ্রোহাচার ক্রমে রুষীয় সমরের ন্যায় দীর্ঘ সূত্রী হইয়া উঠিল…বিট্রিস পরাক্রমে তাহারা শঙ্কা ও করে না, রুষীয় সমরসূত্রে এদেশীয় সমাচার পত্র সর্ব্বদাই তত্তৎ সংবাদের আন্দোলন হইতেছে এবং সন্তালীয় বিদ্রোহিতা সূত্রে ও বিলাতীয় সংবাদ পত্রে নানা বাদ বিতণ্ডা চলিতেছে, কোন ২ পত্রে প্রকাশ হইয়াছে সন্তাল ভয়ে কলিকাতাস্থ লোক পর্য্যন্ত সশঙ্ক হইয়াছেন, কেহ ২ লিখিয়াছেন অনেক রুষীয় এজেন্ট সন্তাল দিগের পৃষ্ঠবল হইয়া রণোৎসাহ দিতেছেন এবং টাইমস সম্পাদক সন্তাল দিগের সাহসবার্ত্তায় লেখেন সন্তাল দিগকে রণশিক্ষা দিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে আনিলে তাহারদিগের দ্বারা অনেক সাহার্য্য হইতে পারে, যাহা হউক, সামান্য বিবেচনা করিতে ২ সন্তালীয় ব্যাপারে প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া উঠিয়াছে।…

সংখ্যা ৪৫১ সন ১২৬২ সাল তারিখ ৭ আশ্বিন শনিবার,
ইংরাজী ২২ সেপ্টেম্বর ১৮৫৫

সন্তাল দলের গোলযোগের মূল গুন।

অন্তঃকরণে অত্যন্ত বিরক্ত না হইলে কেহ মহাবল রাজকূলে বিবাদানল প্রবল করে না, রাজারা প্রজা রক্ষক, প্রজারা কি উৎকট কারণ ব্যতিরেকে মৃ—ঘীকার করিয়া রাজ বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতে পারে, তাহারা কি করে, রাজাই তাহারদিগের বিনাশ করিতে উঠিলেন সুতরাং তাহারাও প্রতিজ্ঞা করিয়া রাজ বলে পতঙ্গের ন্যায় অগ্ন চাকিতে আসিল।

পর্ব্বতের দক্ষিণাংশ বাসি সন্তাল দিগকে রেলরোড কর্ম্মচারিরা একগুণে দশগুণ খাটাইলেন. তদুপযুক্ত বেতন দিলেন না, তাহারা চুক্তিমত উপযুক্ত বেতন চাহিল, রেলরোড কর্ম্মচারিগণ তাহারদিগকে মারিয়া ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন এবং কেহ২ যুবাকালাবস্থিতা সন্তাল কান্তাদিগকে বলাৎকার করিলেন ইহাতেই দক্ষিণাংশের সন্তালদল জাত ক্রোধ হইয়া দলবদ্ধ হইতে লাগিল, এই এক কারণ।

পর্ব্বতের উত্তরাংশে পাহাড় তলিতে মধ্যে ২ অনেক ধান্যভূমি আছে তাহাতে উত্তম ধান্য হয়, সন্তালেরা পুরুষানুক্রমে ঐ সকল ভূমিতে ধান্য বুনিয়া সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, কোন পুরুষে ঐ সকল ভূমির রাজস্ব দেয় নাই, কালেক্‌টর বা মাজিস্ত্রেট সাহেব দেখিলেন উর্ব্বর ভূম্যাধিকারে রাজকর নাই অতএব তিনি গবর্ণর কৌন্সিলে পত্র লিখিলেন ঐ সকলভূমির উপর কর নির্দ্ধারণ করিলে গবর্ণমেণ্ট অধিক লভ্য দেখিবেন, এবং লোভাকুল রাজকুল তাহাতেই উত্তর লিখিলেন তুমি ঐ সকল ভূমির কর নির্দ্ধারণ কর কালেক্‌টর বা মাজিস্ত্রেট সাহেব পোলিস দারোগাকে লিখিলেন পাহাড়তলির কত ভূমিতে ধান্য হয় তুমি তাহার পরিমাপ করিয়া লিখিবা, ঐ সকল ভূমির উপর কর নির্দ্ধারণ হইবেক, দারোগা পাহাড়তলির ধান্যভূমিতে যাইয়া রসারসী ফেলিয়া মাপ করিতে লাগিলেন সেই সময়ে উত্তরাংশীয় সন্তালেরা আসিয়া দারোগাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আমার দিগের ধান্যভূমিতে রসারসী ফেলিয়া কেন মাপ করিতেছ, দারোগা বলিলেন ইহার কর নির্দ্ধারিত হইবেক, সন্তালেরা কহিল আমরা কখন রাজস্ব দেই না এই সকলভূমির ধান্য বিক্রয় করিয়া মদ ভাং খাইয়া পর্ব্বতের উপর বাস করি. তোমাকে "কাড়মু" অর্থাৎ তোমার উপর তীর মারিব, দারোগা ভীত হইয়া বলিলেন তোরা যদি আমাকে তুষ্ট করিস তবে বিঘা একআনা রাজস্বে তোদের ভোগে রাখিয়া দিব, সন্তালেরা কহিল যদি প্রতি বিঘা এক আনা করিতে পারিস তবে টাকা দিব, তুই কি চাইস, দারোগা বলিলেন ১০০০ মুদ্রা তাহারা কহিল ভাল এক সহস্র মুদ্রাই দিব কিন্তু অগ্রে ৫০০ শত টাকা আর বিঘা ভূমি ১ আনা রাজস্ব নির্দ্ধার্য্য হইলে আর পাঁচশত টাকা পাইবি, ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ দারোগাকে ৫০০শত টাকা দিল, দারোগা ঐ ৫০০ শত টাকা লইয়া থানায় গেলেন, এ দিগে কালেক্‌টর

কি মাজিস্ত্রেট সাহেব ধান্যভূমিতে যাইয়া কোন বিঘা ৪ আনা কোন ৬ আনা হার নির্দ্ধার্য্য করিলেন তাহাতেই কয়েকজন সন্তাল থানায় যাইয়া দারোগাকে কহিল তুই বলিয়াছিস্ প্রতি বিঘায় রাজকর ১ আনার অধিক লাগিবেক না তবে কেন সাহেব কোন বিঘা ৪ আনা কোন বিঘা ৬ আনা হার করে দারোগা ভীত হইয়া কহিলেন, কি করিব ভাই, সাহেব স্বয়ং আসিয়া কর নির্দ্ধার্য্য করিতেছেন তাঁহার সাক্ষেতে আমার কোন কথা চলে না, সন্তালেরা কহিল তবে যে আমাদের ৫০০ শত টাকা লইয়াছিস্ তাহা দে, দারোগা কহিলেন সে টাকা খাইয়া ফেলিয়াছি কোথায় পাইব. ভাই তোরা আমাকে ক্ষমাকর, ইহাতেই পর্ব্বতের উত্তরদিক বাশি সন্তালেরা ক্রোধাসক্ত হইয়া আপনার দিগের বাসায় গেল, ইহার পরেই দক্ষিণ উত্তর উভয় দিগের সন্তালেরা একত্র হইল এবং মধ্যস্থলে যে সকল সন্তালছিল তাহারাও আসিয়া ঐ দুই দলের সহিত যোগ দিল এবং কেবল সহস্র২ মনুষ্য নাশ হইল ইহা কি রাজার পাপ নহে প্রজারক্ষা করা কর্ত্তব্য।

দুই...সংবাদপ্রভাকর...

।। সংকলন ।।৮০

৪ঠা শ্রাবণ, সন ১২৬২ সাল। ইং ১৯ জুলাই, ১৮৫৫

"ভাগলপুর ১ জুলাই।

সম্পাদক মহাশয়! ভাগলপুর, বীরভূম, রাজমহল, মুরশিদাবাদ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন জিলার পর্ব্বতবাসী অসভ্যলোক সকল একত্র দলবদ্ধ হইয়া রাজ-বিদ্রোহ উপস্থিত করাতে চারিদিগে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে, মাজিস্ত্রেট সাহেবরা ভীত হইয়া একত্র বাস করিতেছেন, প্রজাদিগের ধন প্রাণ রক্ষা করা দূরে থাকুক তাঁহারাআপনাপন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত সঙ্কুচিত হইয়াছেন দুরাত্মারা যেখানে গমন করিতেছে সেইখানেই নির্দ্দয়রূপে স্ত্রীপুরুষ বালক বালিকার প্রাণবিনাশ পূর্ব্বক সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিতেছে, প্রায় বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত দেশ তাহারদিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে, তাহারদিগের সংখ্যা অন্যূন ষোল হাজার হইবেক, ব্রিটিশ অধিকার মধ্যে এরূপ ঘটনা কোন কালেই হয় নাই, বর্গির হেঙ্গামা অপেক্ষা এই ব্যাপারকে অতিভয়ানক

বলিতে হইবেক, সম্পাদক মহাশয় আজি হৃতসর্বস্ব হইয়া ছিন্নবসন পরিধানপূর্ব্বক এক কর্ম্মকারের গৃহে বসিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিলাম।"

"আমড়া ১৩ই জুলাই।

সম্পাদক প্রবর! পর্ব্বতবাসিদিগের ভয়ানক অত্যাচারের বিষয় লিখিতে বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে, তাহারা ঝিকরহাটীতে আসিয়া যে নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়াছে বোধ হয় ব্যাঘ্রাদি পশুরাও তদ্রূপ করেনা, অনল দ্বারা গৃহাদি দগ্ধ করিয়াছে, যাহাকে পাইয়াছে তাহাকেই কাটিয়াছে এবং যথা সর্বস্ব লইয়া প্রস্থান করিয়াছে ..

সাঁওতাল জাতিদিগের বিলক্ষণ ঐক্য আছে, কোন বিপদ সময়ে তাহারা যদ্যপি পর্ব্বতের উপর নাগড়া ধ্বনি করে তবে এক ঘণ্টার মধ্যে ৪।৫ হাজার লোক অস্ত্র ধরিয়া একত্র হয়, যে জাতি মধ্যে এরূপ একতা সেই জাতির নিকট সৈন্য রাখা কত আবশ্যক তাহা মহাশয়েরাই বিবেচনা করিবেন, যাহা হউক এই ঘটনায় গবর্ণমেণ্টের কোন ক্ষতি নাই যে ক্ষতি সে কেবল প্রজার। এই অত্যাচার ব্যাপার···কি কারণে··সূত্রপাত হইয়াছে তাহাও নিশ্চয় হয় নাই, কেহ বলে তিতুমীরের ন্যায় দুইজন যবন বুজ্‌রুক ব্রিটীস অধিকার অপহরণের স্বপ্ন দেখিয়া এই ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছে, কিন্তু দুরাত্মারা যখন কালীপূজা করিয়া তাহার সম্মুখে নরবলি দিতেছে, তখন যবনের দ্বারা এই ব্যাপার হয় নাই. কেহ বলে যে রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারিরা সাঁওতাল জাতীয় স্ত্রীলোক ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছিল তাহাতেই তাহারা ঐক্য হইয়া যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছে, কেহ আবার বলেন যে, রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ে অত্যাচার হইয়াছিল, যাহাহউক বিস্তারিত জ্ঞাত হইয়া আমি পরে লিখিব।"

সংবাদ প্রভাকর

৫ই শ্রাবণ, সন ১২৬২ সাল। ইং ২০ জুলাই, ১৮৫৫

···রাজমহল, ভাগলপুর, মুরসিদাবাদ, জঙ্গিপুর, অরঙ্গাবাদ, আমড়া, জিয়াগঞ্জ ইত্যাদি স্থান হইতে আমরা যে সকল পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ইংরাজী পত্রে যাহা প্রকাশ হইয়াছে তদ্দ্বারা নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে সাঁওতাল জাতিরা কোনকালে রাজবিরুদ্ধাচরণ করে নাই তাহারা চিরকাল রাজানুগত ও পরিশ্রম তৎপর, তাহারদিগের পরিশ্রমে রাজমহলের পর্ব্বতো-

পরি বিচিত্র উদ্যান ও নগর নির্মিত হইয়াছে, তাহারা কৃষিকার্য্যের দ্বারা প্রচুর শষ্য উৎপন্ন করিতেছে, সেংপটেণ্ট সাহেব যে সময়ে ঐ পর্ব্বতের রাজস্ব বিষয়ের ভার গ্রহণ করেন সে সময়ে কেবল ৩০০ মাত্র সাঁওতাল জাতি তথায় বাস করিয়াছিল এইক্ষণে তাহাদিগের সংখ্যা প্রায় একলক্ষ হইয়াছে এবং দক্ষিণ পর্ব্বত হইতে সাঁওতাল জাতি অধিক পরিমাণে আগমন করিতেছে তাহারা বাঙ্গালীর ন্যায় ভীরু স্বভাব নহে বলবান এবং সাহসিক। রেইলওয়ে সংক্রান্ত কর্ম্মচারীরা তাহাদিগের প্রতি নানা বিষয়ে অত্যাচার করাতে তাহারা অস্ত্র ধারণ করিয়াছে।

রেইলওয়ে কর্ম্মচারিগণ হুগলি ও বর্দ্ধমানে যে প্রকার অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহাতে আগেকার ভীরু স্বভাব লোকেরা কোন আপত্তি না করাতে তাঁহাদিগের সাহস বৃদ্ধি হইয়া গিয়াছে কিন্তু বলবান লোকেরা কেন তাহা সহ্য করিবেক? আমরা অবগত হইলাম যে রেইলওয়ের কর্ম্মচারিরা সাঁওতাল জাতির যুবতি স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া বলাৎকার করিয়াছেন, কোন কোন স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া পাঁচ সাত দিবস আপনাদিগের নিকট রাখিয়াছেন, তাহাদিগের উদ্যান হইতে বলদ্বারা ফল কাষ্ঠাদি লইয়াছেন তাহার মূল্য দেন নাই, সাঁওতাল লোকদিগকে পরিশ্রম করাইয়াছেন অথচ মূল্য কিছুই দেন নাই, বলবানজাতি এত অত্যাচার কেন সহ্য করিবেন? এই বিষয়ের বিশেষ তদন্ত অতি আবশ্যক, যাহারা চিরকাল রাজানুগত তাহারা বিনা কারণে রাজবিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে একথা কে বলিবেন?

৫৩০১ সংখ্যা, বুধবার ১৭ শ্রাবণ ১২৬২ সাল। ইং ১ আগষ্ট ১৮৫৫

...মুরশিদাবাদ হইতে ২৩ জুলাই তারিখের যে পত্র আসিয়াছে তাহা নিম্নভাগে প্রকাশ করিলাম।

সাঁওতাল জাতিরা অস্ত্র ধরিয়া মুরশিদাবাদের অতি নিকটে আসিয়াছে তাহারা শ্রীযুত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর তথা শ্রীযুত রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ বাহাদুরের জমীদারী বেলে ও মৃত্যুঞ্জয়পুর লুট করিয়াছে তাহাতে তাহারা অল্প সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় নাই। ৫০ জন প্রজা হত হইয়াছে তাহারা উক্ত রাজাদিগের লাটঝুরি নামক তালুক আক্রমণার্থ আগমন করিতেছে এমত জনরব যে দুরাত্মারা রাজাদিগের কান্দির রাজবাটি আক্রমণ করিবেক। এই কথা যদ্যপি সত্য হয় তবেই সর্ব্বনাশ, প্রজাদিগের মহানিষ্ট হইবেক।

রাজাদিগের কেবল ঠাকুর বাটিতে স্বর্ণ রৌপ্য নির্ম্মিত তৈজসে হীরামুক্তাদি খচিত দেবাভরণ স্বর্ণ খাট পালঙ্ক ইত্যাদি প্রায় ৭।৮ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আছে...

৫৩০৪ সংখ্যা, শনিবার ২০ শ্রাবণ ১২৬২ সাল। ইং ৪ আগষ্ট ১৮৫৫

আমরা অবগত হইলাম যে অত্যাচারি সাঁওতালদিগের মধ্যে প্রায় তিন চারি শত লোক ধৃত হইয়াছে অনেকে হত ও আহত হইয়াছে মেং পনেট সাহেব একদল সৈন্য সহিত পর্ব্বতে উঠিয়া অত্যাচারিদিগের ঠাকুর বাটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাতেও তাহারা ভীত হয় নাই, স্থানে স্থানে অত্যাচার করিয়া বেড়াইতেছে প্রায় ৮০০০ সাঁওতাল দলবদ্ধ হইয়া ভাগলপুর আক্রমণার্থ গমন করিয়াছিল কিন্তু সম্মুখে এক নদীতে তাহারা গভীর জল দেখিয়া ভাগলপুরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, ঐ নদীতে নৌকাদি কিছুই ছিল না, এ কারণ তাহারা বীরভূমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

এতদ্দেশীয় কারাগার সমূহের তত্ত্বাবধায়ক মেংলচ সাহেব রাণীগঞ্জে ও তন্নিকটস্থ অন্যান্য স্থানে ও পশ্চিম গমনের প্রশস্ত রাস্তায় সাঁওতালদিগের অত্যাচার নিবারণের ভার গ্রহণ করিয়া গরুর গাড়ী ও মজুর লোকদিগের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছেন শ্রীযুত গোবিন্দ প্রসাদ পণ্ডিতের জামাতা আপনার অধীনস্থ গাড়ী সকলের চাকা খুলিয়া স্থানে স্থানে রক্ষা রক্ষা করতঃ গো ও গাড়োয়ানদিগকে স্থানান্তরে পাঠাইয়া ছিলেন এই বিষয় মেংলচ সাহেব অবগত হইয়া তাঁহাকে বিধিমতে ভয় প্রদর্শন করাইবাতে তিনি সাহায্য করণে সম্মত হইয়াছেন।

৫৩০৫ সংখ্যা, সোমবার ২২ শ্রাবণ ১২৬২ সাল। ইং ৬ আগষ্ট ১৮৫৫

...এক ব্যক্তি সাঁওতালদিগের সুবার নিকটে ছদ্মবেশে গিয়াছিল ঐ ব্যক্তি তিনদিবস আহার করে নাই, সুবার বাটির নিকট উপস্থিত হইয়া সুবার দোহাই দেয় ইহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ঐ ব্যক্তিকে একটি টাকা দেন এবং কোন সাঁওতাল তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে এই অভিপ্রায়ে তাহার সমভিব্যাহারে লোক দিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি কমিশনার সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্যক্ত করিয়াছে যে সুবা খেরুয়া বস্ত্রে পাদ্রীর ন্যায় পরিচ্ছদ প্রস্তুত করতঃ পরিধারণ করিয়াছেন, তিনি কাষ্ঠাসনে উপবেশন করেন, তাঁহার সম্মুখে রাশিকৃত টাকা, আধুলি ও পয়সা আছে, বোধ হয় ঐ

সকল টাকা লুটের টাকা...দুরাত্মারা দুইটা নীলকুঠীর সমুদয় দ্রব্যাদি অপহরণ করিয়াছে তাহারা প্রজাদিগের প্রতি যে প্রকার অত্যাচার করিতেছে তাহা বর্ণনা হয়না, অত্যাচারিদিগের সংখ্যা ৪০।৫০ হাজার হইবেক...চারিদিকে হাহাকার শব্দ উঠিয়াছে।

৫৩০৮ সংখ্যা, শুক্রবার ২৫ শ্রাবণ ১২৬২ সাল, ইং ৯ আগষ্ট ১৮৫৫

মেং টুগুড সাহেবের পত্র

কাপ্তেন মিডেলটন মেং এবং আমি কিছু নিজামতের সৈন্য লইয়া বেলা দেড়টার সময়ে ডগ্গাডিহিতে উত্তীর্ণ হইলাম সেখানে ও লোক নাই। আমি কানুর বাটিতে প্রবেশ পূর্ব্বক সাঁওতালদিগের ঠাকুর পাইয়াছি, ঐ ঠাকুর একখানা মৃত্তিকা নির্ম্মিত চাকার ন্যায়, তাহার দুই স্থানে ছিদ্র আছে.তাহাতে দুগ্ধ প্রদান করিলে ফুলিয়া উঠে। দুগ্ধ উর্দ্ধে গমন করে, ঐ ঠাকুরের আরও অনেক আশ্চর্য্য কথা নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগের মুখে শ্রবণ করিলাম। ঐ ঠাকুরের নিকট কয়েকটা ছাগ মুণ্ড ও দুইটা মণ্ডের মুণ্ড ছিল। কানু পূজাতে তাহা বলিদান করিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে গিয়াছিল।...

তিন...সম্বাদ ভাস্কর...

২১ ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬

৮ [ফিব্রুআরি] দিবসে একজন সন্তালের ফাঁসি দ্বারা প্রাণ নাশ হয়, লেপ্তেনেন্ত টৌ লমিন সাহেবের হত্যা ব্যাপারে যে সন্তালেরা লিপ্ত ছিল এ ব্যক্তিও তাহারদিগের একজন সঙ্গী, এই সন্তালও ফাঁসীর আজ্ঞা শ্রবণে ভীত হয় নাই, ফাঁসী কাষ্ঠে উঠিবার কালে তামাকু চাহিয়া খাইয়া ছিল।

...বিদ্রোহি প্রদেশের যাবতীয় কামারেরা দিবা রাত্রি বন্দুক নির্ম্মাণ করিতেছে, বোধহয় সন্তালেরাই তাহা প্রস্তুত করাইতেছে, তীর ধনুক টাঙ্গী লইয়া সিপাহিদিগের সহিত সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারগ হয়না এই জন্যই সন্তালেরা বন্দুকের আয়োজন করিতেছে।

...লেপ্টেনেন্ত গবর্ণর বাহাদুর গেলবারে বিদ্রোহি প্রদেশে যাইয়া, সন্তালদিগের প্রশ্রয় বাড়াইয়া দিয়াছেন, তিনি বিদ্রোহি প্রদেশীয় পোলিসে সন্তাল বরকন্দাজ নিযুক্ত করিয়াছেন এবং সন্তালদিগকে এরূপ স্বাধীনতা দিয়াছেন যে তাহারা আপনাপন মোকদ্দমা যখন পঞ্চাইতের দ্বারা নিষ্পত্তি করিবেক, ইহাতেই তাহারা আপনারদিগকে স্বাধীন বোধ করিতেছে এবং স্বাধীনতা রক্ষা জন্য অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করাইতেছে।

২৫ নভেম্বর ১৮৫৬

বীরভূম হইতে আগত পত্র

মহাশয়, নিষ্ঠুরতার বিষয় কি কহিব, যদি আপনি স্বচক্ষে দেখিতেন তবে অশ্রুজলে অবগাহন করিতেন, পোলিস সম্পর্কীয় লোকেরা দামিনীকো নামক স্থান হইতে ৫০ জন সাঁওতালকে ধৃত করিয়া আনিয়াছে তাহারদিগের অবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন, ঐ সকল সন্তালেরা যে দিবস ধৃত হয় সেদিন ও তৎপর দিবা রাত্রি নিরাহারে বন্ধনাবস্থায় ছিল আহারার্থে জলবিন্দুও পায় নাই. পোলিসের লোকেরা তাহারদিগের যেমন ধৃত করিয়াছে অমনি বেড়ী পায়ে দিয়াছে, হাতে কড়ী পায়ে বেড়ী. ঐ কড়ী বেড়ী শৃঙ্খল যুক্ত করিয়াছে তৎপরে পঞ্চাশ জনকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, বেড়ীর ঘর্ষণে অনেকের হস্তপদে ঘা হইয়া গিয়াছে, সেই ঘা হইতে ঝর্ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, পথে চলিতে না পারিয়া অনেকে পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারদিগকে টানিয়া লইয়া আসিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গে চর্ম্ম ছড়িয়া গিয়াছে ঐরূপ টানাটানিতে এক বৃদ্ধ মরিয়াগিয়াছিল, তাহার মৃতদেহ হস্তী পৃষ্ঠে তুলিয়া বীরভূমে পাঠাইয়া দিয়াছে, দামিনীকো হইতে বীরভূমে আসিতে আবদ্ধ সন্তালেরা যে কয়েক দিবস পথিমধ্যে ছিল তাহারা অন্ন পায় নাই, বীরভূমের কারাগারের সম্মুখে আনিয়া যখন শৃঙ্খল খুলিয়া দিল তখনও তাহারা হাঁটিয়া কারাগারে প্রবেশ করিতে পারিল না, বেত্রাঘাত করিতে ২ পদাতিকেরা হেঁছড়াইয়া টানিয়া জেহেলখানায় লইয়া গেল পরে তাহারদিগের কপালে কি হইয়াছে আমি জানিতে পারি নাই।...

সন্তালেরা আপনারদিগের স্বাধীনতা রক্ষা জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল সংগ্রাম সময়ে সভ্য জাতিরাও গ্রাম ২ দাহ করিয়া থাকেন, এবং বিপক্ষ পক্ষের

অনুগত লোকদিগের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া লন, সন্তাল সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টও সন্তাল প্রজাদিগের গ্রাম দাহ অর্থ লুঠ করিয়াছেন, সন্তালেরা চুরী ডাকাইতী করে নাই, এক্ষণে তাহারা দুর্ব্বল হইয়াছে,...

দামিনীকে স্থান হইতে যে ৫০ জন সন্তাল ধৃত হইয়া বীরভূম কারাগারে আসিয়াছে তাহারা জীবিতাবস্থায় আছে কিনা শ্রীযুত বাহাদুর অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার তত্ত্ব লইবেন, আমি জানিয়াছি গবর্ণমেণ্টের জেনেরেল ডিপার্টমেণ্টের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা ভাস্কর পত্র পাঠ করিয়া থাকেন এবং প্রয়োজন মতে শ্রীশ্রীযুতের সাক্ষাতেও কোন কোন বিষয় পাঠ করেন অতএব বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি আমার লিখিত এই প্রস্তাবটি যেন শ্রীল শ্রীযুত প্রধান পুরুষের কর্ণগোচর হয়।

।। এক ।।

'সমাচার সুধাবর্ষণ'ও 'সংবাদ প্রভাকর'—দুটি পত্রিকায় যেসব সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তা হতে এরকম একটি ধারণা করা চলে যে, বিদ্রোহের কারণ ছিল অসংগত। বিদ্রোহীরা ছিল হিংস্র; এবং বিদ্রোহীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বহু নারকীয় ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে এসব তথ্যে, সাঁওতালরা কেন যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে তার বিশেষ উল্লেখ নেই। এক্ষেত্রে কেবল 'সমাচার সুধাবর্ষণ' ৭-৬-১২৬২ তারিখ ও 'সংবাদ প্রভাকর' ৫-৪-১২৬২ তারিখের প্রকাশিত পত্রে বিদ্রোহের কিছু কারণ উল্লেখিত হয়েছে। এতে শূন্যতার কিছুটা ফাঁক পূরণ হয়েছে মাত্র।

অবশ্য 'সম্বাদ ভাস্করে'৮১ ২৫শে নভেম্বর, ১৮৫৬-তে বীরভূম থেকে আগত যে পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছে; তাতে পত্র লেখকের সাঁওতালদের প্রতি সহানুভূতি ও মর্মবেদনার কারণটুকু ধ্বনিত হয়েছে।

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে, সেদিনের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় কৃষি-কেন্দ্রিক অভ্যুত্থানগুলি সহানুভূতির সংগে সমর্থন করতে পারেননি। না পারার-ও কারণ ছিল। তখন তাঁদের জীবনধারা ছিল মুৎসদ্দীগিরির জীবন-ধারা। ইংরেজদের অগ্র-প্রসারের ইতিবাচক দিক শুধু তাঁরাই লক্ষ করেছেন। তাছাড়া নিজেদের শক্তি ও সামর্থ্যের ওপর ছিল আস্থার অভাব। মোট-কথা ইংরেজদের শাসন তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল না। তাই এসব

বিদ্রোহের প্রতি তাঁদের দৃষ্টি বিমুখ ছিল। সে কারণেই সাঁওতাল বিদ্রোহ কিংবা সিপাহীবিদ্রোহে এঁদের সহযোগিতা মেলেনি। অবশ্য সংস্কারবাদ ও নিয়ম তান্ত্রিক আন্দোলনের ধারাটিকে অস্বীকার করা ইতিহাস বিরোধী। সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র।

ঈশ্বর গুপ্ত সাঁওতালবিদ্রোহ কিংবা সিপাহীবিদ্রোহকে সমর্থন করতে পারেননি। সিপাহী বিদ্রোহের ওপর তিনি রীতিমত ব্যঙ্গপ্রবণ ছিলেন, ব্যরসিকতা করেছেন বটে। এর কারণ বোধকরি 'মধ্যবিত্ত সুলভ আড়ষ্টতা'। এই আড়ষ্টতার ফলে কোনো বুদ্ধিজীবী লিখতে পারলেন দুর্মুখ ভাষ্য: "সম্প্রদায় সমাচার লিখিতে ২ লেখনীর মুখ ক্ষয় হইয়া গেল তথাচ এ পাপ গোল নিবারণ হইল না, বরং দিন ২ বৃদ্ধি পাইতেছে।"৮২

অথচ সমকালীন পত্রিকা 'ক্যালকাটা রিভিউ' সাঁওতাল-অসন্তোষের কারণ কিঞ্চিৎ তুলে ধরেছে। শোষণের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা করেছে। অবশ্য স্বজাতিপ্রাণতার জন্য নিষ্ঠুর রাজকাহিনী এড়িয়ে গেছে; কিন্তু তাতে বুঝতে অসুবিধে হয়না যে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ব্রিটিশ রাজনীতি আশ্রিত ও পুষ্ট।

'ক্যালকাটা রিভিউ'৮৩ উদাহরণ দিয়ে সাঁওতালদের অসন্তোষের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছে। যেমন, দুর্গামোমিন স্ত্রী পুত্র নিয়ে চাষবাস করে খায়। ছিল পরম সুখেই। যৌবনে সে মহাজনের নাম-ও শোনেনি। ঋণের কথা কল্পনা-ও করেনি। পরিবর্তিত অবস্থায় চাষের কিংবা হঠাৎ-ই অর্থের প্রয়োজন হলো; তখনই মহাজন বলদেও সিং হাজির হয়ে ৪ টাকা ধার দিল, সুদ ২৫ টাকা। কিংবা হলধর চৌধুরী দুর্গামোমিনকে ৬ টাকা ধার দিয়ে বুঝে নিল তের টাকা। কিন্তু কেউ রসিদ দিল না। বেশি কেন নিল, তার জবাবদিহি-ও না। আবার হয়তো মহাজন মাণিক চৌধুরীর বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান কিংবা কোনো শোকানুষ্ঠান তাতে তার বাড়তি অর্থ চাই। তখন সে নিকটবর্তী গ্রাম থেকে একশত টাকা 'সেলামি' চেয়ে পাঠায়। চাওয়া নয়, জুলুম আদায় সুরু করে দেন। মহাজনের প্রয়োজনের তাগিদটাই বড়ো। তাই আদায়ের কসুর হয় না। টাকা না দিতে পার, শস্য দাও। শস্য নিতে গরুর গাড়ী নিয়ে মহাজন স্বয়ং হাজির হতেন। কাজের, জন্ত ব্যক্তিগত ব্যবহারে সাঁওতাল কুলি নেওয়া চলত, অথচ মজুরি নগদ নেই।

আরো আছে। গঙ্গাধর প্রতাপশালী জমিদার। তাঁর সীমানা মাণিক স'াওতালের গৃহ স্পর্শ করেছে। অতএব কর চাই। মাণিক স্বীকার করে নেয়। চুক্তি হয়, ছ' আনা। কিন্তু জমিদারের গোমস্তা উসুল করে ছ'টাকা। রাজস্ব ক্ষেত্রে অরাজকতা আরো ভয়ানক। নায়েব সাজোয়ালদের দায়িত্ব ছিল পরগণাইত ও মাঝিদের কাছ থেকে গ্রাম বাবদ খাজনা নেওয়ার। খাজানার কথা হয়তো ছ'টাকা। কিন্তু তারা ছ'টাকা বাড়তি দাবি করল। গ্রামে যখন এসেছে উপরিটা দিতেই হবে। কিছু না পার, বাঁশ দাও, বেড়া-বাঁধার কাজে লাগবে।

এছাড়া মহাজনরা কতরকম ভাবে অন্যায় মামলা রুজু করে ভিটে মাটি ছাড়া করাতেন দুর্গামোমিন কিংবা মাণিক স'াওতালদের; তা কল্পনাতীত।

।। দুই ।।

এতদিনের শোষণ-পেষণ, দলিতকরণ, অধিকার হরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামী-নেতৃত্ব দিয়ে সিদু ও কানু স্বরাজ্য স্থাপনের যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, সেকথা স'াওতাল জনসমাজ শ্রদ্ধার সংগেই স্মরণ করেন। স'াওতালদের সাংস্কৃতিক জীবনচর্যায়-ও তা মূর্ত হয়ে আছে। 'সিদু-কানহু মেলা' তাঁদেরই স্মরণ মেলা। সিদু-কানুর সংগ্রাম ও নেতৃত্ব স্মরণ করে বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার কাশিয়া গ্রামে লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরের দিন ও স'াওতাল পরগণা জেলার বারহেত থানার ভগ্নাডিহিতে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এই পবিত্র মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়।৮৪

কলিকাতায় ৩০-৬-১৯৭৭ তারিখে শিক্ষিত আদিবাসী সমাজ "সিদো-কানহু দিবস' পালন করলেন। এই উপলক্ষে যে আবেদন তাঁরা রেখেছিলেন; তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হলো।৮৫ এতে সিদু-কানু সম্পর্কে স'াওতাল জনসমাজের গভীর শ্রদ্ধার কথা স্পষ্টকিত হবে।

"স'াওতাল গণ-আন্দোলনের সূচনা হিসাবে ৩০শে জুন;

"সিদো-কানহু দিবস"

উদ্‌যাপন উপলক্ষে আবেদন

ইংরাজি ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন।

ভগনা ডিহির পবিত্র শালকুঞ্জে সমবেত দশ হাজার সাঁওতালরা 'শপথ' গ্রহণ করেছিলেন বিদেশী শাসন, শোষণ ও অত্যাচার থেকে শোষিত, বঞ্চিত, পদদলিত আপামর জনসাধারণ তথা দেশকে মুক্ত করে শোষণহীন স্বরাজ ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার। ফলে, এই দিনটিই সূচনা করেছিল সিদো ও কানহু—সিদো মুরমু ও কানহু মুরমু—দুই ভাইয়ের নেতৃত্বে সাঁওতাল তথা শোষিত, বঞ্চিত, পদদলিতদের গণ-আন্দোলন।

...ইংরাজদের অবাধ নিষ্পেষণে আর সরকারী আমলা, জমিদার-ধনিক-মহাজনদের সীমাহীন শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁরা গর্জে উঠেছিলেন। ...হাজার হাজার সাঁওতাল শহীদের রক্তে রচিত হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিস্মরণীয় প্রথম অধ্যায়—তারই সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৫৫ সালের ৩০শে জুন। তাই, ইহা আমাদের সমগ্র জাতির একটি স্মরণীয় ও বরণীয় দিবস।

...আমরা মনে করি, ভারতের জন-গণ-মন অধিনায়ক জনতার জাতীয় অভিব্যক্তির প্রথম গণ-আন্দোলনের শুভ সূচনায় এই ৩০শে জুন দিনটিকে আমাদের সমাজের সর্বস্তরে উক্ত জননেতাদ্বয়ের নামানুসারে "সিদো-কানহু দিবস" হিসাবে পালন করা একান্ত কর্তব্য। তাই বিভিন্ন জন-সংস্থার মাধ্যমে এই দিবস পালন করার জন্য আমরা সকলের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।

কোলকাতায় আমরা "সিদো-কানহু দিবস" উদ্‌যাপন করার প্রয়াসী হয়েছি। এই উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণ করার ব্যবস্থা হয়েছে শিয়ালদহস্থিত 'নেতাজী সুভাষ ইনষ্টিটিউট'এ আগামী ৩০শে জুনের সন্ধ্যা ৬টা থেকে ১০ পর্যন্ত। আমাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আমরা সর্বস্তরের জনসাধারণের নিকট আন্তরিক আবেদন করছি। ইতি—১লা মে, ১৯৭৭।"

দশম অধ্যায়

সিপাহী বিদ্রো

(১৮৫৭-১৮৫৮)

ক. ইতিহাস পর্ব.

…সিপাহী বিদ্রোহের ইতিকথা…

- *এক. বিদ্রোহের কারণ*
- *দুই. বাঙলায় সিপাহী বিদ্রোহ*
- *তিন. সিপাহী বিদ্রোহের বাঙলা ইতিহাস*
- *চার. শতবর্ষের আলোয় সিপাহী বিদ্রোহের বাঙলা ইতিহাস*

খ. সাহিত্য পর্ব:

- *এক. সিপাহীবিদ্রোহ ও ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা*
- *দুই. সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় ছোট গল্প*
- *তিন. সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাস*
- *চার. সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় নাটক*
- *পাঁচ. দিনলিপি, বিবরণী ও আত্মচরিতে সিপাহী বিদ্রোহ*
- *ছয়. সংবাদ-ভাষ্যে সিপাহী বিদ্রোহ*

১০ ॥ অধ্যায় ঃ সিপাহী বিদ্রোহ

ক. ইতিহাস পর্ব

সিপাহীবিদ্রোহের ইতিকথা…

একটি ঘটনা। ঘটনাটি ছোটো। মনে হবে গল্পের আঙ্গিক। কিন্তু তা একেবারেই মূল্যহীন নয়। ব্যাপারটি এরকম ঃ একজন ব্রাহ্মণ সিপাহী স্নান করে একলোটা (ঘটি) জল নিয়ে ফিরছিল; (এমন-ও হতে পারে, রান্নার উদ্যোগ করছিল) পথে নিম্নবর্ণের এক খালাসী (মতান্তর: ঝাড়ুদার) সেই ব্রাহ্মণ সিপাহীর কাছে জল খেতে চাইল। ব্রাহ্মণ সিপাহী স্পর্শাস্পর্শের কথা ভেবেই ইতস্তত করতে থাকে। খালাসী ভ্রূকুটি-কুটিল হেসে বলে,—তোমরা জাতের বড়াই কর, সবুর করো! সাহেব লোক এবার নোতুন টোটায় গরু-শূয়রের চর্বি মাখিয়ে দিচ্ছে তখন তোমাদের জাতপাত কোথায় থাকবে?১

দমদমের সমস্ত সিপাহীদের মধ্যে কথাকটি ছড়িয়ে গেল। এ খবর ব্যারাকপুরে-ও পৌছুল। সিপাহীদের মধ্যে মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল। ভাবলে মনে হবে, কয়েকটি কথা। কিন্তু কথাকটি পল্লবিত হয়ে তুমুল তোলপাড় সুরু করেছিল, শুধু বাংলাদেশে নয়; সারা ভারতে।

১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে সামরিক কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ব্রাউন-বেস বাতিল ও এনফিল্ড রাইফেল চালু হয়। এই বন্দুকের কার্তুজ দাঁতে কেটে বন্দুকে পুরতে হতো।

গরু-শূকরের চর্বি মিশ্রিত টোটাকে ঘিরে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহীদের মধ্যে রটনা ও ঘটনার পরম সংঘাত সুরু হয়। স্থানে স্থানে বিক্ষোভ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। তাদের মনে হলো, ইংরেজ সরকার তাদের ধর্মনাশের দুরভিসন্ধি মূলক নীতি গ্রহণ করেছেন। বিক্ষোভ এমনই

আকার ধারণ করল যে, সামরিক কর্তৃপক্ষ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। সামরিক অফিসারদের ও সরকারের মধ্যে অনেক কথা চালাচালি, চিঠি লেখালেখি হলো বটে, কিন্তু এই শোচনীয়তার ঔষধি নির্ণিত হলোনা।২

এমনকি, কয়েকজন দায়িত্বশীল ইংরেজ সেদিনের ইংরেজী প্রাত্যহিক পত্র 'ইংলিশম্যান'-এ বক্তব্য রাখলেন: সিপাহীদের একটি দলকে উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়ে কার্তুজ উৎপাদনের পদ্ধতিটি স্বচক্ষে দেখিয়ে আনলে এ বিক্ষোভ হয়তো স্তিমিত হবে।৩ বলাবাহুল্য, এই যুক্তি-গ্রাহ্য পরামর্শটি মানিত হয়নি।

ব্যারাকপুরের ৩৪ নং রেজিমেণ্ট (34th N. I) যেন দপ্ করে জ্বলে ওঠে। বোধকরি, মঙ্গল পাণ্ডের মতো ব্যক্তিত্ব সেখানে ছিল বলেই সামরিক ছাউনিতে এই দাবানল। ঐ রেজিমেণ্টের অসন্তোষ, ক্ষোভ রাণীগঞ্জে-ও ছড়িয়ে পড়ল; কারণ ঐ রেজিমেণ্টের একাংশ সেখানে-ও ছিল। সিপাহীরা অফিসারদের বাঙলোতে আগুন জ্বালাতে সুরু করে। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৮ ও ২৫ তারিখে ৩৪নং রেজিমেণ্টের দুটি দল নিয়মানুগ কাজের তাগিদে বহরমপুরে পৌঁছুল; সেখানে ছিল ১৯নং রেজিমেণ্ট। [19th N. I.] ফলত, ব্যারাকপুর থেকে এ দুটি দল যে রোষবহ্নি বয়ে নিয়ে গিয়েছিল; তা মুহূর্তেই কঠিন বাতাবরণ সৃষ্টি করল। ২৬শে ফেব্রুয়ারি বহরমপুরের সৈন্যশিবিরে চাপা অসন্তোষ, কার্তুজকে ঘিরে। ১৯নং বাহিনীকে ১৫ রাউণ্ড গুলি নিয়ে করতে হবে প্যারেড। কিন্তু সৈন্যরা ক্যাপ নিতে অস্বীকার করল। কারণ, এর পরেই নিতে হবে টোটা। সিপাহীরা ক্যাপ নিতে সম্মত হচ্ছেনা, এই সংবাদ পেয়ে কমাণ্ডিং-অফিসার মিচেল সাহেব সিপাহীদের অনেক ভয় দেখালেন।* কিন্তু মিচেল সাহেবের উদ্ধত-বাক্‌চাতুর্য তাদের

---

*৫.৩ ১৮৫৭ তারিখে ১৯নং রেজিমেণ্টের পদাতিক বাহিনীর কয়েকজন সিপাহী মিচেলের ব্যবহার সম্পর্কে সরকারকে এক পত্র লেখেন। কর্তৃপক্ষের আদেশে জেনারেল হিয়ার্সে জানতে চেয়েছিলেন কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট তিনি এই কথাটি বলেছিলেন কিনা, রূঢ় আচরণ করেছিলেন কিনা।

"If you will not take the cartridges, I will takeyou to Burma, where through hardship you will all die" এই কথাটি মিচেল সাহেব বলেছিলেন, তা তিনি অস্বীকার করেন।

দ্র, Selections from the Letters, Despatches and Other State Papers 1857-58, edited by G. W. Forrest, P, 91

ক্ষিপ্ত করে তোলে। সেদিনই তারা বারুদখানা আক্রমণ করে ও সেনা-নিবাসের রসদ হস্তগত করে।

ব্যারাক-যুদ্ধের নায়ক মঙ্গলপাণ্ডের কথায় ফিরে আসি। কারণ, তাঁর ব্যক্তিক-প্রবণতার জন্য তিনি ইতিহাস পুরুষ। মঙ্গল পাণ্ডের চরিত্র-কথনে রজনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন—"মঙ্গল পাঁড়ে বলিষ্ঠ ও তরুণ বয়স্ক। তাহার চরিত্র ভালছিল; সাত বৎসরকাল, সে প্রকৃত বীর পুরুষের ন্যায় গবর্ণমেণ্টের কার্য্য করিতে ছিল। সেনাপতিগণ এই তরুণ বয়স্ক সিপাহীর চরিত্রে কখনও কুটিলতা বা বিশ্বাসঘাতকতার আভাস পান নাই। ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর ন্যায় মঙ্গল পাঁড়ে সর্ব্বদা আপনার ধর্ম্মানুগত অনুশাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিত।"৪

এহেন চরিত্রের মানুষ ৩৪নং রেজিমেণ্টের সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহমুখর হয়ে, মর্মস্পর্শী প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইংরেজের বিরুদ্ধে। ধর্ম ও জীবন রক্ষার তাগিদে। তিনি এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য-দম্ভী: একলাই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন ২৯. ৩. ১৮৫৭। তবু-ও জনচেতনার উন্মেষে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন: সহসাথীরা এগিয়ে এস। আমার সঙ্গে হাত মেলাও। ধর্ম বাঁচাও। জীবন দিয়ে লড়াই কর।৫

সংবাদ পেয়ে লেফটেনান্ট বাগ এগিয়ে এলেন। মঙ্গলপাণ্ডে বাগ-কে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন। তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। বাগ ও গুলি ছুঁড়ে ছিলেন কিন্তু উভয়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। পাণ্ডে তরোয়াল নিয়ে উন্মত্ত হয়ে উঠেন। বাগের সহকারী হিউসন প্রতি-অক্রমণের চেষ্টা করলেন। পারলেন না। তিনিও আহত হন। তাঁরা সমবেত সৈন্যদের উদ্দেশ্যে কাতর আবেদন জানালেন বটে, কিন্তু কেউ এগিয়ে আসায় ইচ্ছা প্রকাশ করল না। অবশ্য নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে তাঁরা বেঁচে গেলেন একজন মুসলমান সিপাহী শেখ পল্টুর সহযোগিতায়। শেখ পল্টু, মঙ্গল পাণ্ডেকে নিরস্ত্র করার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় আহত অফিসারদ্বয় পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।৬

মঙ্গল পাণ্ডের সহসাথীরা এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। নীরবে দাঁড়িয়ে সমর্থন করেছিল। সমর্থন করেছিল* এরূপ বলার কারণ, লেঃ বাগ, হিউসন

* "লেফটেনান্ট বগ চলিয়াগেলে সিপাহীরা সেখ পল্টুকে বারংবার বলিতে লাগিল যে মঙ্গল পাঁড়েকে ছাড়িয়া দাও। সেখ পল্টু যখন মঙ্গল পাঁড়েকে ধরে, সেই সময় কোন কোন সিপাহী সেখ পল্টুকে গুলি করিয়া মারিবার ভয়-ও দেখাইয়াছিল।"

দ্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস, ১৩১৬ পৃ, ১৩৭

মেজর সার্জেন্ট হুইশার, ব্রিগেডিয়ার গ্রান্ট বিপর্যয়ের সময় সিপাহীদের সহযোগিতা চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা সহযোগিতা পাননি। ঈশ্বরী পাণ্ডে নামে একজন সিপাহীর ফাঁসী-ই হলো। তাঁর অপরাধ, সে মঙ্গল পাণ্ডেকে ধরে দিতে প্রথম অস্বীকার করেছিলেন বলে। যাইহোক, মঙ্গল পাণ্ডের বিরোধেবিদ্ধ জেনারেল হিয়ারসে তাঁর দুই পুত্রকে সংগে করে অস্ত্র-সজ্জায় সজ্জিত হয়ে সমবেত সিপাহীদের এই বলে নির্দেশ দিলেন; নির্দেশ না বলে বলা ভালো মৃত্যুর পরোয়ানা জারী করলেন, কারণ হাতে পিস্তল তুলেই বলেছিলেন: আদেশ দেওয়ার সংগে সংগে যে পাণ্ডেকে ধরার প্রথম অস্বীকার করবে, তার মৃত্যু অনিবার্য।৭

শমন-দমনের কূট-কৌশলটি লক্ষ করে পাণ্ডে বুঝলেন তাঁর দিন ফুরিয়েছে, আত্মগত আকাঙ্ক্ষা সফল হবার নয়। তাই নিজের বন্দুকেই মরতে চাইলেন। তা হলো না। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে আহত হলেন মাত্র। সেই অবস্থায় তিনি ধৃত হলেন। ৮ই এপ্রিল, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ২৬ বৎসর ২ মাস ৯ দিনের যুবক মঙ্গলের ফাঁসি হলো। অমর শহীদের আত্মগত উপলব্ধিকে বাংলা তো নয়ই, সারা ভারত অস্বীকার করেনি। আজ-ও ৮ই এপ্রিল বাংলার অধিবাসী মাত্রেই তাঁকে স্মরণ করেন শ্রদ্ধার সঙ্গে, প্রাপ্য প্রণামী জানাতে দ্বিধাবোধ করেন না। একজন ঐতিহাসিকের মতে: "We always ought to remember with pride in our heart the name of Mangal Panday, whose blood was the source of the river of martyrdom! The seed of freedom that had been sown for three years and more, was first watered with hot blood from the body of Mangal Panday! When the time comes to get its crop, let us not forget who first boldly came forward to nourish it!"৮

ধর্মনৈতিকতার কারণে সুরু হয়েছে এ সংগ্রাম। বিচিত্র তার দিক। সে আলোচনার পূর্বে মীরাটের বিদ্রোহীদের কিছু পরিচয় দিই। এতে বিদ্রোহের প্রকৃতি ও ব্যাপক-বিস্তৃতি সম্পর্কে বোঝা সহজতর হবে।

২৪শে এপ্রিল, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে থার্ড ক্যাভলরি ঘোড়সওয়ার সিপাহীরা প্যারেডে জমায়েত হয়ে কার্তুজ ছুঁতে অস্বীকার করল, মোট ৯০ জন সিপাহীর মধ্যে ৮৫ জন। সামরিক আইন অনুসারে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে তাদের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হলো। ৯ই মে দণ্ডিত সিপাহীদের আবার

আনা হয় প্যারেড গ্রাউণ্ডে। তাদের দণ্ডাদেশ পড়া হলো। তাদের সামরিক পোষাক খুলে নেওয়া হলো। হাতে পায়ে লোহার বেড়ী লাগিয়ে তাদের জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক কে-সাহেব তাঁর বিদ্রোহের ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। বিদ্রোহীদের করুণ অবস্থার প্রতি সাধারণ মানুষের সহানুভূতির কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, যেসব অনুগত সিপাহীরা ইংরেজের বিপদমূহূর্তেও বিশ্বস্ততার পরিচয় দিয়েছে; তাঁদের অনেকেই হাত নেড়ে, উচ্চস্বরে জেনারেলের কাছে ৮৫ জন সৈন্যের ক্ষমার জন্য আবেদন নিবেদন করেছে। কিন্তু তা যখন হলো না, তখন তারা হতভাগ্য সংগীদেরই সান্ত্বনা জানিয়েছে। এই ঘটনায়, "There was not a Sepoy who did not feel the rising indigation in his throat. But in presence of those loaded field-guns and those grooved rifles, and the glittering sabres of the Dragoons, there could not be a thought of striking."১০

আসল কথা। "পঁচাশি জন বীরবন্দী শহরবাসী নরনারীদের মন জয় করে নিয়েছে। সিপাইদের আন্দোলনের সঙ্গে জনসাধারণের প্রাণের যোগসূত্র স্থাপিত হয়ে গেল।"১১

সিপাইদের এই লাঞ্ছনার দৃশ্য দেখে ঘোড়সওয়ার বাহিনী এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, "at once prepared for a revolt from the English rule, and in order to rescue their comrades resolved to dare the worst extremity."১২

১০ই মে, ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ, সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা। মীরাটের বিশ নম্বর রেজিমেন্টের সিপাহীরা সশস্ত্র হয়ে বেরিয়ে পড়ে। বেপরোয়াভাবে গুলি চালায় ও অফিসারদের বাংলোতে আগুন ধরায়। ইংরেজ অফিসারেরা হত-চকিত হয়ে গেলেন বিদ্রোহী সিপাহীদের আচমকা আক্রমণের মুখে পড়ে। ঐ দিনই কর্ণেল ফিনিসকে হত্যা করার সংগে সংগে বিদ্রোহের অংগার ছড়িয়ে পড়ল ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিক্ষিপ্তভাবে। জেনারেল হিউটসনসহ সমস্ত ইংরাজ অফিসার সপরিবারে কোনোক্রমে পালালেন বটে—কিন্তু ঐ দিন রাতেই বিদ্রোহী সিপাহীরা ও মীরাটে থাকেনি। তারাও দিল্লীর অভিমুখে ধাবিত হলো। তারা লালকেল্লার মধ্য-অলিন্দে প্রবেশকরত বিদ্রোহদ্যোতির

বাহক হিসেবে। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করল; অধিগত সাফল্যের স্মারক হিসেবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, বিদ্রোহীদের সাফল্য এসেছিল কি না! সে উত্তর অবশ্যই ব্যর্থতার ইতিহাস।

তবুও এর পরিব্যাপ্তি ও উদ্দাম প্রকৃতি অস্বীকার করবার নয়। ১২ই মে ১৮৫৭। মীরাটের বিদ্রোহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে বেরিলী, মথুরা ও মুজফরনগর, সাহারানপুর, এটওয়া এবং আলিগড়ে। সেকেন্দ্রাবাদের সামরিক ব্যারাকে-ও প্রচণ্ড উত্তেজনা। ১৮মে থেকে ২৫শে মে ঘটনা বহুল কটি দিন। বিদ্রোহীরা মুজফরপুর থেকে মোরাবাদে ঘাঁটি স্থাপন করে। মোরাবাদের জেল থেকে বন্দী সিপাহীদের মুক্ত করে আনে। এরপর উত্তর প্রদেশের গাজি উদ্দীন নগরে (অধুনা গাজিয়াবাদ) সিপাহীরা ঘাঁটি স্থাপন করে। গাজি উদ্দীন নগরেই ইংরাজ বাহিনীর সংগে সিপাহীদের সম্মুখ লড়াই সুরু হয় ৩০.৫.১৮৫৭ তারিখে।

"গাজি উদ্দীন ক্যাম্প থেকে আর্মিহেড কোয়ারটারের মেজর জেনারেলকে লেখা ব্রিগেডিয়ার উইলসনের যেসব চিঠি পাওয়া গেছে তা থেকে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সিপাহী বিদ্রোহের যুদ্ধ ক্ষেত্র ছিল গাজি উদ্দীন নগর। মীরাট নয়।"১৩ উইলসনের প্রতিবেদন সমূহ থেকে এ-ও জানা যায় ইংরাজ সৈন্যরা গাজি উদ্দীন নগরের আশে পাশে কয়েকটি গ্রাম আগুন ধরিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কারণ ঐ সব গ্রামের অধিবাসীরা বিদ্রোহীদের নানাভাবে সাহায্য করত।১৪

কিন্তু যুদ্ধ যেখানেই কেন্দ্রীভূত হোক না কেন, ব্যারাকপুরের অস্থির অশান্ত তীব্র-তপ্ত সৈনিকদের ব্যারাক-যুদ্ধের যে উত্তরণ ঘটে দিল্লীর রাজপথে বাহাদুর শাহকে নিয়ে শোভাযাত্রর প্রাক্-মুহূর্তে; তা হলো ইতিহাসে মহাবিদ্রোহের পর্বান্তর, সন্দেহ নেই।

এক. বিদ্রোহের কারণ...

বিদ্রোহের পর্যালোচনা প্রসংগে এর কারণ সমূহ নিয়ে কিছু বলা যেতে পারে। সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল তার কারণ স্বরূপ ধর্মনৈতিকতার প্রশ্নটি অবশ্যই উত্থাপন করা যায়। শুধুমাত্র অজ্ঞতা কুসংস্কার জনিত কারণেই যে সিপাহীরা ধর্মবাঁচানোর চেষ্টা করেছিল; তা

নয়। তাদের ভীতির অনেক সংগত কারণছিল। বস্তুত; ইংরেজরা এদেশকে করতলগত করার পর থেকেই খ্রীস্টধর্মের প্রতি এদেশীয়দের সম্ভ্রম-দৃষ্টি আসুক এই মাত্র চায়নি; যাতে করে ব্যাপকভাবে দেশের মানুষ খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে এমন মনোভাব পোষণ করত, চেষ্টা চালাতো কূট-কৌশলে। একটি উদাহরণ। লেফ্‌টেনান্ট কর্নেল হুইলার ব্যারাকপুরের সিপাহী বাহিনীতে খ্রীস্ট ধর্ম প্রচার চালাতেন- প্রচারপত্র বিলি করতেন; সিপাহীদের বাঙলোতে গিয়ে তিনি খ্রীস্ট-ভজনায় প্রেরণা দিতেন। আরো আছে। মাদ্রাজের অনেক পদস্থ ইংরেজ, কর্মচারীদের পত্রাদি প্রেরণ করে বলতেন, যেহেতু সারাভারত একটি সরকারের প্রতি আত্মাধীন। টেলিগ্রাফ, রেলওয়ের মাধ্যমে সারাভারতের সংযোগস্থল এক ও অবিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, সেজন্য সারা ভারতের জন্য একটি সঠিক ধর্ম থাকা উচিত। আর তা হলো খ্রীস্ট ধর্ম।১৫

এই সব ধর্মবাগীশদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে ছিলেন স্যার টমাস মুনরো। এমনকি সেদিনের ইংরেজিদৈনিক ইংলিসম্যান পত্রিকায় এই সম্পর্কে কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। এতে ভারতীয়দের ক্ষোভের সমর্থন জানানো হয়েছে। একটি মন্তব্যের কিয়দংশ, !"It was no wonder therefore that the men should be in an excited state specially when such efforts at conversion are openly avowed, and that they would discover what they considered a plot to betray them into a loss of caste."১৬

সুতরাং ধর্মনাশ হতে পারে, সিপাহীদের এ আশংকা অমূলক ছিল না। ধর্মের প্রশ্নে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই গোড়া। তাদের মনে হয়েছে ধর্মরক্ষাই* স্বাধীনতা রক্ষা। তাই হায়দ্রাবাদের ব্রিগেডিয়ার ম্যাকেঞ্জিকে

---

*রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর 'আত্মশক্তি' প্রবন্ধে বলেছেন: "আমাদের দেশে কল্যাণ শক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।" দ্র, 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট, রবীন্দ্র রচনাবলী,

ক্রুদ্ধ জনতা বলেছিল, তাঁদের জীবন থেকে ধর্মই বড়ো। কিন্তু স্বার্থান্বেষী ইংরেজ এই বড়ো কথাটিকে কলুষ চোখে ছোটো করেই দেখেছিল। বিদ্রোহীদের কণ্ঠস্বরে ছিল তাই বহ্নি-দীপ্তি।

এখানে কার্তুজ কাহিনীকে১৭ হাল্কা করে দেখা ঠিক নয়। কেননা এতে ধর্মভীরু সিপাহীরা ধর্মচ্যুতির আশংকায় 'বিন্দুতে সিন্ধু' দেখেছিল। কাজেই একথা স্পষ্ট। এসব সিপাহীদের সংগে ইংরেজের মৌলিক বোঝাপড়া সম্ভব ছিল না।

ধর্মনৈতিকতার সূত্র থাকলে ও প্রাগুক্ত ধারাটিকে আমরা সামরিক ধারায় ফেলেছি। কারণ সমর কুশলীদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ক্ষোভ-রোষ সমর অস্ত্রের একটি কূট প্রশ্নকেই ঘিরে। এই ধারায় সিপাহীদের অসন্তোষের আরও কিছু কারণ তালিকাবদ্ধ করা যায়। যেমন ব্রিটিশ সৈনিকদের তুলনায় ভারতীয় সিপাহীদের বেতনের স্বল্পতা, বৈষম্যমূলক ব্যবহার, পদোন্নতির সুযোগের অভাব প্রভৃতি। এক্ষেত্রে জনৈক ইংরেজ অফিসারের বিনয়-বচনটি প্রণিধান-যোগ্য "ভারতের প্রত্যেকটি বিদ্রোহই, তা বাংলাদেশেই হোক বা অন্যত্র হোক, মূলত আমাদের তরফ থেকেই উৎপন্ন করা হয়েছিল: সচরাচর তাদের সঙ্গে যোগাযোগের দিক থেকে কিছু বিচ্যুতি ঘটেছিল, তাদের মনোভাব সমূহের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছিল, সিপাহীদের স্বাস্থ্যও অপরাপর সুযোগ সুবিধার প্রতি কোন নজর দেওয়া হয়নি, পক্ষান্তরে যেখানে ইউরোপীয় সৈন্যদের সকল বিষয়ের জন্যই পর্যাপ্ততম যত্ন নেওয়া হয়েছিল, এছাড়া তাদের ধর্মীয় মনোভাব ও সংস্কারগুলির প্রতি অবিজ্ঞজনোচিত আঘাত করা হয়েছিল, তাদের পাওনাগণ্ডা ও অধিকার সমূহের প্রতি অহেতুক হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল।"১৮

এর পর আমরা অসামরিক ধারাটির উল্লেখ করতে পারি। ডক্টর নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য বলেছেন, "ভারতীয় মহাবিদ্রোহের আসলে দুটি ধারা বে-সামরিক ও সামরিক, সামরিক ধারাটা হচ্ছে সিপাহী বিদ্রোহ বলে যাকে অভিহিত করা হয়, কিন্তু সেটাই সব নয়। অসামরিক জনগণের বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ, দুটি বিরাট ঘটনা পৃথক উৎস থেকে নির্গত হয়ে শেষ পর্যন্ত এক হয়ে গিয়েছিল।',১৯

এধারার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ সিপাহীদের বিদ্রোহ-মুখর করে তোলে। যেমন লর্ড ডালহৌসীর স্বত্ব বিলোপনীতিতে

সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝান্সী প্রভৃতির অধিগ্রহণ ; নানাসাহেবের ভাতা বন্ধ, অযোধ্যা অধিকার, নাগপুর ও অযোধ্যার রাজপ্রসাদ লুণ্ঠন প্রভৃতি কলুষ কর্ম। সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ভারতীয়দের স্থানছিল নিম্নে। ইংরেজ ভারতীয়দের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে ওঠেনি। ভাবের আদান প্রদান ছিল না। তাই উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও স্থাপিত হয়নি। বাঙলার একজন শিক্ষিত হিন্দু ইংরেজের বিরুদ্ধে এই বলে দোষারোপ করেছেন যে "a hundred years of unmitigated active tyranny unrelieved by any trait of generosity." এমনকি শতাব্দীর সংস্পর্শ ও "has not made the Hindu and Englishman friends or even peaceful fellow subjects"২০

মনের এই বিযুক্তি, বিচ্ছিন্নতার কারণেই ইংরেজসরকারের ইংরেজি শিক্ষা, রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রচলন, সতীদাহ দমন প্রভৃতি কল্যাণ মূলক কাজগুলিও পর্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে নিতে জনমানসের এত কুণ্ঠা ছিল। তাছাড়া যে অর্থনৈতিক শোষণ শ্বেত প্রশাসকগণ সুরু করেছিল শতবৎসর পূর্বে, তার অব্যাহতগতি দেশীয় শিল্পের ওপর ছিল প্রচণ্ড আঘাতস্বরূপ। তার ওপর বিদেশী পণ্যের আমদানির ফলে দেশজশিল্প ধ্বংস হচ্ছিল। এরফলেই "ভারতীয় অর্থনীতিতে...ইংলণ্ডের সামগ্রিক প্রভুত্ব সম্পূর্ণ হয় এবং সেই সঙ্গেই ফেটে পড়ে সারা ভারতের তীব্র অসন্তোষ। সর্বস্বান্ত হবার পথে ভারতের সর্ব শ্রেণী ও সর্ব-সম্প্রদায় এক নতুন একতার চেতনা লাভ করে—এই একতার চেতনাই ভারতের নবীন জাতীয়তা গঠনের প্রথম ধাপ।"২১.

দুই. বাঙলার সিপাহী বিদ্রোহ...

সিপাহী বিদ্রোহের সুরু ব্যারাকপুরের সামরিক ছাউনিতে কিন্তু ব্যারাক যুদ্ধ সহসা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল, সে কথা আগেই বলে এসেছি। কিন্তু যে বাঙলা থেকে বিদ্রোহ উদ্ভূত, সেই বাঙলার বিদ্রোহের স্থিতি ও ব্যাপ্তি ছিল ; সে কথা ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেননি। কিন্তু বর্তমান ঐতিহাসিকগণ এর বিরুদ্ধ-প্রমাণ উপস্থিত করেছেন। তা থেকে বোঝা সম্ভব, সমগ্র বাংলাদেশে সিপাহী বিদ্রোহের আশ্চর্য দীপ্তি ছিল।

অবশ্য বিদ্রোহ সূত্রগুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায় ইংরেজ সরকারের পীড়ন দমনে। বাংলায় সিপাহী বিদ্রোহের কয়েকটি খণ্ড চিত্র এখানে দেওয়া গেল।

১. বীরভূম জেলার রজন শেখ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে জনসমাজকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করে ছিলেন। আবার করিমখাঁ নামক জনৈক ব্যক্তি বিদ্রোহের চেষ্টা করেছিলেন ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এই অপরাধে তাঁর ফাঁসি হয়। বর্ধমানে কোনো সংগঠিত সামরিক বিদ্রোহ না হলেও সেখানে বিদ্রোহ প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। মেদিনীপুর জেলার বৃন্দাবন তেওয়ারি নামে এক ব্রাহ্মণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হয়েছিলেন। তাঁর-ও ফাঁসি হয়। এই জেলার মীর জাদু ও শেখ জমিরুদ্দিন নামক দু'জন বিদ্রোহীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। বিদ্রোহীদের উত্তেজনার কাজে বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার রাজ পরিবারের অনেকেরই সন্দেহজনক ভূমিকা ছিল।২২ বাঁকুড়া জেলার সাঁওতাল ও চোয়াড়দের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা লিখেছেন জেলা গেজেটীয়ার প্রণেতা ও' ম্যালি সাহেব।২৩ মালদহ জেলার চুমনসিং নামে নামে এক ব্যক্তি বিদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। জলপাইগুড়ি জেলার বিদ্রোহী সিপাহীদের সংগে যোগ দিয়েছিলেন একজন ক্ষুদ্ররাজা ও তাঁর হৃশত ভুটিয়া অনুগামী। ঢাকা থেকে সিপাহীরা ভুটানে প্রবেশ করলে ভুটানের রাজা-ও বিদ্রোহীদের সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে ছিলেন। হরুকসিং (হাতিয়ারারাজ কথিত) বিদ্রোহীদের সবরকম সাহায্য করেছিলেন।২৪

হুগলী জেলার সবকারী জেল ডাক্তার কুবের চন্দ্র রায় বিদ্রোহী সিপাহীদের সমর্থন করেছিলেন।২৫ তিনি ও দ্রোহাত্মক মনোভাব দেখিয়েছিলেন।

স্যার এফ. জি. হ্যালিডে তাঁর বিদ্রোহকালীন 'মিনিট'-এ ৩০.৯.১৮৫৮ তারিখে লিখেছেন ঃ ইউরোপীয় সৈন্য সমাবেশ করে নদীয়া বহরমপুরের দেশীয় বাহিনীর বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়েছে বটে তবে এই মুহূর্তে একটি অস্বাভাবিক, অস্বস্তিকর পরিবেশ লক্ষিত হবে কৃষ্ণনগর, যশোহর এবং নদীয়ার সমগ্র বিভাগটিতেই।২৬

২. পূর্ববঙ্গের অনেক অঞ্চলের মুসলমানেরা বিদ্রোহী সিপাহীদের নানা-প্রকারের সাহায্য করেছিলেন এমন জনশ্রুতি আছে। যশোহরের ঝিকর-গাছির মহম্মদ আলি নামে একজন পুলিশ জমাদার এক ধর্মের ফতোয়া

জারী করে প্রচার করেন যে, 'শেষ বিচারের দিন (কেয়ামতের দিন) আসছে।'২৭ ঐ জেলার পৈরাগখোর ইংরেজ সরকারে বিরুদ্ধাচরণ করার অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

ফরিদপুর জেলার ফরাজীদের আন্দোলন চলছিলই। সিপাহী বিদ্রোহের জ্বলন্ত অগ্নিতে তারা সমিধ্ সংগ্রহ করল। ফরাজী নায়ক আবদুল শোভান ও রিয়াসৎ আলি ব্রিটিশ বিরোধী কার্য কলাপে নেতৃত্ব দিলেন। দুদুমিঞা তখনও বেঁচে। নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্ত তাঁকে রাজবন্দী হিসেবে আলিপুরজেলে আনা হয়।

৩. ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর চট্টগ্রামে বিদ্রোহ সুরু হয়। চট্টগ্রামের ৩৪ নং রেজিমেন্ট ক্ষিপ্ত হয়ে কোষাগার লুণ্ঠন করে ত্রিপুরার রাজধানী আগর তলার অভিমুখে ধাবিত হয়। ত্রিপুরাধিপতি ঈশান চন্দ্র এই সংবাদ জ্ঞাত হয়ে বিদ্রোহী সিপাহীদের গ্রেপ্তারের আদেশ জারী করেছিলেন।২৮ কিন্তু রাজআদেশ অবজ্ঞা করে ত্রিপুরায় যারা বিদ্রোহ সংগঠনের চেষ্টা করছিল তাদের কয়েকজন ধরা পড়ে। রাজা তাদের কুমিল্লার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন।২৯ তবুও সে বিদ্রোহ থেমেগেল না। উত্তাপ রইলো বটে, তবে আগুন তদনুযায়ী নয়।

৪. নোয়াখালিতে চট্টগ্রামের বিদ্রোহ খবর পৌঁছনোর সংগে সংগে সেখানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। এই বিদ্রোহ দমনে ভুলুয়ার রাজাদ্বয় প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ ২০০০ সশস্ত্র লোক পাঠালেন ম্যাজিস্ট্রেট সাইমনের সাহায্যে। সাইমন তদগত চিত্তে লিখেছিলেন, ভুলুয়ার রাজারা বিদ্রোহ দমনের নিমিত্তে সশস্ত্র লোক পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া তাঁদের শক্ত দেওয়াল ঘেরা পাকা কাছারি বাড়িটি ইংরেজের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন; সেটিই আমাদের দুর্গ হলো।৩০

৫. আসাম বিভাগের জোড়হাটের রাজা কন্দর্প সিংহ সিপাহীদের সংগে জড়িত ছিলেন। রাজাকে উত্তেজিত করেন তাঁর দেওয়ান মণিরাম দত্ত। রাজার বাড়ী খানাতল্লাসী করে মণিরাম দত্তের ষড়যন্ত্রমূলক চিঠিপত্র পেয়েছেন ইংরাজ প্রশাসন বিভাগ। মণিরাম কলিকাতায় থাকতেন। তিনি ছাতু-বাবুর বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার হন। মণিরামের প্রচেষ্টায় মধুমল্লিক নামে একজন রাজাকে বিদ্রোহীদের সংগে সংযোগ রাখতে প্ররোচিত করতেন।

রাজার সাক্ষ্যে সেসব জানা যায়। এরজন্য মণিরামের ফাঁসি হয়। মধুমল্লিকের দ্বীপান্তর।৩০ক.

৩. সিপাহী বিদ্রোহের বাংলা ইতিহাস...

এক...সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস...

সিপাহী বিদ্রোহের বিশ বছর পরে মহাবিদ্রোহের ওপর বাংলা ইতিহাস প্রকাশিত হয় (১৮৭৭)। লেখক হলেন রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০) বলাযেতে পারে, লেখকের বাল্যকালে সিপাহী বিদ্রোহ যে বিস্ময়বোধের পরিমণ্ডলটি সৃষ্টি করেছিল, যৌবনে তাই-ই লেখক মানসে ভাববিপ্লব উপস্থিত করেছিল। এক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টি স্বচ্ছ। জাতীয়তাবাদী ও দেশ প্রেমিকতার মুক্ত বুদ্ধিতে তিনি চালিত। কিন্তু তাঁর দেশ প্রচারণা ও আবেগ সংযত, পরিমাপিত। কূটকৌশলে তিনি পরিচালিত। তাই তাঁর ইতিহাসে 'সিপাহী বিদ্রোহ' কথাটি অন্তরিত, তদর্থে 'সিপাহিযুদ্ধ'* কথাটি অনুশীলিত। অর্থাৎ 'বিদ্রোহ' করেছিল সিপাহীরা, 'যুদ্ধ' করেছিল ইংরেজরা—যুদ্ধে তাদের জয় হলো। রাজার পক্ষে পরাজয় মানা সম্ভবও নয়।

এতে তাঁর দুটি লাভ হয়েছিল। ১. বইটি ইংরেজের জাত ক্রোধ সৃষ্টি করেনি। ফলত, বইটি বাজেয়াপ্ত হয়নি। ২. পরবর্তীকালে গ্রন্থাগারে অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য বইটি বিবেচিত ও অনুমোদিত হয়েছিল।৩১.

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস—গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে রজনীকান্ত গুপ্ত জানিয়েছেন; "কোন কোন বৈদেশিকের হস্তে ভারতীয় ঐতিহাসিকচিত্র স্থল বিশেষে অতিরঞ্জিত বা অরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান গ্রন্থে তাদৃশ বৈষম্য পরিহার করিতে যথাশক্তি যত্ন করিয়াছি। গ্রন্থে যে যে বিষয়ের প্রবর্ত্তনা করা গিয়াছে, তৎসমুদয় ন্যায়, সত্য ও উদারতার সম্মান রক্ষা করিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে।"৩২

---

* রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' সমাপ্ত করেছেন মোট ৫টি খণ্ডে। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে। তাতেও লেখকের প্রদত্ত বানান ছিল 'সিপাহি'। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়; তাতে বানান ছিল 'সিপাহী'। এর পরের খণ্ডগুলিতে এই বানানই দেখা যায়।

তিনি প্রথম খণ্ডে এই বিদ্রোহের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন;
"ডালহৌসীর রাজ্যগ্রহণ—প্রণালীতেই দূরদর্শিব্যক্তিগণের হৃদয় এইরূপ ক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। ডালহৌসীর অহম্মুখতা, ডালহৌসীর অনাশ্রবতা, ইহার উপর সমবেদনার অভাবই ভারতীয় ক্ষেত্রে এইরূপ শোচনীয় রাজনীতির কার্য্য প্রণালী প্রবর্ত্তিত করে।"৩৩

রজনীকান্ত অন্তরের সংগে সিপাহীবিদ্রোহ যে সমর্থন করেননি, তার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। তিনি তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে লিখেছেন: "যদি তাহারা...নির্দ্দিষ্ট নিয়মে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের জন্য ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত, তাহাহইলে তাহারা, একদিনে সকলে সকলস্থান মুক্ত উদ্যত হউক, আর নাই হউক, আপনাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বোধ হয় অসমর্থ হইত না। সৌভাগ্য বশতঃ এরূপ একীকৃত মন্ত্রণায় পরিচালিত ও একবিধ লক্ষ্যসাধনে নিয়োজিত সর্ব্বব্যাপী সৈনিক দলের আবির্ভাব হয় নাই।"৩৪ এই 'সৌভাগ্য বশতঃ' শব্দটির মধ্যে তাঁর অন্তরাবেগ কষ্ট কল্পনা নয়। অথচ তিনি সিপাহীদের আন্তরিকতা-ও আত্মত্যাগের প্রতি সন্দেহ পোষণ না করেই তাঁর গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে লিখেছেন—:"উত্তেজিত সিপাহীদের মধ্যে এইরূপ সাহস ও বীরত্ব সম্পন্ন যোদ্ধার অভাব ছিল না। ইহারা স্বাধীনতার জন্য আত্মপ্রাণ উৎসর্গ করিতেও বিমুখ হয় নাই।"৩৫

রজনীকান্ত সিপাহীযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ, ঘটনার সমাবেশ ঘটিয়েছেন চতুর্থ ও পঞ্চমখণ্ডে। চতুর্থ খণ্ডে পাঞ্জাব, দিল্লী, পেশোয়ারের ঘটনাবলী, বিহারের কুমারসিংহ ও অমরসিংহের বীরত্বপূর্ণ অভিযান প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বাঙালীর ইংরেজপ্রীতি বড়ো করে দেখানো হয়েছে।
পঞ্চম বা শেষখণ্ডে তাতিয়াতোপী ও ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম কাহিনী; যুদ্ধের অবসান পর্যন্ত পটভূমি; মহারাণীর মহাঘোষণা প্রভৃতি তথ্য বিবৃতি দিয়ে তিনি গ্রন্থের শেষ করেছেন।

দুই...সিপাহীবিদ্রোহ বা মিউটিনী...

রজনীকান্ত গুপ্তের পর সিপাহী বিদ্রোহের ওপর আরও একটি বৃহৎ উপন্যাস ১৩০৪ সালে প্রকাশিত হয়। এটির রচয়িতা ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এর উদ্‌যোক্তা-প্রকাশক ছিলেন উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশকের মতে এই যুদ্ধ অনর্থছিল, কারণ রাজা-প্রজা কিংবা ভৃত্য প্রভুর যুদ্ধ অসমান যুদ্ধ, তেমনি সিপাহী যুদ্ধ ও একটি। তাঁর মতে "ইংরাজেরা এদেশের হিন্দু মুসলমানকে বল পূর্ব্বক খ্রীস্টান করিয়া তাহাদের জাতি নাশ করিবেন, এইরূপ অমূলক জনরবে অবোধ লোকদিগের চিত্ত বিচলিত হইয়াছিল। অনেক জনরব অমূলক, তথাপি কুচক্রকারী লোকদিগের নানারূপ উত্তেজনায় অনেক বায় প্রত্যয়ী অশিক্ষিত সিপাহী ভ্রান্তিবশে রাজ বিদ্রোহে মাতিয়া উঠিয়াছিল।"৩৬

প্রকাশকের বক্তব্য ভুবনচন্দ্রের মতের পরিপোষক। ভুবনচন্দ্র ও এরূপ লিখেছেন,—"তাহাদের (সিপাহীদের) অসন্তোষ অপেক্ষা আশঙ্কা অধিক ইহাই অবধারিত। তাহারা ভাবিল, তাহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন, জীবন অপেক্ষা যাহা যাহা প্রিয়তর, তাহাও সঙ্কটাপন্ন ; যাহারা এই সঙ্কটের উৎপাদন করিয়াছে, তাহাদের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে পরিত্রাণের অন্যপন্থা নাই।"৩৭

এই গ্রন্থে সিপাহীদের বিদ্রোহ তৎপরতা ও নিষ্ঠুরতা : ইংরেজদের নৃশংস অত্যাচার সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন ভুবনচন্দ্র। তাঁর রচনার মধ্যে দেশভাবনা দুর্লক্ষ্য নয়। ইংরেজরা সিপাহীদের প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার করেছে, তার বিবরণ দিতে তিনি যেমন বিষণ্ণ বোধ করেছেন, তেমনি বিহারের কুমার সিংহের বীরত্ব পূর্ণ অভিযান বর্ণনা প্রসংগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। আবার নানাসাহেব ও লক্ষ্মীবাঈ-এর প্রতি ইংরেজরা যে নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন তা তিনি সমর্থন করতে পারেননি। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি তাঁর সহৃদয়তাও সহানুভূতি অগোচর থাকে নি। কিন্তু বিদ্রোহী সিপাহী ও বিদ্রোহী নায়কদের সম্পর্কে তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ও ছিল তার প্রমাণ মেলে উপসংহারে তাঁর স্বচ্ছ-বক্তব্য থেকেই। "দিল্লী তক্তের মোগল-গৌরবের বিলোপ, নানাসাহেবের পলায়ন, ঝাঁসীর রাণীর লীলা-সংবরণ, মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁতীয়াতোপীর ফাঁসী, অপরাপর বিদ্রোহী সর্দ্দারগণের সমুচিত দণ্ড প্রাপ্তি ; বিদ্রোহী সিপাহী ও অন্যান্য লুণ্ঠনকারী বদমোসগণের বহুলোক মরিল, কতক কতক পলাইল, কতক কতক লুকাইল, কতক কতক বনবাসী হইল, কতক কতক আনুগত্য স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রাপ্ত হইল, সকললোকের শঙ্কা ঘুচিল। জগদীশ্বর প্রসন্ন হইয়া ভারতে শান্তি সলিল বর্ষণ করিলেন।"৩৮

তিন...সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস...

"আমি সাধ করিয়াই সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিব বলিয়া এই গুরুতর কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি।" এ-কথা বলেছিলেন সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ইচ্ছা ছিল সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস তিনখণ্ডে প্রকাশ করার। কিন্তু তিনি মাত্র একটি খণ্ড প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। 'হিতবাদী' পত্রিকার উদ্যোগে নীরদবরণ দাস কর্তৃক ১৩১৬ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় তাঁর 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড। কিন্তু সত্য কথনের জ্বালা অনেক স্পষ্ট বলার ঝুঁকি-ও বড় কম নয়। এর জন্য ইংরেজের রোষ দৃষ্টি থেকে তিনি নিষ্কৃতি পাননি, বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তাঁর অমূল্য গ্রন্থখানি।৩৯

লেখক তাঁর গ্রন্থে সিপাহী শব্দের নামায়ন, উৎসার প্রসার সম্পর্কে সবিস্তারে লিখেছেন। সিপাহীদের ক্ষোভ, রোষ, সিপাহীদের আচরণ-বিচরণ সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তবে সিপাহীদের জন্য তাঁর বেদনা-ও ধ্বনিত হয়েছে। তাদের সাহসিক অগ্রগমন, বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে তিনি আনন্দ বোধ করেছেন। তাদের পরিণামের কথায় দুঃখ বোধ করেছেন। তিনি বলেছেন উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবই তাদের ব্যর্থতার কারণ। তাই হতাশার সংগে বলেছেন, কুমার সিংহ বা তাঁতীয়া তোপীর মত-ও ব্যক্তি যদি দিল্লীতে যেতেন, বিদ্রোহের পরিণাম স্বতন্ত্র হতো। তিনি আর-ও বলেছেন, "দেশকাল ও পাত্র সিপাহী যুদ্ধের অনুকূলে ছিল।" এই কথাকটির মধ্যে সেদিনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার চিত্রটি অনাভাসিত নয়।

লেখকের মর্মান্তিক উপলব্ধি-সম্মত একটি মন্তব্য হলো এই,—"১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ ভারতবর্ষের ভাগ্যের মহামুহূর্ত্ত মনে করিয়া ভারতবাসী পরিবর্ত্তনের অন্বেষতার মধ্যে সকল জ্বালা জুড়াইবার উদ্দেশ্যে সিপাহীযুদ্ধের দাবদাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা বিধাতার প্রেরণাও বলিতে হইবে, জাতির কর্ম্মফল-ও বলিতে হইবে।"৪০

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহীযুদ্ধের কয়েকটি কারণের প্রতি ইংগিত করেছেন।

১। ইংরেজের ভূমিসংক্রান্ত বন্দোবস্ত। তিনি বলেছেন "ভূমি সংক্রান্ত আইন প্রভাবে সর্ব্বস্বহীন পুরাতন অভিজাত বর্গ পর্যাপ্ত ইহন বানাইয়াছিলেন।"৪১

২। সিপাহীদের বেতনবৃদ্ধিমূলক অসন্তোষ। ডালহৌসীর সেনাপতি চার্লস

নেপীয়ার বুঝেছিলেন : "সিপাহীগণ অসন্তুষ্ট ও উত্তেজিত হইয়াছে, তাহাদিগের বেতন বৃদ্ধিমূলক এবং অপরাপর কয়েকটি প্রার্থনায় গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত না করায় সিপাহীরা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উচ্ছেদ কামনা করিতেছে, তাহারা কেবল সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছে।"৪২

৩। রেলটেলিগ্রাফের বিস্তার, বিদেশীদের অত্যধিক প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতির কারণ সিপাহীযুদ্ধের মূলে রয়েছে।

এক্ষেত্রে তাঁর সমগ্র দৃষ্টি যে দিকে নিবদ্ধ হয়েছে তা হলো এই : "ভারতের হিন্দু মুসলমান জাতিগত, দেশগত, সম্প্রদায়গত বিদ্বেষ-বৈষম্য লইয়া এতদিন ইংরাজের অভ্যুত্থান লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু লর্ড ডালহৌসীর শাসনকালে যখন কুমারিকা হইতে হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষকে তাঁহারা এক শাসন শৃঙ্খলায় সংবদ্ধ দেখিলেন, তখনই ভারতবাসী হিন্দু মুসলমান প্রবঞ্চিতের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া নষ্ট সামগ্রী উদ্ধারের জন্য শেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন "৪৩

বলাবাহুল্য, সিপাহীদের আবেগ-বিদ্রোহ সফল হয়নি। তাই লেখক একে বলেছেন 'বিয়োগান্ত নাটক।'

৪. শতবর্ষের আলোয় সিপাহী বিদ্রোহের বাংলা ইতিহাস· ·

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতে মহাবিদ্রোহকে নিয়ে আলোড়ন সুরু হয়। মূল্যায়ন করতে বসলেন পণ্ডিতগণ,—শতেক বর্ষের মূল্যায়ন। বলাবাহুল্য বিতর্ক হলো অনেক। আলোচনার ধারা সূত্র, ধারাভাষ্য হলো বটে, কিন্তু স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কেউ বলেছেন একে ভারতের প্রথম জাতীয় বিদ্রোহ। কেউ-বা বলেছেন এ-তো ছিল স[illegible] পুন-প্রবর্তনের চেষ্টা। আলোচনার ক্ষেত্রে অসমর্থন ও সমর্থনের প্রশ্নে দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়েছেন ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীগণ।

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার স্বীকার করেননি, এটা স্বাধীনতার যুদ্ধ কিংবা জাতীয় অভ্যুত্থান। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন অবশ্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু ডক্টর শশিভূষণ চৌধুরী, ডক্টর সুশোভন সরকার, বিনায়ক দামোদর সাভারকার প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টত-ই বলেছেন ১৮৫৭-এর অভ্যুত্থান ছিল

জাতীয় অভ্যুত্থান, স্বাধীনতার যুদ্ধ। এখানে বলা ভালো কেউ স্বীকার করুন আর নাই করুন লর্ড ক্যানিং কিন্তু এই মহাবিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয় করেছেন যথার্থভাবে। তিনি একপত্রে ৮.৮ .৮৫৯ তারিখে চার্লস উডকে লিখেছিলেন : "The struggle which we have had has been more like a national war than local insurrection"৪৪

যাইহোক, শতবর্ষের আলোকে মহাবিদ্রোহের উপর যে ক'টি বাংলা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তা মূলত ইতিহাস গ্রন্থ এবং এসবে দ্বিতীয় ধারাটির গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা সংক্ষেপে গ্রন্থগুলির পরিচয় নেবো।

॥ ১ ॥

'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ ১৮৫৭' নামে একটি অনন্য গ্রন্থ রচনা করেছেন প্রমোদ সেনগুপ্ত। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৭-তে। লেখক এই জাতীয় গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্তর-নিবদ্ধ ভাবটা প্রকাশ করলেন যে, "ভাবালুতার বশবর্তী" না হয়ে এবং "ঐতিহাসিক তথ্যকে ক্ষুন্ন বা বিকৃত না করে, উপরন্তু তথ্য প্রমাণের দ্বারা ১৮৫৭-৫৯ সালের মহাবিদ্রোহ যে স্বাধীনতা প্রয়াসী ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রথম জাতীয় অভ্যুত্থান, এটা দেখানোই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইংরেজ লেখকের' তাঁদের লেখাতে যে সমস্ত তথ্যপরিবেশন করেছেন, তাতেই নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয় যে, এই বিদ্রোহ একটা ভারতীয় জাতীয় বিদ্রোহই ছিল এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য একটা ব্যাপকগণ-অভ্যুত্থান ও বটে।"৪৫

তিনি রমেশ মজুমদারকে তীব্র আক্রমণ করে বলেছেন এই বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ, স্বাধীনতা এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা অনায়াস লক্ষ্য। তিনি দৃঢ় কণ্ঠেই ঘোষণা করেছেন "সিপাহী বিদ্রোহ' ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনকে সমূলে ভারত থেকে উৎখাত করা। এখানে আপসের কোনো পথ-ও নেই ; হয় জয়ী হতে হবে, নতুবা মৃত্যু অনিবার্য। ১৮৫৭-৫৮ সালে বিদ্রোহীরা যে সাহস, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়েছিল তা শুধু অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক আন্দোলন গুলিতেই দেখা যায়। কিন্তু নীল আন্দোলনের গুরুত্ব

কে অস্বীকার না করেও, এবং তার বৈপ্লবিক দিকটাকে উপেক্ষা না করেও, এটা বলা চলে যে নীল আন্দোলন ছিল বিদেশী ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়ে আইন সঙ্গত উপায়ে একটা সংস্কার আন্দোলন; ইংরেজ শাসনকে ধ্বংস করার আন্দোলন তা নয়।"৪৬

॥ ২ ॥

১৯৫৭তে 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এর লেখক হলেন মণিবাগচি। বিদ্রোহ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা হলো এই; "বৈদেশিক শাসন পাশ ছিন্ন করবার একটা দুরন্ত প্রচেষ্টা এই বিদ্রোহ—এতে কোনো ভুল নেই। এই স্মরণীয় বিদ্রোহ-ই সে দিন একটা উজ্জল ও মহৎসম্ভাবনাপূর্ণ যুগান্তরের মুখে আমাদের এনে দিয়েছিল। কাজেই এ-বিদ্রোহ ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের বিষয় এবং এতে ত'ারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, পরাজয়ের গ্লানি সত্ত্বেও তাঁদের বীরত্ব এবং আত্মোৎসর্গ ভারতের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য। শতাব্দীর প্রান্তে দাঁড়িয়ে যে সংগ্রাম ও সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে জাতি তার সশ্রদ্ধ সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করবে আর চিরদিন স্মরণ করবে শৃঙ্খল মোচনের জন্য তাদের সেই সর্বস্বপণ আত্মদান।"৪৭

ত'ার শ্রদ্ধ-গম্ভীর বক্তব্যটি গ্রন্থের শেষ কটি পংক্তিতে ঝরে পড়ে; "পলাশির প্রান্তরে ক্লাইভের শাঠ্য ও ষড়যন্ত্রের ভেতর দিয়ে একদিন ইংরেজ বণিক কোম্পানী যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল শতবর্ষের মধ্যেই সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি উঠল টলে।... পলাশির প্রতিশোধ নিল ভারতবাসী মিরাট-দিল্লী কানপুর লক্ষ্ণৌ-ঝাঁসীতে। রক্তের স্বাক্ষরে বিদ্রোহীরা রচনা করে গেল ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। ব্যর্থ হলেও অগ্নিক্ষরা সে ইতিহাস গৌরবেরই ইতিহাস।

আর সেই ইতিহাসে য'ারা অংশ গ্রহণ করেছিলেন—সেই মঙ্গল পাণ্ডে, কুমারসিংহ, অমরসিংহ, নানা সাহেব, ত'াতিয়াতোপি, মৌলবী আহমদউল্লা রাণীলক্ষ্মীবাঈ, হজরৎমহল, বাহাদুর শাহ—তাঁরা সকলেই ভারতবাসীর গর্ব এবং গৌরবের পাত্র।"৪৮

॥ ৩ ॥

মহাবিদ্রোহের উপর সাম্প্রতিক গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুকুমার মিত্রের '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতে মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। তিনি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যে তত্ত্বটি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন তা হলো "উত্তর ও উত্তর পূর্ব ভারতে মহাবিদ্রোহ এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত মধ্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ভিন্ন পরিবেশে এবং ভিন্ন অবস্থায় বিদেশী শাসকদের অত্যাচার ও শোষণের ফলে একদিকে জ্বলে ওঠে মহাবিদ্রোহের আগুন, আর একদিকে শুরু হয় নিয়ম তান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন—যে আন্দোলন ক্রমেই সশস্ত্র বিদ্রোহের দিকে অগ্রসর হয়েছিল।"৪১

॥ ৪ ॥

মহাবিদ্রোহের প্রসংগ নিয়ে পূর্ববাংলা অধুনা বাংলাদেশ থেকে একটি গ্রন্থ ১৯৫৭তেই প্রকাশিত হয়েছে। নাম, 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'। লেখক সত্যেন সেন। ভারতে-ও এর একটি সংস্করণ ১৯৭১-তে বের হয়। বিপ্লবী লেখক সত্যেন সেনের 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী'তে বীর শহীদদের অমর গাথা ধ্বনিত হয়েছে। এতে টুকরো টুকরো কাহিনীর সমাহার। যেমন মীরাটের বিদ্রোহ, আবার দিল্লীতে ঈদ উৎসব প্রভৃতি কাহিনী এবং আজিমুল্লাহ খাঁ, শহীদ মঙ্গল পাণ্ডে, কুমার সিংহ, ঝান্সীর রাণী, তাঁতিয়াটোপী প্রভৃতি বীর যোদ্ধাদের অমর কথন এতে বিধৃত। গল্পের সরস ভংগিতে লেখা এসব কাহিনী। অথচ ইতিহাসের অনন্ত ইংগিত আশ্চর্যভাবে সংবদ্ধ এবং গভীর তার রসমূল্য।

খ. সাহিত্য পর্ব

সিপাহী বিদ্রোহের রক্তাভাস বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে আছে। সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে যে রাজনৈতিক পর্বান্তর সুরু হয় তার একটি বৈশিষ্ট্য হলো বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংশয়। সেই সংশয় তাঁদের সাহিত্য কর্মে-ও লক্ষিত হবে।

কিন্তু একথা ঠিক নয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে'র দীপ্তোজ্বল বাঙলা সাহিত্যের অজস্র সম্পদের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের 'উল্লেখ' কিংবা প্রত্যক্ষ, প্রভাব' প্রমাণ দুর্লভ। বা সিপাহী বিদ্রোহের কোনো প্রভাব সমসাময়িক সাহিত্যে পড়েনি। অথচ বাঙলা দেশের নীল আন্দোলন ধ্বনিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়, দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নীল দর্পণে'৫০।

এখানে এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে বলা যায়, বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা যে সংশয় দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের সময়, নীল বিদ্রোহের সময় তার অনেকটাই কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন তাঁরা। সিপাহী বিদ্রোহের সময় বাঙালীদের আড়ষ্টতা, ঔদাসীনতা লক্ষ করা গেছে, এ সবই তাঁদের পরবর্তী সময়ে তীব্র দাহের সৃষ্টি হয়। এরই ফলে নীল বিদ্রোহের সময় তাঁদের বিপ্লবমুখীন ঝোঁক লক্ষ করা গেছে। কিন্তু তাঁদের ভূমিকা সর্বাত্মক ছিল না। অবশ্য এসময় থেকেই ঔপনেবেশিক চরিত্রের বিরুদ্ধ ধারণার সৃষ্টি যথার্থ-ই হয়েছে। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে যতই সিপাহীদের দ্বারা সংগঠিত হোক না কেন, সামন্ত শ্রেণীর ক্ষোভ-রোষ সঞ্জাত হোক না কেন, তাতে জনচেতনার ব্যাপকতা না থাক, একটি কথা অবশ্যই স্বীকার্য "The revolution of 1857 was not a battle against ideas, but against men".৫১ নীল বিদ্রোহের সংগে সিপাহী বিদ্রোহের এইটা-ই স্বচ্ছ পার্থক্য।

যাইহোক, বাঙালা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে সিপাহী বিদ্রোহের বৃহত্তর পটভূমিকার যোগ ছিল কতটুকু তা দেখতে হবে।

এক. সিপাহী বিদ্রোহ ও ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা

ঈশ্বর গুপ্ত সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেন নি। ইংরেজ শাসনের প্রতি তাঁর অবিচল সমর্থন অপ্রকাশিত থাকেন নি। তাঁর 'শিখ যুদ্ধে ইংরেজের জয়' 'দিল্লীর যুদ্ধ', 'কাবুলের যুদ্ধ' 'ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম' ও 'যুদ্ধ শান্তি' প্রভৃতি বর্ণনায় ইংরেজের প্রতি তাঁর অচলাভক্তি নিষ্ঠার পরিচয় বহন করে। সিপাহীদের প্রতি তাঁর অবনীত ক্রোধ ঃ

পামর পাতকী পাষণ্ড যত।
পাপের ঘটনা করিতে কত॥
অদোষে হইয়া কুপথে রত।
রমণী বালক করিছে হত॥
শুনিয়া বধির হইতেছে কানে।
সহেনা সহেনা সহেনা প্রাণে॥

অথবা,

ভক্তিহীন জ্ঞানহীন চিরাধীন যারা।
মেরে লাফ কোরে পাপ দেয় তাপ তারা।
আজ্ঞাচারী রক্ষাকারী অস্ত্রধারী যত।
একেবারে এপ্রকারে পাপাচারে রত॥
নরে পশু হবে বধু করে অসু নষ্ট।
হত রব কত কব কত সব কষ্ট॥
কি বিশাল সেনাপাল বামা-বাল নাশে।
অকারণে ক্রোধ মনে প্রভুগণে শাসে॥

বিদ্রোহী নেতাদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা কিছু কিঞ্চিৎ ছিল না। তাঁদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। তাঁতিয়াটোপীর সম্বন্ধে তাঁর রূঢ়-মন্তব্য :

এই ভারত কিসে রক্ষা হবে, ভেব না মা, সে ভেব না।
সেই তাঁতিয়াটোপির মাথা, আমরা ধরে দেব নানা॥

আরেকটি।

সেটাতো পুষ্টি এঁড়ে,
সেটাতো পুষ্টি এঁড়ে দস্তি ভেড়ে নস্তি কর তারে।

অথবা এইটি। কবির তির্যক পরিহাস—

নানা পাপে পটু নানা কথা শুনে না, না।
অধর্মের অন্ধকারে হইয়াছে কানা॥
ভাগ-দোষে ভাল ভুমি ঘটালে প্রমাদ।
আগেতে দেখেছ ঘুঘু শেষে দেখ ফাঁদ॥

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে আরো অসংযত ভাষায় তিনি গালি দেন। রাণীর সম্পর্কে তাঁর কটু-কাটব্য:

হাদে কি শুনি বাণী, ঝাঁসির রাণী
ঠোঁট কাটা কাকী॥
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে সাজিয়াছে নাকি?
নানা তার ঘরের ঢেঁকি,
নানা তার ঘরের ঢেঁকি, মাগী খেঁকী,
গোয়ালের দলে।
এতদিনে ধনে জনে যাবে রসাতলে।

আবার সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হওয়াতে কবির অভিনন্দন;

ধন্য লর্ড গভর্ণর ধন্য চীপ কমেণ্ডর,
ধন্য ধন্য ধন্য সেনাপতি।
ধন্য ধন্য সৈন্য সব ধন্য ধন্য ধন্য রব
ধন্য ধন্য ব্রিটিসের পতি॥

অন্যত্র,

ব্রিটিসের জয় জয় বল সবে ভাইরে।
এসো সবে নেচে কুঁদে বিভুগুণ গাইরে॥৫২

ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ৭.৩. ১২৬৩ তারিখে একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন; সেটি কবিতায়।৫৩ এতে ইংরেজের জয়গান করা হয়েছে। বিদ্রোহী সিপাহীদের বিদ্রোহ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এর কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো।

করি এই নিবেদন, দীন দয়াময়।
বাঞ্ছাফল পূর্ণকর, হবে বাঞ্ছাময়॥

চিরকাল হয় যেন, ব্রিটিসের জয়।
ব্রিটিসের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয়॥
এমন সুখের রাজ্য, আর নাকি হয়।
শাস্ত্রমতে এই রাজ্য, রাম রাজ্য কয়॥

ইংরেজ শাসকদের জন্য কবির পরম আকুতি সমর্পিত হয়েছে পরমেশ্বরের নিকট। তিনি বলেন ;

হে নাথ করুণাময়, নিবেদন তাই।
তব পদে ইংরাজের, জয় ভিক্ষা চাই॥
এই ভাবে রক্ষা কর, এই অধিকার।
ভারতে বিভ্রাট যেন, নাহি ঘটে আর॥

বিদ্রোহীদের প্রতি কবির আবেদন। তাদের প্রতি তাঁর পরামর্শ-ও বটে ;—

এদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন যিনি।
তোমাদের মন্দকারী কভু নন তিনি॥
কর কর, কর সবে, অস্ত্র পরিহার।
কর কর, কর মুখে, স্বদোষ স্বীকার॥
ধর ধর, ধর এসে, চরণে তাঁহার।
পূর্ব্ববৎ অনুগত, হও পুনর্ব্বার॥
অপার কৃপার নিধি, "লার্ড" দয়াময়।
করিবেন বিবেচনা উচিৎ যা হয়॥

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে নিতে হয়। তা হলো তাঁর সংশয়। ডক্টর অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মধ্যে কোথায় যেন 'স্বতঃ বিরোধিতা' ছিল ; সে কথা বলেছেন। তিনি একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যে, কবি শিখদের স্বজাতি-প্রেমকে প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের 'বিদ্রোহী' বলাতে তিনি ক্ষুব্ধ। এর জন্য তিনি লিখেছেন ; "শীকদিগকে বিদ্রোহী শব্দে পদবাচ্য করা কর্ত্তব্য নহে, যাহারা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষণার্থ অস্ত্রধারণ করে, তাহাদিগকে সাধুবাদ দেওয়াই উচিত, তাহারা পুত্তলিকাবৎ রাজা দলিপ সিংহের রাজ্য রক্ষণার্থ যত্নযুক্ত নহে, কিন্তু পরাধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্নকরণার্থ উপযুক্ত প্রযত্ন এবং প্রয়াস প্রকাশ করিয়াছে।"৫৩

আসলে ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে সিপাহীদের সম্বন্ধে ছিল সংশয়। আর সংশয় থেকেই 'স্বতঃ বিরোধিতা'* সৃষ্টি হয়েছে। এর জন্য তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে-ও লিখেছেন সংবাদ প্রভাকরের পাতায়। ১৫. ৪. ১২৬৫ তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন; যখন শুনলেন দেশীয় সিপাহীরা বিদ্রোহী হবার অপরাধে তাদের ফাঁসি হয়। অথচ তাতে গোরা সৈন্যরা যুক্ত থাকার অপরাধে তাদের ফাঁসির পরিবর্তে দ্বীপান্তর হয়। এই বৈষম্য মূলক বিচারকে তিনি 'গর্হিত বলিয়া' মনে করেন।৫৫

আবার তিনি গোরা সৈন্যদের অতিমাত্রিক অত্যাচার সম্পর্কে দ্বিধাহীন ভাবেই লিখতে পেরেছিলেন। এমন একটি লেখা বের হয় ২২. ৪. ১২৬৫ তারিখের সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে। "এস্থান বাসিদিগের উপর গোরা সেনারা অধুনা যেরূপ অহিতাচরণ করিতেছে, তাহা লেখনীদ্বারা বর্ণনা করা দুষ্কর, তাহারা বলপূর্ব্বক লোকের বাটী মধ্যে প্রবেশ করত যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আপনাদিগের আড্ডা মধ্যে পলায়ন করে, পথিমধ্যে ব্যাপারিদিগকে অবলোকন করিলেই তাহারদিগের বোঝা হইতে সমস্ত আহারোপযোগী দ্রব্যই কাড়িয়া লয়..." ।৫৬

অথচ তিনি সর্বদাই ইংরেজদের জয় ঘোষণা করেছেন। ইংরেজ বন্দনা গান তাঁর সাহিত্য কর্মে পরিস্ফুট। কারণ তিনি মনে করতেন ইংরেজ "প্রতিক্ষণ সুনিয়মে, শান্তির স্থাপন"** করে চলেছেন। কিন্তু তাঁর উত্থাপিত দুটি প্রসংগ-ই ইংরেজের সুনিয়ম ও শান্তি স্থাপনার পরিচয় বহন করে না।

দুই. সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকা ও ছোট গল্প...

সিপাহী যুদ্ধের স্মৃতি তখন-ও ম্লান হয় নি। অনেকেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে পুলকিত হয়েছেন, রোমাঞ্চিত অনুভব করেছেন। এই যুদ্ধে মহা বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গেছে, রাজা মহারাজার পালাবদলের মধ্য দিয়ে মধ্যযুগীয় শেষসত্তার বিলয়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে গল্পকথা উপকথার বিনুনি। মহান সে পটভূমি।

---

* শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন বলেছেন 'ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল।'
  দ্র, উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য, ২য় সং, ১৩৬৫, পৃ. ৬২

** সংবাদ প্রভাকর ৭.৩. ১২৬৪

॥ ১ ॥

করে এই পটভূমিকে অবলম্বন গল্প লিখেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-ও (১৮৬১-১৯৪০) লিখেছেন। প্রাক্-রবীন্দ্র ধারার এই দুই শিল্পীর মধ্যে নগেন্দ্রনাথের গল্পটি বেশ পরিণত। স্বর্ণকুমারীর 'মিউটিনি' গল্পটির মধ্যে "কোন সূক্ষ্ম কৌশলের অবতারণা নেই, পরিণতির মধ্যে কোন দূর-সঞ্চারী ব্যঞ্জনাও নেই। কিন্তু সিপাহী যুদ্ধের পটভূমিকায় ইংরেজ রমণীদের এক গল্প। বিদ্রোহের বিভীষিকা ও অপরিচিত ভারতবর্ষের প্রতি সর্বদা শঙ্কা দুই মিলে কাহিনীতে রোমাঞ্চকর আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে।"৫৭

নগেন্দ্রনাথের গল্পের সময়কাল সিপাহী বিদ্রোহ ঘটনার দুটি বছর পরের কাহিনী। সিপাহী বিদ্রোহ দমিত, অবসিত। দেশের শান্তি সংস্থাপিত। কিন্তু ইংরেজের মনে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কারণ বিদ্রোহী নেতা নানাসাহেব এবং আরো অনেকেই লুকিয়ে আছেন। তাই দেশে দেশে ঘুরছে বহু গুপ্তচর।

এই পটভূমিতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত গল্প—'ভৈরবী'। তাঁর গল্প বলার কুশলতা ও প্লট রচনার শৈল্পিক নিষ্ঠা এটির মধ্যে স্পষ্ট। কিন্তু জীবন রসের তীব্রতায় ও মাধুর্যতায় গল্পটিকে চিত্রিত করতে পারেন নি। ছোটগল্পের গবেষক বলেছেন, "গল্পটি প্রাক্ রবীন্দ্র ধারায় শ্রেষ্ঠ গল্প।"৫৮ গল্পটি এরকম ;৫৯

বৈরাগ্যের বারাণসীতে এক ভৈরবী এসেছেন। "ভৈরবী তরুণী—অপূর্ব্ব সুন্দরী।" সেই লোভে ঘুরছে দুই পাষণ্ড। আর-ও একজন আছে, গুপ্তচর। তার নাম মোমতাজ আলি। সে একদা ভৈরবীর প্রণয়প্রার্থী ছিল। একদিন সকালে গংগার তীরে সে এসে বললে, আমি তোমায় চিনতে পেরেছি। প্রতিশোধ নিতে এসেছি। তোমাকে ধরিয়ে দিলে তোমার ফাঁসি হবে না বটে তবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে। "তুমি আমার সঙ্গে আইস, তোমার ভয় নাই। ইংরাজ তোমায় ধরিতে পারিবে না।"৬০ অসৎ তার উদ্দেশ্য। ভৈরবী অপমান করলেন। মোমতাজ আলির ইংগিতে তখন সিপাইরা বেরিয়ে আসে। ভৈরবী তাঁর হাতের ত্রিশূল আপনবক্ষে বিদ্ধ করলেন। 'চঞ্চল জলতরঙ্গ' তাঁর মুখে আঘাত করল। জনচিত্ত স্পন্দিত হলো : রাণীচন্দা "আজমগড়ে ইংরাজের সঙ্গে যে বড় লড়াই করিয়াছিল ?৬১ মোমতাজ আলি অবনত মস্তকে বলেছিল, হ্যাঁ—"সেই।"

॥ ২ ॥

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ 'দুরাশা' নামে ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসে এক অসামান্য গল্প লেখেন৬২। ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়াপাতে একটি নিষ্ঠুর প্রেম ও ধর্মের দ্বন্দ্ব। গল্পটি এই ;—

এক মুসলমান দুহিতা নিজের আত্মপরিচয়ে বলেন ; "আমি বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী।" "আমার পিতৃকুলে দিল্লির সম্রাট বংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল, সেই কুলগর্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল, পিতা ইতস্তত করিতেছিলেন এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহিলোকের সহিত সরকার বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অধিকার হইয়া গেল।" নবাব পুত্রী আর-ও বলেন : "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম কেশর লাল।"

এই কেশর লালই গল্পের নায়ক, বিপ্রবীর। কেশরলাল নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ। শুদ্ধ-নৈষ্ঠিক তার জীবন। "নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনুদেহখানি ধূমলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মতো বোধ হইত", নবাবপুত্রীর। সে তাকে ভালোবাসল। কিন্তু মুসলমান কুমারীর প্রেম সে গ্রহণ করেনি। তাই নারী তার সমগ্র জীবন দিয়ে সাধনা করল, ব্রাহ্মণ্যের সাধনা। তপস্যার মতোই কঠিন সাধনা। তীর্থে তীর্থে, মঠে-মন্দিরে ঘুরে বেরিয়েছেন তিনি। একদিন তার মনে হলো—"বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি…আমার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতি দূরে।"

কিন্তু আর একদিন তিনি দেখলেন তার স্বপ্নের নায়ক ভ্রষ্ট। ব্রাহ্মণ্য তার সংস্কার মাত্র, আভ্যাসিক ব্যাপার। তাই বদ্রাওন কুমারী যখন আবিষ্কার করেন একদা ব্রাহ্মণ্য অভিমানী কেশরলাল তার ধর্মসংস্কার ত্যাগ করে ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী ও তার গর্ভজাত সন্তানদের নিয়ে দীনবেশে দিন যাপন করছেন, ঠিক তখনই নারীর সমগ্র সত্তার মধ্যে তীব্র দাহ সৃষ্টি হয়। "হায় ব্রাহ্মণ তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ

করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় পাইব।"

এই হলো ব্যর্থ প্রেমের ছবি। সিপাহী বিদ্রোহ যার পশ্চাৎ। অবশ্য প্রমথনাথ বিশী 'দুরাশা' গল্পটিকে 'ছবি নয়, ছবির ফ্রেম'৬৩ বলেছেন। কিন্তু ফ্রেম মজবুত হলে এবং তাতে ঔজ্জ্বল্য থাকলে চোখ ধাঁধায়, মনোযোগ আকর্ষণ করে। আবার 'ফ্রেম' যে একটি স্ট্রাকচারাল কর্ম সে কথা মনে রাখলে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য যথার্থই মনে হয়। তাই গল্পের বর্ণের মধ্যে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকাকে চেনা কষ্ট কল্পনা নয়। যাই হোক, গল্পটি আমাদের মোহিত করে, একটি জীবনের শূন্যতা সার্বিক হয়ে ওঠে।

॥ ৩ ॥

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'ভীম চুলুহা' নামে একটি গল্প লিখেছেন। এটির-ও পটভূমিকা সিপাহী বিদ্রোহ। ডক্টর শিশির কুমার দাশ লিখেছেন, "গল্পটি সার্থক নয়, তবে সিপাহী বিদ্রোহের সম্পর্কে যে ছোট গল্প ধারা বাংলায় ইদানীং পুষ্টিলাভ করেছে এই গল্পটি সেই ধারার পূর্বসুরী মাত্র।"৬৪

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৩৮) সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় 'একটি স্মরণীয় ঘটনা' নামে গল্প লিখেছেন। একটি বালিকা দুই সাহেবের হাত দেখে বলেছে তারা চোদ্দই যে, মারা যাবে। ঘটনা তাই ঘটে। নিয়তির পরিহাস। ভবিতব্যকে বালিকা যেন চোখের সামনেই দেখেছিল। রোমাঞ্চ ও শিহরণে ভরা গল্পটি নিষ্ঠুর নিয়তিকেই ইংগিত করে। ছোট গল্পের বিশেষজ্ঞ বলেছেন: "মৃত্যুর অনাগত ছায়া গল্পের আকাশকে অব্যর্থ ও অনিবার্য ভয়ে ভরিয়ে রেখেছে।"৬৫

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ। সিপাহী বিদ্রোহ চলছে। বিদ্রোহীরা দুর্বার। হিংস্র উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। স্থানটি কানপুর শহর। এখানে সিপাহীরা ক্রোধে, রোষে ফুঁসছে। ইংরেজ হটাও অভিযান চলছে। সর্বত্র মার, মার এই মাত্র রব। শাসকরা ভীতসন্ত্রস্ত, শাসন যন্ত্র বিপর্যস্ত।

এই পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) একটি গল্প লিখেছেন। গল্পটি 'পরিণাম'৬৬। গল্পটিতে লেখকের আন্তরিকতা লক্ষণীয়। মনেরআবেগ

সরস-গম্ভীর। কিছু হাসি এতে আছে বটে তবে সবটাই বেদনার মধ্যে গল্পের অন্তর্লীন। মর্মস্পর্শী এই গল্পটি হৃদয়ানুভূতির আকর। ডক্টর সুকুমার সেন সুধীন্দ্রনাথের গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর গল্প "শান্ত বাৎসল্যের করুণ মাধুর্যে অভিষিক্ত।"৬৭

গল্পটির কথাবস্তু :

মনিয়ার নামে এক ইংরেজ কর্মচারী স্ত্রী ও শিশুকন্যা সংগে নিয়ে ডাকগাড়ীতে স্থানান্তরে চলেছেন। পথে একদল উন্মত্ত সিপাহী তাদের দিকে ধেয়ে আসছিল। মনিয়ার সাহেব বুঝলেন, সুমুখে বিপদ। তিনি স্ত্রীকে গাড়ীর পেছন থেকে নামিয়ে দিলেন, বললেন কন্যাকে নিয়ে দৌড়ে পালাও। পাশেই এক মুসলমান বণিকের কাছে আশ্রয় চাইলেন মিসেস মনিয়ার। আশ্রয় পেলেন শর্তে। সিপাহীদের হাতে যদি তার স্বামীর মৃত্যু হয় তবে বণিককে বিয়ে করতে হবে। হলো-ও তাই। কিছুদিনের মধ্যে মেম মনের অসুখে মারা গেলেন। বণিক খাঁ সাহেব শিশুটিকে নিয়ে বিপদে পড়লেন। এবার খাঁ সাহেব শিশু ও বৃদ্ধা দাসীকে সংগে নিয়ে কলিকাতায় এলেন। ঘর ভাড়া নিলেন। সেখানেই শিশুটিকে দাসীব কাছে রেখে তিনি ফিরে এলেন কানপুরে।

বুড়ীর স্নেহের আঁচ পেয়ে শিশু এখন বালিকা। খাঁ সাহেব তাকে অর্ফান স্কুলে ভর্তি করে দিলেন 'মিস টার্নার' নাম দিয়ে। বালিকার 'দীনতা, বিনয় ও সৌজন্যে' সকলে তাকে ভালবাসত। অনেকেই তার বন্ধু হলো। বুড়ী তাকে 'মণিবাবা' বলে ডাকতো। বালিকা—'আম্মি'।

একদিন নৌকডুবিতে খাঁ সাহেব ভরাডুবি হলেন। ঋণগ্রস্ত তিনি। কিছু টাকার প্রয়োজনে বুড়ির কাছে হাত পাতলেন অন্তত দুশো টাকা হলেও হয়। বুড়ী দিতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ হলেন তিনি। তিনি যে টাকা এতদিন পাঠিয়েছেন তা থেকে দুশো টাকা সঞ্চয় তার নেই? নিশ্চয়ই বুড়ী চুরি করেছে। তাড়িয়ে দিলেন। এরপর মিস টার্নারকে অর্ফানেজবোর্ডারে রেখে তিনি সীলোনে চলে গলেন বন্ধুর কাছে।

মিস টার্নার ক্রমে এণ্ট্রেন্স, এফ. এ., পাশ করলেন। সে এখন পূর্ণ যুবতী। মিশনে কাজ-ও পেয়েছেন, বেতন একশত টাকা। দিন তার কাটছিল। কিন্তু বুড়ীর জন্য একটি ম্লান ছায়া থেকেই যায় তার মনে। একদিন হঠাৎ-ই

মর্মভেদী চীৎকার শুনে রাস্তার বেরিয়ে এলেন তিনি। দেখলেন, পুলিশের প্রহারে জ্ঞানহারা সেই বৃদ্ধা আম্মি। বুড়ির কাছে অলংকার ও টাকাকড়ি দেখে পুলিশের সন্দেহ, তাই প্রহার।

জ্ঞান ফেরার পর বুড়ী তার মণিবাবাকে দেখে চমকে গেল। বেদনার্ত কণ্ঠে সে জানায়, এই অলংকার মিসেস মনিয়ার রেখে গেছেন তার সন্তানের জন্য। আর এই টাকা সে দেশের জায়গা জমি বেচে সংগ্রহ করেছে খাঁসাহেবকে দেবার জন্য। খাঁ সাহেব তাকে চোর অপবাদ দিয়েছেন। এ সবই বুড়ী তার মণিবাবাকে দিল। তারপর সে একটি সোনার বালা মণিবাবার হাতে পরিয়ে অন্তিম বাসনা পূর্ণ করল। শেষ মুহূর্তে আরো একবার "ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, 'মণি'।" তারপর সব শেষ। শুধু শেষ হয়নি মণিবাবার কান্না আর প্রতি রবিবারের সন্ধ্যায় 'আম্মি'র কবরে ফুল নিবেদন করার প্রাণের তাগিদটি।

॥ ৪ ॥

প্রমথনাথ বিশী সিপাহী বিদ্রোহের ওপর বারোটি* গল্প লিখেছেন। এবং এই গল্পগুলি তিনি 'চাপাটি ও পদ্ম', (১৩৬২) গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তিনি এই গ্রন্থের 'পূর্বকথা'য় জানিয়েছেন, কেবল একটি গল্প ছাড়া "বাকি এগারটি গল্প এই অর্থে ঐতিহাসিক যে সিপাহী বিদ্রোহের কোন না কোন গ্রন্থে গল্পাঙ্কুরগুলি পাইয়াছি।"

এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো। ১৩৬২-তেই তাঁর স্ব-নির্বাচিত গল্প গ্রন্থ বের হয়। এতে তিনি যে দুটি গল্প সংকলন করেছেন তা হলো 'ছিন্ন দলিল' ও 'নানাসাহেব'। মনে হয় চরিত্র সৃষ্টি ও ঘটনার প্রতিবেদন বা 'এফেক্ট'-এর প্রতি তিনি নজর দিয়েছেন এ দুটি গল্পে। তাই এ দুটিতে তিনি বিশেষ মনোযোগী। আমরা এই দুটি গল্প প্রসঙ্গোপকরণে সাজিয়ে নিতে পারি।

---

* সেই শিশুটি, জেমিগ্রীণের আত্মকথা, কোকিল, ছিন্নদলিল, জলাবসিংএর, শিবলাল, ছায়া-বাহিনী, মড্, রথ, নানাসাহেব, প্রায়শ্চিত্ত, রক্তের জোর অভিশাপ।

৯.

ছিন্নদলিল

জেনারেল হ্যাভলকের সৈন্যদল কানপুর দখলে এনেছে। বিদ্রোহীরা দমিত। কানপুর শান্ত। পূর্বতন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ শেরার আবার কানপুরের ভার নিয়েছেন। কোম্পানীর ঢুলী ঢোল বাজিয়ে কোম্পানী রাজত্বের পুন প্রতিষ্ঠার সদম্ভ ঘোষণা করছে।

কোটওয়ালীর উত্তর দিকে কিছু গুঞ্জন শুনে শেরার কৌতূহলী হলেন। কিছু অনুমান করার আগেই "পাঁচ, সাত, দশজন লোক ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গেল—।" (পৃ. ৬৫) তারা রাজভক্ত প্রজা সে কথাটাই বোঝাতে চাইল। "সিপাহী বিদ্রোহ ঘটিবার আগে তাহারা আগ্রা, মীরাট, সীতাপুর প্রভৃতি স্থানে চাকুরী করিত।" (পৃ. ৬৭) তাদের মধ্যে বদ্দিনাথ মুখুজ্জে কানপুরের কাছে সরকারের তহশীলদারের কাজ করতেন। এই দলে সে-ই নেতা। তিনি বলে চলেন, সিপাহীলোকেরা ক্ষেপে ওঠে। তাই তারা কানপুরে পালিয়ে এসেছেন, আশ্রয়ের জন্য। সিপাহীরা তাদের ওপর অত্যাচার করেছে বটে কিন্তু নিয়তি তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এখন তাদের দীর্ঘ উপবাস চলেছে। তারা সাহেবের কাছে মিনতি জানায়, তিনি বাঁচালেই তারা বাঁচে।

সাহেব জানতে চাইলেন। তাবা রাজভক্ত প্রমাণ কী। প্রমাণ দিয়েছে অনেক। সাহেব কিছু বিশ্বাস করলেন, আবার করলেন-ও না। তখন বদ্দিনাথ মুখুজ্জে একখানি দলিল বের করে। তাতে সাহেব বুঝলেন এদের ভীরুতা আছে বটে তবে তারা শিখযুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে অংশ গ্রহণ করে থাকলেও থাকতে পারে। সাহেব অবশ্য খুশি হলেন বদ্দিনাথের মোক্ষম ভাষণে. "হুজুর ভীরুলোকে কখনো বিদ্রোহী হয় না, কারণ ভীরুতা হচ্ছে রাজভক্তির বীজ।" (পৃ. ৭০)

এরপর চতুর বদ্দিনাথ সাহেবের খুশিভাব লক্ষ করে একটি কাগজে লিখে আনলেন। "This house belongs to one Mokarjea, very loyal subject, please not to molest." সাহেব স্বাক্ষর করলেন। (পৃ. ৭০) তা দরজায় সাঁটিয়ে বদ্দিনাথ ও তার সংগিগণ কাল যাপন করেন নিশ্চিন্তে। কিন্তু গৃহের বাইরে আপদ কম নয়। কোম্পানীর ফৌজ চরম অত্যাচার সুরু করেছে। তাই বিদ্রোহীদের অনেকেই মরল, ফাঁসি গেল ও পালাল।

এমন অনাচারের দিনে, তারকচন্দ্র রায় নামে এক যুবক কাকুতিমিনতি করার পর সেই বাড়ীতে আশ্রয় পেলেন। আত্মরক্ষার তাগিদে হীনমন্যতা তারকের পছন্দ নয়। সে বলে, "তেলেঙ্গি লড়ছে, পুরবিয়া লড়ছে, শিখ লড়ছে, মুসলমান লড়ছে, আর আপনাদেরই যত ভয়।" একদিন সন্ধ্যেবেলায় বদ্রিনাথের ডাক পড়ে কোটওয়ালীতে। শেরার সাহেব জানতে চান, কোন বাঙালী ছোকরা তাদের কাছে আশ্রয় নিয়েছে কিনা। তাঁর কাছে গোয়েন্দার খবর আছে, সিপাই পক্ষের লোক সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। বদ্রিনাথ মিথ্যে বলেছেন। না সেখানে কেউ আশ্রয় নেয়নি। সাহেব আশ্বস্ত হলেন রাজভক্ত প্রজা এমনটি করতে পারে না।

পরদিন ভোরবেলায় সেই যুবকের খোঁজ মেলে না। সবাই দেখল দরজায় শেরার সাহেবের স্বাক্ষরিত সেই কাগজটি-ও নেই। তার বদলে একটি কাগজ আছে বটে তবে লেখাটি এরকম; "This house belongs to traitors to the country—NANAsahib"

এসব দেখে "মুখুজ্জে মশাই মেঝেতে মাথা কুটিতেছে—চণ্ডাল, চণ্ডাল, চণ্ডাল!" (পৃ. ৭৯)

২.

নানাসাহেব

সিপাহী বিদ্রোহ মিটে গেছে। দিল্লীর বাদশাহ নির্বাসিত। ঝান্সীর রাণী সম্মুখ সমরেই নিহত হয়েছেন। তাঁতিয়াটোপির ফাঁসি হয়েছে। ধরা পড়েনি নানাসাহেব। আর পড়েনি নানার দক্ষিণ হস্ত আজিমুল্লা খাঁ। আর-ও একজন। নানার হারেমের ক্রীতদাসী বিবিঘরের হত্যাকাণ্ডের নায়িকা. নাম হুসেনিবিবি।

নানাকে গ্রেপ্তারের জন্য প্রদেশে প্রদেশে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। অথচ সর্বত্রই রব উঠেছে, নানাকে অনেক স্থানে অনেকেই দেখেছে। কেউ-বা বলছে নানা মরেছে। এমনি এক সাক্ষ্য দিয়েছে তাঁর নাপিত। ইংরেজ তা বিশ্বাস করেন না। নানা হয়তো ছদ্মবেশে ঘুরছে। তাই সন্ন্যাসী বা ফকির সকলেই ধৃত হয়। ধৃত ব্যক্তিকে কানপুরে আনা হতো। বিভিন্ন পরীক্ষায় নিঃসন্দেহ হলেই তবে

সেই ব্যক্তিকে ছাড়া হতো। নানাকে চেনাবার জন্ত নানা বিশেষজ্ঞ এসেছেন ; আকৃতি, প্রকৃতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বা পদচিহ্ন বিচারে তারা পারদর্শী। তবু-ও ধরা পড়ছেন না নানা।

নানাকে অবশ্ত সকলে চেনে না। চেনে কানপুরের এক হোটেলের মালিক মামুদ ও তার কর্মচারী 'হেডওয়েটার' ইসাক। তারা খানা দেয়। নানার সম্পর্কে খোস গল্প করে। সপ্তাহে একদিন করে ইসাকের ডাক পড়ত জেলখানার প্যারেডে। সারা সপ্তাহ ধরে যেসব নানা ধরা পড়েছে তাদের সনাক্তকরণের জন্ত। ইসাক সারিবদ্ধ নানার সম্মুখ থেকে হেঁটে যেত। তারপর জেনারেল সাহেবের নিকট এসে 'সেলাম করিয়া বলিত হুজুর, তামাম ঝুটা।' এরপর নকল নানার দল ছুটি পেত।

১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তার ফলে নানাসাহেবের সংখ্যা বেড়ে গেল। জেলে থাকলে খেতে পাওয়া যায়। তাই খাবার লোভে সাধু-ফকির গৃহী অনেকেই নানা হতে চাইল। সকলেই এসে দারোগাকে বলে সে নানা। ইসাক তাদের চিনিয়ে দেয়, না কেউ-ই নানা নয়।

একদিন সন্ধ্যায় সুবেশে এক ভদ্রলোক ও একজন স্ত্রীলোক মামুদের হোটেলে ঢুকলেন। উভয়েরই পরনে সাহেবি পোষাক। উভয়েই কিছু শংকিত, আড়ষ্ট। চঞ্চল তাদের চাহনি। উদ্বিগ্নতার ছাপ চোখে মুখে। যাই হোক খাবার খেলেন। দাম মিটিয়ে দিলেন পুরুষটি। কিছু বকশিশ দিলেন ইসাককে। ইসাক সেলাম করে অনুচ্চস্বরে বলে "সেলাম আজিমুল্লা খাঁ।" "সেলাম জুবেদিবিবি।"

তারপর ইসাক জানায়, আপনারা নিরাপদ স্থানে এসেছেন। কেউ আপনাদের চিনতে পারবে না। উভয় পক্ষে বিস্ময়ের যবনিকাপাত হলো ইসাকের আত্ম উন্মোচনের ভেতরে। "কণ্ঠের স্বর অনেকখানি নামাইয়া একবার এদিকে ওদিকে তাকাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিল—আমিই নানা-সাহেব।" (পৃ ৯২)

প্রমথনাথ বিশীর দুটি গল্প-ই সুখপাঠ্য ও সুরচিত। যে স্বাচ্ছন্দ্য ও মাধুর্য থাকলে গল্প উৎরোয়, এখানে তার প্রমাণ কতকাংশ মেলে বটে তবে তিনি যে কুশলী শিল্পী তার প্রমাণ এখানে অনায়াস নয়। অবশ্ত সিপাহী বিদ্রোহের পট ও পরিবেশ রচনায় তিনি রসজ্ঞ মনের পরিচয় দিয়েছেন।

একটি কথা। যাকে আমরা 'ওয়ার্থ-কোটিং' বলি ; তা হলো এই "হুজুর ভীরু লোকে কখনো বিদ্রোহী হয় না, কারণ ভীরুতা হচ্ছে রাজভক্তির বীজ।" (হিন্দলিল, পৃ. ৭০) বাস্তবিকই, সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই 'ভীরুতা' একটি বিরাট জনগোষ্ঠীকে নীরব রেখেছিল। সেই ঐতিহাসিকতাই গল্পের উপজীব্য।

তিন. সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাস…

১.

চিত্তবিনোদিনী

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় প্রথম৬৮ বাংলা উপন্যাসটির নাম 'চিত্ত বিনোদিনী অর্থাৎ বিদ্রোহ সম্বলিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'। এটি প্রকাশিত হয় ১৭৯৬ শকে। লেখকের নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। গ্রন্থকার নিজের নামের সঙ্গে এম.এ, বি.এল জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ সে যুগে তিনি উচ্চ শিক্ষিত। উপন্যাসটি দুটি ভাগে বিভক্ত,—প্রথম ভাগে উপসংহার বাদে বারোটি ও দ্বিতীয় ভাগে উপসংহার বাদে ২২টি অধ্যায় আছে। হরিনাভির প্রাচীন ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত ৩০২ পৃষ্ঠার উপন্যাস খানির দাম ছিল এক টাকা চার আনা।৬৯

মূলকাহিনী।

ইংগ ভারতীয় তরুণী "এমি আমাদের ঘরের বউ 'চিত্ত বিনোদিনী'।" কমিসারিয়েট বিভাগের বিলেতি সাহেব রেমণ্ড বিয়ে করেছিলেন ভারতীয় মহিলা। তাদেরই মেয়ে এমি।

কমিসারিয়েটে কাজ করে বিজয়সিংহ ও চারুচন্দ্র নামে দুই যুবক। বিজয় এমির প্রেমাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এমি 'বাঙালীসুলভ, যুবজনদুর্লভ, লজ্জা-প্রবুদ্ধ চারুচন্দ্রকে"কে ভালোবাসে। এই ঘটনা জানতে পেরে বিজয় চারুচন্দ্রের ওপর হিংস্র হয়ে ওঠে। ঘটনা চক্রে একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে চারুচন্দ্রের পরিচয় হয়। এই সূত্র প্রমাণিত করে বিজয় চারুচন্দ্রকে ইংরেজের হাতে বন্দী করায়, একবার নয় দুবার। কিন্তু চারু দুবারই মুক্তি-ও পেল। বিজয় চারুকে বিপদে ফেলার জন্য বাঙালী দস্যুদলের সংগে ষড়যন্ত্র করে। দস্যুদলপতি রঘুবর এমি ও চারুকে বন্দী করে। এদিকে বিজয়ের হাতে সমর্পণের জন্য একটি স্ত্রীলোকের শব দেখিয়ে এমির মৃত্যু খবর প্রচার করে

ও চারুকে মুক্তি দেয়। চারু মনের দুঃখে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। চারুর শব তোলা হয়। দস্যুদলপতির স্ত্রী চারুকে দেখে চীৎকার করে ওঠেন। হারানো পুত্রকে চিনতে পেরে উভয়েই পুত্রের চিতায় পুড়ে মরার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু চিতায় শবের জীবণ-লক্ষণ প্রকাশ পায়।

বিপরীতদিকে, চারুর মৃত্যু খবর পেয়ে এমি বিষ খেল বটে। তবে মরল না। ডাক্তার তাকে আসল বিষ দেয়নি। তাই সে বেঁচে ওঠে। অতএব চারু-এমির মিলন ঘটে।

ঘটনার আরো প্রকাশ। রঘুবরের আসল নাম প্রতাপ সিংহ ওরফে মদনলাল। বিজয় প্রতাপের জারজ সন্তান। রেমণ্ড সাহেবের ভগ্নীর সঙ্গে তার অবৈধ প্রণয় ছিল। বিজয় সে কাহিনী জানত না। তেমনই হেলেনা যাকে রেমণ্ড সাহেব এমির সঙ্গে মানুষ করেছিলেন; সে-ও জানত না তার মা এক ব্রাহ্মণ ঘরের মহিলা। যাইহোক বিজয় ও হেলেনার বিয়ে হয় ঘটনা চক্রে।

উপন্যাসে আর একটি সাবপ্লট আছে।

কৃপারাম গঙ্গোপাধ্যায় একজন ধনাঢ্য কুলীন। তার পুত্রের নাম সুকুমার ও কন্যার নাম হেমলতা। সুকুমারের বন্ধু হেমচন্দ্র হেমলতাকে ভালোবাসে। কিন্তু কৃপারাম অকুলীন পাত্রের কাছে মেয়ে বিয়ে দেবেন না। সুকুমার গোপনে হেমচন্দ্র হেমলতার বিয়ে দেন। তবু-ও কৃপারাম এ বিয়ে মেনে নিলেন না। তিনি মেয়ের আবার বিয়ের ব্যবস্থা করতে থাকেন। একদিন পাত্র-পাত্রী পালিয়ে যায়। হেমচন্দ্রের বন্ধু চারুচন্দ্র। চাকরির আশায় হেমচন্দ্র বন্ধুর নিকটই যাত্রা করে। কিন্তু তখন সিপাহী বিদ্রোহ চলছে। পথে হাঙ্গামা হয়। দস্যুদলের হাতে পড়ে তারা বিপর্যস্ত। এই সময় হেমচন্দ্রের হেমলতার সতীত্বে সন্দেহ হয় তাই তাকে 'কলঙ্কিনী' বলে। হেমলতা মনের দুঃখে পাহাড় থেকে পড়ে যায়। কিন্তু একজন দস্যু তাকে উদ্ধার করে। প্রতাপচন্দ্রের আত্ম কথনে প্রমাণ মেলে হেমলতার নির্মল চারিত্রিক সততার কথা। সে কথা শুনে চারুচন্দ্র মর্মাহত হয়। সে-ও জীবন বিসর্জন দেবে মনস্থ করে। এমন সময় খবর পায় হেমলতা বেঁচে আছে। তারপর উভয়ের আবার মিলন হয়।

—ঔপন্যাসিক 'ঐতিহাস উপন্যাসিক' লেখেনি। লিখেছেন বিশুদ্ধ নভেল। মিলনের গল্প। লেখকের তাঁর মত স্পষ্ট। "যে দেশে মিলন না হইলে যাত্রা

জানেনা, যে দেশে কপাল কুণ্ডলার পুনর্জীবন হয়, তথায় শোচনীয় ব্যাপারে গ্রন্থ শেষ অসাধ্য। আমাদের কাগজে না থাকে, গল্পে না কুলায়, ঘটনায় না বলে. মিলন দেখাইয়া দিতেই হইবে।" (পৃ ২৯৬) কিন্তু এই মিলের কাহিনী লিখতে বসে বিদ্রোহের একটি ক্ষীণ রেখা অংকন করেছেন বটে তবে তা চিনে নিতে কষ্ট হয়।

সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব এই উপন্যাসটিতে প্রকাশ পেয়েছে। চারুচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীর প্রতিনিধি স্বরূপ। তিনি ইংরেজের জয়গান গেয়েছেন। ঔপন্যাসিকের মনোভাব-ও পরিস্ফুট হয়েছে এই কটি শব্দে—

"জয় ইংলণ্ডের জয়, ভারত রাজ্যের জয়।
ব্রিটিশ জয় পতাকা উড়িছে ভারত ময়।" (পৃ. ৭৮).

উপন্যাসটিতে ভাষায় অস্পষ্টতা নেই। অনেক চরিত্রের ভিড় বলেই উপন্যাসের গতি স্বচ্ছ নয়। তাছাড়া লেখক বিষয় পরিকল্পনার মধ্যে অবান্তর ঘটনা যোগ করেছেন। কাহিনী বন্ধনে গোল সেখানেই।

২.
নানাসাহেব

উপেন্দ্রনাথ মিত্র সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় একটি উপন্যাস লিখেছেন। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৬ সালের ১১ই ভাদ্র। এটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১২৯০-তে। রচয়িতা গ্রন্থটির নাম রেখেছেন কাব্যের আঙ্গিকে। যেমন,

ভারতের সুখ স্বপ্ন
নানাসাহেব
বা
[ব্রিটীশ গৌরব রবি ভারত গগনে]

একচল্লিশটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এই উপন্যাসটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৩।

সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই যে বিরাগ ছিলনা, তার একটি নিদর্শন হলো এই উপন্যাসটি। লেখকের একটি সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি

ছিল ঐতিহাসিক পুরুষ নানাসাহেবকে ঘিরে। অবশ্য ইংরেজ রোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য যে 'ক্যাপশন' তিনি রচনা করলেন ইংরেজের পক্ষে, তা কিন্তু আসল নয়। এর মূল গভীরে। তা তাঁর একটি বক্তৃতায় আভাসিত। "আজ এই স্তিমিত তেজোসম্পন্ন বঙ্গে স্তিমিত প্রভাবী বঙ্গবাসীর সম্মুখে হৃদয় খুলিয়া কি গাহিতে বসিলাম !! বীরগীত !! ধুন্ধুপন্থ নানাসাহেবের জীবন বৃত্তান্ত বা ভারতের সুখস্বপ্ন !! না বৃটীশ গৌরব রবি ভারত গগনে।" (অবতরণিকা অংশ) বলাবাহুল্য, তিনি বীর গীতই গেয়েছেন।

উপন্যাসটির পটভূমি ঐতিহাসিক। উপন্যাসটির আধেয় বা বিষয় বস্তু-ও ঐতিহাসিক পুরুষ ও কাহিনী সমন্বিত। নানাসাহেব, আজিমুল্লা, তাতিয়া-তোপী এবং সেনাপতি জ্বালক প্রভৃতি চরিত্রগুলি স্পষ্টরূপ ধারণ করেছে।

বিষয়বস্তু :

বাজীরাও-এর পোষ্য পুত্র নানা সাহেব। ইংরেজরা তাঁকে অবজ্ঞা করেছেন ; বঞ্চিত করেছেন। তাই তিনি ক্ষুব্ধ, রুষ্ট ও বিদ্রোহী। ইংরেজের ওপর সিপাহীরাও বিভিন্ন কারণে অসন্তুষ্ট। তাদের নিয়ে নানাসাহেব স্বাধীন ভারত গড়ার সংকল্প নিলেন। কিন্তু দেশদ্রোহীরা পুরস্কারের লোভে বিদ্রোহীদের পেছনে লেগে থাকে। এমন একজনের নাম নানকচাঁদ। যিনি অনায়াসেই বলতে পারেন, 'স্বজাতির ছিদ্র প্রকাশ করা মহাপাপ !! কিন্তু রাজহিতৈষী হওয়াতো পুণ্যের কাজ !! বর্ত্তমানকালে ইংরাজগণই ভারতের রাজা !! তাহাদের হিতৈষী হইলে, আমার পাপ কি ? আমার প্রধান শত্রু নানা ! তাহার সহকারীর করা অপেক্ষা নরকনিবাস আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। ইংরাজগণের হিতসাধনার্থে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিলাম।" (পৃ. ৪৩)

যাহহোক, ইংরেজের বিরুদ্ধে নানাসাহেবের যুদ্ধ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। এক্ষেত্রে লেখক তাঁর চরিত্রকে দায়ী করেছেন। জাতিভাই বল্লারাও-এর প্রেমিকা অহল্যাকে পেতে নানা উন্মত্ত হয়ে ওঠেন।* অবশ্য তিনি জানেন না যে, অহল্যা বল্লারাও এর প্রেমিকা। নানকচাঁদ নানার এই দুর্বলতার সুযোগ

* ঔপন্যাসিক গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদের পাদটীকায় বলেছেন : "ইতিহাসে জানা যায় যে, নানা প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া রাজা হইলে একটি আত্মীয় কামিনিকে লইয়া তাঁহার গৃহে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়।" (পৃ. ৭০)

নিলেন। তিনি চুন্না নামে একব্যক্তি ও বল্লারাওএর গুরু শিবপ্রসাদ স্বামীর সংগে ষড়যন্ত্র করে ইংরেজের পক্ষ নিলেন। ফলত, ইংরেজরা যুদ্ধে জয়ী হন।

নানাসাহেবের পতন, ইংরেজের বিজয় কাহিনী যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি বিঠুরের সিংহাসন লোভী নানকচাঁদের সিপাহীদের হাতে মৃত্যু-কাহিনী-ও বলা হয়েছে। এতে একটি কল্পিত কাহিনী ঢোকানো হয়েছে। তা হলো ব্রিটিশ সেনাপতি হ্যাভলকের সামনে ঝাঁসীর রাণীর অগ্নিতে আত্মবিসর্জন। সবশেষে, বল্লারাও ও অহল্যার মিলন দেখিয়ে, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়গান করে উপন্যাসটির সমাপ্তি দেখানো হয়েছে।

উপন্যাসটির ভাষা ভঙ্গি বেশ সহজ-সরল। বক্তৃতাধর্মী, কোথায়-ও বা কাব্যিক। কিন্তু 'চিত্ত বিনোদিনী' অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর না হলে-ও অল্প সময়ের ব্যবধানে এটির দুটি সংস্করণ প্রকাশের মধ্যে কাহিনীর যাথার্থ্য ধরা পড়ে।

৩.

চন্দ্রা

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় 'চন্দ্রা' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। এটি প্রথমে মাসিক 'কুসুম মালা' পত্রিকায় ১২৯১ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পরে বসুমতী প্রকাশনায় ১৩১৮ সালে গিরিশ গ্রন্থাবলীর নবম খণ্ডে 'চন্দ্রা' উপন্যাসটি সংকলিত হয়। উপন্যাসটি ছোট, ৭৯ পৃষ্ঠায়। দশটি বিভাগ ও তেত্রিশটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ।৭০

মূল কাহিনী :

রামচাঁদ খুড়োর মনে বৈরাগ্য এসেছে। সে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। গাঁজা, মদ খায়। একদিন গঙ্গা থেকে একটি শিশুকে তুলে আনে সে। কোনো এক নারী শিশুর মৃত্যু হয়েছে ভেবেই গঙ্গায় ফেলে দেয়। সমাজে রব উঠলো দানোর পাওয়া ছেলে এটি। পুলিশ চোর সাব্যস্ত করে। ফলে তার কারাদণ্ড হয়। সমাজের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে ঘর ছাড়ে রামচাঁদ খুড়ো।

এরফলে তার স্ত্রী শান্তা ও সেই ছেলে,—নাম হারান, দুর্দশার মধ্যে পড়ে। রামচাঁদ বিদ্রোহী সিপাহীদের দলে যোগ দেয়। মঙ্গল পাঁড়ের সংগে তার যোগাযোগ হয় বটে। তবে সে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে, খাঁটি

বিদ্রোহী সে হয় নি। তারই পালিত পুত্র হারান অবশ্য বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছে। এখন তার নাম সোমনাথ। সন্ন্যাসী এবং বিদ্রোহী হিসেবেই তার পরিচয়।

সোমনাথ একজনকে গুরু মেনেছে। সে বিদ্রোহী দলের নেতা। তার সংগে নানাসাহেব ও আজিমউল্লার যোগাযোগ। সোমনাথের গুরুর বিদ্রোহী হওয়ার পেছনে একটু কারণ আছে। ইংরেজের সংগে সম্পত্তি নিয়ে তাঁর বিবাদ এবং স্ত্রী সাবিত্রীর সংগে এক ইংরেজের অবৈধ সম্পর্ক আছে এমন একটি সন্দেহে-ও তিনি জ্বলছিলেন। তাই গৃহত্যাগ করেছেন। এরফলে সাবিত্রী পাগলিনী হয়ে স্বামীকে খুঁজে ফেরেন। তাদেরই মেয়ে চন্দ্রা।

চন্দ্রা এক মিশনারি সংস্থায় বড়ো হয়। একসময় গঙ্গাবক্ষে নৌকাডুবি থেকে সোমনাথ তাকে বাঁচায়। সেই থেকেও তাদের ভালোবাসা। এক জমিদারের পুত্রের নাম রমানাথ। সে চন্দ্রার রূপে পাগল। যেমন করেই হোক সে তাকে পেতে চায়। তাই ডাকাত দলকে টাকা দিয়ে চন্দ্রাকে অপহরণ করায়। ডাকাত দলের সঙ্গে সোমনাথের লড়াই হয়। সোমনাথ আহত হয়।

চন্দ্রা সোমনাথের প্রণয়িনী একথা জানতে পেরে রমানাথের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তখন সে দেশের জন্ম জীবন বিসর্জন দেওয়ার সংকল্প করে। এইসময় বিদ্রোহের আগুন পরিব্যাপ্ত। বিভিন্ন স্থানে ইংরেজের সংগে সিপাহীদের যুদ্ধ হচ্ছে। একটি যুদ্ধে সোমনাথের গুরু প্রাণ দেন। এই সংবাদে সাবিত্রী নিজের বুকে ছুরি মেরে আত্মহত্যা করেন। এর আগে কন্যা চন্দ্রার জন্ম একটি চিঠি রেখে যান, শেষ চিঠি। রমানাথ-ও ইংরেজের সংগে লড়াইয়ে জীবন দেয়। মৃত্যুর পূর্বে সোমনাথকে সে অনুরোধ জানিয়েছে চন্দ্রাকে বিয়ে করার।

সোমনাথ জেনেছে রামচাঁদ দস্যুদলপতি; ইংরেজের পক্ষে গুপ্তচর-ও বটে। শুধু এইটুকু জানে না, এ হলো সেই ব্যক্তি যে তাকে গঙ্গা থেকে তুলে আনার অপরাধে; অপবাদ ও জেলের শাস্তি পেয়ে সমাজ সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই কলুষ কর্মে নিমগ্ন। যাইহোক সোমনাথ রামচাঁদকে হত্যার জন্ম অসিযুদ্ধে নেমেছে। এই মরণ-যুদ্ধ থামাবার জন্ম পালিত পুত্রের নিকট যা শান্তা যখন ছুটে এলেন; তার আগেই পেছন থেকে নানাসাহেব গুলি করে হত্যা করেন দেশদ্রোহী রামচাঁদকে। তাই পিতা-পুত্রের মিলন হলো না।

এরপর হ্যাভলকের বাহিনীর কাছে সোমনাথ পরাজিত হয়। সোমনাথ ও তার মা এবং চন্দ্রাকে কলকাতায় চালান দেওয়া হয়। চন্দ্রা লর্ড ক্যানিং-এর কাছে দয়াভিক্ষা করে সোমনাথকে বাঁচায়। এই সময় ঘটনাচক্রে মায়ের শেষ চিঠি চন্দ্রার হস্তগত হয়। তার ফলে সে সোমনাথের সংগে দেখা না করেই বিবাগিনী হলো। সোমনাথের কাছে সেটাই 'ট্রাজেডি'।

পুশকিনের ক্যাপটেনের মেয়ের সংগে চন্দ্রার মিল ও বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের চরিত্রে আনন্দমঠের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করেছেন সুকুমার মিত্র।৭১

এতে গিরিশচন্দ্র যেসব চরিত্র চিত্রণ করেছেন তা স্পষ্টরূপ লাভ করে নি। প্রত্যেকটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। সমাজের প্রতি, সংস্কারের প্রতি বিরূপতা থেকে সৃষ্টি হয়েছে একেকটি চরিত্র। এর গতি-ও নাটুকে। প্রেম-প্রীতি, মমতা যেমন পরিপুষ্টিতা লাভ করল না, তেমনি বিদ্রোহী সত্তার সাফল্য ও বৈফল্য-ও স্পষ্টকিত হলো না। রামচাঁদের চরিত্রটি উপেন্দ্রনাথ মিত্রের 'নানাসাহেব'-এর নানকচাঁদ চরিত্রের সংগে মিল লক্ষিত হয়।

৪.

ঝান্সীর রাণী

চণ্ডীচরণ সেন মহাবিদ্রোহকে অবলম্বন করে 'ঝান্সীর রাণী' ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। এর প্রকাশকাল ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দ। এর একটি দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয় ১৮৯৪ বা ১৯০১ সালে। গ্রন্থটি দুষ্প্রাপ্য।৭২ উপন্যাসটি দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত রচনা। ইতিপূর্বে তিনি 'দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ'* উপন্যাস রচনা করে সুনাম অর্জন করেছেন।

ঝান্সীর রাণী উপন্যাসটি ৩৪৫ পৃষ্ঠার। এতে ৪৩টি অধ্যায় আছে। তিনি ভূমিকায় রাণী লক্ষ্মীবাঈর কীর্তিগাথা সম্পর্কে লিখেছেন—"রাণী লক্ষ্মীবাইর ন্যায় বীরাঙ্গনা ইংলণ্ডে কিম্বা আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করিলে, প্রত্যেক লোক আপন আপন গৃহে যত্ন সহকারে তাহার প্রতিমূর্তি রাখিতেন। কিন্তু ভারত-বর্ষের লোক এখন পর্য্যন্তও রাণী লক্ষ্মীবাইর গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।" [ভূমিকাংশ]

---

* গ্রন্থটির সম্পর্কে এই গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে বিশদ আলোচিত হয়েছে।

এমন একটি মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ চণ্ডীচরণের পূর্বেই করেছিলেন : "আমরা সিপাহি-যুদ্ধ সময়ের...অনেক বীরের নামোল্লেখ করিতে পারি যাঁহারা ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সংগীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্তিতে, অভ্রভেদী স্মরণ স্তম্ভে, অমর হইয়া থাকিতেন।"৭৩ অতএব, "আমরা সর্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইকে ভক্তিপূর্বক নমস্কার করি।"৭৪

ঝান্সীর রাণী রচনার পেছনে চণ্ডীচরণের যে একটি অন্তর্লীন বেদনা ছিল তা তাঁর বক্তব্যে পরিস্ফুট। "সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া দেশের নৈতিক বায়ু পরিশুদ্ধ না হইলে,—অসংখ্য লোকের শোণিত দ্বারা বসুন্ধরা সিক্ত, প্লাবিত এবং পরিপুষ্ট না হইলে, দেশীয় জনসাধারণের অন্তরাত্মা সাংগ্রামিক তেজে অনুপ্রাণিত না হইলে, জ্ঞানবীজ এদেশে কখনও অঙ্কুরিত হইবার সম্ভব নাই।" (পৃ ১০৫)

বিষয়বস্তু :

ঝান্সীর মহারাজের নাম গঙ্গাধর রাও। তাঁর দুই পত্নী লক্ষ্মীবাই ও গঙ্গাবাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা গঙ্গাবাইকে মহারাজের উপপত্নী বলেছেন। গঙ্গাবাই কোম্পানীর পেন্সনভোগী নারায়ণ ত্র্যম্বক শাস্ত্রীর কন্যা। একদা কলিকাতা নিবাসী সম্ভ্রান্ত ধনীপুত্র সমাজ সংস্কারক যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ওরফে যোগিরাজের প্রতি গঙ্গাবাই আসক্তা ছিলেন। বিষয়টি পিতামহী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পছন্দ না হওয়ায় তারা সুকৌশলে ঝান্সীর রাজের সঙ্গে গঙ্গাবাইয়ের বিয়ে দিলেন। ব্যর্থ প্রেমিক যোগিরাজ সাংসারিক জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে দেশ-পর্যটনে বেরুলেন।

ঘটনা দ্রুত বদলায়। মহারাজের অকাল মৃত্যু হলো। ইংরেজরা ঝান্সী তাদের রাজ্যভুক্ত করতে চান। বিরোধ সেখানেই : এসময়ে সারা দেশে ইংরেজের বিরুদ্ধে সিপাহীরা রাগে-রোষে ফুঁসছে। ইংরেজের দুর্নীতি ও কুশাসনে রাজা-মহারাজারা ক্ষুব্ধ। ক্ষুব্ধ আরেক কারণে-ও। তাঁরা ইংরেজের কাছ থেকে বঞ্চনা ও দুর্ব্যবহার ছাড়া আর কিছু পান নি। ঝান্সীর রাণীও তাদের মধ্যে একজন।

বিদ্রোহের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহীরা ঝান্সীর ইংরেজদের হত্যা করে। রাণী লক্ষ্মীবাই ও গঙ্গাবাই তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। এরপর

লক্ষ্মীবাই রাণীর সিংহাসনে আসীন হলেন। যোগিরাজ-ও ফিরে এসেছেন। লক্ষ্মীবাই ও গঙ্গাবাইয়ের ইংরেজ বিরোধিতা তাঁর পছন্দ নয়। তিনি ইংরেজের পক্ষপাতী। অথচ পুরনো প্রেম তিনি ভুলতে পারেন না। তাই রাণীদের মংগল চাইলেন। যুদ্ধ থেকে তাঁদের নিবৃত্ত চাইলেন। অবশ্য এরমধ্যে বিধবা গঙ্গাবাইকে আরেকবার চেষ্টা করলেন বিয়ে করার। চেষ্টাই মাত্র।

উভয়ের একটি ঘনিষ্ঠ আলাপন। যোগিরাজ বলছেন : "তুমি এখন বিধবা হইয়াছ। তোমার পিতা বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত বলিয়া মনে করেন। যদি আমাকে সুখী করিতে পারিলেই তোমার মনে সুখের সঞ্চার হয়, তবে এখন আমার জীবনের চিরসঙ্গিনী হইয়া আমাকে সুখী কর। তোমার সম্মিলন আমাকে চিরসুখী করিবে।" (পৃ ২৯৯)। কিন্তু সময় গড়িয়ে গেছে। গঙ্গাবাই এখন তাঁকে জিতেন্দ্রিয় পুরুষ ভাবতেই বেশি সুখী। তাই বলতে পারলেন—"তোমার চিরপবিত্র শরীর কলঙ্কিত করিবে ? তুমি জিতেন্দ্রিয়—তুমি যোগী"। (পৃ. ৩০১)

ইংরেজ সৈন্যরা বিদ্রোহ দমনের নামে বীভৎস হত্যাকাণ্ড সুরু করে দেয়। বীরাঙ্গনার লড়াই সুরু হয়। ফুলবাগে অসীম বীরত্বের সঙ্গে লক্ষ্মীবাই যুদ্ধ করলেন বটে তবু-ও শেষ রক্ষা হয়নি। ইংরেজের কামানের গোলায় সপত্নী গঙ্গাবাইসহ তিনি প্রাণ দিলেন।*

তাঁদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নারায়ণ ত্র্যম্বক শাস্ত্রী ও যোগরিাজ উপস্থিত ছিলেন। অন্ত্যেষ্টির পবিত্র মুহূর্তে যোগরিাজ শ্মশানের স্নিগ্ধ মাটিতে যে কটি কথা লিখলেন তা ব্যক্তিগত হয়ে-ও নিখিল স্পর্শী।

"অতুল বীরত্ব, শান্ত পবিত্র প্রণয়
অনাদৃত, এ শ্মশানে আজি ভস্মময়
অন্ধদেশ না চিনিল রতন উজ্জ্বলে ;
ভবিষ্যতে যদি কভু নব পুণ্যফলে
নূতন জীবন আর জ্ঞানদৃষ্টি লভে,
ফুলবাগ পুণ্যতীর্থে পরিণত হবে।" (পৃ. ৩৪৪)

* "১৮৫৮ সালের ১৭ই জুন তাঁর নশ্বরদেহ ভস্ম হয়ে গিয়েছে সত্য। তবু তিনি অমর। ভারতবর্ষের মানুষ ত্াঁর মৃত্যু স্বীকার করেনি। "অমর হ্যায় ঝাঁসী কি রাণী।"—মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য্য, ঝাঁসীর রাণী, ১৩৬৩, পৃ. ৪

ব্যর্থ প্রণয়ীকে দিয়ে যে বাণীমূর্তি রচনা করলেন চণ্ডীচরণ, তা ভবিষ্যৎ-চৈতন্যের মূলসূত্র। আত্মজাগরণের দিনে ইতিহাসের প্রতি বাঙালী সমাজের দৃষ্টি ও কৌতূহল ধাবিত হবে . এই বিশ্বাস চণ্ডীচরণ করতেন ভাব ও ভাষায় নয়,—বিষয় ভাবনাতে-ও।

৫.

অমরসিংহ

সিপাহীবিদ্রোহকালীন বিহারের এক বীর নায়ক কুমার সিংহ ও তাঁর ভাই অমরসিংহের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে 'অমর সিংহ' উপন্যাসটি লিখেছেন নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালীর যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল তা উপন্যাসে লক্ষ্যগোচর হয়। উপন্যাসটির প্রকাশ কাল ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দ। উপন্যাসটি ৪১টি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নগেন্দ্রনাথ সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় একটি গল্পও লিখেছেন। উপন্যাসটি বসুমতী সাহিত্য মন্দির থেকে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত নগেন্দ্রগ্রন্থাবলী দ্বিতীয় ভাগে সংকলিত হয়েছে। ৭৫

বিদ্রোহ সম্পর্কে নগেন্দ্রনাথের কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধার যোগ্য। এতে তৎকালীন বাঙালীর মনোভাব বোঝা সহজতর হবে। যেমন, "সন ১৮৫৭-৫৮ সালের সিপাহী-বিদ্রোহকে কেহ কেহ সিপাহী-যুদ্ধ বলিয়া থাকেন। প্রকৃত পক্ষে উহা যুদ্ধ নহে, বিদ্রোহ মাত্র। যেদিন ভারতবাসীর সহিত ইংরাজের যুদ্ধ হইবে, সেইদিন ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজের বাস উঠিবে।" (পৃ. ২৮৯)

অথবা,

"দেশ ইংরাজের স্বপক্ষে ছিল, প্রবল প্রভাপান্বিত রাজগণ ইংরাজের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করেন নাই। লোকে ইংরাজের আনুকূল্য করিত সিপাহী-দিগকে সাধ্যমত সাহায্য প্রদান করিতনা।" (পৃ ২৮৯)

এবং

"যুদ্ধ যাহা হইয়াছিল, তাহা ইংরাজে ও ইংরাজের সিপাহীতে। সকল সিপাহী ও ইংরাজের বিপক্ষ হয় নাই। শিখেরা ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ না করিলে, বিদ্রোহাগ্নি এত সহজে নির্ব্বাপিত হইত না। এরূপ যুদ্ধকে বিদ্রোহ

নামে অভিহিত করিতে হয়।" (পৃ. ২৯০) বিদ্রোহের স্বপক্ষে নগেন্দ্র নাথ কিছু বলেছেন। যেমন, "পর্ব্বতের প্রকাণ্ড কটাহে যেমন তরল অগ্নি ফুটিতে থাকে, ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানালোকের হৃদয়ে সেইরূপ তরলাগ্নি ফুটিতে-ছিল। ইংরাজের অজ্ঞাতে বিদ্যুৎ-শিখার ন্যায় বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ চতুর্দিকে নিক্ষিপ্ত হইল। ইংরাজ ঘুমাইতেছিল, উঠিয়া দেখিল, গৃহের চতুর্দিকে অগ্নি লাগিয়াছে।

নিঃশব্দে অথচ বিদ্যুদ্গতিতে বিদ্রোহের বীজ দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। ইংরাজ সৌভাগ্যশালী, সেইজন্য বীজোদ্ভূত বৃক্ষ শিশুতে নিয়মিত জলসেক করিবার কেহ ছিলনা। যাহারা অগ্নি লাগাইয়াছিল, তাহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্র হস্ত, কিন্তু অগ্নিতে ইন্ধন প্রদান করিবার কেহ ছিল না, সেইজন্য সেই ভারত-ব্যাপী হুতাশন অতশীঘ্র নিভিয়া গেল, নহিলে ইংরাজ ভস্মীভূত হইয়া যাইত, তাহার চিহ্ন এ দেশ হইতে লুপ্ত হইত।" (পৃ. ২৯০)

মূলকাহিনী :

কুমার সিংহ শাহাবাদ জেলার প্রতাপশালী জমিদার। প্রজানুরঞ্জক, মুক্তহস্ত জমিদার ঋণভারে দুর্দশাগ্রস্ত। ঋণ মুক্তির জন্য তিনি বোর্ড অবরেভিনিউকে জমিদারীর ভার দিতে চাইলেন। বোর্ডঅবরেভিনিউ সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঋণের বিশ লক্ষ টাকা কুমার সিংহের স্কন্ধেই চাপান হয়েছিল। কুমার সিংহ বিপদে পড়লেন। ইংরেজের ওপর তাঁর ভরসা অন্তর্হিত হলো। তিনি বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন।

কুমার সিংহের দুই ভাই,—সমর সিংহ ও অমর সিংহ। দুই ভাইকে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পর সমর সিংহ মারা যান। অমর সিংহ সংসার সম্পর্কে উদাসীন হন। সন্ন্যাসী হলেন।

অমর সিংহের জীবনের উদ্যোগপর্বে দুজন সাধু পুরুষের সাক্ষাৎ মেলে। একজন ফকির ফজলশাহ ও অপরজন বাঁশুলিয়া বাবা। ফজলশাহের নির্দেশে অমরসিংহ সন্ন্যাস জীবন ত্যাগ করে সংসারে ফিরে এলেন। কুমার সিংহের পাশে দাঁড়ান।

সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কুমার সিংহ বিদ্রোহী সিপাহীদের ইন্ধন যোগান। নেতৃত্ব দেন। ফলে আরায় ও দানাপুরে সাময়িক ভাবে ইংরেজ শাসন বিযুক্ত হলো।

মেজর আয়ার গাজিপুরে চলেছিলেন। পথে শুনলেন আরায় ইংরেজরা বিষম সংকটে। তিনি ফৌজ নিয়ে আরায় উপস্থিত হলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো দুপক্ষের। এতে কুমার সিংহ পরাজিত হন। ক্রুদ্ধ আয়ার জগদীশপুরে কুমার সিংহের বসত বাটী বিধ্বস্ত করলেন। একবার অমর সিংহ বিদ্রোহী সিপাহীর পৈশাচিকতার হাত থেকে রক্ষা করেন এক ইংরেজ রমণীকে। তার নাম লরা। এই উদ্ধার কর্মে অমর সিংহ আহত হন। এই সময় অমর সিংহ ও লরা বাঁশুলিয়া বাবার গোপন আশ্রয়ে কিছু কাল একত্রে কাটান। লরা অমর সিংহের প্রেম পড়েন।

খল দারোগা রামশরণ ইংরেজের গুপ্তচর। রামশরণের কৌশলে বিদ্রোহী নায়ক অমর সিংহ ইংরেজের হাতে বন্দী হন। কিন্তু ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতারণা করে লরা অমর সিংহকে উদ্ধার করে আনেন। এই সময় ঘটনা দ্রুত বদলায়। কুমার সিংহ অমর সিংহকে স্থলাভিষিক্ত করে দেহ ত্যাগ করেন। অমর সিংহ গোপন আশ্রয় হতে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন বটে। তবে ইংরেজকে প্রতিহত করতে পারলেন না। অবশেষে বাঁশুলিয়া বাবার নির্দেশে তিনি সপরিবারে নেপালে পালিয়ে গেলেন। প্রতিহিংসা পরায়ণ রামশরণ তাঁর পিছু নেয়। এবং অরণ্যের এক গুপ্ত স্থান থেকে গুলি করে। সমর সিংহের বিধবা পত্নী লছুমী অমর সিংহকে বাঁচাতে সেই গুলিতেই জীবন দিলেন। ভালোবাসার চিরন্তন মূল্য হিসেবেই। লছুমীর সুগোপন ভালো বাসা—"কেহ জানিতনা, সে নিজেই জানিত না। মরিবার সময়কালে জানিল। লছুমীর অন্তিম কালের সেই দৃষ্টি অমর সিংহের মনে চিরকাল জাগরুক রহিল।" (পৃ. ৩৫৭)

সিপাহী বিদ্রোহ সাঙ্গ হওয়ার সংগে সংগে ইংরেজি ভাষায় বেশ কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে। এসবের পটভূমিকা সিপাহী বিদ্রোহ। ঔপন্যাসিকরা দাবী করেছেন সশস্ত্র সংঘর্ষের 'সত্য ঘটনা ভিত্তিক' কাহিনীর রূপালেখ্য মিলবে তাঁদের রচনাতে। এসব উপন্যাসের সাধারণ পরিচিতি 'মিউটিনি নভেল্স'৭৬ নামে।

অবশ্য, একটি কথা মনে রাখা দরকার সিপাহী বিদ্রোহ উনিশ শতকীয় ইংরেজ লেখকদের মনে যে ভীতির সঞ্চার করেছিল তারই প্রতিক্রিয়া মেলে

তাঁদের রচনায়। বিজাতীয় মনোভাব, ভারতীয়দের প্রতি ক্রোধ-রোষ, ঘৃণা-বিদ্বেষ প্রভৃতির প্রতিভাস মিলবে এসবে।

প্রথম মিউটিনি-নভেল 'দি ওয়াইফ অ্যাণ্ড দি ওয়ার্ড, অর, এ লাইফ'স এরর' ১৮৫১ সালে রচিত হয়েছে বটে তবে লেখক অজ্ঞাত। এরপর উল্লেখযোগ্য, মেডোস টেলরের রচিত 'সীতা' উপন্যাসটি। এই লেখকের লেখা ত্রয়ী উপন্যাস 'তারা', 'র‍্যালফ ডার্নেল' ও 'সীতা' (১৮৭৩) ইংরেজ ও ভারতবাসীর সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতায় রচিত। 'র‍্যালফ ডার্নেল' উপন্যাসটি পলাশী যুদ্ধের পটভূমিকা ও 'সীতা' সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত। টেলর এই গ্রন্থ দুটিতে "অনেক বেশি বস্তু নিষ্ঠ এবং অনেক কম এক দেশ দর্শিতায় প্রস্তু।"৭৭

আবার ফ্লোরা অ্যানী স্টিলের 'অন দি ফেস অব দি ওয়াটার' (১৮৯৭) গ্রন্থে সিপাহীদের সম্পর্কে নরম ও সহানুভূতিশীল মনোভাব দুর্লক্ষ্য নয়। সেদিক থেকে বিপরীত মনোভাবের পরিচয় ও সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে জর্জ টি. চেসনীর 'দি ডিলেমা, অর, এ উওম্যান'স কাটচ্যুড' (১৮৭৬), শ্রীমতী ই. এম. ফীলডের 'ব্রাইডা : এ স্টোরি অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি' (১৮৮৩), গিলি অ্যালেনের 'দি রাণী : এ লিজেণ্ড অব ইণ্ডিয়ান মিউটিনি' (১৮৮৭) প্রভৃতি গ্রন্থে।

কিন্তু একটি কথা বলার থাকে। বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ লেখকগণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সংগ্রাম চিত্র এঁকেছেন, উদার ভাবে এবং কথাসাহিত্য রচনা করেছেন অনেকটা নিরপেক্ষভাবে। পূর্বসূরীদের চেয়ে সংস্কার মুক্ত তার নিদর্শন অবশ্য রুডিয়ার্ড কিপলিঙ্-এর সাহিত্যে মেলে না। ভারতীয় জীবনের পটভূমিকায় কিপলিঙ্-এর সাহিত্য গড়ে উঠলে-ও তাঁর মানস পরিমণ্ডলটি গঠিত ছিল "সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংবদ্ধ ব্রিটিশ জাতির চিরন্তন অহমিকা—সেই গর্ববোধ ও কিপলিঙ্-এর সাহিত্যে বাণী রূপায়িত।"৭৮ অথচ তাঁরই সমসাময়িক লেখকী বেরেস ফোর্ড-এর 'দি সেকেণ্ড রাইজিং' (১৯১০) এবং এডমণ্ড কেণ্ডলারের 'শ্রীরাম, দি রেভোল্যুশনারী' (১৯১২) গ্রন্থ দুটি নিরপেক্ষতা ও উদারতায় [illegible]। প্রসংগক্রমে বলা যায়, শশিচন্দ্র দত্তের 'শঙ্কর, এ টেল অব দি মিউটিনি অব ১৮৫৭' (১৮৭৪) গ্রন্থে (যথাস্থানে আলোচিত হবে) যে সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ পেল এবং যার বিস্তৃতি ঘটে শ্রীমতী স্টিলের উপন্যাসে তারই ব্যাপক রূপায়ণ ঘটেছে এ দুটি উপন্যাসে।৭৯

চার. সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় নাটক…

॥ ১ ॥

সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকায় অমৃতলাল নিয়োগী* একটি নাটক রচনা করেছেন,—সেটির নাম 'নির্ব্বাপিত দীপ'। ১২৮৩ সালে নাটকটি প্রকাশিত হয়। নাটকটি ছোটো এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০+৬। এতে মোট বারোটি গীত রয়েছে।

নানাসাহেব ও ঝান্সীর রাণীর কাহিনী নিয়ে নাটকটি রচিত হলে-ও কাল্পনিক চরিত্রের ভিড় আছে বটে।

কথাবস্তু।

নানাসাহেব ও ঝান্সীর রাণী ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেছেন। কিন্তু ঝান্সীর বাঙালী সেনাপতি গোপাল ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণের বিপক্ষে। সে ইংরেজের একনিষ্ঠ সমর্থক। নানাসাহেব তাঁকে অপমান করেন। ফলত, গোপাল নানাসাহেবকে অপদস্থ করার চেষ্টায় থাকেন। সুযোগ-ও মেলে নানাসাহেবের চারিত্রিক দুর্বলতা জনিত একটি সুযোগ।

নানাসাহেবের একজন বাঙালী অনুচরের নাম রামলাল বসু। নানা তাঁর রূপবতী কন্যা কৃষ্ণ ভাবিনীকে অপহরণ করান ও কারাগারে রাখেন। গোপাল এই ঘটনাটি একটি পত্রে রামলালকে জানান। কিন্তু তিনি তা বিশ্বাস করলেন না। গোপাল এতে ক্ষুব্ধ হন ও ষড়যন্ত্র করেন।

নানাসাহেবের পত্নী মহীকুমারী স্বামীকে বুঝিয়ে কৃষ্ণ ভাবিনীকে মুক্তি দেবার দিন ধার্য করেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনের আগেই গোপাল কৃষ্ণ ভাবিনীকে হত্যা করে একটি সিন্দুকে ভরে রামলালের কাছে পাঠিয়ে দিল।

* সুকুমার মিত্র '১৮৫৭ ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে লেখকের নাম বলেছেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র (পৃ. ৭১)। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থ তালিকার ক্রমিক সূচিতে (৬৪৮১ পৃ, ১১৩) ছাপা রয়েছে অমৃতলাল নিয়োগী। 'নির্ব্বাপিত দীপ' গ্রন্থটির প্রথম দিকের কয়েকটি পাতা না থাকায় লেখকের নাম ও অন্যান্য তথ্য জানা যাচ্ছে না। অন্যত্র খোঁজ করেছি গ্রন্থটি পাওয়া যায় নি। আমরা গ্রন্থকারের নাম ও প্রকাশকালের তারিখের জন্য পরিষদ গ্রন্থ তালিকার উপর নির্ভর করতে পারি।

শোকাভিভূত পিতা প্রতিশোধ নিলেন নানার ওপর। তিনি লর্ড ক্যানিং ও ইংরেজ সেনাপতি হ্যাভলকের নিকট ইংরেজের বিরুদ্ধে নানাসাহেবের সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস করে দেন। এর ফলে নানার বিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হন। পালিয়ে যাবার সময় গোপাল তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। অবশ্য গোপাল-ও নিহত হলেন নানাসাহেবের ভাই মধুরাও-এর গুলিতে। এরপর মহীকুমারী স্বামীর চিতায় সহমরণে যান। নানাসাহেবের ঘনিষ্ঠ এক বাঙালী সহচর চন্দ্র কাতর কণ্ঠে বলেন : "হায়রে। এতদিনের পর ভারতের গৌরব-দীপ নির্ব্বাপিত হ'ল !! ভারতবাসিগণ চিরসন্তাপ সাগরে ভাসমান হ'ল !!!" (পৃ. ৫০)

নাটকটির ভিত্ দুর্বল। মূল প্লটে বাঙালী চরিত্রের মেলা। নাট্যকারের একটি প্রচার ছিল যেন নানাসাহেবের পতনের পেছনে বাঙালীর অবদানই বেশি। তাই অকপটে বাণী দিয়েছেন,—দৈববাণী।

শোনরে বাঙ্গালি জাতি ;
জ্বালালি বিষের বাতি ;
ডুবিল তোদেরি তরে স্বাধিন তপন।
নারিরক্তপাতে পুনঃ বঙ্গের পতন॥ (পৃ. ৫০)

কিন্তু নাট্যকারের দেশাত্মবোধ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। দেশের জয়গান গেয়েছেন। দিয়েছেন জাগরণ-মন্ত্র ও অভয়বাণী :

গীত সংখ্যা—৬ / পরজ-কাওয়ালি
রণমদে মাতরে এখন।
শত্রুগণে রণাঙ্গনে কর আহ্বান।
নিষ্কোষিয়া তরবারি,
জয় জয় রব করি ;
কম্পিত কর আজি ভারত ভুবন।
ভারত সমরাঙ্গণে
শেতাঙ্গ যবনগণে ;
পাঠাওরে শমন ভবন॥

অথবা,

গীত সংখ্যা—১২ / ছায়ানট—আড়াঠেকা

কি হলো হায়।
নিরাশ আশায় ॥
কঠিন পাষাণ হৃদি, বিদরিয়ে যায় রে;
শোক আঁখি জলে
হৃদি ভেসে যায়।
তারতেরি শেষ ফল, বুঝিয়ে ফলিল;—
অকালে প্রলয় বায়ু,
ওই বহি যায় !!!

এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে নিতে হয়। তা হলো নাটকটির প্রকাশকাল সিপাহী বিদ্রোহের বিশ বছরের মধ্যেই। সেই সময় বাঙালী মনোভাবের যে পরিবর্তন আসছিল, তা নাটকটিতে ইংগিত বহ। লেখক সে কারণেই ঐতিহাসিক কাহিনীকে উপজীব্য করেছেন। আরেকটি কথা। সময় ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই সাহিত্য সৃষ্টি হয়। সেক্ষেত্রে এই নাটকটি সার্থক নামা।

॥ ২ ॥

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাটক লিখেছিলেন সিপাহী বিদ্রোহের বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইয়ের কাহিনী নিয়ে। নাটকটির নাম 'ঝাঁসীর রাণী'৮০। নাটকটি অসম্পূর্ণ।

গিরিশ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বদেশপ্রাণ। এই অসম্পূর্ণ নাটকটিতে তা বুঝতে অসুবিধে নেই। বীরাঙ্গনা নারীর দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা ও স্বাধীনির্বিত্তির মধ্যে তাঁর চিত্ত ভাবনার সমূহ প্রকাশ ঘটেছে। অবশ্য চরিত্র রূপায়ণে ও বলিষ্ঠ আঙ্গিক সৃষ্টিতে তাঁর কুশলী চেষ্টা এখানে মেলে না বটে। তবে ইতিহাসের মূলগ্রহন-ও রাণীর দূরদর্শিতা ও তেজস্বিতা স্পষ্ট করেই এঁকেছেন।

প্রসংগক্রম :

বিধাতার বঞ্চনায় রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের তিন মাসের শিশুপুত্রের অকাল মৃত্যু। পুত্রশোকে মহারাজ শয্যাগত। দত্তকপুত্র গ্রহণের চতুর্থ দিবসে

মহারাজের স্বর্গলাভ—এ নিয়ে গভীর আলোচনা চলে রাজার অমাত্য বর্গের মধ্যে।

রাণী লক্ষ্মীবাই রাজ-সভা আহ্বান করেছেন। কারণ, মহারাজের উইল অনুসারে দত্তকপুত্র সিংহাসনের অধিকারী। রাণী তার অছি। কিন্তু তিনি টের পেয়েছেন, ইংরেজরা মহারাজের অন্তিম বাসনা পূর্ণ হতে দেবেন না, ঝাঁসী অধিগ্রহণ করবেন। তাই রাজকার্য নির্বাহ হবে কিভাবে; তা নিয়েই এই আলোচনা সভা।

কিন্তু অনেকের মতোই বিশিষ্ট অমাত্য মেরোপন্থ বলেন, কোনো কিছুর সিদ্ধান্তের আগে দত্তক পুত্র-বিষয়ক মহারাজের প্রেরিত পত্রের উত্তর বড়লাট কী জানান, তা দেখা যাক। কিন্তু লক্ষ্মীবাইয়ের মত ভিন্ন। তিনি বলেন: "আপনারা সকলে রাজঅমাত্য রাজনীতি বিশারদ, কি উত্তর আসবে, আপনারা কি জ্ঞাত নন? মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজ্যগ্রহণ, বর্দ্ধদেশ অন্তচ্ছেদ, সেতারা অধিকার উপর্য্যুপরি এই সকল কার্য সম্মুখে দর্শন করে, এখনো পত্রের কি উত্তর হবে, আপনারা অবগত নন? পত্রের উত্তর আসবে—ঝাঁসী ইংরাজের রাজ্যভুক্ত।"

রাণীর এই অনুমান অনতিবিলম্বেই সত্য হয়ে যায়। তাই ইংরেজ সেনাপতি ম্যালকম যখন বলেন—লর্ড ডালহৌসীর হুকুম "অদ্য হইতে কেল্লায় ঝাঁসীর পতাকা নামাইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পতাকা উড়িবে।"

রাণীর সংক্ষিপ্ত উত্তর। "আমার ঝাঁসী আমি দেব না।" কিন্তু রাণীকে দুর্গ যখন ছাড়তেই হলো, তখন রাণীর অগ্নিভাষণ আমাদের মনকে অধিকার করে—"আজ আমি দুর্গ হতে বহিষ্কৃত হলেম, আজ ঝাঁসী পতিত হলো, কিন্তু যদি ইংরেজ পদার্পণের ভার, ধর্ম্ম, মনুষ্যত্ব, ভারতে বিলুপ্ত না হয়ে থাকে, তাহলে আবার একদিন ঝাঁসীর দুর্গে পতাকা উড্ডীয়মান হবে, আবার একদিন রাণীরূপে আমি ঝাঁসীর সিংহাসনে উপবেশন করে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করবো।"

রাণীর প্রতি নাট্যাচার্যের যে অবিমিশ্র শ্রদ্ধা ছিল তা এমন বাক্-নির্মিতির মধ্যে সুস্ফুট। ফলত, ইতিহাস সাহিত্যের আঙিনায় এসে হাজির হয়, হাত ধরে।

এখানে উল্লেখ্য, গিরিশচন্দ্রের 'চন্দ্রা' উপন্যাসটির কথা বলে এসেছি। এটি বিদ্রোহের পটভূমিতে রচিত। কিন্তু এতে তিনি সমাজের কুৎসিৎ দিকের

প্রতি যেমন অঙ্গুলি সংকেত করেছেন ও বিদ্রোহকালীন শিক্ষিত বাঙালীর দোটানা মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন; তেমন ছবি অবশ্য এই নাটকটিতে আঁকেন নি। তবে দেশচিন্তক গিরিশচন্দ্রকে এখানে স্পষ্ট চেনা যায়।

॥ ৩ ॥

আমরা আরেকটি ঐতিহাসিক নাটকের নাম করতে পারি। অবশ্য তা কিশোর নাটক হলে-ও তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। নাটকটির নাম 'বিদ্রোহী'। লেখক বিধুভূষণ চক্রবর্তী। কাটোয়া থেকে ১৩৭০ সালে এটি প্রকাশিত হয়। নাটকটি ছোটো। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। নাট্যকার সিপাহী বিদ্রোহকে কী চোখে দেখেছেন তা তাঁর একটি প্রশস্তিমূলক কবিতাতে আভাসিত। কবিতাটি হলো এই;

'হে বিদ্রোহি!
হে বীর সিপাহি!
তুমি হে পূজারি!
এনেছো যে স্বাধীনতার অগ্নিবাণী,
তুলেছো উচ্চে বন্দনরে হে মহামানি!
অধীনতা সঙ্কুচিত ব্যথিত পরাণী
অত্যাচার-জর্জরিত স্বদেশ কল্যাণি।
হে বিদ্রোহি!
হে বীর সিপাহি!
তুমি হে পূজারি!'...

নাট্যকার বিহারের কুমার সিংহের বিদ্রোহকে উপজীব্য করেছেন। কুমার সিংহ বিদ্রোহের সংগঠক। এবং তিনি কেন যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুখর সেকথা তাঁর ভাষণে সুস্ফুট। তিনি তাঁর অনুগামীদের বলছেন—

"তোমরা বীর বিক্রমে যুদ্ধ ক'রে দেশ রক্ষা কর। অত্যাচারীকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দাও। আমি অশীতি বয়স্ক, ব্যাধি পীড়িত, তবুও এই কৃপাণ হস্তে স্বদেশের জন্য অত্যাচারীর ধ্বংসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছি। যে ফিরিঙ্গী প্রভুর দৌরাত্ম্যে আমি হৃত-সর্বস্ব, প্রতিপত্তিহীন হয়ে আজ দেহের এই অন্তিম অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি, তোমরা তার প্রতিশোধ নাও। নানারূপ করতারে

জর্জর করে নীলকরের কঠোর পাশবিক অত্যাচারে যে জাতি ভারতের সর্ব প্রদেশের অস্থিমজ্জা ভেঙে চূর্ণ করে দিয়েছে—তার প্রতিশোধ নাও।"৮১

এখানে ইতিহাসের সংগে সাহিত্যের অসংগতি নেই।—ভারতের অধিকাংশ সামন্ত প্রভুরা আত্ম অসন্তুষ্টির কারণেই ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। ইতিহাসের সেই তথ্য এখানে প্রাণিত হয়েছে।

পাঁচ. দিনলিপি, বিবরণী ও আত্মচরিতে সিপাহী বিদ্রোহ…

এক…পর্যটকের দিনলিপি…

"২৩ জ্যৈষ্ঠ (১২৬৪), ৪ জুন, বৃহস্পতিবার।
বেলা দুই প্রহর চারিঘণ্টা পরে বারাণসীর সেনাপতিগণ দেশীয় পদাতিকগণকে অনুমতি করিলেন যে, 'গবর্ণমেণ্ট হইতে কিছু নূতন হুকুম আসিয়াছে তাহা সকলের গোচরার্থ প্রকাশ করিব। অতএব তোমরা প্যারেডপর দণ্ডায়মান হও।'

প্যারেডের হুকুম দেওয়াতে পশ্চিম দিকে শিখ পদাতিকগণ, দক্ষিণ দিকে সওয়ারগণ, মধ্যস্থলে বলণ্টারি পদাতিক, এক পণ্টনের মধ্যে দুই কোম্পানি গাজিপুর ও জৌনপুরে ছিল, তদ্ভিন্ন যত পদাতিক ছাউনীতে ছিল, সকলে বিনাস্ত্র প্যারেডে দণ্ডায়মান হইলে পর, সেনাপতিগণ সুসজ্জীভূত হইয়া গোরা পদাতিকগণকে হত করিতে অনুমতি করিলেন।…তাহাতে বিধিকৃত বলণ্টারি পদাতিক দুইশত হত হইয়া বক্রী পলায়ন সময় তোপের ধূমে রণস্থল ঘোর কুজ্ঝটিকার ন্যায় অন্ধকার হইয়াছিল।"

গত শতকের এক পর্যটকের দিনলিপি এটি। ঘটনাটি মর্মান্তিক। বিদ্রোহী সিপাহীরা দিল্লী ও মীরাটে ইংরেজ শাসন বিচূর্ণ করেছে। কাশী-ও অগ্নিগর্ভ। সিপাহীদের দমন করার জন্য এসেছেন সেনাপতি নীল। এক কূট-কৌশলে কাশীর শিকরোলে যে নিষ্ঠুর কর্মটি তিনি করলেন: তারই মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শী ভ্রমণবিলাসী যদুনাথ সর্বাধিকারী। ১২৬০ সালের ১১ই ফাল্গুন থেকে ১২৬৪ সালের ৯ই অগ্রহায়ণ পর্যন্ত—এই প্রায় চার বছর ধরে আর্যাবর্তের তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেছেন। কাশীতে থাকা কালীন তাঁর

চোখের সামনেই এমন ভয়ানক দৃশ্যটি ঘটল : তারই তথ্যবিবৃতি দিয়েছেন পূর্বোদ্ধৃত দিনলিপিটিতে।

যদুনাথের রোজনামচাটি লেখা হয়েছিল বাঁধানো একটি খাতায়। এটি দীর্ঘকাল অমুদ্রিত থাকে। ১৩২২ সালে (ইং ১৯১৫) প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় গ্রন্থকারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি গ্রন্থের নাম দেন 'তীর্থ ভ্রমণ'৮২।

এতে কাশী ও গয়ার বিবরণ গুরুত্ব পেলে-ও দিল্লী, মীরাট, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কানপুর, বিঠুর প্রভৃতি স্থানের সিপাহীদের বিদ্রোহের কথা তিনি লিখেছেন। কিছু তিনি দেখেছেন, কিছু বা শুনেছেন এবং অনেকটাই সংগ্রহ করেছেন সংবাদপত্র থেকে। যদুনাথ দুই একটি বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। যেমন 'খয়ের খাঁ' বাঙালীদের প্রতি সিপাহীদের আক্রোশ সম্পর্কে। খয়েরখাঁ বাঙালীরা সিপাহীদের কেমন ভয় করতেন ; তার উল্লেখ করে যদুনাথ লিখেছেন : "সাহেব বাঙ্গালিদিগকে দেখিতে পাইলেই অধিক আক্রমণ, সাহেবরা সপরিবারে গড়ের মধ্যে ও বাঙ্গালি সকলে নানাস্থানে গুপ্তভাবে আছে। যাহাদের পরিবার সঙ্গে, তাহাদের অতিশয় ক্লেশ।...অনেক বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী অবধূত থাকীর বেশ ধারণ, কেহ বা পাগলের বেশ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছে।" এরফলে প্রতিষ্ঠাবান বাঙালী যেমন প্রয়াগের সাব অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন তারাচাঁদ চক্রবর্তী ও ডেপুটি পোষ্ট মাস্টার বিশ্বনাথ দে কিংবা কানপুরের নীলকর সাহেবের কর্মচারী করুণাময় ভট্টাচার্য বিদ্রোহীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন।

সিপাহীদের ক্ষোভের সমর্থন প্রসংগে প্রচ্ছন্ন ইংগিত দিয়েছেন যদুনাথ। তা হলো, যখন কাশীর রাজা সিপাহী ও ইংরেজের মধ্যস্থতা করতে তৎপর হলেন; তখন বিদ্রোহী গুমান সিং বলেন—"যখন মানহানি হইয়াছে' তখন ধন প্রাণের ভয় কি আছে? সাহেবদিগের সহিত মিল করিতে হইলে ঘরের বহু-বেটি না দিলে হইতে পারে না।"

ভ্রমণ কাহিনী অবশ্য ইতিহাস নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকরা এসব টুকরো টুকরো দিনলিপি থেকে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। তাই পর্যটকের রোজনামচার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম নয়।

১. হুতোমের বিবরণ

কালীপ্রসন্ন সিংহ সিপাহীবিদ্রোহের সময় যে সব হুজুক দেশকে মাতিয়ে তুলেছিল, তা নিয়ে তিনি ব্যঙ্গরসিকতা করেছেন। বাঙালীর ভীরুতা সম্পর্কে-ও নিষ্ঠুর ইংগিত দিয়েছেন তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' গ্রন্থে।৮৩

"পশ্চিমের সেপাইরে ক্ষেপে উঠেচে, নানাসাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লীর নোড়ে চৌক আবার "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হবেন—ভারি বিপদ। সহরে ক্রমে হলস্থুল পড়ে গ্যালো, চুনোগলি ও কসাই-টোলার মেটে ইংরেজ, পিদরুস, পবিস, ডিস্ প্রভৃতি ফিরিঙ্গীরে থাবার লোভে ভলিন্টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বস্লো, নানারকম অদ্ভুত হুজুক উঠতে লাগলো—আজ দিল্লী গ্যালো,—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশাখ্যালার হারকেতের মত ইংরেজরা উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—"। (পৃ. ৫৪)

হুতোমের কশাঘাত।

তখন বাঙালিরা ক্রমে "বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে, "যদিও একশ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙালিই আচেন—" (পৃ. ৫৪)

আবার 'মিউটিনির' সময় ইংরেজদের শোচনীয় অবস্থা প্রসংগে হুতোম কিছু হুজুকের কথা-ও বলেছেন।

"ইংরেজরা বাপ, ছেলে ও স্বজাতি শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠে-ছিলেন, তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লার্ড ক্যানিঙের রিকলের জন্য পার্লিয়া-মেন্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের একশেষ হয়ে গ্যালো।" (পৃ. ৫৫)

২. শিবনাথ শাস্ত্রীর বিবরণ

সিপাহীবিদ্রোহকে কেন্দ্র করে যে সব গুজব উত্থিত হয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী। শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন: "১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বিদ্রোহী সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা শহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্যা করিবে এবং

কলিকাতা সহর লুট করিবে। এই অবসরে কলিকাতার অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন, দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় কি হয় বলিয়া ...... বাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও দেশীয় খ্রীষ্টানগণ সর্ব্বদা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বন্দুকের দোকানের গলায় অসম্ভব রূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়া গভর্ণর জেনেরাল লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভুত পরামর্শ দিতে লাগিলেন,—কালাদের অস্ত্রশস্ত্র হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি; ক্যানিং তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরাজেরা তাঁহার নাম Clemency Canning "দয়াময়ী ক্যানিং" রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদ-পত্র সকলের স্বাধীনতা হরণ করা হইবে, কালি কথা উঠিল, রাত্রি ৮টার পর যে মাঠের ধারে যায় তাহাকেই গুলী করে, সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত, একটি জিনিষের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইতনা; লোকে নিজ বাসাতেই দুই চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ মত প্রকাশ করিতে সাহস করিতনা, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে। কিন্তু অধিক রাত্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া আসিতে গেলেই পদে পদে অস্ত্রধারী প্রহরী জিজ্ঞাসা করিত "হুকুমদার" অর্থাৎ (Who comes there ?) তাহা হইলেই বলিতে হইত, "রাইয়ত হ্যায়" অর্থাৎ আমি প্রজা, নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে একটা ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়া কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই।

যাহাহউক ইংরাজগণ সত্বর বিদ্রোহাগ্নি নির্ব্বাপিত করিলেন।...কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক নবশক্তির সূচনা হইল; এক নব আকাঙ্ক্ষা জাতীয় জীবনে দেখা দিল।"৮৩

৬. মুবারক শাহের পুঁথি

মুবারক শাহ তাঁর পুঁথিতে দলছুট-ইংরেজ সিপাহীরা যে বিদ্রোহীদের সংগে যোগ দিয়েছে তার বিবরণ দিয়েছেন। মুবারক শাহ তাঁর পুঁথিতে বেরিলি থেকে আগত একজন ইংরেজ বর্গ বাবকের কথা-ও উল্লেখ করেছেন; তিনি বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছিলেন।

মুবারক শাহ উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বুলন্দশহর নগর জেলার অধিবাসী। কিছুকাল শাহারানপুর এডওয়ার্ড সাহেবের অধীনে চাকরি করেছিলেন। তিনি দিল্লীর নিকটবর্তী মুন্দ নামক থানার দারগা থাকাকালীন সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; একদিন বিদ্রোহী সিপাহীরা তাঁর থানায় চড়াও হলে তিনি বিদ্রোহী দলেই যোগ দিলেন।

এরপর তিনি দিল্লী যান; সেখানে কোতোয়ালের কাজ নেন। বিদ্রোহীদের হাতে দিল্লীর পতনের সময় পর্যন্ত তিনি কোতোয়ালের কাজ করেছেন। কিন্তু বিদ্রোহ দমিত হলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে ফেরেন। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে সাবেক মনিব এডওয়ার্ডের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এডওয়ার্ড কপর্দক শূন্য, নিরস্ত্র মুবাবক শাহকে তাঁর শিবিরে রেখে দিল্লীর অবরোধ কাহিনী লিখতে বলেন। সেটি মুবারক শাহের পুঁথি নামে পরিচিত। এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন এডওয়ার্ড স্বয়ং।৮৫

মুবারক শাহের পুঁথি-বিবরণী থেকে তিনটি বিষয় স্পষ্টীকৃত হয়। ১. বিদ্রোহী সিপাহীদের দলে বিশুদ্ধ ইংরেজ* সিপাহী-ও ছিল ২. বিদ্রোহীদের দ্বারা দিল্লীর অবরোধ কাহিনী ৩. মুবারকশাহ বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়েছিলেন ইংরেজ সান্নিধ্যে থাকা সত্ত্বে-ও।

তিন...[illegible] ও...

১. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী

বাঙালী মনীষী দেবেন্দ্রনাথ দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। হিমালয়ের ধ্যান গম্ভীর সৌন্দর্য অনুভব ও নির্জনে [illegible] বাসনায় তিনি ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল সিমলায় পৌঁছুলেন। সেই বছরই বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। সিমলায়-ও সে বিদ্রোহ-বহ্নির উত্তাপ কিছু কম ছিল না। [illegible] অগ্রগমন ও উন্মত্ততা সম্পর্কে হঠাৎ কিছু খবর কিছু বা গুজব আসের [illegible] তার উল্লেখ তিনি করেছেন তাঁর আত্মজীবনীতে। পরিস্থিতির এই [illegible] লেখায় ছোটো ছোটো ঘটনা মূর্ত হয়ে উঠেছে। [illegible]

* [illegible] হয়েছে শ্বেত-সেনা ছিল এমন একটি প্রমাণ মিলেছে [illegible] তারিখের সংবাদ প্রভাকরের পাতায়।

তয়ে গোরা সৈন্যদের পাণ্ডুর চেহারা, বাঙালীর ভয়-বিহ্বলতা, 'চাচা আপন বাঁচা' নীতি তাঁর রচনায় সরসদিক। বলা যায়, লোক চরিত্র সম্পর্কে এক সুনিপুণ ছবি এঁকেছেন তিনি।

তাঁর রচনা থেকে একটি কৌতুক বর্ণনার উদ্ধৃতি দিই। এতে তৎকালীন ভীরু বাঙালীর ছবিটি ধরা পড়বে। সিমলায় কর্মরত বাঙালী প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গুর্খাদের দ্বারা সিমলা আক্রমণ ও লুঠের আশঙ্কায় "তিনি দেওয়ালের চুণ লইয়া কপালে দীর্ঘ ফোঁটা করিয়াছেন। গলা হইতে উপবীত বাহির করিয়া চাপকানের উপর পরিয়াছেন। চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ মলিন। আমাকে (মহর্ষিকে) দেখিয়াই বলিলেন, "গুর্খারা বামুন মানে।" জিজ্ঞাসা করিলাম, "হয়েছে কি?" তিনি বলিলেন যে, "গুর্খা সৈন্যরা সিমলা লুঠ করিবার জন্য আসিতেছে। আমি স্থির করিয়াছি যে, আমি খদে যাইব।" আমি বলিলাম যে, "তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এই কথায় তাঁহার মুখ আরও শুকাইল।"৮৬ আরেকটি ছবি। ইংরেজ সৈনিকদের শঙ্কার ছবি।

ডগশাহীর পর্বত চূড়াতে মহর্ষি উঠেছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। কিন্তু সেখানে দেখলেন গোরা সৈন্যরা মদের খালি বাক্স বসিয়ে "চক্রাকৃতি কেল্লা নির্মাণ করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটা পতাকা উড়িতেছে, তাহার নীচে একটা গোরা একটা খোলা তরোয়াল লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।... কিন্তু সে অতি মলিন ও বিষণ্ণভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল 'গুর্খারা কি এখানে আসিতেছে?" আমি বলিলাম, "না, এখনো এখানে আসে নাই।"৮৭

২. রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত

রাজনারায়ণ বসু তাঁর আত্মচরিতে৮৮ বিদ্রোহী সিপাহীদের কিছু বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বিদ্রোহের সময় মেদিনীপুরের গভর্নমেন্ট জেলা [illegible] শিক্ষক ছিলেন। বিদ্রোহের সময় শিক্ষিত বাঙালীরা কিভাবে [illegible]

[illegible] চরিত্র সম্পর্কে সুনিপুণ [illegible] পরিচয় [illegible] 'আত্ম-জীবনী'র আর একটি বিশিষ্ট গুণ। [illegible] দুটি আর বাংলা সাহিত্যে ইহার পূর্বে আর দেখিতে পাওয়া [illegible] [illegible] ভট্টাচার্য, বাংলা কথাসাহি[illegible]

উদ্বেগের সংগে দিন কাটিয়েছেন; তার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। একেকটি সংবাদ অনেকটাই গুজবের আকারে সমগ্র মেদিনীপুরকে সন্ত্রস্ত করে তোলে।

গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারী এক সিপাহীর পরিণতি সম্পর্কে রাজনারায়ণ যে তথ্যটি দিয়েছেন তা হলো এই: "সিপাহী বিদ্রোহের ভারতব্যাপী তরঙ্গ মেদিনীপুর পর্য্যন্ত পৌছে। ১৮৫৭ সালের ১০ই মে বিদ্রোহী সিপাহীরা মিরাট নগর ত্যাগ করিয়া দিল্লী গমন করে। সিপাহীদিগের গুপ্ত ষড়যন্ত্র এত বিস্তৃত ছিল ১০ই মের অব্যবহিত পরেই একজন তেওয়ারি ব্রাহ্মণ মেদিনীপুরস্থ রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টনকে বিগড়াইবার চেষ্টা করে। তখন ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের শৈশবাবস্থা। মেদিনীপুরে যে রাজপুত জাতীয় সিপাহীর পল্টন ছিল...কর্ণেল ফস্টার এই পল্টনের অধিনায়ক ছিলেন। উক্ত তেওয়ারি ব্রাহ্মণকে মেদিনীপুর স্কুলের সম্মুখে কেল্লার মাঠে ইংরাজেরা ফাঁসি দেন।" (পৃ. ৬৬)

বিদ্রোহের সুরুতে সাহেবদের অবস্থা প্রসংগে তিনি একটি মজার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন; "বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সাহেবরা আরও অধিক ভীত হইয়াছিলেন। হইবার কথা। একদিন সাহেবরা ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে সিপাহীদিগকে ডাকিয়া একটা থালের উপর ধান দূর্ব্বা রাখিয়া প্রত্যেক সিপাহীকে তাহা ছুঁইয়া এক শপথ করিতে বলিলেন যে সে বিদ্রোহী হইবেনা। প্রত্যেক সিপাহী সেইরূপ শপথ করিল। কিন্তু সাহেবদের তাহাতে বিশ্বাস হইল না।" (পৃ. ৬৬)

বাঙালীর উদ্বেগ আশঙ্কার কথায় তিনি লিখেছেন—"নিদ্রার সময়ে লাল কোর্ত্তাধারী সিপাহীর স্বপ্ন দেখিতাম। যখনই শুনিতাম যে সিপাহীরা বাজারে টাকার বদলে মোহর সংগ্রহ করিতেছে, তখনই আমাদের আশঙ্কা হইত যে বিদ্রোহের আর দেরি নাই।" (পৃ. ৬৬-৬৭) বিলেতি বস্ত্রেও সিপাহীদের ক্রোধ ছিল তার প্রমাণ রাজনারায়ণের রচনায় মেলে: "আমরা স্কুলে কাজ করিবার সময় প্যান্টালুনের ভিতর ধুতি পরিয়া কাজ করিতাম, যখনই সিপাহী আসিবে প্যান্টালুন ও চাপকান ছাড়িয়া ধুতি ও চাদর বাহির করিবা পরিব স্থির করিয়াছিলাম। সিপাহীদিগের প্যান্টালুনের উপর বিশেষ রাগ ছিল।" (পৃ. ৬৬)

তিন. বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবন চরিত

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাঙালী যোদ্ধা। অবশ্যই ইংরেজের পক্ষে। মহাবিদ্রোহের সময় দুর্গাদাস বিশ্বাস আর নিষ্ঠা, বুদ্ধি ও ধৈর্য দিয়ে ইংরেজের আস্থাভাজন হয়েছেন। একটি বিশ্বাসের শক্ত জমির ওপর চলেছেন একটানা, কিন্তু ঝড়ের বেগে।

স্বভাবতই এই মানুষটি মহাবিদ্রোহ সম্পর্কে পোষকতা করেননি। না করার-ও কারণ ছিল। "সিপাহীগণ জানিত,— সাহেবদের সহিত দুর্গাদাস বাবুর একপ্রাণ এক দেহ। সাহেবরা জানিতেন।— যত সিপাহী আছে সকলেই দুর্গাদাসের গোলাম।"৮৯

মহা বিদ্রোহের সময় তাঁর বীরত্বপূর্ণ দিনগুলির কাহিনী শুনিয়েছেন বঙ্গবাসীর সম্পাদক যোগেশচন্দ্র বসুকে। তিনি তাঁর বীররসের কাহিনী মাসিক 'জন্মভূমি'তে ধারাবাহিকভাবে ১২৯৮-৯৯ সালে প্রকাশ করেন 'আমার জীবন চরিত' এই নামে।

- পরে 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী বা আমার জীবন চরিত', নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে। আমরা এই গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করবো; তাতে বিদ্রোহের বিস্তৃতি ও তাঁর ভূমিকা বোঝা যাবে।

· দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কথা স্পষ্টত-ই বলেছেন: "ইংরেজের নুণ খাইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়াছি ...।" (পৃ ৩) আবার এই বাঙালী সৈনিকের আত্মতৃপ্তি ছিল যে, তিনি ইংরেজের পক্ষে লড়াই করতে পেরেছিলেন। তিনি পরম আবেগেই বলেছেন: "ইংরেজের জন্য সিপাহী- যুদ্ধের কালে রণক্ষেত্রে আমি শাণিত তরবারি হস্তে অশ্বে আরোহন করিয়া সিপাহী সৈন্যের সহিত সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কখন ও বা যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষের প্রাণ রক্ষার জন্য অগ্রসর হইয়া আমি নিজে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।" (পৃ. ৩)

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্রোহের যে বিবরণ দিয়েছেন, তার কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো।

"১৮৫৭ সালের মার্চ্চ মাস হইতেই সিপাহীগণের মেজাজ কিছু গরম বলিয়া বোধ হইল। একটু বাঁকা বাঁকা চাহনি, একটু বাঁকা বাঁকা কথা, একটু বাঁকা বাঁকা চলন সিপাহী দল মধ্যে সৃষ্টি হইল। আমি ইহার মর্ম্ম তখন ভাল বুঝিতে পারিলাম না। মার্চ্চমাস এই ভাবেই কাটিল।

এপ্রেল মাসে অশান্তির লক্ষণ আরও কিছু অধিক মাত্রায় দেখা দিল। সিপাহীগণ কথায় কথায় ভেরিয়ান হইতে লাগিল; কথায় কথায় চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ভ্রূভঙ্গী করিতে আরম্ভ করিল। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কেহই, কোন কথাই বলে না।

হঠাৎ একদিন জনরব উঠিল, ইংরেজরাজ হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই জাতিকুল নাশার্থে উদ্যত হইয়াছেন। এই কথা হাটে, বাজারে, সহরে, পল্টনে, রেসালায় কেবল জল্পনা হইতে লাগিল। রাষ্ট্র হইল, ইংরেজ গো এবং শূকরের চর্বি-সংযুক্ত টোটা সিপাহীদের দ্বারা দাঁতে কাটাইয়া তাহাদের ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টায় আছেন।...." (পৃ. ৬৪)

"ব্যাপার ক্রমশঃ গুরুতর হইবার উপক্রম হইল। কোন কোন পদাতি সিপাহী প্রকাশ্যতই বলিতে আরম্ভ করিল—"আমরা আর বন্দুক স্কন্ধে করিয়া প্যারেডে বাহির হইব না।" (পৃ.৬৫)

"আমি সেদিন একদল পদাতি সিপাহীকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলাম, "কেন তোমরা বৃথা গোলমাল করিতেছ? ইংরেজ তোমাদের জাতি ধর্ম্ম নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন নাই।" আমার এই কথা শুনিয়া তাহারা ক্রোধে যেন ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল। একজন বলিল, "বাঙ্গালী এবং ইংরেজ উভয়ে এককাট্টা হইয়াছে।" আমি ব্যাপার বুঝিয়া আর কথা কহিলাম না।" (পৃ. ৬৫)

"মে মাস আসিল। সিপাহীগণ ক্রমঃশই অধিক মাত্রায় মাতিয়া উঠিতে লাগিল। ইংরেজগণ ভয়ে শঙ্কিত হইলেন। আমিও প্রমাদ গণিলাম।" (পৃ.৬৬)

ছয়. সংবাদ-ভাষ্যে সিপাহী বিদ্রোহ...

সংবাদ প্রভাকর ১০

সংবাদ। ১৪ ২.১২৬৪

সংপ্রতি এতদ্দেশীয় সিপাহি সেনা দ্বারা যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের প্রতি ভক্তি ও অভিপ্রায় প্রকাশ জন্য এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা গত দিবস হিন্দু মিট্রোপলিটান কালেজে যে সভা করিয়াছিলেন তাহাতে শ্রীযুত রাজা রাধাকান্তদেব বাহাদুর, শ্রীযুত রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর, শ্রীযুত বাবু রাজেন্দ্র দত্ত, শ্রীযুত রায় হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুত বাবু কালী

প্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি অনেকানেক মহাশয়েরা উপস্থিত হইয়াছিলেন, শ্রীযুত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সকল অবধারিত হয়, অন্যান্য বিবরণ সকল আগামিতে প্রকাশ করিব অদ্য স্থানাভাব হইল।

১। এই সভা শ্রবণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে, এতদ্দেশীয় কয়েক দল পদাতিক সৈন্য গভর্ণমেণ্টের বিরোধি হইয়া স্থানে স্থানে অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহারদিগের এই অসচ্চরিত্র এবং ব্যবহার জন্য সভার ঘৃণাও ভয়।

২। এতদ্রাজ্যের প্রজামণ্ডলী সিপাহিদিগের এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতি কোন রূপ সহায়তা না করাতে গভর্ণমেণ্টের প্রতি তাহারদিগের অত্যন্ত ভক্তি হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা অত্যন্ত পুলকিত এবং আনন্দিত হইয়াছেন, যেহেতু তাহারা একাল পর্যন্ত যে প্রকার রাজভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন এতদ্বারা তাহা আরো সংপূর্ণরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে।

৩। কতিপয় সিপাহি সেনা দুর্জ্জনগণের কুপরামর্শে ও মিথ্যা ভয় প্রদর্শন দ্বারা যে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সভা সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন, যেহেতু ঐ ভ্রমের কোন কারণ নাই।

৪। এই বিদ্রোহ সময়ে দেশের শান্তি রক্ষা নিমিত্ত গভর্ণমেণ্টের প্রতি যদ্যপি কোন প্রকার সাহায্য প্রদান করিতে হয় তবে এই সভা এরূপ অবধার্য্য করিতেছেন যে মহারাণীর এতদ্দেশীয় সমুদয় প্রজা তজ্জন্য প্রাণপণে সাহায্য করা আপনারদিগের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কার্য্যবোধ করিবেন।

৫। এই সভার বিবরণ সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ এতদ্দেশীয় প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রেরণ করা হয়।

৬। এই সভার বিবরণের এক অনুলিপি সভাপতি মহাশয় স্বাক্ষর পূর্ব্বক ভারতবর্ষের শ্রীযুত অনরবিল গবরনর জেনরেল বাহাদুরের সমীপে প্রেরণ করা হয়।

সম্পাদকীয়। ৭. ৩. ১২৬৪

কয়েকদল অধার্ম্মিক—অবাধ্য—অকৃতজ্ঞ হিতাহিত বিবেচনা-বিহীন এতদ্দেশীয় সেনা অধার্ম্মিকতা প্রকাশ পূর্ব্বক রাজবিদ্রোহি হওয়াতে রাজ্যবাসি শান্ত স্বভাব অধন সধন প্রজামাত্রেই দিবারাত্র জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা

করিতেছেন, "এই দণ্ডেই হিন্দুস্থানে পূর্ব্ববৎ শান্তি সংস্থাপিত হউক, তাঁহার সমুদয় বিঘ্ন বিনাশ হউক। হে বিঘ্নহর!—তুমি সমুদ্রবিহারক দস্যুর উপদ্রব নিবারণ কর,—প্রজাবৎসল যথার্থিক সুবিচারক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের জয়-পতাকা চিরকাল সমভাবে উড্ডীয়মান কর।—অত্যাচারি-অপকারি-বিদ্রোহকারি দুর্জ্জনদিগকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান কর।—যাহারা গোপনে, অথবা প্রকাশ্য-রূপে এই বিষময় অনিষ্ট ঘটনার ঘটক হইয়া উদ্বেগিত কারক লোকদিগকে কুচক্রের দ্বারা পরামর্শ প্রদান করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাদিগের অপমান কর। তাহারা অবিলম্বেই আপনাপন অপরাধ—যথার্থ মনস্তাপ ভোগ করুক।"

...এই বক্তা সমুদয় প্রণিধান করুন, ব্রিটিশ অধিকারে আমারদিগের দেশ কি প্রকার সুখের আধার হইয়াছে, অনায়াসেই অতি সহজে নানাপ্রকার কার্য-কর্ম্ম, বিষয়, উপার্জ্জন, স্বপদে থাকিয়া, স্বচ্ছন্দরূপে বিবিধ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন, বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা ধনাহরণ, নির্ভয়ে অর্জ্জিত ধনের বৃদ্ধি, অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের সুদের দ্বারা ধনবৃদ্ধি করণ, বাষ্পে আরোহণ পূর্ব্বক হইয়া অল্পকালেই দূরস্থিত তীর্থাদি দর্শন, স্বাধীন রূপে ধর্ম্ম কর্ম্ম, রাজকার্য্য ব্যাপারে আবেদনপত্রাদি প্রদান, এবং রাজ বিষয়ে দোষোল্লেখ পূর্ব্বক সংশোধনের অনুরোধকরণ ইত্যাদি অশেষ বিধ বিষয়ে আমরা অশেষরূপে উপকৃত হইতেছি, অতএব সকলে একবার মুক্ত কণ্ঠে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা ঘোষণা করিয়া মনের সহিত জয় প্রার্থনা কর।

...আমারদিগের কিছুমাত্র ভয় নাই, ব্রিটিশ অধীনে যেমন সুখে আছি চিরকাল সেইরূপ সুখেই থাকিব। সর্ব্বশেষে এই প্রার্থনা করি গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের নিশ্চিত চিত্ত হইয়া রাজ্যের সুব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, প্রজার [illegible] নিবারণে যত্নশীল হউন, তত্ত নাহি পরিপূর্ণ হওয়াতে প্রজারা আর রক্ষা পায় না, [illegible] যত্ন না করিলে দেশ বাঁচে না।

হে বাঙ্গালি, বঙ্গবাসীগণ! তোমারদিগের প্রতি [illegible] ভেদ নিদ্রা [illegible]

সেবা যাহা কর। [illegible]

[illegible]

[illegible] তাহারদিগের দমনার্থ সদুপায় করাই উচিত, এবং উপস্থিত সময়ে রাজার [illegible] করাই কর্ত্তব্য।…

…তাহার পাখ্য ব্রিটিস রাজ্যেশ্বরদিগের সুবিস্তার অধিকারের প্রধান রাজধানী এই মহানগর মধ্যে কোন প্রকার বিদ্রোহ ব্যাপার উপস্থিত করিতে পারে। সিংহের গৃহ সমক্ষে কুক্কুরে গর্জ্জন করিবে, মূষিকের দ্বারা পর্ব্বত [illegible], ভেকে সমুদ্র শোষণ করিবেক, পঙ্গু ব্যক্তি প্রবল জলধি [illegible] করিবেক, এই সমস্ত অসম্ভাবিত কার্য্য যদ্যপি সম্ভবপর হয় তথাচ অবাধ্য সিপাহিদিগের দ্বারা এতদ্রাজধানী গৃহীত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, [illegible] উপস্থিত সময়ে সতর্কভাবে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন করুন, আমারদিগের কোন আপত্তি নাই, যদ্যপি কোন লোকে বুদ্ধির হীনতা প্রযুক্ত [illegible] নিক্ষেপ পূর্ব্বক মৃত্যু প্রার্থনা করে তবে তাহার অবশ্য প্রাণ বিনষ্ট হইবেক।

…[illegible] ব্যারাকপুরে অবাধ্য সিপাহি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], অতএব আমরা [illegible] নিকট প্রার্থনা করিতেছি [illegible] [illegible] [illegible] ।

[illegible] ১৫. ৬. ১৮৫৭

আমরা পরম্পরা শুনিলাম কয়েকজন শ্বেত সেনা বিদ্রোহি সিপাহীদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজবিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। সেই শ্বেত সেনা দলের অধ্যক্ষ মহাশয় তাহাদিগকে কৌশল ক্রমে ধৃত করত এতদ্দেশীয় কোর্ট [illegible] বিধির অধীনে বিচারার্থে সমর্পণ করেন। গোরা সৈন্যেরা দোষিরূপে সাব্যস্ত হইয়াও তাহাদিগের ফাঁসি হইতে পায় নাই। শ্বেত বর্ণ বলিয়া তাহাদিগকে কিছুদিনের জন্য দ্বীপান্তরে প্রেরণের অনুমতি হইয়াছে।… [illegible] আর কাহাকে [illegible] পারে? এতদ্দেশীয় পদাতিকের [illegible] যাহারা বিদ্রোহী রূপে ধৃত হইয়াছিল তাহারা তাবতেই উদ্ধন দ্বারা শমন সদনে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছে, তাহাদিগের প্রতি দয়া করিবার লোক কেহই উপস্থিত [illegible] নাই, আর শ্বেত পদাতিকেরা [illegible] [illegible]

বলিয়া যথাযথে [illegible] বর্ণনা করিতে পারিব। আমরা দিগের বুদ্ধি সত্ত্বে এ বিদ্রোহকে [illegible] বলিয়া বর্ণনা করিতে পারি।

সম্পাদকীয় । ১৫, ৯, ১৮৫৭

যে বিদ্রোহবহ্নি এই রাজধানীর অতি নিকটস্থ [illegible] হইতে একেবারে [illegible] পশ্চিম রাজ্যের বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং [illegible] সময়ে লোকে একেবারে [illegible] কোনো কোনো স্থানে [illegible] এক্ষণে সেই বিদ্রোহানল [illegible] হইল, [illegible] সেই প্রকার [illegible] সেপাহিগণ এবং তাহাদের বিদ্রোহ [illegible] পশ্চিম রাজ্যের [illegible] লোকে একেবারে [illegible] করিয়া [illegible] ব্রিটিশ পরাক্রমকে [illegible] পরিত্যাগপূর্ব্বক [illegible] হয়, অবোধেরা সেই প্রকার ব্রিটিশ পরাক্রমের ভয়ঙ্কর প্রতাপ [illegible] হইয়াছে [illegible] করিয়া এই রাজ্য মধ্যে [illegible] হইয়াছিল এইক্ষণে তাহারা [illegible] কি [illegible] তাহা [illegible] করিতে পারে [illegible] হইতে পারে না।

[illegible] প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে সিপাহি [illegible] নয়। বাঙালী [illegible] সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেছেন [illegible]। তাঁরা কোন বাঙালী। তাঁদের [illegible] পরিচয়ই বা কী?

১৮।৫।২. ১৮৫৭ তারিখে মেট্রোপলিটান কলেজে বুদ্ধিজীবীদের যে সভা হয়েছিল—সিপাহী বিদ্রোহ বিষয়ক; তাতে দেখা যাবে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কমলকৃষ্ণ, রাজেন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র ঘোষ, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বিত্তবান ও রক্ষণশীল বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।* এবং রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ছিলেন এর সভাপতি।

এ থেকে সাম্রাজ্যবাদের প্রতি আনুগত্য কিংবা [illegible] অনাবিল তা, [illegible] 'কুসংস্কারাচ্ছন্ন গাঁওয়ার' সিপাহীরা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে ও ইংরেজের [illegible] চেষ্টা করে। এই আঘাত [illegible] তাঁদের পক্ষে নেহাৎই অমূলক ছিল না। ইংরেজ, বিদেশী দেশ দখল করে [illegible] যে অত্যাচার শুরু করেছিল ও বাঙালীদের যেভাবে নিপীড়ন করতে থাকে; তা মধ্যবিত্ত বাঙালী বেশ ভালভাবেই টের পেয়েছেন। যাইহোক [illegible] সিপাহীদের অগ্রগমনে বিক্ষিপ্ত বুদ্ধিজীবীদের মুখে প্রকাশ কথা নয়। সংবাদ প্রভাকরের ৭.৬.১৮৫৭ তারিখের সম্পাদকীয় থেকে ইংরেজের প্রতি বাঙালির কাতরতার কারণটাই শোনা যাক:

"সকলে প্রণিধান করুন, ব্রিটিশ অধিকার আমারদিগের পক্ষে কি প্রকার সুখের আধার হইয়াছে। [illegible] নানা প্রকার অর্থকরী বিদ্যার উপার্জন [illegible] বিবিধ সদুপায়ে অর্থ উপার্জন বিদেশীয় বাণিজ্য দ্বারা ধনাগম, নির্ভয়ে অর্জিত ধনের বৃদ্ধি অর্থাৎ কোম্পানির কাগজের সুদের দ্বারা ধনবৃদ্ধি করণ।" এই সত্যটুকু জানতে আমাদের অসুবিধা হয় না। তাই একটা লেখক শক্তি নিয়ে তাঁরা বিদ্রোহের প্রতি কুৎসা করেছেন [illegible] ও [illegible] দিয়েছেন। তা মনীষীদের আত্মজীবনী থেকে পাই।

[illegible] শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে যে বিদ্রোহ-বিরোধী মনোভাব ছিল তা তাঁদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, শিক্ষা, আলোচনা থেকে জানতে পারা যায়। তাঁরা এই বিদ্রোহ [illegible]

* ডা. ক বাঙালি জাতিকে সিপাহীযুদ্ধে (১৮৫৭-৫৮) [illegible] দাবা না বাঁধিতে ইংরেজ পক্ষে যোগ দিয়াছিল।
ড. যোগেশ চন্দ্র বাগল, বাংলার উচ্চশিক্ষা, ১৯৬৩, পৃ.৫৪

সময়ে। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার গ্লানি তাঁদের মনে দেখা দিয়েছে। ফলত সংগ্রামী মানসের স্বরূপ উপলব্ধি করতে তাঁরা পেরেছিলেন বলেই মনে হয়। তাই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮৫৮-তে 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' সেই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে এই অংশে ;—

স্বাধীনতা-হীনতায় "কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়হে,
কে পরিবে পায় ?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গ সুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায় হে,
স্বর্গ সুখ তায়॥"

মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য ১৮৬১-তে প্রকাশিত হয়। বাঙালী মনের অবদমিত ইচ্ছাটির যেন স্ফুরণ ঘটল। রাবণ সন্তান রাক্ষস বীর ইন্দ্রজিৎকেই মধুসূদন কাব্যের নায়ক গড়েছেন। আর দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহি বিভীষণকে যেন স্বদেশবাসীকে নোতুন করে চিনিয়ে দিলেন। বিভীষণের দেশদ্রোহিতার পরিণাম অর্থ স্বদেশ বাসীর মনের দুয়ারে আঘাত হানল। "সিপাহী যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই যে এই কাব্যখানি এতটা সমাদর লাভ করেছিল তার একটি কারণ, এতদিন পরে, মনে হয়, শুধু ছন্দের নূতনত্ব বা রসের গভীরতাই নয়, এর উপরে আর একটি জিনিষও রয়েছে, তা হ'ল বাঙালী তথা ভারতবাসীর তখনকার মনের কথা জোরের সঙ্গে প্রকাশ। বাঙালী বীর্য্যেরই উপাসক হতে চাইছে।"৯১

একাদশ অধ্যায়

[illegible]

। ১ ।

দেশকাল বিদ্রোহ নির্ভর

। ২ ।

বিদ্রোহের প্রকৃতি

। ৩ ।

সাহিত্য সঞ্জীবনী

। ৪ ।

নবযুগ প্রসঙ্গ

"ইংরেজ অনায়াসে বাঙলা জয় করেছিল৷ বাঙলায় ইংরেজ এসে শান্তি স্থাপন (Pax Britannica) করেছিল, এই ধরনের কতই না গল্প প্রচার করা হয়েছে। বাঙালীর চরিত্রে কলঙ্ক লেপনের জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা বহু চেষ্টাই করেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আসল ইতিহাসকে চিরতরে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। বাঙলার জনসাধারণ ব্রিটিশ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যে একটানা প্রতিরোধ চালিয়েছিল তা বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় অধ্যায় ভারতবাসী চিরদিন স্মরণ করবে।"

'বন্দরের বন্ধনকাল এবারের মতো হলো শেষ'

১১ ॥ অধ্যায় ঃ সমীক্ষণ

॥ ১ ॥

দেশকাল বিদ্রোহ নির্ভর

মহাবিদ্রোহের মহানদী বাঁকে আমরা নোঙর করেছি। যে সময় বিন্দু থেকে দীর্ঘ পথের অতিক্রান্তি, তারই পার্থক্য ও বিবিধ যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে বিদ্রোহী ভারতের অভিরেখায়।

১৭৫৭-১৮৫৭ এই শতবর্ষে, কেবলমাত্র বাঙলায় ইংরেজের বিরুদ্ধ-সংগ্রাম সুরু হয়েছে, তা নয়। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, সমগ্র ভারতে বিক্ষোভ বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান ঘটে গেছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। সেদিনের যূথবদ্ধ যে কোনো আন্দোলনকে সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো কষ্ট কল্পনা নয়।

ডক্টর নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই শতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহের যুগ'[1] বলে অভিহিত করেছেন। বাস্তবিকই, কেন্দ্রীয় প্রেরণা ও সংহত কোনো শক্তি না থাকাতেই এসব বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই স্থানিক এবং খণ্ড-প্রকৃতির। কিন্তু ইতিহাসের ধারায় এসবের মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। তাই, এক নজরে বিদ্রোহী ভারতের রূপটি দেখে নেওয়া যাক।

॥ এক ॥

১৭৫৮-র শেষ দিকে দিল্লী থেকে শাহ আলম ছুটে এলেন বিহারে এবং বিহারে বসেই জাল বিস্তার করলেন; বাংলার মসনদ থেকে মীরজাফরকে সরিয়ে স্বনির্বাচিত কোনো ব্যক্তিকে বসিয়ে মুঘল-গৌরব পুনরুদ্ধারের। ব্যর্থ হয়েছে তাঁর পরিকল্পনা ও চেষ্টা। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সম্রাট আরেকবার বাংলা জয়ের স্বপ্ন দেখেন। বাংলার বুকে তখন ষড়যন্ত্র চলছিলই। বর্ধমান, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজারা ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের মূলে। সুতরাং তাঁদের আমন্ত্রণে শাহ-আলম হাজির হলেন। মারাঠা সেনাপতি শিউ ভট্ট-ও এই দলে যোগ দিলেন।

কিন্তু শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনী দামোদর নদ পার হয়েছিল বটে; তবে প্রতিকূল তরংগ ইচ্ছাপূরণের বাঁক পেরুতে দেয়নি। সে বছর বীরভূম ও বর্ধমান রাজাদ্বয়ের পরাজয় ঘটে। এই সময় পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা খাদিম হোসেন খাঁ বিদ্রোহী হয়েছিলেন; কিন্তু ইংরেজ ও মীরণের সম্মিলিত বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল। অবশ্য অকস্মাৎ বজ্রঘাতে মীরণের মৃত্যু হওয়ায় খাদিম হোসেনের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়নি।৩

১৭৬০-১৮০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাঙলার গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহের একটি তালিকা আমরা দিয়েছি। বরংচ অন্যত্র দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাক। ১৭৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দে মহীশূরের হায়দার আলির উদ্যোগে মারাঠাশক্তি সমূহ ও হায়দ্রাবাদের নিজামকে নিয়ে একটি শক্তিশালী জোট গড়ে ওঠে ইংরেজের বিরুদ্ধে। কিন্তু হেস্টিংসের কূটনৈতিক-চালে সব ব্যর্থ হয়। ১৭৮১-তে বারাণসীরাজচৈৎ সিংহকে উচ্ছেদ করার ফলে ব্যাপক অংশ জুড়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে টিনেভেলি জেলার পন্‌জালন কুরিচির পোলিগাররা ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। ১৭৯২-তে মালাবারের স্থানীয় রাজারা ইংরেজের বিরোধিতা করেন। এবং ভিজিয়ানা গ্রামের রাজা বিজয়রাম রাউজ ইংরেজের রাজনৈতিক শর্ত অস্বীকার করে ১৭৯৪-তে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি এতে পরাজিত ও নিহত হন। ঐ সময় গঞ্জাম জেলার কিমেদির জমিদার খাজনা বাকি পড়ার অজুহাতে গ্রেপ্তার হলেন। এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়।৪

১৭৯৫-তে ইংরেজ বিরোধিতায় একটি জোটবদ্ধ-শক্তির কথা জানা যায়। কাবুলের জামানশাহ, মহীশূরের টিপুসুলতান, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, অযোধ্যার নবাব আসফ্‌উদ্দৌলা এবং রোহিলা সর্দার গোলাম মোহাম্মদ প্রভৃতি একজোটে এলেন বটে। কিন্তু তাঁরা প্রত্যয়-সিদ্ধ নজির গড়ে তুলতে অক্ষম হলেন। ১৭৯৯-র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি হলো ইংরেজের সংগে টিপুর যুদ্ধে পরাজয় ও মৃত্যু। এবং অযোধ্যার সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজির আলির বিদ্রোহ। ওয়াজির আলিকে ঘিরে বিদ্রোহের বিস্তার সারাভারতে ইংরেজের বিরুদ্ধে সার্বিক দাহেরই পরিচায়ক।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকাণ্ড আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে সমগ্র ভারতে। এমন কোনো বৎসর ছিলনা, যার দিন সমূহে কোনো না কোনো জায়গায় বিক্ষোভ বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছে। এসব বিদ্রোহের কারণ বিভিন্ন বিচিত্র। তার মধ্যে কয়েকটি বোধকরি এই ;—

১. ইংরেজের পররাজ্য-গ্রাস নীতি। ভিন্ন অর্থে সাম্রাজ্যবাদ।

২ অত্যধিক কর আদায়। শিথিল অর্থে অতিমাত্রিক লোভ।

৩. সামন্ত তন্ত্রের প্রতি অনুদার নীতি। গূঢ় অর্থে, জমিদারদের সম্মান-মর্যাদার খর্বকরণ।

৪. অভ্যন্তরীণ অর্জিত-সংস্কারের প্রতি হস্তক্ষেপ। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে ভেলোরে ও ১৮৫৭-তে সিপাহীদের সংস্কারের প্রতি কুঠারাঘাতের চরম ফল ছিল বিদ্রোহ।

৫. ঐতিহ্যবাহী রাজপরিবারের প্রতি ইংরেজের নিষ্ঠুর আচরণ বিধি। যেমন টিপুসুলতান, নিজাম ও চৈৎসিংহ ও ওয়াজির আলির প্রতি ইংরেজের দুর্ব্যবহার এক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

আমরা এরজন্য দুটি কথা মনে রাখলেই যথেষ্ট, তাহলো ইংরেজদের শোষণ নীতি ও সাম্রাজ্যবাদ চরিত্র।

। দুই ।

এরপর উনিশ শতকের বিদ্রোহী ধারার পরিচয় এখানে দেওয়া হলো। মহীশূরের ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যে বেদনোরের জমিদার ধুন্দিয়ার বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। তাঁকে প্রতিহত করতে ইংরেজ শক্তিকে বেশ বেগ

পেতে হয়েছে। শেষে ১০-৯-১৮০০ তারিখে ধুন্দিয়া আর্থার ওয়েলেসলির কাছে পরাজিত হন। ১৮০০-১৮০১ খ্রীস্টাব্দে গঞ্জাম জেলার বহু জমিদার শ্রীকর ভঞ্জের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হলেন। ১৮০৪ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যার অন্তর্গত খুরদার রাজা ইংরেজের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগে রাজ্য হারান। উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে করবৃদ্ধির ফলে জমিদারদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়।

১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বুন্দেলখণ্ডের গোপাল সিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে ৪ বৎসর যুদ্ধ করেছিলেন। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে ভেলোরে সিপাহীবিদ্রোহ দেখা দেয়। "যে সিপাহীদের দক্ষতাকে মূলধন করে ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাড়বাড়ন্ত, তাদের বেতন, মর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়, এবং সর্বপরি নানান অজুহাতে তাদের যুগ অর্জিত সংস্কারগুলির প্রতি রূঢ় আক্রমণ চালানো হয়েছিল। এই বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করেছিল।"৫

১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে ত্রিবাংকুরের দেওয়ান ভেলুতাম্পি কোচিন ও মালাবার অঞ্চলের অপরাপর রাজ্যগুলির সঙ্গে ইংরেজ বিরোধী চক্রান্তে লিপ্ত হন। ইংরেজের বিরুদ্ধে বহুযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন। শেষে পরাজিত হয়ে আত্মহত্যা করেন।

১৮১০ খ্রীস্টাব্দে সুরাটে আবদুল রহমান নামে জনৈক ব্যক্তি নিজেকে ইমাম মেহদী বলে ঘোষণা করেন এবং ফর্মান জারী করে সুরাটে ইংরেজ প্রতিনিধির কাছে কর দাবি করলেন; এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণে আদেশ জানালেন। ১৮১৩-তে সাহারানপুর অঞ্চলে গুর্জরদের এবং ১৮১৪-তে মুরসন ও হাতরাস অঞ্চলে এবং ১৮১৫-তে কাথিয়াবাড অঞ্চলে রাজপুত সামন্তদের ইংরেজ বিরোধী কার্যকলাপ ইংরেজ শক্তিকে হতচকিত করে তোলে।

করবৃদ্ধির প্রতিবাদে বেরিলীতে ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে মুফ্‌তি মোহাম্মদের নেতৃত্বে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এতে মুফ্‌তি আহত হলে মুসলমান সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজ পক্ষে ও বিদ্রোহীদের অনেকেই হতাহত হয়। আলিগড়ে ভূম্যধিকারীরাও বিদ্রোহী হয়েছিলেন। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো দয়ারামের বিদ্রোহ। তাঁর বিরাট সেনাবাহিনী ও সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে ১২-ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১২-ই মার্চ পর্যন্ত বীরদর্পে

ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি পরাজিত হন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যার পাইকরা বিদ্রোহ করেছিল জগদ্বন্ধু বিদ্যাধর মহাপাত্রের নেতৃত্বে। ১৮১৮-তে পেশোয়ার পুনরায় কোরেগাঁও ও আস্তির যুদ্ধের সূত্রপাত করে-ও আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে খান্দেশের নিকটবর্তী ভীলেরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৮২০-তে রাজস্থানের মের উপজাতি ইংরেজের বিপক্ষে গিয়েছিল।

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে হরিয়ানা অঞ্চলের জাঠ, মেওয়াট ও ভট্টিরা বিদ্রোহী হয়ে সরকারী সম্পত্তি লুণ্ঠন করে প্রচার করে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়েছে।

ঐ বৎসরে বিজাপুরের জনৈক ব্রাহ্মণ দিবাকর দীক্ষিত বিজাপুর থেকে ৪ মাইল পূর্বে সিন্দগি নামে একটি স্থানে লুণ্ঠন চালায় ও নিজস্ব সরকার স্থাপন করে। এবং বেলগাঁও জেলার কিট্টুরের রাজা শিবলিঙ্গ রুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্রের সিংহাসন দাবি ইংরেজরা মেনে নেননি। ফলত, তিনি বিদ্রোহী হন। এই স্থানে ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দেও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৮৩০-এ উত্তর কোঙ্কনের তীরে সবন্তবদিতে বিদ্রোহ দেখা দেয়।

১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে বীরভদ্র বাউজের নেতৃত্বে বিদ্রোহ এবং ১৮৩১-তে খান্দেশে পুনরায় ভীলদের বিদ্রোহ ঘটতে থাকে। ১৮৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে রাঁচী ও হাজারিবাগ জেলা, পালামৌ জেলার চৌরি পরগণায় কোল বিদ্রোহ বিরাট আকার ধারণ করে। ১৮৩৫-এ গঞ্জাম জেলায় শ্রীকর ভঞ্জের পুত্র ধনঞ্জয় বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন। এখানে সাময়িকভাবে ইংরেজ অস্তিত্ব লুপ্ত হয়। ১৮৩৬-তে সবন্তবদিতে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে শোলাপুরে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটেছিল। বেতন না পাওয়ার কারণেই এই বিদ্রোহ। পরের বছরে প্রথম আফগান যুদ্ধের প্রাক্কালে সিপাহীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। হিন্দুরা সিন্ধু পার হয়ে ধর্ম-চ্যুত হতে চায়নি, মুসলমানেরা স্বধর্মীয়দের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে আপত্তি জানিয়েছিল। ১৮৩৯-৪ আসামের সাদিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। কচ্ছ পশ্চিমঘাট অঞ্চলের কেলিজাতি ভাউখারে, চিমনি যাদব, এবং নানা দরবারে নামক তিন ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৮৪০-তে নরসিং দত্তাত্রেয় নামক এক মারাঠী ব্রাহ্মণ আরব সৈন্যের সহায়তায় বাদামীর দুর্গ দখল করেন। সরকারী কোষাগার লুণ্ঠন করে 'রাজা' উপাধি গ্রহণ

করেন। ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের সাগর জেলায় কয়েকজন জমিদার বিদ্রোহী হন। ঐ সালেই রুরকীর নিকটস্থ কুঞ্জার তালুকদার বিজয়সিং রাজা উপাধি গ্রহণ করেন ও ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। ১৮৪২-তে সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ, মালিগাঁও ও কোটায় সেনাবাহিনী বেতন না পাওয়ার কারণে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৮৪৩-তে জব্বল পুরের ৬নং ক্যাভালরি ঐ একই কারণে বিদ্রোহী হয়। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ বিরোধী চিত্র হিসাবে কোলাপুরের আন্নাসাহেবের বিদ্রোহ, গাদকারি এবং সুবাটের লবণ বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য।

১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম শিখ যুদ্ধ, খান্দেশের ভীল্ বিদ্রোহ ও উড়িষ্যার খণ্ড উপজাতির বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৪৮-তে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে পাঞ্জাবে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫০-তে পাঞ্জাবের কয়েকস্থানে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৫২-তে খান্দেশের সদো ও চোপদা অঞ্চলে একটি কৃষক বিদ্রোহ দেখা দেয়।৬ ১৮৫৫-৫৭ খ্রীস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ ও সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা আমরা করেছি।

সুতরাং শতবর্ষের আলোকে (১৭৫৭-১৮৫৭) ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেসব বিদ্রোহ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে; তা আমরা লক্ষ করলাম। অবশ্যই এই তালিকা পূর্ণায়ত নয়। তবু-ও এর মধ্যে বিদ্রোহের ঐক্যসূত্র দুর্লক্ষ্য নয়। এর মধ্যে কিছু কিছু বিদ্রোহ ছিল রাজা উজীরদের বিদ্রোহ। স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ায় এঁরা ইংরেজের বিরোধী হয়েছিলেন। কিন্তু এই সব আভিজাত্যিক বিদ্রোহ কৃষকবিদ্রোহ থেকে দূরান্বিত নয়।

বিদ্রোহের প্রকৃতি

আঠারো ও উনিশ শতকের বাঙলার বিদ্রোহচিত্র স্মরণ করে আমরা কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। সিদ্ধান্তগুলি সূত্রবদ্ধ করা যায় এইভাবে:

এক। ইংরেজ শাসনারম্ভ, বাঙলা তথা সারা ভারতের বুকে সহজ ভাবে হয়নি। অল্প আয়াসে, শ্রম স্বীকার না করে ইংরেজের শাসন-যন্ত্রটির উদ্যোগ প্রসার সম্ভব ছিল না। সর্বত্রই সূচনার প্রথম লগ্নে যা

হোক, পরবর্তী সময়ে প্রতিরোধ, সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যাপক-রূপ ধারণ করে। ইংরেজ শাসনিক ব্যবস্থা ভারতের জনগোষ্ঠী কেউ সহজভাবে মেনে নেয়নি।

দুই। ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বিদ্রোহগুলি স্থানিক কিন্তু গণভিত্তিক। বিশাল কৃষক-জনতার বিরোধিতার মধ্যে গণ-উদ্যোগ লক্ষিত হয়েছে। অবশ্য গণ-উদ্যমের মধ্যে গণতান্ত্রিক চেতনা দুর্লক্ষ্য নয়। সমগ্র ভারতের বিদ্রোহ চিত্রের প্রতি লক্ষ রেখেই এমন মন্তব্য করা যেতে পারে। একটি উদাহরণ, বাহাদুর শা সম্রাট বলে ঘোষিত হলে-ও তিনি ছিলেন সৈন্যদের দ্বারা মনোনীত বাদশা। আরো আছে। কানপুরে নানাসাহেবকেও নেতৃত্ব পদে বরণ করেছিল সিপাহীরা। এমনকি, নানাসাহেব যে পৌর সংগঠন গড়ে তোলেন তার প্রথম ম্যাজিস্ট্রেট পদে হুলাস সিংকে নিযুক্ত করা হয়েছিল শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের 'একটি ডেপুটেশনের উপদেশ অনুযায়ী'।৭

তিন। বিদেশী শাসনের উচ্ছেদই ছিল এসব বিদ্রোহের লক্ষ্য। বিদ্রোহী জনতা ইংরেজ শাসন-শোষণ, অবিচার অনাচার থেকে মুক্তি চেয়েছে এবং অব্যাহতি চেয়েছে সামন্ত শ্রেণীর পীড়ন-তাড়ন থেকে-ও। অবশ্য জমিদারেরা যে ক্ষেত্রে বিদ্রোহের উদ্‌যোক্তা সে ক্ষেত্রে আত্ম-স্বার্থ-ই বিদ্রোহের কারণ। আর কৃষকদের ক্ষেত্রে ছিল অভাব অনটনের তাড়না।

চার। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে হিন্দু মুসলমান সমান ভাবে ভূমিকা পালন করেছে। এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহ, ত্রিপুরায় সমসের গাজির বিদ্রোহ কিংবা বারাসতে তিতুমীরের বিদ্রোহ বা ফরিদপুরের ফরাজী বিদ্রোহ সমূহ।

পাঁচ। ধর্মীয় বিশিষ্টতা নিয়ে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান অনেক ক্ষেত্রে শুরু হলে-ও অত্যল্পকালের মধ্যে তার গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য তিতুমীর পরিচালিত ওহাবী বিদ্রোহ, পাগলপন্থী বিদ্রোহ বা ফরাজী বিদ্রোহ।

ছয়। জমিদারগণ অনেক সময়ই নিজেদের স্বার্থে কৃষক জনসাধারণকে উত্তেজিত করেছেন; ইংরেজের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছেন। অবশ্য

সাধারণ জনগোষ্ঠী কৃষি সম্পর্কিত ব্যাপারে আশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়কেই তারা সমস্যার্থ মনে করেছে বলেই তাদের প্রতিবাদী চারিত্রিক ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই রায়পুরের (বাঁকুড়া) দুর্জন সিংহের সমস্যা প্রজারা অনুভব করে। কিংবা মানভূমে গঙ্গা-নারায়ণের অনুগামী হয়ে ভূমিজ সম্প্রদায় ক্ষেপে ওঠে (১৮৩২)। এক্ষেত্রে আরো স্মরণ করা যায় জঙ্গল মহালের গণ বিদ্রোহ সমূহ।

আরো আছে। বরাভূমের সীমান্তে মেদিনীপুরের প্রায় ৪০ মাইল পশ্চিমে ভূমিজ সর্দার ঘাটওয়াল বৈজনাথের বিদ্রোহ (১৮০০-১৮১০)। বৈজনাথের সংগে ভূমিজ সর্দার ও ভূমিজরা ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে নামে।৮

সাত। পর্বত-অরণ্যচারী উপজাতীয় আদিবাসীদের মধ্যে যে সংগ্রামী চেতনা লক্ষ করা গেছে, তার বিশিষ্টতা কিছু কম নয়। নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ, মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব আদায়ের জন্য তারা গণসংগ্রামে নেমেছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমাজাতি ইংরেজের বিরুদ্ধে সুরু করেছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। তাদের সংগ্রামী চেতনা ও মূলসুরের সংগে ভারতের অন্য প্রান্তের বিক্ষুব্ধ জনতার মৌল প্রেরণা থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়।

আট। ইংরেজের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসংগ্রামের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বিদ্রোহীদের মধ্যে দুর্বার হয়ে ওঠে। এই লক্ষ্যে সুসঙ্গে গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠা, তিতুমীরের নেতৃত্বে ওহাবীরা নদীয়া, চব্বিশ পরগণা ও যশোহর প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তিতুমীরকে স্বাধীন বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। ফরিদপুরে 'ফরাজী' বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছে একই উদ্দেশ্য নিয়ে। দুদুমিঞা এই বিদ্রোহের নায়কত্ব করেছিলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যু-লড়াই করেছে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহে, গণ-শাসনের প্রতি বিদ্রোহীদের কেন্দ্রীয় প্রেরণা ছিল তা বলাই বাহুল্য।

আমাদের আলোচিত বিদ্রোহগুলি ছিল স্থানিক কিন্তু গণভিত্তিক। তাই এর প্রকৃতি ছিল দুরন্ত, দুর্বার। তবু-ও এসব গণবিদ্রোহ ব্যর্থ

হয়েছে। তার কয়েকটি 'কারণ' নির্দেশ করা যেতে পারে। যেমন :

এক। অর্থনৈতিক সংগ্রাম অর্থাৎ অভাব অনটনের প্রতিকার আকাঙ্ক্ষায় যে সংগ্রাম সৃষ্ট হয়, তা যেমন শ্রেণী সংগ্রামে রূপান্তরিত হতে পারে না; তেমনি তার প্রকৃতি-ও 'বৈপ্লবিক' আকার ধারণ করতে পারে না: এর রূপ হয় 'সংস্কারমুখী' সংগ্রাম। অর্থাৎ নিবেদনের রাজনীতি। অবশ্য মনে রাখা দরকার, আজকের দিনের রাজনৈতিক চেতনা ও আদর্শ সে যুগে ছিলনা; থাকা-ও সম্ভব নয়। সেই প্রাক্-রাজনৈতিক যুগে বিদ্রোহীরা যে চেতনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিলেন; তা আজকের রাজনৈতিক চেতনা থেকে খুব একটা দূর পার্থক্য ছিল না। বরংচ সে কৃষক জনতার আত্ম-বলিদানের মধ্যে শ্রেয়সত্তা ও তাদের দেশ-হিতৈষণার মধ্যে মঙ্গল-শ্রীবিভাসিত রূপটি আজকের রাজনীতির মধ্যে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

দুই। ধর্মভিত্তিক সংগ্রাম ও সংগ্রামী নায়কদের দেবত্বীকরণ, ঐশী শক্তি ও মহিমা আরোপ বিদ্রোহের ব্যর্থতার অপর একটি কারণ। ধর্মের নামে যে সংগ্রাম সুরু হয় তার রূপ ও বিশেষত্ব সর্বজনগ্রাহ্য হতে পারে না। ধর্মের জিগীর দিয়ে স্বাধীন ধর্ম রাজ্য গড়ে তোলার আহ্বানের মধ্যে তিতুমীরের পতন, দুদুমিঞার পতন লুকিয়ে ছিল। আবার সিদু-কানুকে সাক্ষাৎ 'ঠাকুর' বানানোর মধ্যে এবং তিতুমীরকে 'পীর' দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার মধ্যে যে মহিমা আরোপ করা হয় তার অসাধারণত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। সুতরাং গণবিদ্রোহ একক ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণে সফল হতে পারে না।

তিন। কতকগুলি প্রথাগত বিশ্বাস, লৌকিক-সংস্কার, আচার অনুষ্ঠান বিদ্রোহের প্রেরণাদায়ক হলে-ও এসব অতিপ্রাচীন আদিম কৌশল প্রয়োগের মধ্যে দুর্বলতা লক্ষণীয়। সিদু কানুর সুবাঠাকুরত্বে অভিষেক, ডাল প্রেরণ—একটি বিশেষ সমাজে সাড়া পড়লেও সারাদেশে সার্বিক প্রেরণা বহন করতে পারেনি। আবার সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহের আগুন প্রবল বেগে ধাবিত হলো কতকগুলি লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে। যেমন চাপাটি৯, পদ্মফুল প্রেরণ, হাড়েরমালা,

জলের আধার, আশীর্বচন প্রভৃতি বহনের মধ্যে। এসব দ্রব্যাদি ও অনুভাবনের মধ্যে বিদ্রোহ সম্পর্কে খবরাখবর ও গুজব প্রচারিত হয়েছিল ; যা বিদ্রোহের সাংগঠনিক দিকটিকে অনিবার্য ব্যর্থতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বে অনেক গুজব শোনা গেল ; তার দুই একটি।১০

ক. লাগলাগিন (নাগনাগিনী) সাপেরা ধেয়ে আসছে, লোক গিলে খাবে। অতএব বিহিত কর। পাঁচগ্রামের লোকেরা একত্র হলো ; পরামর্শ করার জন্য। অর্থাৎ এর গুরুত্ব ছিল বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।

খ. লাহেগড়ে (লোহাগড়) কুমারী মেয়ের গর্ভে সুবা জন্মেছে। অর্থাৎ ভগবান হাজির হয়েছেন পরিত্রাতারূপে।

গ. একটি মহিষ আসছে। যার আঙিনায় ঘাস খাবে সেখানেই থাকবে, সেই বংশের ধ্বংস না হওয়া পর্যন্তই থাকবে। এই গুজবটির অর্থ, সকলেই গৃহ-অংগন পরিষ্কার রাখবে ; যাতে বিদ্রোহীদের জমায়েত, সভা সমাবেশ, জল্পনা-কল্পনার স্থান পেতে অসুবিধে না হয়।

স্থানীয় বিদ্রোহগুলি পরিশেষে ব্যর্থ হয়েছে রাজনৈতিক চেতনা, সংঘবদ্ধতার অভাব ও জাতিগত, ধর্মগত অনৈক্যের কারণে। কিন্তু বিদ্রোহীরা যে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শোষণ অবিচার অনাচারের প্রতিকারের চেষ্টা করেছে, তা এই রাজনৈতিক সচেতনতার যুগে প্রাক্-রাজনৈতিক যুগের সেইসব কর্মকাণ্ড ও ঘটনা বহুল বিদ্রোহ-বিপ্লব বিস্ময়বোধের সৃষ্টি করে।

কিন্তু তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবিগণ হয়তো বলবেন বিদ্রোহীদের মধ্যে ধর্মরাজ্যস্থাপনার উন্মাদনা ও সামাজিক দস্যুতা ছিল। কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা "সমাজ বিজ্ঞানের বিচারে এই দস্যুতা ও ধর্মরাজ্য স্থাপনার কামনাজাত গণবিক্ষোভ যেমন প্রাক্‌রাজনৈতিক যুগের গণবিদ্রোহ তেমনি আধুনিক সামাজিক আন্দোলনের প্রাগৈতিহাসিক পর্ব বিশেষ।"১১

॥ ৩ ॥

সাহিত্য সঞ্জীবনী

দেশকালের তাগিদে সাহিত্য। সাহিত্য সঞ্জীবন মন্ত্র বহন করে। ফরাসী দেশে, ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের চিন্তাধারা, সাহিত্য-কর্ম ও অনুভাবনে দেশকে বিদ্রোহ-বিপ্লবের প্রত্যক্ষভূমিতে টেনে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলত, ফরাসী বিপ্লব সর্বতোমুখী হতে পেরেছে। সাহিত্যের জাগরণে দেশ সমৃদ্ধ হয়, বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগামী চিন্তাধারার মূলসূত্রগুলি সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়; অনুশীলিত হয়। আমাদের দেশে সেরকম অগ্রগামী চিন্তা ধারার অভাব থাকার ফলে সাহিত্যপুষ্টি লাভ করতে পারেনি। তা করতে অনেক সময় লেগেছে। সেসব অবশ্য অনেক পরের ঘটনা। এখানে মনে রাখা ভালো, আমাদের দেশের স্থানীয় বিদ্রোহগুলির বিস্তার প্রাক্‌-রাজনৈতিক (Prepolitical) যুগের ঘটনা।

সুতরাং আলোচনার সীমায়তি আছে বটে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিদ্রোহের পূর্বাভাস অন্তত দেশপ্রেরণা ও সশস্ত্র বিপ্লবের ঝোঁকটা আমাদের উনিশশতকের সাহিত্যে-ও মেলে। অবশ্য বিদ্রোহের পরবর্তীকালে বিদ্রোহের ঘটনানিয়ে যেসব সাহিত্য হয়েছে; তার মূল্যায়নে এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বিদ্রোহের রূপরেখাটি তুলে ধরার প্রয়াস আমরা পেয়েছি।

॥ এক ॥

এখানে আমরা ভবিষ্যৎ-দর্পণাত্মক দুটি গল্পের১২ উল্লেখ করতে পারি, যার মধ্যে জাতীয়ভাবোধ, স্বাদেশিকতা ও সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা লক্ষিত হবে। এ-দুটি গল্প যথাক্রমে সিপাহী বিদ্রোহের বাইশ ও বারোবৎসর পূর্বে রচিত। ভারতীয় ভাষায় কথাসাহিত্যের যথার্থ উদ্ভব ও বিকাশের গোড়ার দিকে বিদেশী ভাষায় রচিত এ দুটি গল্পের মূল্য অপরিসীম।১৩ গল্প দুটির নাম:

১. 'এ জার্নাল অব ফরটি-এইট আওয়ারস অবদি ইয়ার ১৯৪৫'—এর লেখক হলেন হিন্দুকলেজের ছাত্র, রামবাগানের বিখ্যাত রসময় দত্তের মধ্যমপুত্র কৈলাস চন্দ্র দত্ত। গল্পটির প্রকাশকাল ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ।

২. 'দি রিপাবলিক অব ওড়িশা : অ্যানালস ফ্রম দি পেজেস অব দি টোয়েনটিথ্ সেঞ্চুরি'। এর লেখক হলেন রমেশচন্দ্র দত্তের খুল্লতাত শশিচন্দ্র দত্ত। গল্পটির প্রকাশকাল ১৮৪৫ খ্রীস্টাব্দ। গল্প দুটির বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্তি হলো এই :

১.

ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের অন্যায়-অত্যাচার, কুশাসন চরম সীমান্তে পৌঁছেছে। বড়োলাট লর্ড ফেল-বুচার কুশাসক, অত্যাচারী ও দুশ্চরিত্র। সময়টা এপ্রিল মাস, ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ। সমগ্রদেশ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তি চাইছে। এই মুক্তির পথ রচনায় নেমেছে একদল এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান অর্থাৎ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ। এঁরা ইংরেজ বিতাড়নে কৃতসংকল্প। তাতে মদত দিচ্ছেন "many of the most distinguished men of Calcutta-Babus, Rajas and Nabobs.." এই মুক্তি সঙ্ঘের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তরুণ যুবক ভুবন মোহন। একটি উন্মুক্ত জনসভায় জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে তিনি জনচিত্ত স্পন্দিত করেন। পূর্ববর্তী কুশাসকদের জঘন্য নিন্দা করে বলেন "Let us unfurl the banner of freedom and plant it where Britannia proudly stands"১৫

এমন সময় কলিকাতার ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে দেড়শ সশস্ত্র সরকারী সৈন্য উপস্থিত হয়। দুই পক্ষের হাতাহাতি ও লড়াই হলো। এতে সরকারের পক্ষে হতাহত হলো বেশি।

এই খবর লাটসাহেব কর্নেল ব্যালান কোটের নিকট পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। এরপর তিনি ফোর্ট উইলিয়ম ও মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত সেনানী কর্নেল ব্লাডথার্স্টকে পত্র লেখেন। পত্রের মর্মার্থ হলো ; এদেশের লোকের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা খুব তীব্র হয়ে উঠেছে। তারা সশস্ত্র বিপ্লবের পথও নিতে পারে। সুতরাং ফোর্টকে সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয়। এর পর তিনি সরকারী তাঁবেদার পত্রিকা 'ক্যালকাটা কুরিয়ার' এর একটি মিথ্যা অথচ নিপুণ রিপোর্টাজ তৈরী করলেন। তাতে বলা হলো : গতকাল উত্তর। পূর্ব কলকাতার উপকণ্ঠে একসভায় প্রায় ভদ্র

কারীদের ছত্রভঙ্গ করতে সৈন্যরা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেছে; এতে জনতা ভীত হয়ে পালাতে গিয়ে পরস্পরের পায়ের চাপে কিছু লোক হতাহত হয়। অবস্থা সরকারের নিয়ন্ত্রণে। কিন্তু সরকার এই ধরনের শান্তি ভঙ্গে অত্যন্ত অখুশী।

বিপরীত দিকে, বিদ্রোহীরা এর সমুচিত জবাব দেবার চেষ্টায় থাকে। সেই রাত্রেই নেতৃপরিষদে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, একদিন পর তারা কেল্লা দখল করবে। কিন্তু পর দিন থেকে বিদ্রোহী দলে ভাঙন দেখা দেয়। নেতৃপরিষদের একজন নেতা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কারণে সরে দাঁড়ান। তবু-ও ভুবনমোহন দমে গেলেন না। পরদিন দেশপ্রেমিক জনতা কেল্লার মুখে বাধিত হলো। বিদ্রোহী নেতা গঙ্গানারায়ণ ঘোড়ায় চেপে প্রথমে ছুটে গেলেন। কেল্লার সুমুখে দাঁড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতিকে দুর্গ সমর্পণের আদেশ করেন। সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক স্বাধীনতা সংগ্রামী গঙ্গানারায়ণকে একা পেয়ে ইংরেজ সৈন্য হত্যা করল ও কাগজের মুকুট পরিয়ে কেল্লার প্রাচীরে দোদুল্যমান অবস্থায় রেখে দেয়; সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুর প্রতিশোধের স্মারক হিসেবে। এর ফলে মুক্তি বাহিনী এগিয়ে আসে। যুদ্ধ চলে। ভুবনের তরোয়ালে ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ নিহত হন। তবু-ও লড়াইয়ে শেষ রক্ষে হলো না। ভুবন ও আরো নতুন নেতা বন্দী হলেন।

গির্জায় ঘণ্টায় ছটা বাজে। ময়দানে গিলোটিনের মতো একটা যন্ত্র বসানো আছে। দেশ প্রেমিকদের নিয়ে আসা হয় বধ্যভূমিতে। মৃত্যুর পূর্বে ভুবনের উদাত্ত আহ্বান: দুর্বল সংগঠন নিয়ে আমি আমার শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে দেশ রক্ষার চেষ্টা করলাম,—দেশ জাগরণের মহৎ কর্মটির যে সূত্রপাত করা গেল—ভবিষ্যতে তাকে আপনারা প্রসারিত করুন।১৩

২.

এর পর শশিচন্দ্রের 'কাহিনী'-র দাস উড়িষ্যা। ইংরেজ শাসিত ভারতের 'রাজধানী' দিল্লী থেকে ১৯১৬-তে একটি আদেশ জারী হলো যে ভারতবর্ষে দাস-ব্যবস্থা পুনর্বার প্রবর্তন করা হলো। এই আদেশের ধারায় বলা হলো; ১. এই দাসদের জন্মসূত্রে হিন্দু হতে হবে; ২. এদের পিতামাতা

অথবা এরা নিজেদের স্বাধীনতা বিক্রয় করতে পারবে; ৩. দাস দাসীরা মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে পণ্য হবে; ৪. মালিকদের শাস্তি বিধানের ক্ষমতা থাকবে; ৫. দাসদাসীদের মৃত্যু হলে তাদের সম্পত্তি মালিকদের অধিকারে আসবে। ব্রিটিশসরকারের এই জঘন্যতম আদেশের বিরুদ্ধে ভারতবাসী গর্জে ওঠে। দেশের মানুষ ধিক্কার জানাল। 'মর্নিংস্টার' 'বেঙ্গল হরকরা', 'আগ্রাগেজেট' 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়ট' প্রমুখ জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রগুলি সরকারের কঠোর সমালোচনা করল। এবং বিপ্লবের বাণী প্রচার করতে থাকে। সরকার সংবাদ পত্রের স্বাধীনতারুদ্ধ করে ও দমন নীতির আশ্রয় নিয়ে বিদ্রোহী উড়িয়াদের ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে। সরকারের পক্ষাবলম্বন করে 'গভর্ণমেন্ট অ্যাডভোকেট' পত্রিকা ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর সম্পাদকীয় নিবন্ধে বিদ্রোহীদের তীব্র নিন্দা ও সাবধান করে বলে যে বিদ্রোহ থেকে ভীখুবারিক, জগমোহন, গোকুলদাস, অপর্তি ও বৃন্দাবন সর্দার প্রভৃতি নেতাগণ সরে না দাঁড়ালে সেনাপতি জর্জ প্রাউডফ্রুট শক্তহাতে বিদ্রোহ দমন করবেন। তারচেয়ে বিদ্রোহীরা পিল্লীভীতে এসে বড়োলাটের নিকট নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করুক এবং তাঁর বসবাসের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণে; এদেশীয়রা শ্রম ও অর্থদান করলে তার ফল ভালোই হবে।

কিন্তু বিদ্রোহীরা অন্যপথে চলেন। তাঁরা ইংরেজ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার পণ নিয়েছেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিদ্রোহীরা সমবেত হয়ে ঘোষণা করেন ভারত শাসন করার অধিকার ইংরেজের আর নেই। মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। এরপর দুটি বাহিনী তৈরী হলো। বাংলা ও বিহারের সংযুক্ত বাহিনীর অধিনায়ক হলেন গোকুল দাস ত্রিবেদী; অপর্তি সর্দার হলেন উড়িষ্যা বাহিনীর নেতা।

কিন্তু প্রাউডফ্রুটের তৎপরতায় গোকুল দাস ও অপর্তি সর্দারের বাহিনী বিচ্ছিন্ন হলো বটে তবে ভীখু বারিকের অশ্বারোহী সৈন্যদের পরাক্রমে প্রাউড-ফ্রুটের বাহিনী বিপর্যস্ত হয়। ফলে ইংরেজ সরকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসতে চাইলেন বিদ্রোহীরা নরম হলেন। বিপদ সেখানেই। তার ওপর একজন বিদ্রোহী নেতার প্রেম-পর্যায় বিদ্রোহীদের সংকটে ফেলে। কাহিনীর দ্বিতীয় পর্ব এখান থেকে শুরু।

প্রবীণ ওড়িয়া বীর লক্ষ্মণ দাস খুবাত্তির পরমা সুন্দরী কন্যা নলিনীকে ভালোবাসেন জগদাস খাইখিপো। তাদের বিয়ে-ও স্থির ; কিন্তু ইংরেজের অধীনস্থ উড়িয়া সেনাপতি গোপীদাস তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। নলিনীর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে জগদাসের ওপর হিংস্র হয়ে ওঠে সে। একদিন ঘটনাচক্রে জগদাসকে বন্দী করে। কিন্তু লক্ষ্মণ দাস ও তাঁর অনুগামীরা জগদাসকে মুক্ত করে আনার চেষ্টা চালান। নলিনী-ও ছদ্মবেশে দয়িতের সন্ধানে বের হন। গোপী দাসের দলে যোগ দিয়ে এক সময় নলিনী জগদাসকে নিয়ে পালালেন বটে। তবে গোপীদাস পরে বুঝতে পারে ও তার দল পেছনে তাড়া করে। ফলত, জগদাস পালাতে পারলেন বটে কিন্তু নলিনী ধরা পড়েন। প্রতিহিংসাপরায়ণ গোপী তাঁকে হত্যা করে। জগদাস ভাবতে পারেননি যে উড়িয়া সন্তান নারী হত্যা করবে ; বিশেষত যাকে সে একদা ভালোবাসত।

তাই বিদ্রোহীদের শিবিরে পৌঁছে জগদাস প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্রোধ ও বেদনায় ফুঁসতে থাকেন। লক্ষ্মণ দাস কন্যার শোকে মুহ্যমান না হয়ে উড়িষ্যার পর্বতচারী কিঙারিদের আহ্বান জানালেন। লক্ষ্মণ দাস আশি হাজার সৈন্য নিয়ে ব্রিটিশ ও তাদের তাঁবেদার সৈন্যদের ওপর আক্রমণ চালান। এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য বিদ্রোহীদের হলো বটে তবে গোপী ও জগদাস উভয়েই এতে নিহত হয়েছেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১৫-ই অক্টোবর ছত্রভঙ্গ ইংরেজ বাহিনী উড়িষ্যার সীমানা থেকে পালিয়ে গেল। ক-মাস পরে, ১৩-ই জানুয়ারী ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহীরা উড়িষ্যার স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। পিল্লীভীতের ইংরেজ সরকার উড়িষ্যার স্বাধীনতা স্বীকার করল না বটে। কিন্তু তার অস্তিত্ব বিপন্ন করার দুঃসাহস আর দেখায়নি।১৭

প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে যুগ ও পরিবেশ বাংলাসাহিত্য পরিপুষ্টতা লাভ করেনি, সেই সময় বাঙালীর সাহিত্যে দেশ প্রেমের দৃষ্টান্ত এমন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে, এটা লক্ষ করার মতোই বিষয়। দেশ প্রেরণা-মূলক চিন্তাধারার পরিচয় ডিরোজিওর কবিতা ও কাশী প্রসাদ ঘোষের কবিতা সমূহের মধ্যে পাওয়া গেছে বটে তবে সেসব ছিল অতীতচারণ। "পক্ষান্তরে এই সর্ব প্রথম ভবিষ্যৎ-দর্পণ তাকে স্থানচ্যুত করল।"১৮ আরেকটি কথা। এই দর্পণাত্মক গল্প দুটি যে সময়কে কল্পনা করে রচিত তা ঐতিহাসিক দিক থেকে

সত্যতররূপে প্রতিভাত হয়েছে। উনিশ শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মাথায় যে সশস্ত্র বিপ্লবের কথাটা এসেছিল, তারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্প দুটি। লক্ষণীয় একটি মন্তব্য: "বাংলাদেশের উনিশ শতকীয় নব্য-বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে মাতৃভূমিকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, তার প্রথম স্বাক্ষর স্বরূপ এই গল্পগুলি, এদেশের মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাস সম্পূর্ণ বিস্মৃত হলেও এরা দুটি অসামান্য দলিল।"১৯

আবার বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বতঃবিরোধিতা বা সংশয়ের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। তার আরো একটি প্রমাণ শশিচন্দ্র নিজেই। তিনি ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় 'শঙ্কর: এ টেল অব মিউটিনি অব ১৮৫৭' নামে একটি উপন্যাস লিখেছেন। তাতে তাঁর পূর্বানুভূতি অপসৃত। দেশপ্রেম অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। অবশ্য ইংরেজের দেওয়া উচ্চপদবৃত্তি ও রায়বাহাদুর খেতাবের ভারটা-ও বড়ো কম ছিল না। ফলে তাঁর 'অনুভূতির গোত্রান্তর' স্বাভাবিক।

যাইহোক, উপন্যাসটির মধ্যে নানাসাহেব, আজিমুল্লা কিছু ঐতিহাসিক চরিত্র থাকলে-ও তার মধ্যে কল্পিত কাহিনী ও চরিত্রের অবতারণা হয়েছে। শংকর উপন্যাসের একটি চরিত্র, নায়ক-ও বটে। এতে গ্রামীণ পটভূমিতে নরনারীর ছবি চিত্রিত করা হয়েছে। ইংরেজের অত্যাচার-উৎপীড়ন ইতিহাসের ধারানুসারী। আবার কানপুরে ইংরেজদের ব্যাপক হত্যার দায় নানাসাহেব ও আজিমুল্লার ওপর চাপিয়ে এবং 'হিন্দু' ভারত ও 'মুসলিম' ভারত এই কল্পনার দায়-ও তাঁদের ওপর চাপিয়ে তিনি "ইতিহাসের সত্যকে আচ্ছন্ন করেছেন।"২০

॥ দুই ॥

বিদ্রোহ ভিত্তিক যে সব কবিতা ছড়া, গল্প-গাথা, উপন্যাস ও নাটক রচিত হয়েছে তার একটি রূপরেখা দেবার আমরা চেষ্টা করেছি। এখানে সাহিত্যের ভাষ্যে ইতিহাসের সংগতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে।

আমরা আগেই বলেছি। বিপ্লব ভিত্তিক সাহিত্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে রচিত। এর অবশ্য কারণ ছিল। যে আত্ম-সচেতনতা, জীবন-সংস্কৃতি

সম্পর্কে যে আগ্রহ থেকে নোতুন কিছু সৃষ্টি হয়; তার অভাব ছিল। অবশ্য প্রতিকূল পরিবেশ ও পরাধীনতার মধ্যে তীব্র জীবনাগ্রহ না থাকারই কথা।

বিপ্লবভিত্তিক সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অন্তরায় ছিল মুদ্রাযন্ত্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় 'সমাচার সুধাবর্ষণ' খবরাখবর প্রকাশের দায়ে বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। হোম ডিপার্টমেন্ট ১২.৬ ১৮৫৭ তারিখের একটি প্রস্তাবে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' ও ফার্সি কাগজ 'দুরবীণ'—এর ওপর ওয়ারেন্ট জারী করে এবং ঐ দুটি কাগজের সম্পাদকদ্বয়কে সুপ্রীমকোর্টে উপস্থিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৩-ই জুন Suppression of the Press Act (No. 15 of 1857) পাশ হয়; ফলে 'সমাচার সুধাবর্ষণ' সরকার বিরোধী মন্তব্যের দায়ে ও 'দুরবীণে' বিপ্লবীদের একটি ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার অপরাধে পত্রিকাদ্বয়ের প্রতি সরকারী দণ্ড বিধি স্থির হয়। অবশ্য দুরবীণ সম্পাদক দুঃখ প্রকাশ করে ক্ষমা পেয়েছিলেন। কিন্তু সমাচার সুধাবর্ষণের সম্পাদক শ্যামসুন্দর সেন কোনো দুঃখ প্রকাশ করেননি। তবুও তিনি মুক্তি পেলেন। সম্ভবত, তিনি পত্রিকা প্রকাশের আর অনুমতি পাননি।

শুধু কি তাই, সরকার বিরোধী কোনো পুস্তক রচিত হয়েছে কিনা, তা সরেজমিন তদন্ত করার জন্য লঙসাহেবকে নিয়োগ করা হয়। লক্ষণীয় বিদ্রোহের ব্যাপকতা ভারতের অন্যপ্রান্তে থাকা সত্ত্বেও শুধু বাংলায় এই ব্যবস্থা চালু হয়েছিল।

এখানে উল্লেখ্য, সিপাহীবিদ্রোহ বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ফলে আটান্ন সাল থেকে বাঙলা সাহিত্য যেন 'হঠাৎ সাবালকত্ব' লাভ করল। এতদিন সাহিত্যের পথ প্রস্তুত হয়েছে বটে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি কিছু হয়নি। "বিপ্লবের প্রচণ্ড আঘাত মনের দিগন্ত ও সৃষ্টি ক্ষমতাকে প্রসারিত করে দিল।"২১

১.

দেশকালের মনোভাব অনেকাংশই সাহিত্যে প্রতিফলিত। আমাদের উপস্থাপিত সাহিত্যে তার যথার্থ-ই প্রকাশ মিলবে। যাইহোক, সাহিত্যের ভাষ্যে ইতিহাসের সংগতি প্রশ্নে আমরা নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'অমর সিংহ' উপন্যাসটির কথা উল্লেখ করতে পারি। এতে তিনি বলেছেন: "সিপাহী বিদ্রোহ

ইংরাজের জয় হইবার প্রধান কারণ বিদ্রোহী নেতাগণ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, পরস্পরের সহায়তা করিয়া যুদ্ধ করিতে পারে নাই। বেহারে কুমার সিংহ, অযোধ্যায় মৌলবী সাহেব, মধ্য ভারতবর্ষে টাণ্টিয়াটোপী, সকলেই অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন, প্রত্যেকে ইংরাজকে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহারা মিলিয়া একত্রে ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিলে সহজে ইংরাজের জয়লাভ হইত না। ইংরাজদিগের এই বিশেষ সুবিধা ছিল, এক স্থান হইতে সৈন্য বিপদগ্রস্ত হইলে আর এক স্থান হইতে সৈন্য সাহায্য প্রেরিত হইত। লক্ষ্ণৌ, আরা প্রভৃতি অনেকস্থান ওইরূপে রক্ষিত হয়। কুমার সিংহ আজমগড়ে উপনীত হইলেন, অমনি এলাহবাদ হইতে, লক্ষ্ণৌ হইতে, ইংরাজ সৈন্য উপস্থিত হইল, কিন্তু কুমার সিংহের সাহায্যার্থ আর সৈন্য আসিল না।"২২ একথা ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই স্বীকার করবেন যে, সংঘবদ্ধতার অভাব ও কেন্দ্রীয় প্রেরণা না থাকার ফলেই বিদ্রোহের এই পরিণতি।

পণ্ডিত রেয়াজ অলদীন আহম মাশহাদি (১৮৫৯-১৯১৮) তাঁর 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থে সিপাহী বিদ্রোহ ও ওহাবী আন্দোলনকে ভারতবর্ষের দুটিমাত্র 'রাষ্ট্র বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন। এবং দুটি বিপ্লবের ব্যর্থতার যে কারণ জানিয়েছেন তা-ও মূল্যবান। তিনি লিখেছেন: "ওহাবি মন্ত্রণা প্রৌঢ়ি পরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বেই ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত ও অঙ্কুরেই বিদলিত হয়। কিন্তু উহা পরিপক্ক, পরিস্ফুট ও মোসলমান নামে প্রচণ্ডতা পরিগ্রহ করিলেও সিপাহি বপ্লব অপেক্ষা অধিকতর সুফল প্রসব করিত না। কারণ, ওহাবিগণ বৃকোদর ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিশাল কুক্ষিতে নিঃশেষে পরিপাচিত মোসলমান সাম্রাজ্যের—যাহার অস্থি পর্য্যন্ত তৎকালে জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; —তাহারই উদ্ধারার্থ এই গুরুতর ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।...সিপাহি বিদ্রোহের মূলমন্ত্র যাহাই থাকুক না কেন, ইহা পরিশেষে খণ্ড খণ্ড সুতরাং উপাদনিক দুর্ব্বলতা পরিগ্রহ বিশেষ দুরাকাঙ্ক্ষা ব্যক্তির স্বার্থসাধনে পরিচালিত হয়। ..এই সমস্ত বিদ্রোহ যদি মতপ্রকর্ষে, লক্ষ্যের দৃঢ়তায় যে প্রতিকূল বিষয়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব সঞ্জাত হইয়াছিল তাহার তীব্রতায় ভারতবর্ষীয় সার্ব্বজনীন সহানুভূতি লাভ করিতে পারিত এবং যদি ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের করালগ্রাস হইতে বিমুক্ত করা তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য হইত তাহা হইলে সিদ্ধি নিতান্ত দুরবস্থায়িনী হইত না।"২৩

এখানে এই মাত্র বলা যেতে পারে, সার্বজনীন সহানুভূতি লাভ করেনি বলেই বিদ্রোহের প্রকৃতি ছিল নিতান্তই স্থানিক। আরেকটি কথা, ধর্মীয় সংস্কার যে বিদ্রোহের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে, তার পরিণতি মহত্তর হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ তিতুমীরের সংগ্রাম, শরিয়তুল্লা ও দুদুমিঞার সংগ্রাম সমাজ-জীবনের পরিভাষায়, মানব মর্যাদার পরিপন্থী ছিল। আবার অর্থনৈতিক কারণে বিদ্রোহগুলি সংস্কারমুখী হয়ে ওঠায় এবং আভিজাতিক স্বার্থ জড়িত থাকায় বিদ্রোহগুলি অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে।

২.

সিপাহী বিদ্রোহের সময় শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব সাহিত্যে-ও স্পষ্ট। অনেকের দ্বিধাদ্বন্দ্ব যে ছিল তার ছবি আমাদের উল্লেখিত সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। অনেকে আবার ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণেই বিদ্রোহ থেকে দূরে সরে ছিলেন। হুতোমের রসিকতা ;—"মিউটিনি উপলক্ষে গবর্ণমেন্ট ও বাঙ্গালি শব্দের কথঞ্চিৎ পদার্থ জান্‌তে অবসর পেলেন, "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা আশা ও মানভঙ্গে অন্তরে বিষম জালায় জ্বলতে ছিলেন।"২৪ বাঙালীর একটি অংশের নীরবতা নাট্যকার অমৃতলাল নিয়োগীর-ও মনে হয়েছে। তাই তিনি তাঁর নাটকের নানাসাহেবকে দিয়ে বলাতে পারলেন—"ইংরাজ জাতি বড় সহজ জাতি নয়—বলেই হোক বা কৌশলেই হোক, যে রাজ্য একবার হস্তগত করেছে সে রাজ্য কি সহজে পরিত্যাগ কো'র্ত্তে পারে? চারিদিকেই আর্য্য জাতিরা উন্মত্ত হয়েছে, এসময় যদি বাঙ্গালিরা আমাদের সাহায্য করে, তাহ'লে এই দণ্ডে সমস্ত ইংরাজ রক্তে, ভারতের সমুদায় নদ নদী লোহিত বর্ণ ধারণ করে।"২৫

শিক্ষিত বাঙালীর নীরবতা বা উদাসীনতা কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য। আবার একশ্রেণী বুদ্ধি জীবীদের রচনার প্রভাবে সেই উদাসীনতা কাটছিল। সিপাহী বিদ্রোহের ওপর, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও নাট্যকাররা যে সব রচনা বাঙালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করছিলেন, তার যেমন বহুল প্রচার হচ্ছিল; তাতে বোঝা যায়, বাঙালীর ভাব-মানসে এক পরিবর্তন আসছিল। দেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁরা কৌতূহলী হয়ে উঠছিলেন। উপেন্দ্র চন্দ্র মিত্রের 'নানাসাহেব' প্রভৃতি অত্যল্পকালের মধ্যে দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়।

দেশ ও দেশীয় ঐতিহাসিক চরিত্র সম্পর্কে বাঙালীর কৌতূহল বাড়ছিল এটা তারই প্রমাণ দেয়। তা ছাড়া পত্র পত্রিকায় শিক্ষিত বাঙালীর আবেগ ও কিছু-কিঞ্চিৎ ধ্বনিত হচ্ছিল। এরই ফলে ২৫. ১১. ১৮৫৬ তারিখে সংবাদ ভাস্করের পাতায় বীরভূমের এক পত্র লেখক লিখলেন, অত্যাচারিত সাঁওতালদের "অবস্থা দেখিলে পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিরাও রোদন করেন।" এখানে আরও একটি কথা স্মর্তব্য। ডিরোজিও এবং কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতায় দেশপ্রেমের তীব্র প্রকাশ ঘটলে-ও সশস্ত্র বিদ্রোহ-বিপ্লবের চিন্তাটা তাতে ছিল না। এই চিন্তাটা এসেছিল ইংলণ্ডের সাহিত্যে। টমাস ক্যামবেলের 'দি প্লেজারস অব হোপ' এবং লর্ডবায়রনের 'দি কার্স অব মিনারভা' কাব্যে-ও এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে। আমাদের গ্রন্থের আঠারো শতক ও উনিশ শতকের নান্দীমুখে দুটি কবিতার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। আবার ইংলণ্ডে চার্টিস্ট আন্দোলন কারীরা ভারতে ইংরেজ অধিকারের বিরুদ্ধে যে বিক্ষুব্ধ-তরংগের সৃষ্টি করেছিলেন; তারই গুপ্ত-ভগ্ন রূপ আর্নষ্ট জোন্স-এর কাব্য গ্রন্থে সুস্ফুট। গ্রন্থটির নাম 'দি রিভোল্ট অব হিন্দুস্থান'—গ্রন্থটি সিপাহী বিদ্রোহের সময়ই মুদ্রিত হয়। তাই বলা যায় যে, "খাস ইংলণ্ডের সাহিত্যে এবং আন্দোলনে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চিন্তাটা এসেছে।"২৬

॥ তিন ॥

আমাদের সাহিত্যে বীরচিত্রের প্রস্তাব ও অংকন উদ্দেশ্য মূলক ভাবেই হয়েছে। শিল্পীদের রচনার মধ্যে তাঁদের দেশ হিতৈষণার পরিচয় অস্পষ্ট নয়। আবার এটা-ও দেখা গেছে, অনেকের রচনায় বিদ্রোহীদের চরিত্রে কালিমা লেপন করা হয়েছে। এই সম্পর্কে বলা যায়, দেশ-কালে বিদ্রোহী নায়ক সম্পর্কে সর্বদা মূল্যায়ন যে হয়েছে তা-ও নয়। আবার বিদ্রোহী নায়কদের দুর্বলতম দিকগুলি সমাজ জীবনে কু-ফল ও ডেকে এনেছে। ফলত বিদ্রোহ ও বিদ্রোহী নায়কদের সম্পর্কে দুটি বিপরীত মনোভাবের পরিচয় মেলে। লক্ষনীয় একই সময়ে দুই সাজনের কাব্যে তিতুমীরের পরস্পর বিরোধী পরিচয় মেলে। কিন্তু অবাক হতে হয় যে মানুষটি ইংরেজ শাসনকে চমকে দিয়েছিলেন বারাসতের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে; যাঁর দুর্দমনীয় প্রকৃতির জন্য ইংরেজী

পত্রিকা মন্তব্য করলেন ;—"It is vain to deny the fact—and every thinking man whether in this country or our own (ইংলণ্ড-বাসী) will draw from the inference, that we are standing on a powder magazine. The spark may not come this year, or the next ; but whether it shall rise from Barasut, or Balasore or Mysore, or any other sore, rise we may assure ourselves it will, under the promising example of Sheik Teetoo—and that at no remote period."২৭ সেই মানুষটি পাথাচিত্রে নিন্দিত। অথচ বর্তমানকালে তিনি বন্দনা পাচ্ছেন। নারিকেল বেড়িয়া গ্রামে তিতুমীরের স্মৃতি স্থলে প্রত্যহ তাঁর মসজিদে ধূপ-বাতি প্রদান করেন সেবায়েতগণ। মহরমের সময় বাগুড়িয়াগ্রাম থেকে যে তাজিয়া বের হয় তা নারিকেলবেড়িয়ায় তিতুমীরের স্মৃতিস্থলে শোভাযাত্রা সহকারে আসে। মাঝপথে ঘোষপুর, চণ্ডীপুর, বুরুজ প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু-মুসলমানগণ শোভাযাত্রাকারীদের সাময়িক গতিরোধ করেন ও 'মাতম' অনুষ্ঠান প্রদর্শন ও ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করেন।২৮ মোট কথা, হিন্দু মুসলমানের সাংস্কৃতিক চেতনায়-ও তিতুমীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন।

বিদ্রোহের কালান্তরে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছে বা এখন-ও হচ্ছে তাতে বিদ্রোহ বা বিদ্রোহী নায়কদের অনন্ত মূল্যায়ন হচ্ছে ; অবশ্যই তা ইতিহাসের নিরিখে। এই প্রসংগে সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'বহ্নিবন্যা'২৯ এবং সমরেশ বসুর 'উত্তরবঙ্গ'৩০ উপন্যাস দুটি স্মরণ করা যায়। দুটি উপন্যাসের পটভূমি সিপাহী বিদ্রোহ। এমন কি প্রাবন্ধিক ড. সুধীর করণের 'অরণ্য প্রহরী'৩১ গল্পটি-ও বাদ দেওয়ার নয়।

ঐতিহাসিক পুরুষদের অনন্য মূল্যায়ন হচ্ছে বলেই তাঁরা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে মূর্ত হন। একটি উদাহরণ, সাঁওতাল বিদ্রোহকে স্মরণ করা হয় শোষক-শোষিতের, দলনকারী দলিতের দিব্য-কাহিনী হিসেবে। পুরুলিয়ার অনামধন্য আদিবাসী ছো-শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া এই বিদ্রোহের কাহিনী নিয়ে নোতুন ছো-নাচ রচনা করেছেন। ইতিহাস জীবন্ত হয়। সিদু, কানু, চাঁদ ও ভৈরব রণাঙ্গনে হাজির হন। মুখোসপরা মাঝি মেয়ে নাচের ছন্দে ইংরেজ সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করে। মেয়েদের বেইজ্জতির বদলায় কাঁড়-বাঁশ ধরে সাঁওতালের দল। রক্ত ঝরা দিনগুলি রোমাঞ্চ জাগা শিহরণ আনে।৩২

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সেদিনের সমাজ এসব বিদ্রোহী পুরুষদের মূল্যায়ন করলেন না কেন, কিংবা উদার দৃষ্টি? আসলে, দেশ ও দেশের মানুষ সম্পর্কে যে স্বাভাবিক কৌতূহল, সমগ্র সত্তা দিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষ সম্পর্কে উপলব্ধি থাকা দরকার ছিল; তা গড়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের গোরার যে অনুভূতি—সেই গোরা যার মিউটিনির সময় জন্ম: তার অনুভূতি হলো ;—"একটি সত্য ভারতবর্ষ আছে, পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ সেখানে স্থিতি না হলে আমরা কি বুদ্ধিতে কি হৃদয়ে যথার্থ প্রাণরসটা টেনে নিতে পারব না।"

সেই 'প্রাণরসটা' প্রাক্-রাজনৈতিক যুগে সকলের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়নি বলে তাঁদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না বটে, তবে যে সব বিদ্রোহের স্থানীয় উদ্‌যোক্তারা দেশ হিতৈষণায় অস্ত্র ধরেছিলেন; তাঁদের অন্তরের 'লক্ষীর বন্দর' অর্থাৎ ভারতবর্ষ সম্পর্কে মহত্তর উপলব্ধির জন্য তাঁরা আজ আমাদের শ্রদ্ধেয়।

॥ ৪ ॥

নবযুগ প্রসংগ

উনিশ শতক 'স্বর্ণযুগ'। বাংলায়* রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কাল। ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে বাঙালী রাজনৈতিক চেতনায় ও সাংস্কৃতিক বিকাশে নোতুন জীবনাদর্শের সন্ধান পেয়েছেন। ধর্ম, সাহিত্য, শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি—এক কথায় বাঙালীর জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের প্রাবল্য লক্ষ করা গেছে। সুতরাং বাঙালীর চিন্তা ও চৈতন্যের নব-উন্মেষ** সুবাদেই 'বাংলায় নবযুগ' বলা হয়ে থাকে।

রেনেসাঁস বা নবজাগরণ এই শব্দটির নামায়ন বড়োই ভাবোদ্দীপন। ডেনিস হে রেনেসাঁস সম্পর্কে বলেছেন; "the word Renaissance

---

*"উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসই এ যুগের সারা ভারতের ইতিহাস" দ্র. মোহিত লাল মজুমদার, বাংলায় নবযুগ, ৩য় সং পৃ. ১

**The impact of British rule, bourgeois economy and modern western culture was felt first in Bengal and produced an awakening usually as the Bengal Renaissance"—Susobhan Sarkar, On the Bengal Renaissance, 1979, P. 13

means a period of time and certain characteristics associated with the period."৩৩ অর্থাৎ হে সাহেব সময়ের বিশিষ্টতা ও সময়ের পরিধি সম্পর্কে ইংগিত করেছেন।

আমরা সময়ের সেই পরিধিকে ১৮১৭ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চিহ্নিত করতে চাই। কারণ, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় ১৮১৭-তে। এই সময় কাল থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ অর্থাৎ মহাবিদ্রোহ কাল পর্যন্ত ;—এই পরিধিতে অনেক আন্দোলন, অনেক সংস্কার ও বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। মহাবিদ্রোহ কালে শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা ভারতবর্ষে পরিবর্তনের ঝড় বয়ে গেছে। বাংলার পটভূমিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে দেখা যাবে, হিন্দু কলেজ স্থাপন হবার চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে উদ্যোগ-প্রসার যতটা না হয়েছে ; তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে মহাবিদ্রোহের পর ; এক যুগের মধ্যে। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, রাজনীতি, বিজ্ঞানচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে মহাবিদ্রোহোত্তর আলোড়ন দেখা দেয়। 'হিন্দু মেলার' প্রতিষ্ঠা-ও সেই সময়েরই বাণীসংকেত।

১৮১৭-১৮৫৭-এই চল্লিশ বৎসরে বাঙালী সমাজের তিনটি স্তর অতিক্রান্ত মহাপর্ব বিশেষ। ১. রামমোহনের কাল (১৮১৭-১৮৩১) ; ২. ইয়ংবেঙ্গলের কাল (১৮৩১-১৮৪৩) ; এবং ৩. তত্ত্ববোধিনীর কাল (১৮৪৩-১৮৫৭)। অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাঙালী সমাজে শিক্ষাদীক্ষা ত্রি-পুরুষের। শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার সে কথাই বলেছেন।৩৪ বিনয় ঘোষের হিসেব তিন পুরুষের। ১. বর্ষীয়ানদের মধ্যে ছিলেন রাধাকান্ত দেব, রামমোহন এই কালের প্রধান পুরুষ। ২. মধ্য বয়স্কদের মধ্যে ছিলেন রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ যাঁরা 'ইয়ংবেঙ্গল' ও তত্ত্ববোধিনীর কালের কর্মিষ্ঠ পুরুষ। ৩. রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি হিন্দু কলেজের সদ্য শিক্ষিত এবং তাঁদের অনুজ দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কালীপ্রসন্ন সিংহ।৩৫ যাইহোক, এই—দুই বা তিন পুরুষের সক্রিয় উদ্যমে নবজাগরণের উন্মেষ-পর্ব সম্পূর্ণ হয়।

কর্ণওয়ালিসোত্তর পরাধীন ভারতের পটভূমিকায় সুরু হয় আমাদের রেনেসাঁস। এর সংগে ইউরোপের রেনেসাঁসের তুলনা চলতে পারেনা।

ইউরোপে নবজাগরণের উন্মেষ হয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায়। আর আমরা ছিলাম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরবশে। ফলত, সর্বব্যাপী জাগরণ সম্ভব ছিলনা প্রতিকূল পরিবেশে। তাই এর গতি-প্রকৃতি ছিল শ্লথ ও আবেগহীন। এদেশের মুষ্টিমেয় বাঙালী ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি আত্মস্থ করে কোম্পানীর আস্থাভাজন মৎসুদ্দী হলেন এবং এঁরাই জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কুতূহলী হয়েছিলেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় এই বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা ও কর্মসূত্রে গোঁজামিলই ছিল বেশি। এই ক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত নেপাল মজুমদার যা বলেছেন; তা-ও প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—"সেদিন না ছিল তাঁহাদের দৃঢ় অর্থনৈতিক বনিয়াদ, না ছিল তাঁহাদের চেতনা ও মানসিক প্রস্তুতি। তাই তাঁহাদের জীবনাদর্শনে ও আচরণে যুক্তিবাদ ও ভক্তিবাদ, অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদ সংস্কারবাদ ও বিপ্লববাদের এত তাত্ত্বিক গোঁজামিল; তাই তাঁহাদের রাজনৈতিক সংগ্রামে এতখানি দ্বিধাদ্বন্দ্ব জড়তা ও স্ববিরোধিতা। এক কথায়, আমাদের দর্শন ও সমাজ বিপ্লবের প্রেরণা ও তাগিদ সমাজের ভিতর হইতে আসে নাই। তাই মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবীর ধার-করা প্রাণ-প্রবাহ সংস্কারবাদের খাতে ধীরে ধীরে সমাজের উপরে বহিয়াছে। তাই দর্শন বিপ্লব না হইয়া হইল ধর্ম সংস্কার সমাজ বিপ্লব না হইয়া হইল নিয়মতান্ত্রিক ও সংস্কারবাদী রাজনীতি।"৩৬

মন্তব্যটি যথার্থ। তবে শ্রদ্ধেয় নেপালবাবু সমাজ বিপ্লবের যে 'তাগিদ' টার কথা বলেছেন; তা সর্বাংশে ঠিক নয়। তাগিদটা, প্রয়োজনভিত্তিক। সে কথাটি সমাজ সংস্কারকগণ কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন। সমাজের কুসংস্কার, অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকগুলির প্রতি হস্তক্ষেপ ও সংস্কারের যে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন রামমোহন, বিদ্যাসাগর; তার তাগিদটা সমাজের ভেতরেই নিহিত ছিল। অগ্রণী পুরুষরা তাঁদের অগ্রগামী চিন্তা দিয়ে সেই চেতনাকেই ত্বরান্বিত করেছেন।

এক.

যাইহোক, আমাদের সদ্যোক্ত তিনস্তরের মধ্যে বাঙালী জাগরণের তিনটি বিশিষ্ট দিক-ও লক্ষণীয়। ১. জীবন জিজ্ঞাসা, ২. ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের উদ্যোগ; ৩. মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সচেতনতা ও উদ্যমশীলতা।৩৭

এই জাগরণের প্রাঙ্‌মুখ রচিত হয়েছে রামমোহনের * কর্ম-কুশলতায়। তাঁর সমূহ জীবন চর্যায় তিনটি বৈশিষ্ট্যই* মূর্ত হয়ে উঠেছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর স্বাভাবিক কৌতূহল, বাস্তব চৈতন্য থেকেই নবযুগের তরংগ উত্থিত হয়েছিল। রামমোহনের উদ্যোগপর্বে ধর্ম-সমাজ ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা সম্পর্কে গভীরে প্রবেশ না করে-ও বলা যায়; তাঁর পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের চেষ্টা, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, গ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি কাজগুলি জীবন জিজ্ঞাসার ও কুতূহলতার পরিচয় দেয়।

রামমোহন ধর্মের ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা, ধর্ম ও সমাজের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও পারম্পর্য বিচার করেছিলেন। ম্যাক্সম্যূলর রামমোহনকে তুলনামূলক 'ধর্মালোচনার জনক' বলেছিলেন। যাইহোক ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যেই তিনি "আত্মীয় সভা" (১৮১৫) স্থাপন করেছিলেন। যেখানে "বেদান্ত ধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার হইত।"৩৮ তাছাড়া 'ব্রহ্মসভা' (১৮২৮) স্থাপন করলেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন, স্ত্রীজাতির অধিকার বিষয়ক মতামত আলোচ্য ধারার দ্বিতীয় দিক। ধর্ম ও সমাজ নিয়ে যে আন্দোলনের তিনি সূচনা করলেন তার বিরুদ্ধে রাধাকান্ত দেবের দল-ও সক্রিয় ছিল। তাঁর নামে গান বাঁধা হয়েছিল। তারই কিয়দংশ;৩৯

"সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎ সৎ বলে বানিয়েছে স্কুল;
ও সে জেতের দফা, করলে রফা
মজালে তিন কুল।"

এরপর রামমোহন ইংলণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ধাঁচে স্বদেশের জাতীয় স্বার্থের দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলন করার প্রয়াসী হয়েছিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণের চেষ্টা হলে তার প্রতিবাদ, পার্লামেন্টে দাখিল করা রাজস্ব বিষয়ক সাক্ষ্য, নেপলস্, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের

* "রামমোহনই সর্ব্বপ্রথম এই মৃতকল্প জাতির ঘোর তামসিকতাকে সাত্ত্বিকতার ভাণমুক্তকরিয়া একটা রাজসিক আদর্শের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন।" দ্র, মোহিত লাল মজুমদার, বাংলার নবযুগ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৬৫ পৃ ১

মুক্তি সংগ্রামে তাঁর উদার মনোভাব, ইংলণ্ডে রিফর্ম বিল সম্পর্কে তাঁর গভীর উপলব্ধি রাজনৈতিক সচেতনতারই পরিচয় বহন করে। পার্লামেন্টে রিফর্ম বিলের দ্বিতীয় পাঠ যখন চলছে তখন ২৭.৪.১৮৩২ তারিখে বের্ডফোর্ড স্কোয়ার থেকে এক পত্রে তিনি লিখেছিলেন : "The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny through out the world ; between justice and injustice and between right and wrong..."৪০ এই মন্তব্যে রাজার রাজ-বোধির পরিচয় যথার্থ-ই। এখানে বলে নেওয়া যেতে পারে যে, মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক সচেতনতা ও নিয়ম তান্ত্রিক ও সংস্কার আন্দোলনের তিনি-ই স্রষ্টা। "আত্ম শক্তি অর্জন ও জাতীয় প্রস্তুতির জন্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, গণতান্ত্রিক চেতনা ও আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করে তিনি উদ্যোগী হইয়াছিলেন। বস্তুত পক্ষে, ইহাই ছিল বাংলাদেশের সমগ্র রেনেসাঁসের মূল লক্ষ্য।"৪১

দুই

"১৯শ শতাব্দীর বাঙালীর জীবন বোধ, ও বোধিজ্ঞান ও প্রতীতি, মনন ও ধ্যান এক কথায় জাতির সর্বাঙ্গীন আত্মবীক্ষা জাগ্রত হইল"৪২—সেই জাগরণকে দুর্বার করে তুলেছিল ইয়ং বেঙ্গলের তরুণদল। এই তরুণদল হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ডিরোজিওকে গুরু মেনেছেন *। গুরুর সদ্গুণ তরুণ বাঙালী চিত্তকে আকৃষ্ট করল। তাঁর উদার মানবতা বোধ, স্বদেশ প্রীতি ; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও যুক্তিবাদ তরুণদের প্রভাবিত করল। এর ফলে তাঁদের সুখ্যাতি প্রবাদ স্বরূপ ছিল—"কলেজের ছেলেরা সত্যপ্রিয় ও সৎ, তাঁহারা সত্যের বন্ধু এবং মিথ্যার শত্রু।"৪৩ কিন্তু তাঁদের ধর্মের প্রতি বিমুখতা, সমাজ-সংস্কারের প্রতি তীব্র আগ্রহ ও গভীর অনুভূতি তাঁদেরকে বিদ্রোহী করে তোলে। এবং তাঁদের বিদ্রোহী মনোভাব অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের মতো বিতর্ক সভায়, ও সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভায় প্রকাশ পেতে

*রামতনু লাহিড়ীর বৃদ্ধ বয়সে দিনলিপিতে লেখা থাকত "Derozio, O my Guru"—দ্র যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার নব্যসংস্কৃতি, ১৯৫৮, পৃ.১২

থাকে।৪৪ সংস্কারমুখী চেতনা থেকে তাঁরা 'এনকোয়ারার', জ্ঞানান্বেষণ বেঙ্গল স্পেক্‌টেটার' প্রভৃতি সাময়িক পত্র প্রকাশ করেছিলেন। এতে রাজনৈতিক আলোচনা, বক্তৃতা, মতামত প্রকাশ সুরু করেছিলেন নব্য বঙ্গীয়রা। সংস্কৃত কলেজগৃহে জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনে কোম্পানীর পুলিশ ও ফৌজদারী আদালতের অবস্থা প্রসংগে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় যে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন ; তার ফলে অধ্যক্ষ রিচার্ডসন সাহেবের সংঙ্গে ছাত্রদের তুমুল বাদানুবাদ ও দ্বন্দ্ব একটি ঐতিহাসিক সংঘর্ষ বলে দাবি করা যায়।

আবার জ্ঞানোপার্জিকার সভ্যরাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য জর্জটমসনের সহযোগে The British Indian Association গড়ে তোলেন (১৮৫১)। পূর্বে দুটি মুখপত্র ছিল— ভূস্বামী সম্প্রদায়ের The Bengal Land holders' Association এবং তরুণ বাঙালীদের The Bengal British Indian Association—এই দুটি দলকে টমসন একসূত্রে বেঁধে দিলেন। প্রকৃত পক্ষে টমসন সেদিনের বাঙালীর রাজচেতনাকে উদ্দীপ্ত করলেন ; প্রেরণা দিলেন৪৫ সত্য, যুক্তির প্রবলতম অনুভূতিতে।

তিন.

এখানে উল্লেখ্য, তত্ত্ববোধিনীকালের যাঁরা অগ্রণী পুরুষ অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, নাটুকে রামনারায়ণ, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি মনীষী ইয়ংবেঙ্গলের রচিত পথরেখাকে আরো বিস্তৃত করলেন অনেক প্রযত্নে। এই ক্ষেত্রে তত্ত্ববোধিনী সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' গুরুত্ব অপরিসীম। আবার এই সময় বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের আপাত স্ববিরোধিতা-ও লক্ষণীয়। যেমন, বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রচলন সম্পর্কে সারাদেশে আলোড়ন ওঠে। বলাবাহুল্য রক্ষণশীল ব্যক্তিদের মধ্যে রাধাকান্ত দেব, তত্ত্ববোধিনীর মূল হোতা দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের মতো নিরাকার বাদী ও রামগোপাল ঘোষের মতো সংশয় বাদীরা৪৬ ছিলেন।

আরো একটি বিষয়। ইয়ংবেঙ্গলের নেতৃস্থানীয় রামগোপাল ঘোষ যখন ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনস্থাপনে উদ্যোগী হলেন তখন তার মধ্যমণি হলেন ভূস্বামী সম্প্রদায়ের দুই প্রধান ব্যক্তি ! রাধাকান্তদেব যিনি সভাপতি হলেন আর দেবেন্দ্রনাথ হলেন সম্পাদক। এই দুই প্রান্তের বুদ্ধিজীবীদের

রাজনৈতিক মিলন শুধু নয়; একত্রে কাজ করার অন্তরগরজ-ও দেখা দেয়। দেবেন্দ্রনাথ রাজনৈতিক কর্মে সক্রিয় হতে সদস্যদের জন্য একটি সার্কুলার-ও জারী করেন।

রামগোপালের দীপ্ত ভূমিকা সেদিনের বাঙালীর চিত্তভটে প্রেরণার সঞ্চার করেছিল, সন্দেহ নেই। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপীয়দের সাধারণ আদালতে বিচার করাও ব্যবস্থার জন্য যে বিল আনা হয়, তা ইউরোপীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় 'ব্লাক অ্যাক্টস্' নামে। রাম গোপাল এই বিল সমর্থন করে পুস্তিকা বের করেন। এর জন্য তাঁর দুর্ভোগ কিছু হয়েছিল বটে।

আবার কোম্পানীর সনদ পরিবর্তনের পূর্বের বৎসর ১৮৫২তে হরিশ মুখার্জীর প্রণীত আবেদন পত্রে দ্বিধাহীন-স্বাক্ষর করলেন শিক্ষিত ব্যক্তিরা। ব্রিটিশ সরকারের কাছে এই নিবেদন পত্রে দাবি করা হলো, নীল ও লবণের একচেটিয়া ব্যবসা রদ হোক; ভারতীয় শিল্পকে সাহায্য করা হোক; ভারতীয়দের সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত করা হোক, ভারতীয়দের সংখ্যাধিক্যে ভারতীয় আইনসভা গঠন করা হোক। অবশ্য এসব দাবি পূরণ হলো না বটে। তবে গণচেতনাকে উড়িয়ে-ও দেওয়া হলো না। মধ্যবিত্ত মতাদর্শের কিছু মূল্য দেওয়া হলো। জমিদারদের স্বার্থ-ই বড়ো হয়ে উঠল না। তাই মিশনারীদের দাবি—জমিদারদের অধীনে রায়তদের অবস্থা অনুসন্ধানের দাবি (১৮৫৬); জমিদারগণ উদার ভাবেই সমর্থন করলেন।

—এইসব রাজনৈতিক কর্ম ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন করেছিলেন নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ও সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে। এই আন্দোলনের প্রেরণা মানবপ্রেম থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। তার বড়ো প্রমাণ বাঙালী বুদ্ধিজীবী অক্ষয় কুমার দত্তের সমীকরণটি।

কৃষকের পরিশ্রম = শস্য

কৃষকের পরিশ্রম + ভগবৎ প্রার্থনা = শস্য

ভগবৎ প্রার্থনা = 0 অর্থাৎ মাটি ও মানুষের শ্রমকেই স্বীকার করা হলো। বোধকরি অন্তর-নিবদ্ধ তত্ত্বটি এইভাবে ভাবা চলে; কৃষক = মানুষ। শস্য = মাটি; নিহিত অর্থে দেশ। শ্রম তো মানুষই দান করে। অর্থাৎ দেশ ও মানুষের স্বরূপ-উপলব্ধি হলো নবযুগের লক্ষণ।

চার

বাঙলার স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা লিখতে গেলে বিশেষ করে উনিশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে ; দুটি ধারার—১. বুদ্ধিজীবীদের সংস্কারবাদী * অর্থাৎ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের ঃ ২. কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ করতেই হবে। প্রথম ধারাটিতে লক্ষণীয় রামমোহন ; বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু প্রমুখ দ্বারা প্রচারিত সমাজ সংস্কারের ভাবধারা। আর দ্বিতীয় ধারাটি হলো সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিপাহীবিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি।

এখানে সংক্ষেপে বুদ্ধিজীবীদের সংজ্ঞা নিরূপণ করে নেওয়া যেতে পারে। রবার্ট মিচেলস-এর ভাষায় "it would be wrong to define intellectuals interms of academic examinations."৪৭ আবার বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী কার্লম্যান হাইমের ভাষায় বুদ্ধিজীবীদের সংজ্ঞা হলো এই ; "In every society there are social groups whose special task is to provide an interpretation of the world for that society. We call these 'intelligentsia'৪৮ মিচেলস সাহেব বুদ্ধিজীবীদের আর-ও দুটি গুণের কথা 'priestly qualities' ও 'priestly functions' উল্লেখ করেছেন। এর সংগে বিনয় ঘোষ 'political activity'র কথা যোগ করেছেন৪৯। পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা সকল দেশের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেই আরোপ করা যায়।

যাইহোক, আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীদের সমাজ আন্দোলনের ধারাটি স্বীকৃত হয়েছে যে পরিমাণে ; সেই পরিমাণে কৃষক বিদ্রোহের ধারাটি স্বীকৃত হয়নি। কিন্তু সমাজের গরিষ্ঠতম অংশ এরাই। বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনো অগ্রগামী চিন্তাছিলনা, তাই তাঁদের বিদ্রোহ 'বীরত্ব ব্যঞ্জক' হলে-ও তার পতন অনিবার্য ছিল। অতএব এর গৌরবজনক কোনো ভূমিকা ছিল ; তা অনেকেই স্বীকার করতে নারাজ। কিন্তু আঠারোশতক ও উনিশ শতকের বিদ্রোহধারা আলোচনার মধ্যে বিদ্রোহীদের ভূমিকা, আত্মত্যাগ, ব্যর্থতা ; মোট কথা মৌল প্রেরণা ও তাগিদটি বিচার করার প্রয়াস পেয়েছি। স্থানীয় বিদ্রোহের উদ্যোক্তাদের মধ্যে কোনো গৌরবজনক ভূমিকা ছিল না, বা আদর্শ ; সেই অপবাদটি কতটুকু ভ্রান্ত তা আমাদের আলোচনা থেকে বোঝা যাবে।

* নরহরি কবিরাজ বলেছেন, 'বুর্জোয়া সংস্কারবাদী ধারা' দ্র, পরিচয়, পৌষ, ১৩৬১

মার্কসবাদ মনে করে যে, শ্রেণী হিসেবে কৃষকরা রক্ষণশীল এবং উৎপাদনের দিক থেকে পশ্চাৎপদ। দীর্ঘমেয়াদী কাজের জন্য তাদের সংগঠিত করা ও শক্ত। তাই ইতিহাস বলে যখন কৃষক বিদ্রোহ সফল হয় তখন ধরে নিতে হবে বুর্জোয়া শ্রেণী নেতৃত্ব দেয়; না হয় শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব দেয়। ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশের কালে ফরাসী বিপ্লবে বুর্জোয়া শ্রেণী কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল তার ফলেই ফরাসী বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে। আবার রাশিয়াতে বুর্জোয়াশ্রেণী নেতৃত্ব দিতে পারেনি, পেরেছিল শ্রমিক শ্রেণী। ফলে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সেখানে কৃষকবিদ্রোহ সার্থক হয়েছিল।

এখানে মনেরাখা দরকার যে ফ্রান্স, রাশিয়া ধনতান্ত্রিক দেশ। তাই সেখানের বিদ্রোহ ছিল সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদের বিদ্রোহ। আবার আয়ার্ল্যাণ্ড চীন ও ভারতবর্ষ ছিল ঔপনেবেশিক দেশ। ফলকথা, এদের সংগ্রাম করতে হয়েছে বিদেশী পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে ও তার দেশীয় তাঁবেদার সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। সুতরাং এসব দেশের সংগ্রাম—জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের রূপ নেয়।

চীনদেশে উনিশ শতকের কৃষক বিদ্রোহগুলি বিশেষ করে তাইপিঙের বিদ্রোহ প্রভৃতির অগ্রগামী ভূমিকাগুলি মাওসেতুং অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন। চীনে-ও দেখা গেছে, যখন শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব গ্রহণ করল; তখন থেকেই বিদ্রোহের সাফল্য এসেছে।৫০

মার্কসীয় আলোকে বিচার করলে দেখাযাবে, আমাদের উল্লেখিত স্থানীয় বিদ্রোহগুলি শ্রমিক শ্রেণী বা বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে গড়ে ওঠেনি। সুতরাং ব্যর্থতা অনিবার্য ছিল। তবু-ও বলাযায়, দুটি ধারা ভিন্ন বাঁকে প্রবাহিত হয়েছে বটে, কিন্তু কোনোটিকেই অস্বীকার করা যায় না।

তাই, উনিশ শতকের কাছে আমাদের ঋণ স্বীকার করতেই হবে। আর সমাজ নায়কদের "আদর্শ পুরুষ"৫১ না ভাবার মধ্যে কোনো মহত্ব নেই। মানব কল্যাণের অন্তিম লক্ষ্যকে ভুলে যাওয়া যেমন অপরাধ তেমনই নিরন্ন কৃষক জনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চেতনার মধ্যে স্বদেশ হিতৈষণার অন্ত-সত্তা অনুভব না করা বা সংশয়ান্বিত হওয়া-ও সমান অপরাধ।

পরাধীন ভারতে বিদ্রোহ-বিপ্লবের যাঁরা উদ্যোক্তা, তাঁদের 'স্বাদেশিকতার ভক্তিচন্দনে' শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের মধ্যে উত্তর পুরুষ হিসেবে আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধিও সিদ্ধি।

অনুক্রমণী

উল্লেখ-সূচীতে ব্যক্তিক পরিবেশ, ঘটনাসংঘাত নির্দেশ করা হলো। গ্রন্থনাম ও গ্রন্থ বিষয়ক উল্লেখ উদ্‌ধৃতি চিহ্নাঙ্কিত।

ধ

ন

শুদ্ধি-পত্র

ছাপার ভুল যেখানে তথ্য বিকৃত বা অবোধ্য করেছে, কেবলমাত্র সেইসব অংশের সংশোধন দেওয়া হলো ॥

পৃষ্ঠা	সারি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭	৩	uumolested	unmolested
১১	১০ নং পাদটীকা	Edward Tomson	Edward Thomson
২৮	৬	অন্নুরুদ্ধ	অনিরুদ্ধ
২৮	৭	বক্তি	ব্যক্তি
২৮	১৬	বৃত্তান্ত	বৃত্তান্ত
৩১	১৬	বিদ্রোহদ্যমে	বিদ্রোহোদ্যমে
৩২	৮	লিখেছিলেন :	লিখেছিলেন : ৩৭
৩২	১১	sbusing	abusing
৩৪	১-২	বিদ্রোহ-দ্যমে	বিদ্রোহ-উদ্যমে
৭৩	২৩	মম্বন্তর	মন্বন্তর
৭৫	১৫	পরোমপকারী	পরমোপকারী
৭৫	২১	বহির্বিষক	বহির্বিষয়ক
৮২	১	বপরীত	বিপরীত
৮২	২৪	শিঠের	শিষ্টের
৮৪	৪	শিঠের	শিষ্টের
৮৬	২৪	নবোদ্‌বেধিত	নবোদ্‌বোধিত
৯১	৮	কৌশল-এর	কৌশলত্রয়
১০৩	১৫	শ্রমকিনাঙ্ক	শ্রমকিণাঙ্ক
১০৫	৮	একশত পূর্বের	একশত বৎসর পূর্বের
১২৮	১৮৬ নং পাদটীকা	সংযোগ-৩	সংযোজন-৩
১৩১	১৫	'কৃত্তঘাটের'র	'কৃত্তঘাটের'
১৩৪	২১	রাজপরিবার	রাজপরিবারে
১৩৯	১০	কষ্ঠিপাথরে	কষ্টিপাথরে
১৪৩	৭	সল্পকালীন	স্বল্পকালীন
১৪৪	১৭	সংকৃতি	সংস্কৃতি
	১৯	সম্বদ্ধ	সম্বন্ধ
১৪৭	২	বিতড়নে	বিতরণে
৬০	১২	dose	does
১৭৪	১	জাবক্স খাঁ	জানবক্স খাঁ
১৭৪	৪	জাবক্সের	জানবক্সের
৬	১৩	মেটাবার	মেটাবার
	১৮	বাস	আবাস
২০৬	২১	জমিজারদের	জমিদারদের
২৫৯	২০	অতৃপি	অতৃপ্তি
২৭৪	২১	তিতুর	তিতুমীর

২৭৮	৯	পুঁড়াব	পঁড়ার
২৭৯	৮	বলে	মেলে
২৮৪	৩	গোবডাঙ্গা	গোবরডাঙ্গা
২৮৭	২৪	ভিতুমী র	তিতুমীরের
২৯৯	১৭	শারযতুল্লা	শরিয়তুল্লা
৩০৭	২২	তিনি ভাইয়ের	তিন ভাইয়ের
৩১০	১৬	মহত্ত	মহত্ত্ব
৩১৩	অধ্যায়সূচী	বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া সামরিক সাহিত্য	বিদ্রোহের প্রতিক্রিয় সাময়িক সাহিত্য
৩১৬	ফুটনোট	Treachary	Treachery
৩২৫	৭	অগ্নকাণ্ডের	অগ্নিকাণ্ডের
৩২৮	৫	টল	কইল
৩৪০	৫	অ:সাম্য	অস:ম্য
৩৪২	২২	পলটান	পলটিন
৩৪৬	৫	জন	জন্য
৩৪৬	১৪	নির্লজভাবে	নির্লজ্জভাবে
৩৪৮	৬	বিবেকমান	বিবেকবান্
৩৪৮	১৭	সহানুশীল	সহানুভূতিশীল
৩৪৮	১৭	সাঁওতালদেব	সাঁওতালদের
৩৫৭	১৩	আবরণীয়	অবারণীয়
৩৫৭	২৪	তাহা	তারা
৩৬২	২০	সংস্কতিতে	সংস্কৃতিতে
৩৬৯	১	বাঁকুডাব	বাঁকুড়ায়
৩৯৪	৬০ নং পাদটীকা	সকলনটিতে	সংকলনটিতে
৩৯৫	সংযোজন-১	প্রতিপ্রাদ্য	প্রতিপাদ্য
৪০৯	২	ইংরেজ সরকারে	ইংরেজ সরকারের
৪১৯	২	থাকেননি	থাকেন
৪১৯	৫	অবনীত	অবিনীত
৪২৩	১	করে এই পটভূমিকে অবলম্বন	এই পটভূমিকে অবলম্বন করে
৪৩২	২৯	ঐতিহাস উপন্যাস	ঐতিহাসিক উপন্যাস
৪৫৩	১৭	হিলালয়ের ধ্যান	হিমালয়ের ধ্যান
৪৭৩	২	প্রর্ভক্য	প্রতর্ক্য
৪৯৮	১০	শ্রষ্টা	স্রষ্টা
৪৯৯	২৬	বৃটিশ অ্যাসোসিয়েশন	বৃটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন

লক্ষণীয় : * কয়েকটি ক্ষেত্রে টাইপ পড়ে গেছে বা অস্পষ্ট ছাপা হয়েছে বটে তবে পাঠে খুব বেশি অসুবিধে হবে না বলে মনে করি।
* কয়েকটি পাতায় 'স্পর্টকিত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পড়তে হবে 'স্পাটিকৃত'।